আহীর



বনলতা

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১নং নিতাই বাবু লেন, কলকাতা-৭০০০১২
মুদ্রক : শ্রীযুগল কিশোর রায়, শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস, ৫২ এ, কৈলাস বসু
স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আহীর আজ চলে গেল। আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। দু বছর আমাদের দেখা হবে না। দু বছর; না দু যুগ! ভাবলেই মনে হচ্ছে আমার শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ ক্রমশ থেমে আসছে। মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন দপ্‌দপ্‌ করছে এত দিন থাকব কি করে ওকে না দেখে! আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে, আমি পারছি না। একটু কাঁদিতে চাইছি কিন্তু পারছি না। কান্নাটা গলার কাছে এসে তালগোল পাকাচ্ছে। আজ আগ্রায় ওর শেষ দিন। ওখান থেকে ট্রেনে ম্যাড্রাস তারপর বাই প্লেন আন্দামান। গত তিন দিন আগে আমিই ওকে তুলে দিয়ে এসেছিলাম কালকা মেলে। এই তিন দিন আমার যে কিভাবে কেটেছে সে শুধু আমিই জানি। সে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। এতদিন বুঝিনি ভালোবাসলে এত কষ্ট পেতে হয়। এত যন্ত্রণা বাসা বাঁধে বুকের মধ্যে। এটাই বুঝি ভালোবাসার একমাত্র প্রমাণ। যেমন আমার যন্ত্রনা আমাকে নিশ্চিত করে দিচ্ছে আমি আহীরকে ভালোবাসি। ভীষণ ভালোবাসি। প্রতিনিয়ত আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ওর কথা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার আত্মার সবটুকু স্থান দখল করে আছে আহীর। ওকে বাদ দিয়ে আমি নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি না। কি আশ্চর্য! আমি খুঁজতে চাইছিও না। আমার আত্মা এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে লীন হয়ে যেতে চাইছে আহীরের মধ্যে। সে শক্তিকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। বাধা দিতেও চাই না। নদীর কূল ছাপান বানের তোড়ের মত ভালোবাসার স্রোতে আমিও ভেসে যেতে চাই খড়কুটো হয়ে। কি অনাবিল সুখ তাতে! কি অপূর্ব যন্ত্রণা!

আজই আহীরকে একটা চিঠি লিখি—

প্রিয়বরেষু আহীর,

To Andaman
From Calcutta

আজ তের তারিখ। তোমার ড্রিম ল্যাণ্ডে রওনা হবার দিন। এখন ঘড়িতে ঠিক নটা দশ, কি করছ এখন কে জানে? গত তিন দিন ধরে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করেছ! বড়লোক বন্ধুর ডিনার পার্টিতে দামি মদের স্বচ্ছ পেয়ালায় চিয়ার্স এর ঢেউ তুলে মজা করে সুরা পান করেছ! না-না আমি রাগ করে বলছি না। তুমি তো লক্ষ্মী ছেলে। আমি জানি তুমি এ-এ-এ একটু খানি খাবে। (আমার এ জানাটাকে মিথ্যে করে দিও না যেন।) তুমি তো আর মাতাল নও। আর এটা তোমার নেশাও নয় যে আকণ্ঠ পান করে বেসামাল হবে। তাছাড়া এতগুলো বছরেও কোন নারী যখন তোমাকে বশ করতে পারল না, সেখানে ঐ তরল পানীয়টির কি এমন ক্ষমতা ব'ল যে তোমার মত একজন দৃঢ়চেতা পুরুষকে বশীভূত করবে! (সত্যি, ভাবলেই আমার গর্ব হয়।) কি, ভুল বললাম? আশা করি, না।

এ কদিন আমি কি করেছি জানতে চাইবে না? না থাক, বলব না। তবে নতুন কিছু লেখা তো দূরঅস্ত, এক লাইন পড়ার কথাও মনে হয়নি। এই আজ তোমার

চিঠি লিখতে বসেছি। মনে পড়ছে, আজ থেকে ঠিক তিন মাস আগে এমনই একটা তের তারিখে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম আমার এ শরীরের চোখ দিয়ে। মনের চোখ দিয়ে দেখেছি তারও আগে। অনেক আগে। এখন সেই সব স্মৃতি নাড়াচাড়া করেই আমার দিন কাটে। তুমি চলে যাওয়ার পর রোজ রাত্রে একা একা ছাদে ঘুরে বেড়াই। এক তলার কংক্রীটের পিলার বেয়ে আমার প্রিয় জুঁই ফুলের গাছটা উপরে উঠে এসেছে। তারই থোকা থোকা সাদা ফুলে ছেয়ে আছে গোটা পিলারটা। বেপরোয়া ভাবে বাতাসে ভেসে বেড়ায় জুঁই ফুলের মাদকতা। সেইসব নিরেট রাতের নিঃশব্দতা আমার মনকে ভীষণ ভারাক্রান্ত করে তোলে। আর মাঝে মাঝে সেই নিরবতার বুক চিরে অচেনা অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে আসে এক একটা এয়ার ক্রফ্‌ট। মনে হয় দু-হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ওরা উড়তে উড়তে খানিক পরেই হয়ত তোমার ঘরের উপর দিয়ে চলে যাবে। তুমি হয়ত তখন বিছানায় শুয়ে কোন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছ বা মান্না দের গান শুনছ। কিন্তু তাদের ঐ চাপা আওয়াজে এতক্ষণ স্মৃতির আনাচে-কানাচে আমার মনের যে ভবঘুরে কল্পনাগুলি বল্গাহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। সৃষ্টি হয় একটা মন কেমন করা পরিবেশ। আজকাল তো রাতের খোলা আকাশের তলায় দাঁড়ালেই মনে হয় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে বসে আছি। আর আমার বাঁ দিকের চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে তুমি ঘুমাচ্ছ। কিন্তু ভ্রম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে বাঁ দিকে তাকাই না। ঘাড় ঘুরিয়ে যদি তোমাকে দেখতে না পাই। চোখ বন্ধ করে বসে থাকি। মনে হয়, এই বুঝি তুমি ধাক্কা দিয়ে বলবে, "এই, কি হল দেখছ না! ও বুঝেছি তুমি চাঁদ দেখবে বলে বসে আছ।" 'আমি বেশ বুঝতে পারি আমার হাত দুটো ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বাঁ হাতটা তোমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, "আমার হাতটা একটু ধরবে?" অপেক্ষা করে থাকি তোমার উষ্ণ স্পর্শের জন্য। শুধুই অপেক্ষা। কখনো না-শেষ হওয়া অপেক্ষা। ও ভাবেই আচ্ছন্ন গ্রন্থের মত কেটে যায় অনেকটা সময়। বুকের মধ্যে একটা মিষ্টি যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকি একা একা। বহুদূর থেকে ভেসে আসে একটা অস্পষ্ট নারী কণ্ঠ। হিন্দীতে অনর্গল কি সব যেন বকে চলেছে। তোমার মনে পড়ে আহীর, সেদিন নন্দনে বসে গাইছিলে, 'কটা রাত কাটিয়েছ জেগে/স্বপ্নের মিথ্যে আবেগে…।' গানটা আমিই গাইতে বলেছিলাম। কেন জান? কারণ এখন আমার বিনিদ্র রাতগুলো যে শুধু স্বপ্নের মিথ্যে আবেগেই কেটে যায়। ভাবি, হোক না মিথ্যে। তবুও তো তোমাকে ঘিরে কিছুটা সময় মনের আঙিনায় চলে অলীক নাড়াচাড়া। রহস্যময় আলো আঁধারির মধ্যে নাটকীয় সন্তর্পনে চলে মন দেওয়া নেওয়ার আয়োজন। কিছুক্ষণ স্বপ্নকে সত্যি ভেবে না পাওয়ার যন্ত্রণাটা 'তোমাকে পেয়েছি'র আনন্দে লীন হয়ে যায়। তোমার শরীরের ঘ্রাণ মিশ্রিত বুক ভরা দম নিয়ে বলি, 'কত সুখী আমি।' তারপর এক সময় বাস্তবের কর্কশ হাতের চাপে সে কল্পনার রঙিন স্বপ্নের জালগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চোখের সামনে চকচকে দুধ সাদা সুখের মুক্তগুলো

বায়ুর বুদবুদ হয়ে মিলিয়ে যায় প্রকৃতির অবগুণ্ঠনের আড়ালে। তারপর এই অবুঝ মনটা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় বেশ কিছুক্ষণ। হাতড়ে মরে মহাশূন্যের চোরা গলিতে। এ ভাবেই ক্লান্তির সুরে ভরা আমার নিস্তরঙ্গ জীবন রাত্রির আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য এ গুমরে কাঁদার শব্দ কারুর কানে গিয়ে পেঁছিয় না। কেবলই বুকের পাঁজরে ধাক্কা খেতে খেতে নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনি তুলে তলিয়ে যায় আত্মার অতল গভীরে। না আহীর, আমার চিঠি মানে কেবল সুন্দর সুন্দর কথার বুনোটে তৈরী কয়েক ছত্র লেখা বা কয়েকটা পৃষ্ঠা নয়। আন্তরিকতা না থাকলে এভাবে চিঠি লেখা যায় না বন্ধু। চিঠিতো অনেকের কাছে লিখেছি। কিন্তু তুমি ; তোমার কাছে…এই—এই আহীর, কি ব্যাপার এত গম্ভীর হয়ে গেলে যে! দে'খ আমার দিকে। ধ্যাৎ! এই জন্য তোমায় কিছু বলি না। তুমিই তো শুনতে চেয়েছিলে আমার কথা। বলেছিলে আমি কেমন থাকি তোমার জানা দরকার। তবে এখন সইতে পারছ না কেন? আচ্ছা বেশ আর বলব না। এবার বরং তোমার গানের কথায় আসি। সত্যিই তোমার গলায় সুর আছে। তুমি শিল্পী। তোমাতে রয়েছে ছন্দের সাবলীল ওঠা পড়া। এ অমূল্য গুণ সকলের থাকে না আহীর। ঈশ্বর তোমাকে ধন্য করেছেন এ গুণে দিয়ে। তুমি তার অপব্যবহার কো'র না। জান, আজ আমি একটা নতুন কাজে হাত দিলাম। গত দু মাস ধরে নিজেকে একটু একটু করে তৈরী করছিলাম এ কাজটা শুরু করার জন্য। কি, জানতে ইচ্ছে করছে তো? বলব মশাই বলব। তোমাকেই বলব, আর কাউকে যে একথা বলা যায় না গো। এ যে শুধুই আমার। এর ভাগ তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই দিতে পারি না। এই মুহূর্তে তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। এ পার্থিব দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই একাই শুরু করলাম এ পথ চলা। পথের শেষে কি আছে জানি না। আমার অবচেতন মন বলছে, পথের শেষে আমি তোমার দেখা পাব। Yes You, Mr. Ahire Kumar Basu. আর আমার চেতনাগ্রস্থ মন বলছে, Impossibla. নিশ্চই বুঝতে পারছ এখন আমি চেতন আর অবেচেতন মনের টানাপোড়েনে বিদ্ধস্ত।

যাক, এবার শেষ করি। ইচ্ছে করেই চিঠিখানা আর বড় করলাম না। তোমার ড্রিমল্যান্ড কেমন লাগছে—মানে কতটা ভালো লাগছে জানিও। আর এ চিঠি আন্দামানে কবে গিয়ে পেঁছিয় অবশ্যই জানিও। কারণ তারিখ দেখে মোটামুটি একটা অনুমান তো করতে পারব যে তুমি আমার থেকে কতটা সময় দূরে আছ। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা. গতদিন তুমি বলছিলে না, যে আমাকে ভালোবাসতে পারছ না বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে। কি, মনে পড়ছে? নন্দনে লেকের ধারে বলেছিলে। আরে বাবা এটাই তো ভালোবাসা। কে বললে তুমি আমায় ভালোবাস না? নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছ কোনদিন? যদি না করে থাক একদিন সংগোপনে নিজেকে প্রশ্ন করে দে'খ তোমার অন্তর কি জবাব দেয়। দেখবে আর কোন কষ্ট নেই। আহীর, আমার অভিমানী মন তোমাকে কি বলে জান?—'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবেসে যাব, তুমি অবসর পেলে বেসো॥'—সমি

চিঠিটা খাম বন্দী করে তার উপর গাল ঠেকিয়ে শুয়ে আছি। খামের উপর আগেই নাম ঠিকানা লেখা ছিল। আমি যেন অনুভব করছি ওর নামের পরশ। ভালো লাগছে। অনেকক্ষণ এভাবে রয়েছি। ভাবছি, ম্যাড্রাস মেল ক'টায় কি জানি! আচ্ছা, আহীর এখন কি করছে! লাগেজ নিশ্চই আগের দিন রেডি করে রেখেছিল। ওকে নিশ্চই ওর বন্ধুরা স্টেশান ছাড়তে আসবে। আমার কান্না পাচ্ছে—আমি কাঁদছি বিছানায় উপুড় হয়ে। ঘরের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি ট্রেনের চাকার ঘড়ঘড়ানি। সে শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে পাল্লা নিয়ে বাড়ছে কান্না। চাপা অথচ দুর্বার। শুনতে পাচ্ছি, 'সমি, সমি কি হয়েছে—'

মার গলা। বুঝতে পারছি আমার আশে পাশেই কোথাও মা দাঁড়িয়ে আছেন। ঠিক তাই। মাথায় হাত রাখলেন মা। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কি হয়েছে রে মা? কাঁদছিস কেন?'

এ প্রশ্ন এর আগেও অনেক বার করেছেন। কোন সদুত্তর পান নি। তবু মায়ের মন, মেয়েকে কাঁদতে দেখে কোন্ মা ই বা চুপ করে থাকতে পারেন। কিন্তু ততক্ষণে আমার কান্না গেছে উবে। আমি খামটা লুকোবার চেষ্টা করছি। মার চোখে সব সময় চশমা থাকে তাই ওর নামটা পড়ে ফেলা অসম্ভব কিছু না। তাছাড়া কার চিঠির উপর মাথা রেখে মেয়ে কাঁদছে! মনের কোণে সন্দেহ দানা বাঁধতেই পারে। সেটাই তো স্বাভাবিক। তাড়িঘড়ি করে বললাম, 'কিছু হয়নি। তুমি যাও।'

'কিছু হয়নি তো কাঁদছিস কেন?'

'এমনি, তুমি যাও।'

ভাবটা এমন, যেন মা বাইরে গেলে তবেই আমি দম নেব। মা জানেন এমনি কেউ কাঁদে না, তবুও উনি বেরিয়ে গেলেন। আমি আর কাঁদছি না। চিঠি গোপন করার চেষ্টায় তখন ব্যস্ত। হঠাৎ-ই শুনতে পেলাম বাইরের গেটের শব্দ। মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন। এই মুহূর্তে আমি ঘরে একা। এটাই যেন চাই-ছিলাম অনেকক্ষণ থেকে। একটু একা থাকতে; একটু প্রাণ ভরে কাঁদতে। কী অদ্ভুত! কোথা থেকে বাঁধ ভাঙা কান্না এসে আছড়ে পড়ল আমার বুকে। আমি আবার কাঁদছি; পাগলের মত। দু হাতে মুখের উপর চেপে ধরেছি চিঠিটা। বুঝতে পারছি ওটা দুমড়ে-মুচড়ে ভিজে যাচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই ওটাকে রক্ষা করতে পারছি না আমার আবেগ থেকে। নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না, আহীর তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তিন দিন আগে। তাহলে কেন এত কষ্ট হচ্ছে আজ! কেন পারছি না নিজেকে সামলাতে! কী বিপদ! এই অবস্থায় মা যদি আমাকে দেখে ফেলেন! না না—আমি কিছুতেই ধরা দেব না। চিঠিটা বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রাখলাম। মার গলা তখনও শুনতে পাচ্ছি। কি বলছেন বুঝতে পারছি না। পাশের বালিশটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। একটা অবলম্বন চাই। একসময় বুঝতে পারলাম ভিতরটায় ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছে এক অপার্থিব তৃপ্তি।

রোদনেও সুখ আছে। সে সুখ আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করছে—ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে আমার অশান্ত বেদনা বিধুর মনকে। নাঃ, আজ কিছুতেই এ চিঠি পোস্ট করতে পারব না। বিছানার সাথে লেপ্টে আছে শরীরটা। বালিশ থেকে মাথাই তুলতে পারছি না বাইরে যাব কি করে! অসম্ভব। ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেলাম কপালে—'এখনো কাঁদছিস সমি!'

আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছি। মাকে দেখতে পাচ্ছি না। কপালে হাত রাখার সাথে সাথেই চোখ বন্ধ করে নিয়েছি। লঙ্কা বাটার মত জ্বলে যাচ্ছে চোখ দুটো। পাশে বসে মা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাচ্ছেন, 'চুপ কর, তোর কি হয়েছে পরিস্কার করে বলছিস না। এভাবে কান্নাকাটি করলে অসুস্থ হয়ে পড়বি যে। খারাপ সময় বেশী দিন থাকে না সমি। ধৈর্য্য ধর তোরও সুদিন আসবে। ভালো করে লেখ ওরা নিশ্চই ছাপবে তোর গল্প।'

মার কথাগুলো আমি শুনতে পাচ্ছি। যেন অনেক দূর থেকে অতি কষ্টে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। কিছুটা অস্পষ্ট। আমি শান্ত হয়ে গেছি—কিন্তু মার কথা শুনে নয়। আমি বন্ধ চোখে তখন যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আহীরকে। তবে জায়গাটা অচেনা—ও রকম জায়গায় কোন দিন দেখা হয়নি আমাদের। তা না হোক, জায়গায় কি এসে যায়! আমি তো আহীরকে চাই। ঐ তো—ঐ তো আমরা দাঁড়িয়ে আছি: মুখোমুখি। আহীর দু হাতে আমার মুখটা তুলে ধরেছে। সান্ত্বনা দিচ্ছে—'কেঁদোনা সমি; আমি তো আবার আসব। দু বছর তোমাকে না দেখে আমিই কি থাকতে পারব না কি!'

আমি কিছু বলছি না; শুধু কাঁদছি। কি অসম্ভব ব্যাপার! নিজেই নিজেকে কাঁদতে দেখছি। আমি দু হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছি ওর কব্জি দুটো। বুঝতে পারছি আমার মুঠো ফাঁকা। বিছানায় পড়ে আছে অসাড় হয়ে। অথচ এক অবাস্তব সত্যতার সঙ্গে অনুভব করছি আহীরের পালস্ বিট। ওর শরীরের উষ্ণতা। আমার মুখে ওর নিঃশ্বাস পড়ছে। আমি শান্ত। সারা মুখে চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে টান ধরেছে। আমি কোন উত্তর দিচ্ছি না দেখে মাও থেমে গেছেন। বালিশে মুখ গুঁজতে কেমন ভিজে ভিজে ঠেকল। বুঝলাম আমারই করুণায় ওটি সিক্ত হয়েছে।

মা পাশ থেকে উঠে গেলেন—'অনেক বেলা হয়ে গেছে উঠে পড়, আর শুয়ে থাকিস না।'

এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। এর আগেও ঘটেছে। আমার যন্ত্রণা যখনই অসহনীয় হয়ে উঠেছে তখন এমনি করে অতীত আর বর্তমানের মাঝে, বাস্তব আর কল্পনার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে এক অদৃশ্য সেতু। এই সেতুর পথ ধরেই আহীর বার বার এসে শান্ত করে যায় আমাকে। মুক্তি দেয় দুঃখ দহন থেকে। একটু আদরে ভরিয়া দেয় তপ্ত হৃদয়। এ যে আমার প্রাণের অহঙ্কার। আহীরের প্রতি আমার অপরিমেয় ভালোবাসা পরিমাপ করার ব্যর্থ চেষ্টা করি। ক্লান্ত হই—আবার চেষ্টা করি। এ কথা আহীরকে কোনদিন বলিনি। আমি জানি, যুক্তি দিয়ে এ সত্য

বিচার করতে গিয়ে ও হোঁচট খাবে। অনুভূতির এ সূক্ষ্ম গ্রন্থী খুলতে গিয়ে জট পাকিয়ে একাকার করে ফেলবে। কারণ ওর ভালোবাসা এখনো সুপ্ত। আমি জানি স্থূল অর্থেও আমাকে ভালোবাসে না। এই তো সেদিন বলল—'সমি, তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তোমার সঙ্গ ভালো লাগে, কিন্তু তোমাকে ভালোবাসতে পারি না। বিশ্বাস ক'র, আমার কি যে কষ্ট হয় একথা ভাবলে!'

কি করে বোঝাই ওকে! এটাই তো ভালোবাসা। আহীরের শুক্তি হৃদয়ে গোপনে নিদ্রিত আছে ওর মুক্ত সম ভালোবাসা। আমার আত্মা দেখতে পাচ্ছে তার সেই স্বর্গীয় দ্যুতি। আমি যেন যুগ যুগ ধরে তপস্যা করছি ঐ দ্যুতির জ্যোৎনায় পুন্যস্নাত হব বলে। হাজার হাজার বছর ধরে আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—"প্রতীপ্-প্রতীপ্—প্রসন্ন হও।"

⁂

সেই দিনটা কি বার ছিল আমার ঠিক মনে পড়ে না। নাঃ, কত তারিখ তাও খেয়াল করতে পারছি না। তবে, এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকের কোন একটা দিন হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় পাতা ওল্টাচ্ছি। গত সপ্তাহের পুরানো কাগজ। গল্পগুলো সব পড়া হয়ে ওঠেনি; কিন্তু আমি দেখছি বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো। কে নাম পদবি বদলালো—আমি পাঁচুরাম পাকড়াশি গত এত তারিখে আলিপুর নোটারি এফিডেভিটে পেলারাম পাকড়াশি হইলাম। কেউ কেউ তো আবার নামের সাথে সাথে পৈত্রিক সম্পত্তি মানে বাবার পদবিটাকেও বদলে ফেলেন। সে ফেলুক্ গে আমার তাতে আপত্তি নেই। আমার তো এগুলো পড়তে বেশ লাগে। ভাবি, মা বাবা অথবা দাদু ঠাকুমাদের দেওয়া ব্যাকডেটেড নাম ছেলে মেয়েদের পছন্দ না হলেই বোধ হয় পাল্টায়। তবে এক এক সময় দেখি ভালো নাম বদলে একটা অগামার্কা নাম ধারণ করছে। তখন ভাবি, ইস্ এর পছন্দ বলে কিছু নেই। সেই যখন টাকা পয়সা খরচ করে নাম রাখা তখন একটা ভালো নাম রাখলে কি হয়! মনে হয় খুঁজে পায়নি। আমাকে জিগ্যেস করতে পারত—হেভি হেভি নাম বলে দিতাম। এবার চোখ পড়ল নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র—'রমলা তুমি ফিরে এসো। যা চাইবে তাই হবে। মা অসুস্থ।' হ্যাঁ; ছবি দেখে মনে হচ্ছে বয়স এই পনের ষোল হবে। কাঁচা বয়স। মনে হয় লুকিয়ে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তারপর যা হয় আর কি—ঘরওয়ালে বিয়ে দিতে নারাজ; অশান্তি, অভিমান, একসময় সুযোগ বুঝে বয় ফ্রেণ্ডের হাত ধরে কাট্। কিছুদিন অজ্ঞাত বাস আর দেবীর চরনে ফুল পড়ার মত খবরের কাগজ খুলে ইন্তেজার। কবে ডাক আসে—তারপর শাঁখা সিঁদুর পরিহিতা নব পরিনীতা মেয়ে, জামাই-এর হাত ধরে বাপ মার পায়ে এসে টিপ্ করে পড়বে। ব্যাস্, বিয়ের খরচা অর্ধেক বেঁচে গেল। তবে ছেলের—বাপ ছাড়ার পাত্র নয়। খাট বিছানা থেকে শুরু করে দান সামগ্রী ছেলে মেয়ের চাচ্চার গয়না। আবার যদি শীতকাল হয় তাহলে একটা লাল

শালুর লেপ। বর্ষাকাল হলে কে. সি. পালের ছাতা সবই কড়ায় গণ্ডায় উসুল করে নেবেন। এ সব ব্যাপারে নো কম্পিসডার। হোক না লভ ম্যারেজ—ম্যারেজ তো বটে। আর মেয়ের বাপকেও বলি—সেই তো বাপু মেনে নিলেন, এত ভ্যানতারা করার কি ছিল! আপনি জানেন না আপনার স্ত্রীর হার্টের প্রবলেম! কোলচাঁচা মেয়ে পালালে কোন মা-ই বা বুক বেঁধে থাকতে পারেন! শুধু শুধু সিন্‌ক্রিয়েট করে চাড্ডি হ্যাপা পোয়াতে হল। তার উপর আবার ডাক্তারের ফি, ওষুধ খরচা। তবে ভুত ভোজন থেকে বেঁচে গেলেন এই আর কি, মানে ফোঁড়াটা ফুসকুড়ির ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেলেন। আর ফুঁসকুড়িই বা বলি কেন—জল ঘামাচি বলাই ভালো। কারণ মেয়ের পাত্র খুঁজতে খুঁজতে জুতোর শুকতলা খইল না। মানে কয়েক জোড়া চটির দাম তার সঙ্গে অ্যাড করুন গাড়ি ভাড়া প্লাস মিষ্টি খরচ, বাহ্ঃ! এ যে শাপে বর হয়েছে দেখছি। আপনারও আপনার মেয়েরও। লোকসান কিছু হয়নি। যত লোকসান পড়শীদের। দু পাত খাবে বলে যারা হাত ধুয়ে বসেছিল উল্টে এখন তারাই আপনাদের খাওয়াচ্ছে। রাজভোগ নয়, গাল। তবে চিন্তার কারণ নেই; এই কলিযুগে কারুর এত পাওয়ার নেই যে গাল অভিশাপ বাস্তবে ফলবে। তবে আপনার অমূল্য সম্মান নিয়ে টানাটানি হল তো তাই বলছিলাম। জানেনই তো আজকালকার ছেলে মেয়েরা কি রকম! সব এক একটা ছিনে জোঁক, তাদের যত নিষ্ঠা সব প্রেমে নিবদ্ধ। একটু কলকাতার সাইডে যান দেখবেন সব জোড়ায় জোড়ায় এঁটুলির মত একে অপরের সাথে সেঁটে বসে আছে। ছিঃ! দেখতেও লজ্জা। ওদের আর কি ওরা তো আর দেখতে পাচ্ছে না। ওদের চোখে তখন প্রেমের অনন্ত কুয়াশা। নিজেদের শরীর দুটো ছাড়া বাকি সব ঝাপসা। হাতে হাত—চোখে চোখ—ঠোঁটে ঠোঁট—যাঃগে, আর এগোন ঠিক হবে না। আরে বাবা, প্রেম করনা কে বারণ করেছে; এটা তো বয়সের ধর্ম। বরং না করলেই আজকাল লোকে অসুস্থ বলবে। একটু ছাড়াছাড়ি বসলেই তো হয়! কথা বল, গল্প কর, নিদেন পক্ষে হাসাহাসি করতে গিয়ে একে অপরের গায়ে পড়ে গেলি বা ধরে প্রোটেক্‌শান নিলি। এগুলো মেনে নেওয়া যায়। তা না, চার দেওয়ালের মধ্যে অন্ধকারে ঘটমান 'A' মার্কা সিন গুলোকে প্রকাশ্য দিবালোকে একেবারে রাস্তার চারমাথার মোড়ে টেনে এনেছে। আমার ভালোমানুষ গাতৃভূমিটাকে একেবারে ফরেন কান্ট্রি করে ছেড়েছে। যত সব কুলাঙ্গারের দল। নাঃ! এবার সরকার থেকে একটা নিয়ম করা উচিত। যেমন আইন করে ছেলে মেয়েদের বিয়ের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সে রকম প্রেমের বয়সও বেঁধে দিতে হবে। আর নির্দ্দিষ্ট বয়সের আগে কেউ প্রেম করলে হয় তাকে বিশাল একটা মূল্যের জরিমানা দিতে হবে তা না হলে যতদিন না প্রেমের বয়স হয় ততদিন সশ্রম কারাদণ্ড। নো বেল, নো ছাড়াছাড়ি। যত সব পরিবেশ দূষণের পাণ্ডা। দু দিন জেলের ঘানি ঘোরালেই সব প্রেম চটকে যাবে। পুঁচকে পুঁচকে ছেলে মেয়েগুলো প্রেম পত্র লিখতে গিয়ে কত যে বানান ভুল করে তার ঠিক নেই, তবুও লিখবে। যেন প্রেম করার জন্যেই এই ধরণীতে আবির্ভাব ঘটেছে ওদের।

অ্যাঃ! এক একটা প্রেমের ঠাকুর। কিছু বলারও জো নেই। এমন সব ডেঁপো, বলবে, কৃষ্ণ ও তো একগাদা প্রেম করেছিল। টি. ভি. তে যখন কৃষ্ণের প্রেমলীলা দেখায় তখন তো গদ গদ চিত্তে সংবাদ রাবড়ির মত কোঁৎ কোঁৎ করে গেলো। তার বেলা? বোঝ ঠ্যালা, এ যেন সেই—'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ কর তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ কর, তার বেলা?''—আরে বাবা কৃষ্ণকে তোরা শুধু প্রেম করতেই দেখলি? ও যে ভিলেনের মত অ্যান্টিসোসাল মামাটাকে সাবাড় করে মথুরায় শান্তি পুনঃস্থাপন করল, সেটা তোদের নজরে পড়ে না? সবচেয়ে বড় কথা কুরুক্ষেত্রের মত একটা অতবড় ওয়ারে ছোঁড়াটা কি পাকা হাতেই না ড্রাইভারিটা করে বেরিয়ে গেল। আর যার তার ড্রাইভার নয়, অর্জুনের মত মহারথীর ড্রাইভার। যে অর্জুন যুদ্ধের স্পেশাল আর্মস আনতে আর অজ্ঞাত বাসের ট্রেনিং নিতে স্বর্গে গিয়েছিল। আর সর্বোপরি ঐ জ্ঞানের কথাগুলো—আত্মা অমর—জলে ডোবে না, অস্ত্রে ছেঁড়ে না, আগুনে পোড়ে না ইত্যাদি প্রভৃতি। এগুলো কি শুধুই কথার কথা! তোরা পারবি এরকম কথা বলতে? তোরা তো বলিস—তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। পাগল হয়ে যাব। বাবা মা জাহান্নামে যাক গে; আমি তোমাকে নিয়ে কাশ্মীরে যাব—শাম্মী কাপুরের মত ইয়া হু করব আর বরফ ছুঁড়ব। অবশ্য মনি রত্নমের রোজা দেখার পর কেউ সহজে কাশ্মীরে যাওয়ার কথা বলে না। সে যাগ্‌গে! আরও অনেক জায়গা আছে। এত সব দুরূহ কাজ করার পর একঘেয়েমিকতা কাটাতে কৃষ্ণ যদি একটু প্রেম করেই থাকে তাতে ক্ষতিটা কোথায়। দেবতা বলে কি তার এন্টারটেন্‌মেন্টের দরকার নেই! আর এখানে তো মেনোকা রম্ভারা নেই যে নেচে গেয়ে ওর প্রাণ জুড়োবে! আর সে যুগে বায়স্কোপ থিয়েটারও ছিল না যে শ্রীদেবী মিনাক্ষীদের নাচ দেখবে। এত অসুবিধা সত্ত্বেও-ও যে এই অছেন্দা পৃথিবীতে প্রবলেম সল্‌ভ করতে এসেছিল সেই বড় ভাগ্য। যত সব অকৃতজ্ঞের দল, কথায় কথায় নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম নিয়ে টানাটানি, খোঁটা দেওয়া। ছিঃ!

কিন্তু এ ভদ্রলোকের আবার কি হল! এনার তো প্রেমের বয়স কেন বিয়ের বয়সও কবে ডানা মেলে ফুড়ুৎ হয়ে গেছে। যুবকও নন্ যে বেকারত্বের জ্বালায় গৃহত্যাগ। বাচ্চা ছেলেও নয় যে কেউ মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। রঞ্জিত মণ্ডল তুমি ফিরে এসো—ও! সেই একই ছক। এই সব বুড়ো হাবড়া লোক-গুলো কেন যে বাড়ি ছেড়ে পালায় বুঝি না বাপু! তবে হ্যাঁ, মানসিক ভারসাম্যহীন হলে আলাদা ব্যাপার। তিনি তো জানেনই না কোথায় যাচ্ছেন, বাড়ির দিকে, না বাড়ি থেকে দূরে। অচেনা জায়গার গোলক ধাঁধায় লাট্টুর মত পাক খেতে থাকেন। আমার চোখও পাক খাচ্ছে। বিউটি পার্লার—শৈলবাস—কর্মপ্রার্থী ঘুরে আটকে গেল বৃদ্ধাশ্রমে এসে। নাহ্! আপাতত দরকার নেই, বুড়ো বয়সে ভেবে দেখা যাবে। অটোমোবাইলটাকে অ্যাম্বুলেন্স পড়ে ভুল করলাম। হোটেল—রেস্টুরেন্ট-হলিডে হোম—স্মৃতির উদ্দেশ্যে—ইয়েস, এ আমার এক অদ্ভুত কৌতুহল। মৃত ব্যক্তিদের

উপর আমার শ্রদ্ধা বহাল রেখেই বলছি, এগুলো কাগজে দিয়ে কি লাভ! একমাত্র কাগজওয়ালা ছাড়া আর কারুর লাভ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। এ খবর কি ঐ সব মৃত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে পেঁছয়! যতদূর জানি স্বর্গ নরক যেখানেই ওনারা থাকুন না কেন, কোন হকার-ই এসব নিউজ পেপার নিয়ে সাত সকালে ক্রিড়িং ক্রিড়িং সাইকেলে বেল মারতে মারতে পেঁছে দিয়ে আসতে পারেন না—ইমপসিবল্। এক একসময় তো দেখি কুত্তা-বিল্লির মৃত্যুবার্ষিকিতেও কাগজে ঘটা করে ছবি দিয়ে স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান হচ্ছে। তখন মনে হয় ওরা আমার চেয়েও ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। একই কাগজে একই কলামে একই ভাবে মানুষের সঙ্গে বসে তারাও প্রিয়জনদের শ্রদ্ধার ভাগীদার হচ্ছে। সত্যি কি ভাগ্য! না না সৌভাগ্য। "সিরিয়ালের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই। শুটিং-এর মাধ্যমে অভিনয় ডান্স শিখিয়ে টি ভি ফিল্মে সুযোগ।" বেশীর ভাগ ভাঁওতা। পড়লেই লোভ লাগে। মনে হয় গেলেই সব বড় বড় সুযোগ অপেক্ষা করছে, খপাখপ্ ধরব আর অভিনয় করব। কিন্তু আমি গিয়ে দেখেছি। কাগজ পড়ে যতটা আশা জাগে ওখানে গেলে তার কনামাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য আমি যেখান থেকে অভিনয় শিখেছি সেটা এই কাগজের অ্যাড দেখেই গিয়েছিলাম। সেটা একটু উৎকৃষ্ট মানের। না না আমার ইন্সটিটিউট বলে পারসিয়ালিটি করছি না। তবে আমার লাভ না হোক কোন ক্ষতি হয়নি। অবশ্য একটু ধৈর্য্য ধরে থাকলে হয়ত লাভ হত। কিন্তু আমার মত উচ্চিংড়ির দ্বারা এসব হবার নয়। অত ধৈর্য্য আমার নেই। এ ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে রবীন্দ্রভারতীর ট্রেনারের সামনে আমরা অভিনয় করছি। কোন্ ডায়লগের উপর অভিনয় করা হবে সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। আমি আমার ব্যাগ থেকে তখন বের করে দিলাম 'বহুরূপী' ম্যাগাজিন। স্যার সেটা নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে বের করলেন একটা নাটক। সৌমিত্র বসুর 'অনুপ্রবেশ'। ওটা আমার আগেই পড়া ছিল। কিন্তু সকলের তো পড়া নেই তাই স্যার প্রথম থেকে খানিকটা পড়ে শোনালেন সবাইকে। তারপর বললেন—'থিমটা এই থাকবে। ডায়লগ হুবহু বই-এর মত না হলেও চলবে। মোটামুটি ইম্প্রুভাইজেশন করে অভিনয় কর।'

সবাই চুপ। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওই করছে।

'কি হল ওঠ ওঠ। এ রকম লজ্জা পেলে অভিনয় করা যায় না।'

স্যার নীরব ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান মিশ্রিত তাড়া লাগাচ্ছেন। কিন্তু কেউ ওঠে না। হঠাৎ দেখি দিলুদা উঠল—স্যার বলছেন—'ইয়েস, এবাধ মেয়েদের থেকে কেউ উঠে এস।' কি বিপদ, কেউ উঠছে না। এবার স্যার রেগে গেলেন, 'কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?'

দিলুদার দিকে তাকালাম। উনি পত্নীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ বউ হতে চাইছে না বলে ওর মুখটা কি করুণ লাগছে! না না য্যাঃ! এ আমার চোখের ভুল। আমি মনে মনে প্লট-টা ভাবছি।—একটা যুবতী বউ দেড় বছরের পুরানো

স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে, আর একা একা বোর হচ্ছে। হঠাৎ ডোর বেল বাজে। স্বামী ঘরে ঢোকে। অফিস ফেরত ক্লান্ত স্বামী জল চায়। বউ এর মৃদু অভিযোগ, একা একা বাড়িতে থাকতে ভালোলাগে না। স্বামী চোখ নাচিয়ে সুবুদ্ধি দেয়—তাহলে এবার একটা হয়ে যাক। কি হয়ে যাক বুঝতে না পেরে বউ হাঁ করে থাকে। আবার দুষ্টুমি ভরা চোখে স্বামীর হালকা আভাস—ঐ যে তোমার মাসীমা না দিদিমা যা বলেছিল। এবার বোধগম্য হয়। লজ্জা মাখা মুখে স্ত্রী বলে—না না এখন ওসব থাক। এক্ষুনি অত বাড়তি খরচা তুমি সামলাতে পারবে না!

খপ্ করে আমার হাতটা ধরল। কে রে বাবা! উপর দিকে তাকিয়ে দেখি দিলুদা।—'উঠে আয়।' স্যারও গলা মেলালেন—'ইয়েস কুহেলি ওঠ ওঠ কি এত ভাবছ!' এটা আমার ভদ্র সমাজের নাম।

লে হালুয়া। দিলুদা যে আমার দাদার মত নয়, দাদাই। আর ও আমাকে নিজের বোন ভেবে ভীষণ ভালোবাসে। খুব স্নেহ করে। ওকে আমি কি করে ঐ সব স্ল্যাং কথা বাত্তারা আই মিন বাচ্ছা-কাচ্ছা হওয়ার কথা বলব! না আমি পারব না। আবার বসে পড়েছি। স্যার এসে হাত ধরে তুলে দিলেন। স্যারের আর কি! তখন অন্য মেয়েগুলোর উপর খুব রাগ হচ্ছিল। বললাম—'প্রতিদিন আমি আগে উঠব কেন, অন্য কেউ উঠুক না।' যুক্তিহীন অভিযোগ তাই টিকল না। আমি অভিনয়টা মোটামুটি ভালোই করি। ডায়লগ থ্রোইংও নাকি ভালো, না না বানিয়ে বলছি না। তবে বড্ড ভুলে যাই! ক্যামেরার সামনে নাক ধরে ডায়লগ মনে করি। সমীরদা রেগে গিয়ে বলেন—'এবার তোর নাকটাই কেটে দেব। মুখস্থ কর আগে'। আবার স্ক্রীপ্ট নিয়ে বসি। যাগ্গে অভিনয় যখন করতে এসেছি তখন এত বাদ বিচার করলে চলে না। কোন এক অভিনেত্রী নাকি নিজের কাকার সঙ্গে বেড সিন করতেও রাজি আছেন। আর আমি তো দুটো ডায়লগ বলব, পারব না! তাহলে কি শিখলাম এতদিন! নিজেকে সাহস জোগাচ্ছি; এগিয়ে যাও মিস্ অভিনেত্রী ঠিক পারবে। মনে মনে সেই অভিনেত্রীকে স্মরণ করে নেমে পড়লাম। শুরুটা খুব ভালোই হল—যদিও কেউ হাততালি দেয়নি। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দিলুদা আমাকে—এ সরি, আমার অফিস ফেরত স্বামী আমার কাছে জল চাইলেন—জলও দিলাম। নিজেরা ডায়লগ তৈরী করে অভিনয় করছি। বেশ ন্যাকামি করে বলছি—আমার একা ঘরে বোর লাগে। যদিও এ ব্যাপারটা আমার ভালো আসে না। আমার বোল্ড চরিত্রে অভিনয় করতে ভালো লাগে। এই যেমন ঝান্সী রাণী, লেডি ডক্টর, জার্নালিস্ট বা পুলিশ কমিশনার মানে কিরণ বেদী টাইপ রোল আর কি। পেলে একেবারে চুটিয়ে অ্যাকটিং করব। কথায় কথায় সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছলাম। দিলুদা চোখ নাচিয়ে বলছে—তাহলে এবার একটা হয়ে যাক। এতক্ষণ দিলুদাকে স্বামী মনে হচ্ছিল। ঐ ডায়লগটা শোনার পর মনে হল দুশ্চরিত্র। এ কি! আমার বিয়েই হয়নি ওসব হবে কোথা থেকে! মনে হল লোকটার নাকের ডগায় একটা ঘুসি মেরে দি। পাশ থেকে স্যার বলছেন—'কি হল

বুহেলি ! তোমার এক্সপ্রেশাণ কই ! তুমি স্বামীর দিকে ওরকম রেগে তাকিয়ে আছ কেন ? মনে হচ্ছে এক্ষুনি কামড়ে দেবে—'

হল ফেটে পড়ল হাসিতে। আমিও হাসছি, বোকার মত। উনি আমাকে বোঝাচ্ছেন—'এতক্ষণ তো বেশ হচ্ছিল হঠাৎ কি হল ! আরে বাবা নিজেকে বোঝাও তুমি ওর স্ত্রী।' কি করে বোঝাই ! এক সঙ্গে অনেকের মা হওয়া যায়, বোন বৌদি কাকি, মামি এভরিথিং হওয়া যায়। কিন্তু প্রেমিকা বা স্ত্রী, দূর ! ভাবতেই বিচ্ছিরি লাগে। আমার স্বামীর কথা মনে পড়ছে। কোথায় আছে কে জানে ! তবে আছে কোথাও—এইটুকুই ভরসা। আমার মনে হচ্ছে আমি মহা ফাঁপড়ে পড়েছি। কুরু রাজসভায় আমার বস্ত্র হরণ হচ্ছে। সবাই তাকিয়ে আছে আমায় দিকে। এই কলি যুগে কৃষ্ণকে তো ডাকলে আসবেন না। গত দ্বাপর যুগে তাঁর ডিউটি শেষ করে তিনি রিটায়ার্ড করেছেন। হাজার মাথা খুঁড়লেও নো পাত্তা। তার চেয়ে বরং আমার স্বামীকেই ডাকি। ওগো শুনছ—তুমি কোথায় ? আমি এখানে—'অ্যাকশান'—

চমকে উঠেছি। আমার স্বামী কি ফিল্ম ডিরেক্টার। এ রকম অ্যাকশান দিচ্ছেন কেন ! 'কি হল চমকে উঠলে কেন ?'

'ও স্যার ! সরি'।

'হোয়াট সরি'। স্যার একটু জোরেই অ্যাকশান দিয়ে দিয়েছেন।

এবার আমার কো-অ্যাকটার আমাকে সাহস জোগাচ্ছেন—'তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন বলত ? এর আগে কত শক্ত শক্ত পাঠ অবলীলায় বলে বেরিয়ে গেছিস। আর এই সামান্য ব্যাপারে এত হোঁচট খাচ্ছিস !'

দিলুদা কি একটু বাড়িয়ে বলছে ! হলেও হতে পারে, কাঁহাতক্ আর মিথ্যে স্বামী সেজে চেয়ারে বসে থাকা যায় ! ঠিক হয়েছে, সব দোষ তো তোমার। তোমায় কে বলেছিল আমাকে বউ বাছতে ! আরো তো মেয়ে ছিল। কি জ্বালা ! কেন যে মরতে অভিনয় শিখতে এসেছিলাম কে জানে !

—'স্যার দেখছেন তো আমি ভীষণ চ্যাঁটা মেয়ে আছি। আপনি অন্য কাউকে বলুন, এ আমি পারব না।'

—'আলবাৎ পারবে'। থপ্ করে থাবা বসালেন আমার হাতে। 'তোমাকেই করতে হবে, পালাচ্ছ কোথায় ! মন দিয়ে শোন, তোমাদের তো ম্যাজিক ইফ্ শিখিয়েছি। আর তুমি তো উৎপল দত্তের 'স্তানিস লাভ্স্কি' খেয়ে ব্রেখ্ট পড়েছ। কি আত্মস্থ করেছ তাহলে ? মনে মনে কল্পনা কর যদি তুমি ওর স্ত্রী হতে—নিজেকে বিশ্বাস করাও তুমি ওর স্ত্রী।'

দিলুদার দিকে তাকালাম। মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই বেয়াড়া বউ নিয়ে মহা বেকায়দায় পড়েছেন। বৌদির কথা মনে পড়ছে। যে বৌদি দিলুদার চার বছরের ছেলের মা। হাসি পাচ্ছে—'বুঝেছ ?'

ঢক্ করে ঘাড় নাড়লাম ! কিন্তু বুঝতে পারছি না কি বুঝেছি। যাগ্গে, স্যার

অ্যাকশান বলার সাথে সাথে আবার শুরু করলাম। কোন রকমে টেবিলের কোনটা চেপে ধরে কাজটা উতরে গেলাম। যেন চোখ বন্ধ করে কালমেঘ খেলাম। স্যার মুখটা বেজার করে বললেন—'ঠিক হল না। তোমার মুখে লজ্জা কোথায়? মেয়েরা মা হবার কথা শুনলে যে লজ্জা পায় সে এক্সপ্রেশানটাই পেলাম না।'

আমি তো অবাক—'কি বলছেন স্যার! আমি লজ্জার গুঁতোয়—সরি স্যার, লজ্জার ঠেলায় ডায়লগই বলতে পারছি না। সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হয়েছিল—আর আপনি বলছেন আমি লজ্জা পাইনি!'

'আরে বাবা এ লজ্জা না। মা হওয়ায় লজ্জা। সেই এক্সপ্রেশানটা কোথায়! এখানে সেটাই তো দরকার।'

নিকুচি করেছে মা হওয়ায় এক্সপ্রেশান। আমার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। নিজের জায়গায় বসে মনে হচ্ছে এভারেস্ট জয় করে এলাম। মিথ্যে মা হতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে গেছে আমার। শরীর থেকে সব স্যালাইন ওয়াটার বেরিয়ে গেছে।

'স্যার বলছেন—'নেক্সট্ কাপ্‌ল উঠে এস।'

'স্যার একটু জল খেতে যাব?'

স্যার আমায় মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাক্ করে হেসে ফেললেন, 'যাও।'

আমি বেরিয়ে গেলাম ক্লাস থেকে। ভাবছি স্যার হাসলেন কেন! উনি হয়ত ভাবছেন এই ট্যালেন্ট নিয়ে অভিনয় করতে এসেছে! ভাবুন গে, কি করব এ সব রোম্যান্টিক রোল আমার দ্বারা হয় না। সকলের সামনে রোম্যান্স! তাও আবার অন্যের বরের সাথে! ইম্‌পসিবল। নিজের বরের সাথেই কোনদিন রোম্যান্স করলাম না!

জগ উঁচু করে ঢক্ ঢক্ করে জল খাচ্ছি।

'কিরে অভিনয় করে গলা শুকিয়ে গেছে?'

'আর বলবেন না সমীরদা। এতক্ষণ যেন যাঁতা কলে পড়েছিলাম। আমার দ্বারা এসব স্বামী-স্ত্রীর রোল হয় না।'

'কে বলেছে হয় না! এই তো সেদিন কি সুন্দর করলি।'

'একদম বাড়িয়ে বলবেন না'—

'বাড়িয়ে বলব কেন! সেদিন ঝগড়াকুটি বউ এর রোলটা তুই ভালো করিস নি?'

'ওহ্! ও সব ঝগড়া টগড়া দূর থেকে করা যায়। কাছে গিয়ে রোম্যান্স করতে বললেই ম্যালেরিয়া রুগীদের মত হাঁটু কাঁপে।'

সমীরদা হাসছেন—'আচ্ছা, তোর রোম্যান্সে এত অ্যালার্জি কেন বলত? না কি মনের মত নায়ক পাস না বলে চুটিয়ে প্রেম করতে পারিস না!'

'হবে হয়ত'—

'সে কি রে!'

'না না তা—তা নয়। ভুল বলে ফেলেছি। ও আপনি যতই ভালো নায়ক দিন—সলমন খানকে দিলেও আমি ঐ কুকুরের লেজের মত বেঁকেই থাকব।'

'আচ্ছা ধর, আমার পরবর্তী সিনেমায় তোকে কাস্টিং করলাম, নায়িকার রোলে—তখন?''

'লোভ দেখাচ্ছেন?'

'না না লোভ দেখাব কেন! সিরিয়াস বলছি।'

'আমি রাজি; তবে একটা সর্ত—'

'বাবা! এগ্রিমেন্ট সাইন করলি না এর মধ্যে ডিরেক্টরকে সর্ত দেখাচ্ছিস! তোর সাহস তো মন্দ না!

এ রকম সাহসী রোলেই তো আমি অভিনয় করতে চাই।'

'আচ্ছা বেশ, বল কি তোর সর্ত, শুনি—'

'আমি নায়িকা হতে পারি; কিন্তু কোন নায়ক থাকবে না।'

'হাসালি! নায়ক ছাড়া নায়িকার কোন ভ্যালু আছে না কি।'

'কেন থাকবে না! আপনি সুপ্রিয়ার 'সিস্টার' বই দেখেন নি? ওতে তো মহানায়ক ছিলেন। উনি নায়িকাকে কি এক্সট্রা ভ্যালু দিয়েছেন? সুপ্রিয়া তো একাই অভিনয় করে বেরিয়ে গেলেন। না না, এভাবে আপনি আমাদের আন্ডার এস্টিমেট করতে পারেন না। এ অন্যায়।'

'আরে বাবা, ওটা তো স্বদেশী বই। আমি তো আর স্বদেশী বই করছি না।'

'ও! তাও তো বটে—তাতে কি হয়েছে! আপনি ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' নিয়ে নিন; যথেষ্ট হিট বই। এটা তো আর স্বদেশী না?'

'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়ক ছিল না?'

'ছিল! ও তো সো কল নায়ক। নায়িকার সাথে কম না নায়িকার বোনের সাথেই প্রেম করেছে বেশী। সুপ্রিয়া তো রেহাই পেয়ে গেছে!'

'তোর যত উদ্ভট কথা বাবা। নায়ক ছাড়া বই হিট হয়?'

'বেশ তো, নায়ক ছাড়া একান্তই যদি না চলে, তাহলে নায়ক রাখুন। কিন্তু তিহার জেলে আটকে রাখুন! আর কড়া ইন্সট্রাকশান দিয়ে দিন, নায়িকাকে নিয়ে যেন কল্পনা-টল্পনা না করে। তাহলে আবার ফুল বাগানে ছোটা ছুটি করতে হবে। সে আর এক ঝামেলা। বড় জোর হাতে একটা মাউথ অর্গান ধরিয়ে দিন, আন্ডার গ্রাউন্ডে বসে বসে যত ইচ্ছে বাজাক।'

'আর নায়িকা কি করবে?

'কেন! নায়িকাকে উকিল বা জার্নালিস্ট করে দিন। নায়ক কে জেলের বাইরে আনার জন্য সারা বইটা ধরে অ্যান্টিসোসালদের সঙ্গে স্ট্রাগল করে যাবে। এর চেয়ে আন্তরিক প্রেম আর কি হতে পারে!'

কিন্তু নায়ক-নায়িকার দু চারটে রোম্যান্টিক সিন না থাকলে বইটা যে একদম আঝালা হয়ে যাবে। আজকালকার কোপ্তা কাবাবের বাজারে কোন সুস্থ পাবলিকই য খেলে চাইবে না মা।'

'এই দেখুন। মা বলে দুর্বল করে দিলেন তো! নারী হৃদয় আমার—ঠিক হ্যায়; আপনার খাতিরে একটু কম্প্রোমাইজ করছি। নায়ক মাটির নিচে আর নায়িকা মাটির উপরে এভাবে তো প্রেম হয় না! আপনি বরং কয়েকটা ড্রিম-সিকোয়েন্স ঢুকিয়ে দিন—'

'ভেরি গুড! ড্রিম সিকোয়েন্সে দৃশ্যগুলো বেশ ঘনিষ্ট হয়—'

'আজ্ঞে না স্যার; ওটি হচ্ছে না। ড্রিম সিকোয়েন্স কি রকম হয়? ধোঁয়াটে; তাইতো? ক্যামেরার সামনে কয়েক আঁটি ভিজে খড়ের নুড়ো জেবলে দিন। কুল্‌ কুল্‌ করে ধোঁয়া হবে। দেখবেন, তাতেই কেল্লা ফতে। আপনার পয়সাও বেঁচে যাবে আর নায়ক-নায়িকারও দরকার পড়বে না।'

'তার মানে! তুমি দর্শকদের চোখে ধোঁয়া দেবে?'

'তবে নয় তো কি! সবাই ধুলো দেয় আমি না হয় ধোঁয়া দেব; রেজাল্ট তো সেই একই, চোখ কচ্‌লানো। আর তাছাড়া আজকাল কার দর্শকরা ভীষণ কল্পনা প্রবণ। ধোঁয়ার ওপারে কি হচ্ছে নিজেরাই কল্পনা করে নিতে পারবে। তার জন্যে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

হাত জোড় করে নিজের কপালে ঠেকান সমীরদা। হেসে বললেন, 'ক্ষোমা দে মা। তোর বুদ্ধিতে চললে সিনেমা তৈরী হবার আগেই সুপার ডুপার ফ্লপ।' ক্লাস থেকে একজন মুখ বের করে বলে, 'কুহেলি স্যার তোকে ডাকছেন। ভিতরে আয়।'

'এই মেরেছে! আবার মা হতে হবে না কি! 'সে যে বড় কষ্টের। মা হওয়া নয় মুখের কথা। ও সমীরদা এ তো আসল মা হওয়ার থেকেও বেশী যন্ত্রণা দায়ক। আমি মা হতে চাই না; আমায় ক্ষমা কর।'

আমার অসহায়তা দেখে সমীরদা দাঁত বের করে হাসছেন। আমি মাথা নিচু করে ক্লাসে ঢুকলাম।

ততক্ষণে আমার দুই সতীর্থ দুটিয়ে অভিনয় করছে। হেভি করছে ওরা। আহাঃ! যেন অরিজিন্যাল স্বামী-স্ত্রী। তোদের মঙ্গল হোক। তোরা নাম করা অভিনেতা-অভিনেত্রী হ। দেশ-বিদেশে তোদের সুনাম ছড়াক। খ্যাতির উচ্চ শিখরে ওঠ—দেখিস পড়ে যাস না যেন। হ্যাণ্ডিক্যাপ্‌ট হয়ে গেলে আর অভিনয়ে চান্স পাবি না।

তখন থেকে ভারসাম্যহীন নিরুদ্দেশ মানুষের মত খালি এদিক ওদিক ঘুরে মরছি। সত্যি কথা বলতে, এ কাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে যে বিজ্ঞাপন ওতপ্রতভাবে জড়িত তা হল পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপন। এ আমার অনেক দিনের নেশা। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে পাত্র চাই কলম পড়তে। মেয়েদের কি অদ্ভুত অদ্ভুত বিবরণ। রূপ-গুণের বড় বড় ডিগ্রী ধারি কত সব মেয়ে। স্লিম, সুশ্রী, সুদর্শনা, গৌরবর্ণা, সুকেশী, গৃহকর্মে নিপুণা, নম্রস্বভাবা, সূচী শিল্পে নিপুণা, সঙ্গীতজ্ঞা, নৃত্যশীলা, রুচি-শীলা, ঘরোয়া, সেলাই ফোঁড়াই এ ডিপ্লোমা, ইত্যাদি! বাপ্‌রে বাপ্‌ হাঁপিয়ে গেলাম।

এক চেটিয়া সবাই সু-চাকুরে সুন্দর পাত্র চায়। বেচারা কু-চাকুরেরা কোথায় যায়! যাগ্‌গে, সেটা তাদের দুঃখ আমার নয়। তবে পাত্রী চাই কলামে সু-চাকুরেরাও কম যায় না। তাদেরও ইয়া বড় বড় ডিগ্রীর ল্যাজ। পবন পুত্রের মত। সবাই ফর্সা আর সুন্দরী পাত্রী চায়। কি জ্বালা, আমরা যাই কোথায়! কেউ কেউ আবার উল্লেখ করে দেন, স্বাস্থ্যবতী চাকুরিরতা পাত্রী অগ্রগণ্যা অথবা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। তারমানে গাছেরও খাবেন তলারও কুড়োবেন। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি, সন্ধ্যে বেলা হেঁসেলে কড়া খুন্তির খিঁচুনি। তাও আবার খাবার টেবিলে রুটি দেখে শাশুড়ীমাতা বলবেন—'একি বৌমা, এটা রুটি না গুটি বসন্ত ওয়ালা ...রুর মুখ!'

'খেঁদির মা চাটুটা ভালো করে মাজেনি মা তাই একটু চুঙে গেছে।' সঙ্গে সঙ্গে পতিদেব গর্জে উঠবেন—'থামো তো; তোমার রোজ রোজ ঐ একই অজুহাত। সবকটা রুটি বন্ধ্যা। একটাও ফোলেনি; যত্ত সব!'

উনি আবার ফোলা রুটি দু ফালা করে খেতে ভালোবাসেন। বেচারি স্বাস্থ্যবতী চাকুরিরতা, মাসে মাত্র একদিন তার কদর। সেদিন বাঁজা রুটি, চেয়ে থাকা ভাত, দাঁত বের করা ছ্যাঁচড়া, হড়কে যাওয়া ডাল হাসতে হাসতে উদরে চালান হয়ে যাবে। আহাঃ! কি সুখ। মাসের তিরিশ দিন কেন মাইনে হয় না! যেদিন মানি ব্যাগ গরম সেদিন সংসার নরম। তারপর যে কে সেই। বেলুন চুপসে গেলে তার কি আর কদর থাকে! আবার ঢোকাও একমাস ধরে হাওয়া। যাঁরা সরাসরি পণ নিতে লজ্জা পান এই পদ্ধতিটা তাঁদের কাছে একদম মোক্ষম দাওয়াই। সারা জীবন ধরে দুধ, ঘুঁটে গোবর সবই পাওয়া যাবে। আবার পণ প্রথার বিরুদ্ধে কোথাও সভা টভা হলে নিজেকে একটা নমুনা হিসাবে দাঁড় করান যাবে। কয়েক লাইন গরম গরম বক্তিমে ঝেড়ে হাততালি কুড়োন যাবে। হেঁ হেঁ বাবা, কত সুবিধে! লাঠিও ভাঙল না আবার সাপও সাবাড়। পণও নিলাম না আবার প্রতি মাসে ইন্সটলমেন্টে পণের টাকা ঘরে চলে আসছে।

এই দেখুন কথায় কথায় আবার বে লাইনে চলে যাচ্ছি। আমি এখানে নারী মুক্তি আন্দোলন নিয়ে ভাষণ দিতে চাইছি না, বা দল ভারি করার চেষ্টা করছি না।

'কি রে! তুই এখনো কাগজ নিয়ে পড়ে আছিস? কটা বাজল দেখেছিস, টিউশনি যাবি না?'

মা এর আগেও দুবার তাড়া দিয়ে গেছেন। আমি এতক্ষণ বিজ্ঞাপনের পাতায় চরে বেড়াচ্ছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম—

'এখনো সময় আছে। আজ তো একটা পড়াব।'

'কেন একটা কেন?'

'আর একটা মাসীর বাড়ি গেছে। মেসোর বাচ্ছা হয়েছে দেখতে গেছে'।

'মেসোর বাচ্ছা হয়েছে, সে কি রে!'

'কেন, এত অবাক হবার কি আছে! মেসোর বাচ্ছা হতে পারে না?'

'মেসোর বাচ্ছা!' মা রিপিট করলেন।

আমি ভুলটা বুঝতে পারলাম—'ঐ হল, একই ব্যাপার। মেসোর বাচ্ছা যা মাসীর বাচ্ছাও তাই।'

'তাই বল! আমি ভাবলাম মডার্ণ সায়েন্স আবার নতুন কি মির‍্যাক্‌ল ঘটাল'।

'মডার্ণ সায়েন্স যতই মির‍্যাক্‌ল ঘটাক মা, পুরুষ গর্ভ ধারণে অক্ষম। আর এই একটা অক্ষমতার জন্যই তো ওরা এখনো নারীর উপর ডিপেন্ড করে। যদি কোনদিন এই ক্ষমতাটাও ওদের আওতায় চলে যায়, ভগবান না করুন সেদিনই ওরা পৃথিবীর মেন গেটে নো এন্ট্রি বোর্ড ঝুলিয়ে দেবে। 'ওম্যান নট অ্যালাউড'। তবে তুমি নিশ্চিন্তে থাক, পৃথিবী ধ্বংস হবার আগে এরকম অমঙ্গল জনক কিছু ঘটবে না।'

'বলা যায় না; আধুনিক বিজ্ঞান তো লিফ্‌টে করে এগুচ্ছে। কোনদিন কাগজে পড়ব, পুরুষ মা হয়েছেন।'

'মা, এমন বোকার মত কথা বল! পুরুষ কোনদিন মা হতে পারে না, বাচ্ছার জন্ম দিলেও নয়'।

'কেন নয়। এই তো সেদিন রেডিওতে একটা নাটক হয়ে গেল, এক স্বামী-স্ত্রী বাজার থেকে বাচ্ছার উৎকৃষ্ট ধরনের বিভিন্ন পার্টস কিনে এনে, মানে হাত পা কান নাক আর কি, ঘরে সেটিং করে একটা সলিউশানে ডুবিয়ে রাখলো। নির্দিষ্ট সময় পর বাচ্ছা কেঁদে উঠল'।

'হাসালে মা। বিজ্ঞানীরা আর যাই করুক স্বতস্ফূর্ত ভাবে নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে নি এখনো। ওসব নাটকেই সম্ভব।'

'না রে বিশ্বাস কর। নাটকটা বেশ ইন্‌টারেস্টিং লাগছিল। কিন্তু বাচ্ছাটা কেঁদে উঠতেই আমার বুকটা কেমন চড়াৎ করে উঠল। মনে হল এ নাটক যদি কোনদিন সত্যি হয় তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে সম্পর্কের মূল্যবোধ হারিয়ে যাবে। মাতৃত্বের অপত্য স্নেহ বলে কিছু থাকবে না। সন্তানের মৃত্যুতে কোন বাবা মা কাঁদবে না। একটা মরে গেলে বাজার থেকে আর একটা কিনে নিয়ে আসবে।' মায়ের মুখটা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে।

'দিস ইজ টু মাচ্‌ মা—অ্যাব্‌সলিউট্‌লি ইম্‌পসিবল্‌।'

'কেন ইম্‌পসিবল্‌! আজকাল, মেয়েরা নিজেদের সৌন্দর্য বাঁচাতে, দৈহিক গঠন অক্ষুন্ন রাখতে বাচ্ছাকে দুধ দেয় না। আমাদের সময় এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? তখন এটা ছিল অ্যাব্‌সলিউট্‌লি ইমপসিবল। কিন্তু এখন পসিবল হয়েছে। ভাবতে পারিস! একটা সদ্যজাত শিশু মার বুকের উষ্ণতার জন্য গলা ফাটিয়ে কাঁদছে তখন তার মুখে গুঁজে দেওয়া হল রবারের নিপ্‌ল। ঐ সব মেয়েদের মা হওয়ার কোন অধিকার নেই।'

'মা-আ, কেয়া বাত হ্যায়! আজ এরকম ফিলজফারের মত কথা বলছ!'

'না রে, নাটকটা শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছিল।'

'কিন্তু তুমি নাটক শুনলে কি করে! রেডিওর তো ব্যাটারি নেই।'

'নতুন ব্যাটারি লাগান হয়েছে।'

'কে এনেছে, বাপি? দেখেছ, বাপিটা দিন দিন কি রকম মিথ্যাবাদী হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বলল ব্যাটারি আনিনি, ভুলে গেছি। আজ আসুক বাড়ি।'

'বললে তো দিন রাত কানের কাছে খুলে বসে থাকবি সেই জন্যে বলেনি। ওঠ্, আর আড্ডা মারিস না। তাড়াতাড়ি যা পড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরবি।'

'না মা আর একটু পরে যাব। দেখছ না বাইরে কত রোদ!'

'যা পারিস কর।' মা বেরিয়ে গেলেন।

আমি আবার ডুব দিলাম পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনের সাগরে। মানুষের কথায় এই এক দোষ; নির্দিষ্ট কোন দিশা নেই। আরশোলার মত ফর্ ফর্ করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, যতক্ষণ না টিকটিকির খপ্পরে পড়ছে ততক্ষণ থামার নাম করে না। মানুষের আলোচনাও তাই, শুরু হল একেবারে লন্ডনে বাকিংহাম প্যালেসে যুবরানী ডায়না আর যুবরাজ চার্লস-এর বিবাহ বিচ্ছেদ। ওঁদের ছেলে উইলিয়াম আর হ্যারির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সেখান থেকে সটাং ইণ্ডিয়া ব্যাক; আজহারউদ্দিনের তালাক। আজহারউদ্দিনের বাবা বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন পুত্রবধুকে নিজের কাছে রেখে। আবার ফিরে চল ইংল্যাণ্ডে, ওফ্ঃ! সৌরভ গাঙ্গুলী কি খেলল লর্ডসে! কামাল করে দিয়েছে। সেখান থেকে বীর হনুমানের মত এক লম্ফে একেবারে পক্ প্রনালী পেরিয়ে সোজা রাবনের ডেরায়। নাহ্! রণতুঙ্গার দল যা খেলছে তাতে করে ওদের শ্রীলংকাকে হারানো খুব মুশকিল। আবার জয় শীয়ারাম বলে আর একটা লম্ফ—একেবারে মুম্বাই, ব্যাণ্ডিট্ কুইন দেখলাম। যা করেছে না মাইরি, হুবহু হলিউড স্টাইল। একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম যে এত হিট্ হতে পারে ধারনাই ছিল না। আজকালকার বেশীর ভাগ বই তো এক রকম। শুধু তোয়ালে জড়িয়ে নায়ক নায়িকা গোটা বইটা কাটিয়ে দিল। ডিরেকটারের কস্টিউম খরচাও বেঁচে গেল। আর দর্শকদের সুস্বাদু মাথাও চিবোন হল। আর নামের কি বাহার—একগজ করে লম্বা এক একটা। যত সব আনাড়ীদের নিয়ে কাজ কারবার। নামের সঙ্গে একটা করে আনাড়ী জুড়ে দাও, বই হিট্। অনেক দিন পর গুরু সিনেমায় ফিরলেন। মাঝখানে কেন যে অমিতাভ এ রকম পানকৌড়ির মত ডুব মারল কে জানে! সেই তো আবার ফিরে এলি বাবা!

'সেই তো আবার ফিরে এলে, এতদিন দূরে থেকে বলনা কি সুখ তুমি পেলে…।' সত্যি মান্না দের গলায় কাজ আছে। ভদ্রলোক হৃদয় নিঙড়ে গান করেন। চলো রাজধানী। দেবগৌড়া সরকার টিকে গেল না কি বলত? বেশ ড্রিবলিং করে করে এগোচ্ছে কিন্তু। কলকাতার ফুটবল একেবারে ডুবে গেল। আগেকার হিরোরা খালি পায়ে বাতাবিলেবু লাথিয়ে বিশ্বকাপে গেছিলেন আর আজকের জিরোরা পায়ে কাঁটা বুট পরে দড়িছেঁড়া বাছুরের মত মাঠ ময় ছোটাছুটি করে লোনাজলে জার্সি ভিজিয়ে ফেলল অথচ তাদের দামি পা থেকে একটাও গোল বের হল না, শুধুই চোক। বাঙালী তো, তাই নাড়ীর টানে ফুটবল গ্রাউণ্ডে একটু বেশীক্ষণ আটকা

পড়ে গেছিল। কিন্তু কতক্ষণ আর রোদে দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলা যায়! তাই চল কফি হাউস। কত বিখ্যাত লোকের পদচিহ্ন ধন্য এই স্থান। মাঝখানে শোনা গেছিল কফিহাউস নাকি উঠে যাবে। যাক, যাবে যাবে করে আর শেষ পর্যন্ত গেল না। এক কাপ কোল্ড কফি কণ্ঠনালীতে চালান করে দিয়ে এবার আড্ডাবাজ বাঙালী নন্দনের ঘরে ফেরা। কিন্তু যত গড়বড় এই এখানে, এতক্ষণ দেশ-বিদেশে টৌ টৌ করে ম্যারাথন দৌড় মারল কোথাও হোঁচট খেতে হয়নি। অথচ নিজের পাড়ায় এসে চিৎপুরের জ্যামে আটকে গেল। উফ্, সরকার কেন যে এই ট্রামটাকে ঘাড় ধরে তুলে দেয়নি কে জানে! কলকাতার বুকে শুঁয়োপোকার মত কিল বিল করে এখনো বেয়ে বেড়াচ্ছে। শুঁয়োপোকা তবু মাঝে মাঝে তাড়া খেলে তাড়াতাড়ি চলে, এর সে ক্ষমতাও নেই। তাড়া মারলেই মুখ থুবড়ে পড়বে। আর যদি কোন রকমে একবার টিকিটি ছিঁড়েছে বা একটু বেলাইন হয়েছে তো ব্যাস্! অমনি গোটা পৃথিবী থমকে যাবে। নিজের আর এক পা নড়ার মুরোদ নেই। বিয়ে বাড়িতে বর আসার মত হইচই পড়ে যাবে—লোক ডাক, জন ডাক, পুলিশ ডাক, ক্রেন ডাক। আমার মনে হয় তারাই ট্রামে ওঠে যাদের যাবার ইচ্ছে নেই। যাগ্গে, সেখান থেকে কোন রকমে বড় বাজারটা টপকে একটু গঙ্গার শীতল দম বুক ভরে নিয়েছে কি নেয়নি অমনি হল্ট্। হাওড়ার পোলে ন যযৌ ন তস্থৌ। যেন ময়াল সাপ ছাগল গিলেছে। না পারে অন্দরে চালান করতে না পারে ওগরাতে। কি জ্বালা! এক্সট্রা আর একটা সেতু হয়েও যে কে সেই। যেন মাড়োয়াড়ীদের ভুঁড়ি, দুঃখেও ফুলছে সুখেও ফুলছে। কোন পরিবর্তন নেই। যদি ক্যাঙারুর মত একটা গোদা লেজ থাকত তো হেঁইয়ো মারি বলে এক লাফে গঙ্গাটা পার হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা তো আর হবার নয়! পূর্ব পুরুষদের যদিও বা একটা সরু মত ছিল তাও বিনা ব্যবহারে আজ লুপ্ত প্রায় অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কোনদিন বাঙালী জাতিটাই লুপ্ত প্রায় হয়ে যাবে, যা কুঁড়েমি ধরেছে! তখন বাঙালী বাঁচাতে অভয়ারন্য করতে হবে। গোটা কতক বাঙালী কাপল্ সেখানে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। দেদার সুখ, খাও দাও আর প্যায়দা কর।

যদিও কোন রকমে ঘরের কানাচ পর্যন্ত আসা গেল তো ঘরে আর ঢোকা যাচ্ছে না। বাড়ির পাশে এঁদো গলির নিচু রাস্তায় এক হাঁটু জল। হয় শাড়ী তোল নয় প্যাণ্ট গোটাও। স্যানডাকের খড়খড়ি জুতো হলে খোলার দরকার নেই কিন্তু চামড়ার হলে অবশ্যই হাতে নিতে হবে, তা না হলে আবার ভিজে পাঁউরুটি হয়ে যাবে। আর আকাশের যা ছিরি, দুদিন ছাড়াই নিম্নচাপ। আর কত চাপবি চেপে তো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে! অছেন্দার আকাশে একটু রোদও নেই যে চামড়ার চটি শুকোয়। আর রোদ না পেলেই যত রাজ্যের ছত্রাক মিউকর এসে ওটাতে বাসা বাঁধবে। আর পায়ের আঙুলে যদি হাজা থাকে তাহলে তো কথা নেই, গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। সেপ্টিক বা গরল হয়ে সে আর এক কেলোর কীর্তি।

ঐ সময় বাইরে থেকে এসে যদি কেউ বাধা দেয় তো ভালো তা না হলে

বাঙালীর আলোচনা ঐ হাঁটু জল পেরিয়ে বাথরুমে পা না ধুয়ে একেবারে সোজা রান্না ঘরে ঢুকে যাবে। তারপর ডিস বাটি উল্টে কোথায় কি আছে! আজকাল খাঁটি দুধ বাজারে পাওয়া যায় না। গরুগুলোও চালাক হযে গেছে। যতই সুচ ফোটাও কোঁৎ পেড়ে দুধ আটকে রাখে। গ্যাসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। কেরোসিনের সমস্যা মোটা-মুটি কমেছে। আনাজ পাতির দাম আগুন, ছুঁলে হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। আজকালকার আবার ডিস্কো ফোস্কা; পুড়লেই জলে হাত দাও, পরে বার্নল লাগাবে। আচ্ছা, বার্নল এখনো পাওয়া যায়? নতুন নতুন কত কি তো উঠেছে টু-ইন ওয়ান, থ্রী-ইন ওয়ান। জ্বালা-পোড়া ছেঁড়া-কাটা হোঁচট-কামড়, মাথা ধরা গলা ব্যথা সব এক সঙ্গে নাকি সেরে যায়। চলতে রইল অনন্ত কাল ধরে। কলার ভেলায় সাপে কাটা মড়ার মত শুধুই আলোচনার সাগরে ভেসে বেড়ান। কোথায় গিয়ে ঠেকবে কেউ জানে না। নো কাজ নো কম্ম। আলোচনা আর আলোচনা।

আমার আর মার আলোচনা যেমন ছাত্রীর মেসোর—এ সরি, মাসীর বাচ্ছা হওয়া দিয়ে আরম্ভ হয়ে থিতোলো রেডিওর ব্যাটারিতে। সেই রকম আর কি! কোথায় রাজা রানীদের ডিভোর্স আর কোথায় বার্নল। ভাবা যায়! বলিহারি বাঙালি! একবার কপচাতে শুরু করলে ব্রেক ছাড়া গাড়ির মত চক্কর কেটেই যাবে যতক্ষণ না তেল ফুরোয়।

আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। এতদিন ধরে পাত্র-পাত্রী পড়ছি এ ভাবনা আগে কোনদিন মাথায় আসেনি। একটু নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। আচ্ছা, পাত্রী চাই কলাম দেখে একটা চিঠি পাঠালে কেমন হয়! আমি নিজেই লিখব নিজের বিবরণ দিয়ে। থ্রিলিং একটা ব্যাপার হবে। পত্র যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছলে ভাববে, মেয়েটা হয় বিয়ে পাগল তা না হলে এমনি পাগল। ভাবুক গে, তারা কি আমায় চেনে না কি! কি অবাক কাণ্ড! কেউ আমাকে পাগল ভাববে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই দেখছি! আমি কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলাম না কি! নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখি তো—দূর, এভাবে কি প্রমাণ করা যায়! এতো স্বপ্ন দেখছি কি না তার প্রমাণ। তাহলে বরং কাউকে জিগ্যেস করা যাক। কাকে করি—কাকে করি—মাকে।

'মা—আমি কি পাগল হয়ে গেছি?'

'বাহ্‌ঃ! এতদিনে নিজেকে চিনলি! তুই তো জন্ম থেকেই পাগল।'

'যাঃ, মিথ্যা বলছ। পাগলরা কখনোই স্বীকার করে না তারা পাগল। আমি স্বীকার করছি আমি পাগল, সুতরাং আমি পাগল নই।'

'তুই পাগল কি না জানি না; তবে ঘরে বসে বসে যদি এরকম উৎপটাং বকতে থাকিস তাহলে আমি নিশ্চই পাগল হয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

'তাই যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

টিউশনি যাব বলে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছি আর নিজেকে

দেখছি ; একটা জন্মগত পাগলকে দেখছি। আমার হাসি পাচ্ছে। পাওয়া মাত্রই হেসে ফেললাম। মা যে দালান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি খেয়াল করিনি।

'সমি—একা একা হাসছিস কেন?'

'পাগলরা বিনা কারণেই হাসে মা।'

এবার মা হাসছেন, 'হাসছ যে?'

'তোর পাগলামি দেখে।'

'তাহলে আল্টিমেট্লি এটাই সিদ্ধান্ত হল, যে আমি পাগল!'

'তুই বের হ আগে বাড়ি থেকে, পাগল পাগল করে পাগল করে দিল! বাচাল কোথাকার।'

হ্যাঁ, এই অ্যাডজেকটিভটা আমি যেদিন থেকে কথা বলতে শিখেছি তার আগের দিন থেকেই বোধহয় আমার সঙ্গে গালার তক্মার মত সেঁটে আছে। সর্বত্র আমার এই সুখ্যাতি। আমি না কি বাচাল। টকেটিভ্—ভদ্রলোকেরা বলেন। প্রথম প্রথম একটু রাগ হত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। সবার প্রশ্ন, আমি এত কথা পাই কোথা থেকে! কি করে বলব, আমিই কি জানি না কি! সামনে কেউ থাকলে তার সাথে বকি, কেউ না থাকলে একা একা বকি। অসুবিধা হয় না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে কথা বলি। অঙ্গভঙ্গী করি, ক্ল্যাসিক আর ডিস্কো পাণ্ড করে নাচি। গলা ছেড়ে গান করি। হাসি, কাঁদি, অভিনয় করি, আবৃত্তি করি, ফ্যাশান শো করি। অবশ্য সামনে অন্য কেউ থাকলে এসব করি না। কয়েকবার বাপির চোখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। কেউ যদি লুকিয়ে এসব দেখে তাহলে নির্ঘাত আমাকে পাগল বলবে। আর নিজেকে পাগল প্রমাণ করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই। কারণ আমি জানি আমি পাগল নই। এবার এ পাগলামি বন্ধ না করলে পাঠককুল হয়ত পাগল হয়ে গিয়ে এ বই বন্ধ করে উঠে যাবেন। আসলে আমি ভীষণ একা। আমার ভাই নেই বোন নেই কেউ নেই। বাড়িতে আমি বাপি আর মা। একা থাকা যে কী যন্ত্রণার যে একা থাকে কেবল সেই বোঝে। মাঝে মাঝে তো মনে হয় এই চরম একাকিত্ব আমাকে সত্যিই পাগল করে দেবে।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। চার পাশের কোন ঘটনাই তেমন বুঝতে পারছি না। অনেক দিন ধরে এ রাস্তায় যাতায়াত করছি তো তাই পা দুটোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কে অন্য চিন্তা। চিঠি একটা দেবই। নাই বা দিল উত্তর তাই বা কি! তবুও দেব। কিন্তু এ অদ্ভুত শয়তানি টা আমার মাথায় হঠাৎ চাপল কেন। শয়তানি! এটা কোন শয়তানি না কি! শয়তানি শব্দটাতে আমার যেন ঘোর আপত্তি বলে মনে হচ্ছে। বাপির কথা মনে পড়ছে। বাপি বলেন—'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।' আমি মোটেও অলস নই। গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করেছি। এখন কম্পিউটার পড়ছি। অভিনয় শিখছি, একটু আধটু গল্প, কবিতাও লিখতে পারি। সংসারের তেমন কোন কাজ করি না ঠিকই তবে ডেইলি মাইল খানেক পথ ঠেঙিয়ে টিউশনি করতে যাই। আমার হাত খরচার

পয়সা বাপি দিতে চান কিন্তু আমি নিজে উপার্জন করি। কি যেন বলে—হ্যাঁ, পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে—ন্না সরি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করি। সুতরাং আমি অলস কোন মতেই নই। আর শয়তান! আমি ফুল্লি কনফার্ম, সজ্ঞান বা অজ্ঞানে কোনদিন কারুর কোন ক্ষতি করিনি। সো, আই অ্যাম নট শয়তান, অলস তো নয়ই। অতএব চিঠি দেবই। কিন্তু কোন ঠিকানায়! চিঠির উত্তর যদি বাড়িতে আসে আর বাইচান্স বাপি মার হাতে পড়ে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। আর পাত্র স্বয়ং যদি বাড়িতে চলে আসেন তাহলে তো রক্ষে নেই। খুশিতে ডগোমগো হয়ে সব দায়িত্ব হাসতে হাসতে নিজের কাঁধে তুলে নেবেন। তারপর শুরু হবে আমাকে তাড়াবার সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা। অসম্ভব, যেচে কেউ এমন বিপদ ডেকে আনে! আমি পাগল হতে পারি কিন্তু এতটা পাগল নই। ভাবছি, এতবড় একট প্ল্যান কেবল ঠিকানার অভাবে ভেস্তে যাবে! তা কি করে হয়। আচ্ছা, কোন বন্ধুর ঠিকানায় দিলে কেমন হয়! ইয়েস। কিন্তু কার ঠিকানায় দেব! তেমন বিশ্বস্ত কে আছে! যাকেই বলব সেই পাল্টা সন্দেহ করবে। নিশ্চই প্রেম পত্র—বাড়িতে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আমার বাড়িতে দিচ্ছিস! এই কবে করলি বলনা রে? কি নাম—কোথায় বাড়ি—কেমন দেখতে—কোথায় চাকরি করে—গভমেণ্ট সার্ভিস না প্রাইভেট ফার্ম—না কি ব্যবসা করে—কিসের ব্যবসা, সাপ না ব্যাঙ—যদি সাপ হয় বিষাক্ত না নির্বিষ, যদি ব্যাঙ হয় কুনো না সোনা। বাপ্রে বাপ্! মহাভারতের যুদ্ধের মত সাঁই সাঁই করে প্রশ্নের শর বৃষ্টি। মুহূর্তে তূনীর ফাঁকা। মিথ্যে বলারও জো নেই। ফুরিয়ে যাওয়া টিউব থেকে টিপে টিপে পেস্ট বের করার মত আমার পেট টিপে ওরা সত্যি কথা বের করে নেবে। আর সত্যি কথা যে বলব তারও তো উপায় নেই। সব শালা বেইমান, ছেলে কি আর মেয়ে কি। বাড়িতে এসে ঠিক লাগিয়ে দেবে। যেন আমার বন্ধু নয়, আমার বাবা মার বন্ধু। কবে থেকে মুখ উঁচিয়ে উট মুখো হয়ে বসে আছে বিয়েতে খাবে বলে। আরে বাবা যখন বিয়ে হবে তখন খাবি! অত তাড়া কিসের? তা না দুদিন ছাড়া বাড়িতে এসে—কাকিমা, কুহেলির জন্য ছেলে দেখছেন না? মাসীমা, কুহেলির কোথাও ঠিক হল? জেঠিমা, আমার এক মাসতুতো দাদা আছে কুহেলির সাথে হেভি মানাবে···নিকুচি করেছে তোর মাসতুতো দাদার। আগুনে ঘি দেওয়ার মত সবাই ছিরিক্ ছিরিক্ করে মাকে উত্তপ্ত করে চলে যাবে! আর সারাদিন ধরে আমাকে জল ঢালতে হবে মাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে। পাড়ায় আমার সম বয়সী এক একটা মেয়ের বিয়ে হয় আর মার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে! যাহ্ঃ। আজ অমুকের বিয়ে হয়ে গেল। কাল তমুকের পাকা দেখা। পরশু অমুকের আশীর্বাদ। তোর কবে হবে কে জানে! কে আবার জানে ভগবান জানেন। অত যদি জানার আগ্রহ তাঁকে জিগ্যেস করে এ'স। মা এমন হা হুতাশ করেন, যেন বাজারে সব ছেলে ফুরিয়ে গেল; আর একটাও পড়ে নেই। আমার মেয়েটা বুঝি চিরকাল আইবুড়ো হয়ে রইল। কি সর্বনাশ! কি হবে! আর আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শী তো আছেনই। তাঁরা মাঝে মাঝে আমি

যখন বাড়ি থাকি না সুযোগ বুঝে এসে সেই হুতাশনে বাতাস দিয়ে যান। ব্যাস্, আবার জ্বলতে রইল আমার পিছন পিছন—'এত মেয়ে নিজে দেখে বিয়ে করছে তুই একটা প্রেমও করতে পারলি না! আমারা কোন, খবর আনলে বিরক্ত বোধ করিস—বসতে চাস না। তুই কি চাস বল! বিয়ে করবি, না করবি না!' তখনই বুঝতে পারি আজ নিশ্চই কেউ বাড়িতে এসেছিল। তুঁষের আগুন উস্কে দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে আবার ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং ও চলে—বাপির মুখের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেছিস তোর বিয়ের কথা ভেবে ভেবে কি অবস্থা হয়েছে! এখন চাকরি থাকতে থাকতে তোর বিয়ে না দিলে পরে কি অবস্থা হবে! তোর ভাই দাদা কেউ নেই যে একটু সাহায্য করবে। শুধু পয়সা থাকলেই মেয়ের বিয়ে হয় না পাশে দাঁড়াবার মত লোক জনও চাই। তোর বাপি একা। এ সব চিন্তা করে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাপির দিকে একটু তাকা।

তাকিয়ে আছি বাপির দিকে। মার মত বাপি অত চিন্তা করেন না।

'পিসিমনি এই অংকটা পারছি না।'

ছাত্রীর ডাকে টনক নড়ল। বইটা হাতে নিলাম। 'এতো ঐকিক নিয়মের অংক বিশ্বের সবচেয়ে সহজ অংক। আগে অনেক বার করিয়েছি। হাঁসের ডিম পাড়ার অংক। একদম সোজা, চেষ্টা কর।'

ডিম পাড়ার অংক দেখলেই আমার একটা কথা মনে পড়ে। সম্ভবত ক্লাস ওয়ানের বইএ একটা অংক আছে। জানতে চেয়েছে—লখাইদের হাঁসগুলি গতকাল এতগুলি ডিম পেড়েছে আর আজ এতগুলি ডিম পেড়েছে। দুদিনে লখাই কতগুলি ডিম পেয়েছে?

আমার এক ছাত্রী অংকটা করে উত্তর লিখেছিল—অতএব, দুদিনে লখাই এতগুলো ডিম পেড়েছে।

'কি হল ডিমটা পেড়েছ—সরি, অংকটা করেছ?'

মুখ বাঁকিয়ে বলল—'উত্তর মিলছে না।'

করে দিলাম। 'উত্তর লেখ—রমাদের হাঁসগুলি…রমা! ইয়েস রমা! রমাদির কথা এতক্ষন মনে পড়েনি। অ্যাকটিং স্কুলের বন্ধু। রমাদির বিয়ে হয়ে গেছে। ওর ছেলে ক্লাস টেনে পড়ে। আমাদের ভীষণ ভাব। বাকিদের হিংসে করার মত যথেষ্ট। বয়সের ফারাকটা আমাদের বন্ধুত্বে কোনদিন প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়নি। আমাকে বলে সোফা কাম বেডের মত তুই আমার বোন কাম বন্ধু।

বাড়ি ফেরার পথে দু খানা খাম কিনে আনলাম। কিন্তু পুরানো কাগজ দেখে ছাড়লে তো হবে না সব ব্যাক ডেটেড পাত্র। সুতরাং নতুন কাগজ আসুক। ক্লাসে গিয়ে অপেক্ষা করছি। খানিক পরে চুড়িদারের ওড়না ঠিক করতে করতে রমাদি ঢুকল :—'এত দেরি করলে কেন বলত! তোমার জন্য কখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

'তোমার আর কি, ঝাড়া হাত পা। সকাল থেকে এসে বসে আছো। আমাকে সংসার

গুছিয়ে আসতে হয়, বুঝলে চাঁদু!' আমার পাশে বসল। 'বাবা! এত কথা শোনাচ্ছ কেন! তোমার না হয় বর আছে।'

'আচ্ছা বল কি বলবি।'

'তোমার ঠিকানাটা একটু ধার দেবে?'

'ঠিকানা ধার দেব! ঠিকানা আবার ধার দেওয়া যায় না কি?

'যায়।'

'কি রকম?'

'আমি এক জায়গায় চিঠি দেব, সেই চিঠির উত্তরটা আমার নামে তোমার বাড়ির ঠিকানায় আসবে। তুমি এনে আমাকে দেবে।'

'ও, এই ব্যাপার! সে-না হয় দিলাম। নো প্রবলেম। কিন্তু কাকে দেবে বাছা?'

'অ্যায় অ্যায়! ভুরু নাচিও না। সে সব কোন ব্যাপার নয়। তোমাদের সব এক চিন্তা। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। একটু বড় কিছু ভাবতে শিখলে না!'

'তা বলোই না, বড় কি মহৎ কার্যটা তুমি করতে চলেছ! সেটাই তো জানতে চাইছি।'

'পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দেখে একটা চিঠি ছাড়ব।'

'বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'খেপেছ! যেচে কেউ খাঁচায় ঢোকে? তাছাড়া কাগজ দেখে বিয়ে করতে হবে কেন! ওতে কত দূরে দূরে ঠিকানা থাকে জান! চেনাশোনা ছেলেদের কি অভাব পড়ে গেছে! আমার তো ভাবলেই ভয় করে। ধর, বিজ্ঞাপন দেখে অনেক দূরে আমার বিয়ে হয়েছে। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা এক পরিবেশে। বাইচান্স যদি ধরে পেটায় পালিয়ে আসার পথ খুঁজে পাব!'

'পেটাবে কেন শুধু শুধু?'

'বধূ হত্যা কেন হয়?

'তোর বাবার তো পয়সা আছে—দেবে।'

'আহা! আবদার! বাবার আছে তো আমার কি! আমি উইদাউট পণে বিয়ে করব।'

'আদর্শবাদী?'

'নিশ্চয়ই—আমিও আমার ছেলের বিয়ে পণ নেব না।'

'দাঁড়া, আগে তোর হোক—তারপর তো ছেলের। এত আগে থেকে প্রতিজ্ঞা করলে ভুলে যাবি যে!

'তুমি তো আছ মনে করিয়ে দেবে।'

'তখন দেখব মনে করিয়ে দেবার ভয়ে ছেলের বিয়ে আমাকে নিমন্ত্রণই করলি না। বাপ্‌রে, বিয়ে করবি না যখন তাহলে চিঠি দিবি কেন?'

'এক্সপেরিমেন্ট—'

'এক্সপেরিমেণ্ট !' রমাদি অবাক হয়।

'হ্যাঁ, দেখিনা চিঠিটা যথাস্থানে গিয়ে পেঁছিয় কি না! পেঁছিলে উত্তর দেয় কিনা! দিলে কিভাবে দেবে। একটু মজা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আর কি!'

'সত্যি, সাধে কি তোকে খেপি বলি! এখনো এসব ছেলেমানুষী তোর মাথায় আসে ?'

পরদিন কাগজ দেখে পাঁচজন ক্যাণ্ডিডেটের একটা প্যানেল তৈরী করলাম। সেখান থেকে জহুরীর মত বেছে বেছে কোষ্ঠী পাথরে ঘষে ঘষে একটা খাঁটি সোনার টুকরো বের করলাম। ব্যাস্, তারপর উক্ত বক্স নাম্বার লক্ষ্য করে আমার একটা পত্র বান ছুঁড়ে মারলাম।

সুচরিতেষু,

কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না, তাই হঠাৎই শুরু করে দিলাম। আসলে এর আগে কোনদিন কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে এভাবে পত্র লেখার প্রয়োজন পড়েনি তো তাই! আনন্দবাজার পত্রিকায় পাত্রী চাই কলামে আপনাদের বিজ্ঞাপন পড়েই এ চিঠি লিখছি। আমি বাবা মার একমাত্র সন্তান। বাবা কলেজের প্রফেসার মা হাউস ওয়াইফ। এবার আমার ছোট্ট পরিচয়টা সেরে নি—

নাম—কুহেলি সান্যাল।

বয়স—চব্বিশ বছর পাঁচ মাস পনের দিন। (মেয়ে বলে যেন ভাববেন না বয়স কমিয়ে বললাম।)

উচ্চতা—5′ 3″ (পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি)।

গায়ের রং—ফর্সা। (লোকে তো তাই বলে।)

শিক্ষাগত যোগ্যতা—B. Sc. বর্তমানে Computer পড়ছি।

অন্যান্য যোগ্যতা—i) আমি লিখি। এটা আমার নেশা বলতে পারেন। তবে ভবিষ্যতে এটা যে পেশায় পরিণত হবে না এমন কথা বলতে পারি নে।

ii) আমি অভিনয় করতে ভালোবাসি। বর্তমানে একটা প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় অভিনয় শিখছি। নিজের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে যতটুকু অভিনয় করা যায় আমি ঠিক ততটুকুই করি, বা করতে চাই।

পত্র পাঠাতে প্রয়োজন মনে করলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

নমস্কারান্তে—
কুহেলী সান্যাল।

কুহেলী সান্যাল।
c/o, রমা সাউ।
....
কলিকাতা—......... ।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমিও এ চিঠির কথা একদম ভুলে গেলাম। মনে পড়ল অ্যাকটিং ক্লাসে রমাদিকে দেখে। হাসতে হাসতে বলছে—

'কি রে তোর বরের চিঠি তো এল না!'

'আমি জানতাম আসবে না। আর এক জায়গায় বরং ট্রাই করে দেখি।'

'এক জায়গায় কেন, ছেড়ে যা যত পারিস। আমার ঠিকানার সদ্দ লাগবে না।'

'ধ্যাৎ!'

পরের সপ্তাহটা কেটে গেল বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ করে। তেরই মার্চ কলকাতার ইডেনে ডালমিয়া প্রহসন দেখে মেজাজ এমন হয়ে গেল কি বলব! মনে হচ্ছে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি। আমাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। পেটে পাইপ ঢুকিয়ে স্টম্যাক ওয়াস করে আমাকে বেডে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি অসহায়ের মত শুয়ে শুয়ে ভাবছি, কেন ধরা পড়ে গেলাম! এ রকম বিখ্যাত খেলা দেখার আগে আমি প্রাণে মারা গেলাম না কেন! নিদেন পক্ষে আমার চোখ দুটো অন্ধ হয়ে যেতে পারত অথবা আমি কালা হয়ে যেতে পারতাম। গত দিনের ভারত পাকিস্থানের খেলা দেখার পর এ খেলা দেখে মনে হচ্ছে এক ভাঁড় রসমালাই খাবার পর ভুল করে এক গ্লাস চিরতার জল খেয়ে ফেলেছি। হে ভগবান কেন খেলাম! ভারতের ইতিহাসের পাতায় গোবর জল দিয়ে লেখা থাকবে এই খেলার কথা। আমি একজন ভারতীয় এটা ভাবতেও বিরক্ত লাগছে। মনে হচ্ছে এক ছুটে ভারতের বাউণ্ডারির বাইরে চলে যাই, চিৎকার করে বলি আই অ্যাম নট ইণ্ডিয়ান। এ হারের দায়িত্ব এর লজ্জা আমি বইতে পারছি না। ভারতের হার এর আগেও দেখেছি এত কষ্ট হয়নি। এ কি শুধু হার! এতো অপমান, চরমতম অপমান। শুধু অপমান হলেও হত এটা যে কি একটা হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমি অন্তত পারছি না। আমার পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নিজের নাম ভুলে যেতে ইচ্ছে করছে। এ শোকের ছায়া অনেক দিন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। মনে হচ্ছে আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি। আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। শুনেছি অনেকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়; কিন্তু আমার তাও নেই। উইদাউট ভবিষ্যতে আমি বেঁচে আছি। কী অসম্ভব অসহায়তা! চোখ বন্ধ করে আছি ঘুম হচ্ছে না। মনে হচ্ছে দত্তপাড়ার মেয়েদের মত রাস্তায় ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে চিৎকার করে কাঁদি। কান্না শুনে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যদি আদেশ দেন এ খেলা ডিসমিস! আবার নতুন করে বিশ্বকাপ শুরু হোক, তাহলে কি যে মজা হয় কি বলব! কিন্তু আমি জানি তা হবার নয়। কলকাতার যা বদনাম হবার তা হয়ে গেছে। প্রথম দিন ইন্টারন্যাশানাল প্রোগ্রাম করতে গিয়ে মাঠের মাঝখানে মশারী খাটিয়ে খালি চাদ্দিক দিয়ে ফোকাসিং হচ্ছে। কি যে উটের মাথা অশ্বডিম্ব দেখাল কিছুই বোঝা গেল না। যেন মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়ার বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে—মশারী টাঙিয়ে রাত্রিবেলা শোয়া উচিত তা না হলে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হবে। আবার কে পাতাল ফুঁড়ে উঠছে কে আকাশ ফুঁড়ে নামছে, যত্ত সব। ছেলের চেয়ে ছেলের ইয়ে ভারি। আর শেষ দিন পিচে

হাঁড়ি হাঁড়ি জল ঢেলে হড়কানি করে সোনার ছেলেরা একেবারে ন্যাজে গোবরে হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল। নিজের মুণ্ডুপাত করে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করতে গিয়ে কেবল মুণ্ডুপাতই হল যাত্রা ভঙ্গ আর হল না। নাকের ডগা দিয়ে ড্যাং-ডেঙিয়ে চলে গেল তারা। আর ষোলকলা পূর্ণ হতে যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু পূর্ণ করার দায়িত্ব নিল ইডেনে উপস্থিত দর্শক। তাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে। কর্মকর্তা প্লেয়াররা তো সবটাই ডুবিয়েছে, তাদের সাথে হাত মিলিয়ে যে নাকটুকু ভেসেছিল ওরা সেটাও চেপে ডুবিয়ে দিল, সিদ্ধ হস্তে পালন করল যে যার দায়িত্ব কর্তব্য। ওদিকে বিদেশী নিউজ পেপারগুলোতে দাউ দাউ করে জ্বলছে ভারতের সম্মানের চিতা, যে চিতা কোনদিন নিভবে না। রাবনের চিতার মত ধিক্ ধিক্ করে চিরকাল জ্বলতে থাকবে প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে।

এ শোক তখনো ঠান্ডা হয়নি; অ্যাকটিং ক্লাসে গেলাম। দশ দিন অতিক্রান্ত অথচ সর্বদা সর্বত্র একই আলোচনা। রমাদি ক্লাসে ঢুকল। আমি দেখতে পেয়েও পেলাম না। আমার পাশে কে একজন বসে ছিল তাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসে বলল—

'কিরে, আজ দাঁত বের করে হাসলি না যে?'

'দাঁত আর একটাও পাটিতে নেই, লজ্জার গুঁতোয় সব পেটে ঢুকে গেছে।'

'ও। বিশ্বকাপের শোক এখনো মাথা থেকে নামেনি! মন খারাপ করিস না, আসছে বছর আবার হবে।'

'আসছে বছর না, চার বছর পর।'

'ঐ হল, আমার কাছে একটা ভালো খবর আছে শুনলে তোর দিল খুশ্ হয়ে যাবে।'

দিল খুশ্ হবার কথা শুনে হেসে ফেললাম। অনেক দিন পর হাসলাম।

'কি খবর গো?'

'অ্যায়! এই হাসিটা দেখার জন্যেই এতক্ষণ তেল মাখাচ্ছিলাম।'

হাসি আবার অন্তর্হিত, 'তার মানে কোন খবর নেই!'

'আছে আছে; ধীরজ ধর। এই নাও তোমার প্রেমপত্র এসেছে?'

ব্যাগ থেকে একটা ফোল্ডিং করা রুলটানা কাগজ আমাকে দিল।

'রিঅ্যালি! আমি তো ভাবিই নি আসবে।'

'দু জায়গায় দিয়েছিলিস?'

'হ্যাঁ, শেষেরটা আজকাল দেখে ছেড়েছিলাম।'

'সেই ভদ্রলোক নিজে এসে ওটা দিয়ে গেছেন।'

'এ বাবা! কি হবে এখন? আমি কিন্তু মোটেই ওভাবে যোগাযোগ করতে বলিনি।'

'আমিও তাই বললাম। তোর সাথে দেখা করতে চাইছিল। তুই নেই শুনে ওটা দিয়ে গেল।'

'আমি এখন কি করব?'

'কি আবার করবি ! চলে যা, দেখা করতে বলেছে, ঐ ঠিকানায় দেখা কর ।'

'তুমি পাগল হলে ! আমি কি এই জন্য দিয়েছিলাম ?'

'এই জন্য না দিস ; তুই তো ভাবিসই নি আসবে । এখন এসেছে যখন যোগাযোগ করে দেখ না কি হয় । তোর চিঠি পড়ে ভদ্রলোক কিন্তু খুব আগ্রহী । বার বার তোর নাম করছিল । মনটা কেমন খারাপ খারাপ মনে হল ।'

'যাঃ ! উল্টো পাল্টা বকছ ।'

'না রে বিশ্বাস কর সত্যি বলছি ।'

ক্লাসে স্যার ঢুকলেন । আমরা উঠে দাঁড়ালাম । স্যার রোল কল করছেন । আমরা তখনো কথা বলে চলেছি ।

'তুমি কি করে বুঝলে ঐ ভদ্রলোকই পাত্র ?'

'না বোঝার কি আছে ! কথা বার্তায় যেরকম লাজুক লাজুক ভাব'—

'রাবিশ । লাজুক লাজুক ভাব বলেই ধরে নিলে ও পাত্র ? ওটা হয়ত ওর জন্মগত ইয়ে—'

'কুহেলী, ফাস্ট বেঞ্চে বসে এত কথা হচ্ছে কেন ?'

'সরি স্যার ।'

রমাদি ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'ওটা ওর জন্মগত ইয়ে নয় । উনিই পাত্র । শ্বশুর বাড়ির লোকের সঙ্গে জামাইরা যেমন কথা বলে ঐ ভদ্রলোকও আমার সাথে ঠিক তেমনি করে কথা বলছিলেন । তোর কথা বলতে গিয়ে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল ।'

আমি আর কিছুতেই হাসি চাপতে পারছি না । রমাদি আমাকে হাসিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেছে । বাঁ হাতে মুখটা চেপে স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি । হাত সরালেই যত রাজ্যের হাসি সশব্দে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়বে ।

'থার্টি নাইন—থার্টি নাইন—'আমি তখন ভীষণ ব্যস্ত ।

'কুহেলি—'রাধাদি কনুই দিয়ে এক গুঁতো মারল ।

'ইয়েস স্যার', স্যার রোল কল করছেন খেয়ালই করিনি ।

রমাদি আবার শুরু করল । 'আরও একটা আছে । প্রথমে আনন্দবাজার দেখে যেটা দিয়েছিলিস, আজই এসেছে চিঠিটা । খামের উপর ঠিকানা লেখা দেখে মনে হল বেশ ভালো, মানে হ্যান্ড রাইটিংটা সুন্দর । এই নে' ।

'ইয়েস, আমি এই রকমই একটা চাইছিলাম ।'

খামটা খুলে চিঠিটা বের করলাম । পড়তে যাব কি কানের কাছে মুখটা এনে রমাদি চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, 'কুহেলী স্যার দেখছেন কিন্তু ।' আমি আর কোনদিকে না তাকিয়ে সেটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললাম । ক্লাস শুরু হল । স্যার কত কিছু বোঝাচ্ছেন আমি কিছুই বুঝছি না । আজব কাণ্ড ! আমার মনটা গেল কোথায় ? অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি, আমার অবাধ্য মন ব্যাগের ভিতর । চিঠিটা পড়ার জন্য অধীর হয়ে আছে । একি ! একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির চিঠি পড়ার জন্য মন এত উতলা হচ্ছে কেন ? একি অসভ্যতা !

'রমাদি, চিঠিটা ভীষণ পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'তা হবে না! প্রেম পত্র বলে কথা। বাইরে গিয়ে পড়ে আয় না।'

'ঠিক বলেছ।' দাঁড়িয়ে বললাম, 'স্যার, একটু বাইরে যাব?'

'কেন?'

এই মেরেছে! কি বলি! স্যার কে তো আর বলা যায় না চিঠি পড়তে বাইরে যাব! 'স্যার জল—জল খেতে যাব।'

'যাও।'

ব্যাগটা ঘাড়ে করে নিয়ে ছুটলাম। বাইরে গিয়ে চিঠির ফোল্ডিংটা খুলেছি—পাতাটা কাঁপছে তির্ তির্ করে। কি ব্যাপার। ওহ! আমার হাতটাই কাঁপছে। কিন্তু কেন! বুকের তলায় একটা মৃদু কম্পন। অসম্ভব কৌতুহল; কি লেখা আছে এ চিঠিতে! এভাবে কাঁপলে তো পড়া যায় না। বেঞ্চের উপর মেলে ধরলাম সেটাকে—

Dear কুহেলী,

পাত্রীসু, মাপ করবেন শুরুটা এভাবে করলাম বলে। এতগুলো চিঠির মধ্যে আপনার চিঠি একেবারেই আলাদা ধরনের। তাই আপনার চিঠির উত্তর লেখার জন্য আমি (পাত্রের ভাই) নিজে কলম ধরলাম। বলা বাহুল্য ও কাজটা বাবাই করছেন। আর আপনার এই প্রয়াস সত্যিই আমার ভালো লেগেছে। চিঠির প্রথা ভঙ্গের যখন ভয় নেই তাই আপনার মত করেই আমাদের introduction-টা সেরে নেওয়া যাক।

জাতি ঃ পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদী মাহিষ্য।

পিতা ঃ অবসর প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী।

মাতা ঃ সাধারণ গৃহকর্ত্রী।

ভাই ঃ…

বোন ঃ…

বাড়ী ঃ ডায়মণ্ডহারবার (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা)

এবার পাত্রের বিবরণ দেওয়া যাক ঃ…

বড় ভাই ঃ…

মেজ ভাই ঃ…

সেজ ভাই ঃ পাত্র

ছোট ভাই ঃ আমি নিজে। Graduate…বর্তমানে Indian Air Force-এ Radar department-এ কর্মরত। Posting আগ্রায় (City of Tajmahal).

সুতরাং বাবা-মা দুই দাদা ও বৌদি নিয়ে এক নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। পাত্র এবং আমি চাকরী সূত্রে প্রবাসী।

আশা করি আমি আপনাকে আমাদের পারিবারিক বিবরণ দিতে পেরেছি কুহেলী-দেবী। আর হ্যাঁ, আমার বাবা এক ভাই। আপনি একজন শিক্ষিতা, আধুনিকা, নিজস্বতা সম্পন্না নারী। তাই আশা করি আমার বিবরণ পড়ে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কারণ আপনার চিঠিই সে ইঙ্গিত বহন করে। তাই যদি আপনার সম্মতি থাকে তাহলে এক কপি photo বড়দার অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন বা আপনি নিজে বড়দার অফিসে দেখা করতে পারেন। (আপনি বলেই কথাটা বললাম।) বড়দার অফিস···

So, with this I would come to end of this letter. Wishing you best of luck.

Ahire.

N : B :—যদি মনে কিছু না করেন। আপনার সম্বন্ধে detail জানিয়ে একটা Passport photo আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে খুশী হব। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আসলে আমি 23 March আগ্রা চলে যাচ্ছি।

ঠিকানা—
A. K. Basu

এক্সেলেণ্ট! এত সুন্দর একটা চিঠি স্বপ্নের অতীত ছিল। প্রয়োজন ছাড়াও আমার তারিফ করতে গিয়ে অনেক বাড়তি কথা লিখেছেন। আর যাই হোক এ চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোক আমাকে ভুল বোঝেন নি, আই মিন্ পাগল ভাবেন নি। ভাবলে একটা পাগল মেয়ের জন্য কখনোই এতটা এনার্জি লস্ করতেন না। সর্বোপরি এতটা টাইম ওয়েস্ট করতেন না। আজকাল এ জিনিসটার বড় আকাল। কারুর হাতে সময় নেই। খেয়ে হজম করার সময় নেই—চিঠি লিখে পোস্ট করার সময় নেই—কথা দিয়ে কথা রাখার সময় নেই—পরীক্ষার দিন টিফিন খাওয়ার সময় নেই—ঘড়ির ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে আনার সময় নেই—মোদ্দা কথা, চব্বিশ ঘণ্টায় আর কুলোচ্ছে না; আটচল্লিশ ঘণ্টায় দিন হলে তবে যেন সব কাজ ঠিক ঠিক আঁটে। যাগ্গে, আমি অনেকক্ষণ বাইরে এসেছি। স্যার হয়ত ভাবছেন কুহেলী বাড়ি থেকে জল খেয়ে আসতে গেছে। আর রমাদি ভাবছে আমি বোধহয় চিঠিটা মুখস্থ করছি। সুতরাং এইসব ভুল ভাবনাগুলো ভাঙতে আমার ইমিডিয়েট ক্লাসে ঢোকা উচিত।

'আসব স্যার' ?

'এস। কতদূর জল খেতে গিয়েছিলে ?'

'এখানেই তো স্যার—না মানে—'

'ঠিক আছে বোস।'

বাঁচা গেল—মানের পরে যে কি বলতাম আমি নিজেও জানি না। জায়গায় বসে আড়চোখে তাকালাম রমাদির দিকে। ওমা! ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখ দিয়ে মিট্ মিট্ করে হাসছে। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম, তা না হলে হেসে ফেলতাম। যথা সময়ে ক্লাস শেষ হল। থিওরি বলে বেঁচে গেলাম, প্র্যাকটিক্যাল হলে অভিনয় করতে পারতাম না। ডায়লগই খেয়াল থাকত না। এ আমার জন্মগত ব্যামো একটুতেই এতটা এক্সাইটমেণ্ট। স্যার চলে যেতে রমাদিকে ওটা দিয়ে বললাম—'পড়ে দেখ'।

'তোর চিঠি আমি পড়ব কেন ?'

'আহা, তা তে কি! দিচ্ছি যখন পড়।'

চিঠিটা পড়ে প্রবীণ বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে হুঁ বলল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কি বুঝলে ?'

'বুঝলাম'—

'সেটা তো তোমার ঘাড় নাড়ার বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কি বুঝলে সেটা বলবে তো'!

'বুঝলাম, ভদ্রলোক তোর মত ছ্যাবলামি করেন নি। আর তুই যে ছ্যাবলামো করেছিস সেটাও ধরতে পারেন নি।

'ধরার উপায় থাকলে তো ধরবে।'

'কি ?' রমাদি শুনতে পায়নি।

'কিছু না। আচ্ছা রমাদি আমি তো পাত্রকে চিঠি দিয়েছিলাম পাত্রের ভাই উত্তর দিল কেন ?'

'তাতে কি হয়েছে! যে কেউ দিতে পারে। মামা কাকা বাবা দাদা ভাই যে কেউ। তুই তো আর মেনশান করে দিস্‌নি—পাত্রই উত্তর দিন।'

'তা অবশ্য ঠিক'—আমি ভাবছি, চুপচাপ ভাবছি। মাথার মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে বেড়াচ্ছে। অ্যাকোরিয়ামের স্বচ্ছ জলে একটা ছোট্ট রঙিন মাছের মত লেজ নেড়ে নেড়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে বুদ্ধিটা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঐ তো—ঐ তো যাচ্ছে।

'রমাদি, পাত্রের ভাইকে পাত্রে পরিণত করার দায়িত্বটা তো আমার, কি বল ?'

'ওরে ছাগল! এতক্ষণ বসে বসে এই ভাবলি ?'

'যাই বল রমাদি, চিঠিটা আমাকে ভীষণ ইম্প্রেস করেছে। চিঠি এসেছে শুনে পড়ার কিউরিসিটি—পড়ে পত্র প্রেরককে দেখার এবং জানার কিউরিসিটি'—

'এই যে মিস্ কিউরিসিটি, আমি একটা সৎ পরামর্শ দি ?'

'ওভিয়াসলি! বল'—

'চিঠি পড়ে যা মনে হল'—

'কুহেলী বাড়ি যাবি না ?' অন্য এক বন্ধু ডাকল।

'যাব রে, একটু পরে যাব।'

'কি তোরা সব সময় স্বামী-স্ত্রীর মত গুজগুজ ফুসফুস করিস বলত ?'

'এই দেখো, জানিস যখন স্বামী স্ত্রী তখন পার্সোনাল কথা শুনতে চাইছিস কেন! বাচ্ছা ছেলে পেকে যাবি কোথায়, বাড়ি যা।'

'তা যাচ্ছি, কিন্তু কাল মনে করে তোর ফেয়ার খাতাটা আনিস কিন্তু।'

'আনব, নিশ্চিন্তে বাড়ি যা'।

'চলি গো রমা দি।'

'আয়।'

'হ্যাঁ, বল কি বলছিলে।'

'চিঠি পড়ে যা মনে হল, ফ্যামিলিটা ভদ্র এবং এডুকেটেড। মানে পাত্র পক্ষ হিসাবে বেশ ভালোই। তাই এটা গিয়ে তোর মাকে দেখা। ওনারা যা ভালো বুঝবেন করবেন—'

'অ্যায়! এ রকম গার্জেন গার্জেন ভাব কর কেন বলত? বাবা মাকে-ই যদি দেখাব তাহলে তোমার ঠিকানা ইউজ করলাম কেন! আর বাড়িতে দেখান মানে তো সেই ঝামেলা।'

'ঝামেলার কি আছে! তুই কি বিয়ে করবি না? না তোর বিয়ের বয়স হয়নি?'

'তা হবে না কেন! মেয়েদের তো জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই বিয়ের বয়স হয়ে যায়। আমার বাবা-মা তো আমার মাধ্যমিক দেবার পর থেকেই মুদিখানার ফর্দের মত জামাইদের নামের লিস্ট নিয়ে পিছন পিছন ঘুরছেন। আর আমি পালাবার নতুন নতুন ফন্দি ফিকির বের করছি।'

'তুই একটু কাটখোট্টা আছিস। মেয়েরা বড় হয়ে ভাবে বাবা মা কবে বিয়ে দেবে। আর তুই—'

'একটু কেন রীতিমত কাটখোট্টা। এসব আমার ভাল্ লাগে না।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কোয়েড কলেজে পড়লি অথচ একটাকেও ফিট্ করতে পারলি না। কি করবি, পাত্রের দাদার অফিসে ফটো পাঠাবি?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম—'না।'

'তার মানে তোমার এক্সপেরিমেণ্ট শেষ?'

'না, আগ্রাতে চিঠি দেব।'

'আগ্রাতে! অ—তার মানে ভাইটাকে তোমার পছন্দ।'

'ও ভাবে বলছ কেন! উনি আমার চিঠির উত্তর দিয়েছেন। ওনার চিঠির উত্তর দেওয়াটা কি আমার কর্তব্য নয়! পাত্রী হিসেবে না হোক একজন বন্ধু হিসেবে এটুকু করা যায়। তাছাড়া বিশেষ করে উনি যখন আগ্রার ঠিকানা দিয়েছেন!'

'বন্ধু! তুই তো ওকে চিনিসই না।'

'তাতে কি হয়েছে! আমি বেশ ভাবতে পারি ওনার সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে। আসলে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। একটা অদ্ভুত সুন্দর ফিলিংস্ কাজ করছে আমার ভিতর। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—'

রমাদি হাসছে—'সত্যিই তুই ছেলেমানুষ। বাচ্চারা যেমন একটুতেই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে, আবার সামান্য কিছু পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়—এখন দেখছি তোর শুধু বয়সটাই বেড়েছে, মনটা বাড়েনি।'

'না, ঠিক তা নয়—আসলে এ রকম ঘটনা আমার জীবনে আগে কোনদিন ঘটেনি তো তাই। এভাবে কেউ আমাকে চিঠি দেয়নি—অবশ্য আমিও কাউকে দিই নি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে ; বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভালো করে ভেবে দেখ কি করবি। কোন দরকার পড়লে বলিস আমাকে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'চল, বাড়ি যাবি তো ?'

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দুজন দুদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। রমাদি গেল পশ্চিমে আমি পুবে। বাসে বসে আছি। নিত্যকার মত জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। কিন্তু কিছুই দেখছি না। বড়বাজারের সার সার দোকানগুলোর ওপর দিয়ে চোখ দুটো বুলিয়ে যাচ্ছে। ঘর্মাক্ত মুখে বাতাসের ঠাণ্ডা পরশ লাগতে বুঝতে পারলাম হাওড়ার ব্রীজের উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। বাবা! চিৎপুরের বিখ্যাত জ্যাম পেরিয়ে এলাম! এতদিন ক্লাসে যাচ্ছি এরকম বিরক্তহীন ভাবে কোনদিন বাড়ি ফিরিনি। ঘড়িতে টিকিট গোঁজা ; কখন কাটলাম খেয়াল করতে পারছি না। কি হল আমার! আমি এরকম নিজের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছি কেন! একটা সামান্য চিঠি নিয়ে আকাশ পাতাল কি এত ভাবছি! আমি জানি ব্যাপারটা সাধারণ অথচ কিছুতেই এটাকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছি না। বুঝতে পারছি এত আনন্দ করার মত কিছু হয়নি তবুও আনন্দ হচ্ছে। এই আমার মস্ত দোষ, জানি ভাবার কিছু নেই তবুও ভাবব। মাঝে মাঝে অবাধ্য মনটা এমন আউট অফ্ কণ্ট্রোল হয়ে যায় যে কি বলব! কিছুতেই আমার কথা শুনতে চায় না।

লাস্ট স্টপেজে বাস থামল। আমি নেমে হাঁটতে শুরু করেছি। মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বকাপের কথা লেশ মাত্র মাথায় নেই। সারাটা মন জুড়ে রাজত্ব করছে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। আমি যাকে চিনি না জানি না দেখিনি কোনদিন। আমাকে যেন ভাইরাস আক্রমণ করেছে। আমারই অলক্ষ্যে থেকে আমার শরীর মনকে পরিচালনা করছে সে। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না অথচ কি ভীষণ ভাবে নিজের মধ্যে তাকে অনুভব করছি। তার সকল ক্রিয়াকলাপ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আমি নিজের ঘরে। না, অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কারুর ঘরে চলে যাইনি। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পরিচিত রাস্তা ধরে এসে লোহার গেটটা পেরিয়ে বাড়িতেই ঢুকেছি।

'সমি, তোকে খেতে দি ?'

মা। আমাকে খাবার দেবেন কিনা জানতে চাইছেন। 'সমি—'

'হ্যাঁ দাও।'

'আজ তোর এত দেরি হল ?'

'কোথায় দেরি! তাড়াতাড়ি তো এসেছি। আজ রাস্তায় জ্যামই হয়নি।'

বলেও বিপদ, বাপির পাল্টা প্রশ্ন, 'তাহলে এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

'কোথায় যাব! সোজা বাড়ি আসছি।'

মনে পড়ছে, রাস্তায় বোধহয় জ্যাম হয়ে ছিল; আমিই টের পাইনি। এতক্ষণ ঘড়ি দেখিনি সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। অ্যামিটারের সূচকের মত এটা আমার ধ্রুব সময়। কোন কারণে মিনিটের কাঁটাটা যদি সাড়ে টোপকে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশের দিকে ঠ্যাংটা বাড়িয়েছে তো আর রক্ষে নেই। মা আর বাপির চিন্তার ব্যারোমিটারে দুঃশ্চিন্তার পারদ তরতর করে উপরে চড়তে শুরু করবে। মেয়েটা নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। এত দেরি হবার তো কথা নয়! আচ্ছা, গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়নি তো! কি সর্বনাশ, বাড়ি ফিরবে কি করে! ও রাস্তা যে বড্ড খারাপ। এই জন্য বলি ওসব ছেড়ে দে। আমাদের ঘরের মেয়েরা এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে না। আচ্ছা, কেউ কিডন্যাপ করেনি তো! নাকের সামনে রুমাল নেড়ে অন্য কোথাও নিয়ে চলে গেছে। কি করি এখন! সিনেমা হলে না হয় নায়ক এসে বাঁচাত—কিন্তু এটা যে বাস্তব, বড্ড কঠিন। খানিক পরে হয়ত ফোন আসবে—এত হাজার টাকা দিন। দূর! এত কমে ওদের পোষায় না। লাখ—হ্যাঁ, এত লাখ টাকা দিন। মেয়েকে ছেড়ে দেব। তা না হলে কিমা করে বস্তা ভর্তি করে বাড়িতে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব। সব সিনেমার ডায়লগ। তারপর টাকা দিলেও হয়ত ছাড়বে না। হয়ত পা খোঁড়া করে ভিক্ষে করাবে। দুবাই এ চালান করে দেবে। কিডনি বের করে নেবে—শরীর থেকে বোতল বোতল রক্ত বের করে নেবে। হা ঈশ্বর! আর ভাবতে পারছি না। মেয়েটার আমার কি কষ্ট হচ্ছে। কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো। টি ভি চালাও তো খবরটা শুনি। দূর! খবর তো কখন শেষ হয়ে গেছে। আবার সেই সাড়ে আটটায় হিন্দী খবর। এতক্ষণ থাকব কি করে! না না অ্যাক্সিডেন্ট নয়—ঐ মুখপোড়া গুণ্ডাগুলোই ধরেছে। সর্বনাশ হোক তোদের। নির্বংশ হয়ে যা তোরা। ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হবে। গুণ্ডাদের বাপান্ত করতে করতে সজল চোখে দরজা খোলেন মা। অক্ষত অবস্থায় সশরীরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে খোঁচা মারার মত লাখে লাখে প্রশ্নের মৌমাছি বোঁ বোঁ করে আমাকে আক্রমণ করবে। কোনটা ফেলে কোনটার জবাব দেব খুঁজে পাই না। ঢোক গিলে গিলে কোন রকমে ম্যানেজ করি পরিস্থিতিটা। ব্যাস! প্রশ্ন শেষ, কথা শেষ। সেদিনকার মত আমি অচ্ছুৎ। আমার সাথে আর কোন কথা নয়। মা খেতে দেবার সময় আর্জেন্ট মনে করলে দু একটা বললেও বলতে পারেন, কিন্তু বাপি স্পিকটি নট। দূর, এ রকম করে শিল্প চর্চা করা যায়! প্রতিদিন একই যন্ত্রণা। মাসে যে কতবার করে কিডন্যাপ হচ্ছি আবার ফিরে আসছি তার ঠিক নেই। বাড়ির লোকের এই অহেতুক চিন্তার বলি আমি। যে চুলোতেই থাকি না কেন ঐ সময়ের মধ্যে পড়ি মরি করে বাড়ি ফিরতে হয়। যতই কাজ থাক। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ফিরতে হবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে আমি সত্যিই বেশ অ্যাক্সিডেন্টে মরি, খুব

ভালো হয়। বাপি মার উপর বদলাটা খুব ভাল নেওয়া যায়। কাঁদুক সারা জীবন। সবাইকে বলে বেড়ায় মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি। অথচ বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলে শুধু পিটতে বাকি রাখে। এমনিতে বাপিকে না বলে আমি কোথাও যাই না। তবে পরিস্থিতি যদি এ রকম দাঁড়ায় যে, বলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। বাপি কলেজে বেরিয়ে গেছেন তারপর হয়ত বাধ্য হয়ে কোথাও যেতে হল। ফিরে এসে যদি শোনেন তো ব্যাস্—নো আর্গুমেন্ট নো কম্প্রোমাইজ।

এক সপ্তাহ আমার সাথে কথা বন্ধ। মাঝে মাঝে ডোজ বেশী হলে ওটা দশ দিনেও গিয়ে ঠেকতে পারে। তখন মনে হয় কোথাও পালিয়ে যাই। মরুভূমি কিংবা কোন জঙ্গলে। যেখানে কেউ আমার সাথে কথা বলবে না। আমিও দীর্ঘদিন কারুর সাথে কথা বলতে না পেরে বোবা হয়ে যাব। তারপর কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করে কোন থানায় পেঁাছে দেবেন। পুলিশ আমার নাম ঠিকানা জিগ্যেস করবেন কিন্তু আমি বলতে পারব না। বোবা হয়ে গেছি তো বলব কি করে! তারপর খবরের কাগজ বা টিভিতে অ্যাড্—এই অজ্ঞাত পরিচয় অর্ধপাগল বোবা মেয়েটির সন্ধান জানা থাকলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। বহুদিন অনাহার অনিদ্রায় জঙ্গলে মরুতে ঘুরে আমার বেহাল অবস্থা। পেত্নীর মত দেখতে হয়ে গেছি। কিন্তু মার চোখ তো যতই খারাপ হোক ঠিক চিনতে পেরেছে। বাপিকে ঠ্যালা দিয়ে বলছেন, 'ঐ দেখো, আমাদের সমির ছবি না! আমি তোমাকে বলেছিলাম সমি বেঁচে আছে। চ'ল এক্ষুনি নিয়ে আসি।'

যথাসময়ে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়ে বাপি আমাকে উদ্ধার করে আনবেন। বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদিবেন। মিনতি করবেন—আমাকে ডাক মা, একবার বাপি বলে ডাক।

অসম্ভব। বহুকাল অব্যবহারে আমার আলজিভ লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সব সুর সব কথা। যতই মাথা খোঁড়ো, বাপি বলে আর ডাকছি না। এটা শাস্তি। কথায় কথায় আমার সাথে কথা বন্ধ করার শাস্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি বাপি মা দুজনেই কাঁদছেন। আমার কোটরস্থ চোখ দুটো শুকিয়ে গেছে তাই কাঁদছি না। মনে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি। ভাবছি উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। যখন কথা বলতে পারতাম তখন একটুতেই মুখ গোমরা করে থাকতে। বাপি বলে ডাকলে সাড়া দিতে না। ঠিক হয়েছে। জব্দ! আমার ঐ সংটকে দুর্বল চেহারা নিয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে, যেন শুকনো মনের মরা গাঙে বান ডেকেছে।

বান ডেকেছে আমার অন্তরেও। আহীর বোসের চিঠি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি না ব্যাপারটা! বাড়ি ফিরে বেশ কয়েকবার পড়লাম চিঠিটা। প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছি। মনে মনে ঠিক করছি এ ভদ্র লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবই। চিঠি লিখব—আজই—হ্যাঁ, এক্ষুনি—বসে পড়লাম পেন খাতা নিয়ে। লিখতে বসে ভাবছি কি বলে সম্বোধন করা যায়! উনি

তো লিখেছেন Dear কুহেলি। Dear—ভাবতে ভালো লাগছে। আমিও Dear লিখি। না থাক, অন্য কিছু লিখি—ইয়েস্—

Hallo Mr. Ahire,

প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমার পত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য। আমার চিঠি আপনার ভালো লেগেছে জেনে সত্যিই ভালো লাগছে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আপনার চিঠি হাতে পেলাম। জানি না এই মুহূর্তে আপনি কি করছেন, তবে আমি এখন আপনার পত্রের post mortem করতে বসেছি। আজ 23 March. এতক্ষণে আপনি হয়ত কর্মস্থলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কিংবা রওনা হয়ে গেছেন আগ্রাভিমুখে। সে যাই হোক। আপনার যাত্রা শুভ হোক। (ভাববেন না এটা কেবলই formality maintain করার জন্য বললাম তাহলে আমার আন্তরিকতাকে অপমান করা হবে।) যাক, এবার ভূমিকা ছেড়ে অন্য কথায় আসি।

আমাব বিস্তারিত বিবরণ কি দি বলুন তো! আমার মনে হয়—ও হ্যাঁ ভালো কথা আমার Bio-Science ছিল।.. বর্তমানে কম্পিউটার পড়ছি। তবে মাঝপথে ছেড়ে দেবার আশঙ্কা আছে! আপনি বোধ হয় জানেন আমি একা। বাপি মা আর আমি। আর কি! এবার আপনাকে চুপি চুপি একটা সত্যি কথা বলি। (তাই বলে যেন ভাববেন না এতক্ষণ যা বললাম সব মিথ্যা।) বলব? বলেই ফেলি। আসলে আমি কোন positive result আশা করে এ চিঠি লিখিনি। News paper এ পাত্র-পাত্রী কলাম পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বিশেষ করে দাবিহীন লেখা থাকে যেগুলো। এটা একটা বদ নেশা বলতে পারেন। এমনি Casually আপনাদের Box No.-এ একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এটা আমার নতুন experiment হিসাবে ধরে নিতে পারেন। কিন্তু সত্যি উত্তর আসবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম কত লোক ইতো চিঠি দেবে, আমারটা হয়ত সেখানে কোন মূল্যই পাবে না। আপনার চিঠি পেয়ে আমার সে ধারণাটাই বদলে গেল। তাই ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। পরে ভাবলাম, না, এতটা আনন্দ করার মত কিছু হয়নি। তবে আর কিছু না হোক আপনার সাথে বন্ধুত্বটা তো হল। (আজনবী দোস্ত)। আমি আমার কথা বললাম; আপনি আমায় বন্ধু ভাববেন কি না সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি লিখেছেন আমি আপনার বড়দার অফিসে গিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারি। দূর মশাই, আমার তো ভাবতেই ভয় লাগছে। আপনি আমাকে যতটা Bold ভেবেছেন আমি বোধহয় ঠিক ততটা নই। যতই হোক, এই পুরুষ শাসিত সমাজের এক বাঙালি পরিবারের এক অতি সাধারণ মেয়ে আমি। তবে যদি কোনদিন অসাধারণ হই তো সবার আগে আপনাকেই inform করব। (Please don't mind it is just for a joke.) পাত্র পক্ষের কাছে গিয়ে নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিজেই দেব! অসম্ভব, সে পারব না। তাতে যদি আপনি আমার সম্বন্ধে ধারণা বদলে ফেলেন তো I am sorry. আমার কিছু করার নেই। তবে আপনার চিঠির উত্তর দেওয়াটা আমার কর্তব্য বলে মনে হয়েছে তাই দিলাম। পাসপোর্ট ছবি দিলাম না। কারণ

যে ছবিটা রয়েছে সেটা চার-পাঁচ বছরের পুরানো আর একটু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুন্দর উঠেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারি না ওটার সঙ্গে। ওটা পাঠালে নিজের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা দেওয়া হত তাই দিলাম না। (এটাকে ছবি না পাঠাবার অজুহাত বলে যেন ধরে নেবেন না প্লীজ।)

আচ্ছা, এবার অনুমতি দিন। আপনার অনেক অমূল্য সময় হয়ত নষ্ট করে দিলাম। ক্ষমা চাইব না। বরং আপনি চাইলে অনুরূপভাবে আমার সময় নষ্ট করে এর বদলা নিতে পারেন। অবশ্য এ চিঠির উত্তর আপনি দেবেন কি না, সেটা সম্পূর্ণটাই আমি আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। তবে ভবিষ্যতের কোন দুপুরে যদি কোনদিন কোন পথ চলতি পিয়নের সঙ্গে দেখা হয় তো আপনার কথা অবশ্যই মনে পড়বে। না, এখানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

Thank you & Good bye—

কুহেলি

চিঠিটা বার দুই পড়লাম। বাহঃ! হেভি লিখেছি তো! নিজের কেরামতিতে নিজেই প্রসন্ন। চিঠি লেখার দিক দিয়ে আমি একটু অভিজ্ঞ জানতাম কিন্তু পত্রটা এমন সুন্দর হবে ভাবিনি। নাহঃ, হাতটা বেশ পাকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। আমাকে চিঠি দিয়ে উত্তর পায়নি এমন ক্লেম কেউ করতে পারবে না। আমি রীতিমত সময় দিয়ে চিঠি লিখি। ভাবছি, এই জিনিসটা যখন ওনার হাতে গিয়ে পেঁছবে কি ভাববেন উনি! বুঝতে পারছি না। তবে আর যাই ভাবুক পাগল নিশ্চই ভাববেন না। কারণ পাগলরা কখনো এত গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে না। অবশ্য শিক্ষিত পাগল হলে আলাদা ব্যাপার। উনি নিশ্চই খুশী হবেন। ঘরে বসে বসে বিনা পরিশ্রমে আমার মত একজন বন্ধু পেয়ে গেলেন। 'বন্ধু'—এই শব্দটা আমাকে ভীষণ টানে। রক্তের কোন সম্পর্ক নেই অথচ কি অসম্ভব আন্তরিকতা কি নিষ্কলুষ ভালোবাসা দিয়ে তৈরী এই শব্দটা। আমার অনেক বন্ধু। আহীরও তাদের মধ্যে একজন। বন্ধুর নামের মালায় নতুন একটা মুক্ত সংযোজিত হল আজ।

'সমি—পড়া হয়ে গেলে বাইরে আসিস তো একবার।' মার কথাটা কানে লাগল। পড়া হয়ে গেলে—আমি পড়ছি না কি! টেবিলের উপর কম্পিউটারের বই খাতা ছড়ান আছে, এই পর্যন্ত। এই এক অদ্ভুত বিষয়, কোন কারণে একদিন কলেজ কামাই করলে পরের দিন চোখে অন্ধকার। যেন অথৈ জলে পড়েছি। বই পড়ে যে আত্মস্থ করব সে উপায় নেই। আবার ম্যাডামদের অয়েলিং কর, তাঁরা প্রসন্ন হলে দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেবেন। তার আগে চলবে উকিলের জেরা—কেন আসনি, কবে আসনি, কি জন্য আসনি…

আজ রাত্রে টি ভি তে ভালো সিনেমা দিয়েছে। ভাবলাম দেখব। রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে—হ্যানা হবে ত্যানা হবে, চিৎকার চেঁচামেচি করে মা টি ভি বন্ধ করে দিলেন। রার্গে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। খানিক পরে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মা আমার মুখে মাথায় হাত দিচ্ছেন। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'এখনো ঘুমাস নি ?' আমি চুপ করে আছি।

'সমি—সমি ঘুমিয়ে পড়েছিস ?'

'না।'

'সাড়া দিচ্ছিস না কেন, রাগ করেছিস ?'

'কথা বোল না। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

মা বুঝতে পারেন আমার রাগ পড়েনি। আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুলাম। ঘুম আসছে না। ভাবছি ঠিকানাটা বদলে দেব। রমাদিকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তাছাড়া শনি রবি ছাড়া রমাদির সঙ্গে দেখা হয় না। যদি সোম কি মঙ্গলবার চিঠি আসে তাহলে এক সপ্তাহ পর পাব। আর বাইচান্স যদি না আসতে পারে, তাহলে পনের দিন। না না দূর! ওভাবে হয় না। আমাদের বাড়ির ঠিকানাই দেব। বাপি বা মা নিশ্চই খুলে দেখবেন না। আগে খুলতেন। স্কুল থেকে এলে মা বলতেন—'সমি, তোর চিঠি এসেছে।' খামের মুখ ছেঁড়া, মোড়ক খোলা চিঠিগুলো হাসতে হাসতে এগিয়ে দিতেন। আমার ভীষণ রাগ হত। আমি ছোট বলে আমার কি কোন প্রাইভেসি নেই! তাছাড়া বিনা অনুমতিতে অপরের চিঠি পড়া ঘোরতর অন্যায়। সে যেই হোক, বাবা মা তো কি হয়েছে! কই, তোমাদের চিঠি তো আমি পড়ি না! কোন কৌতূহল প্রকাশ করি না। একটু বড় হয়ে একদিন মাকে বুঝিয়ে বললাম—বাপিকে বলার সাহস নেই। বেশ গুছিয়ে কথা কটা বলতে সেই থেকে চিঠি খোলা বন্ধ। এখন এলে রেখে দেন। তবে জিগ্যেস করেন কার চিঠি। সে করুন গে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আহীরের চিঠি এলে কি বলব! শুধু বন্ধু বললে তো হবে না, কোন্ বন্ধু জানতে চাইবেন। মা আমার সব বন্ধুদের চেনেন তাদের নাম জানেন। তারা সবাই বাড়িতে আসে। যার নাম বলব সে যদি পরের দিন এসে হাজির হয়! মাতো বলবেন—'কাল তোমার চিঠি এসেছে আর আজ তুমি এলে। তুমিই তো হাতে করে আনতে পারতে চিঠিটা ? সেও চোখ ছানা বড়া করে বলবে—'কই, না তো কাকিমা আমি চিঠি দিইনি তো।

সর্বনাশ! সে এক মহা বিভ্রাট। মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে যাওয়ার মত বিশ্রী ব্যাপার আর দুটো নেই। এখন আর ভাবতে ভাল লাগছে না। আগে তো আসুক পরে দেখা যাবে। পরিস্থিতির চাপে কত বুদ্ধি বেরিয়ে আসবে। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন আমার দুচোখে পাঁচা ভর করেছে। অস্বস্তি লাগছে একা একা জেগে থাকতে। একবার এ পাশ একবার ওপাশ করছি। আহীর! নামটা বেশ সুন্দর। নামের মধ্যে একটা শিল্প আছে। 'আহীর-ভৈরব' একটা রাগের নাম। ভোর বেলা গাওয়া হয় এ রাগ। ভোরের অর্কার্ঘ্যের ছোঁয়ায় যেমন নতুন দিনের সূচনা হয় তেমনি তোমার স্পর্শে আমার জীবনে নতুন সকালের ঘুমন্ত অঙ্কুরটা ধীরে ধীরে মাথা তুলছে,—আমি জাগছি--অনন্ত নিদ্রা থেকে জেগে উঠছি। আমি কি এতদিন তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম! তোমার প্রতীক্ষায়! একি! এসব আমি কি ভাবছি! কেন ভাবছি! আহীরের জন্য আমি অপেক্ষা করতে যাব কেন! মা আমাকে ধরে

শুয়ে আছেন। কাউকে স্পর্শ করে যদি তার মনের ভাবনাগুলোর নাগাল পাওয়া যেত তাহলে এতক্ষন হয়ত মা আহীরের কথা জানতে পেরে যেতেন। আমি ধীরে ধীরে মার হাতটা নামিয়ে দিলাম আমার গা থেকে। তুমি কে বন্ধু? কুহেলির নিঃসঙ্গ জীবনে এভাবে কুহক হয়ে দেখা দিলে। আহীর দেখতে কেমন! এতক্ষণ একবারও মনে হয়নি কথাটা। কল্পনা করছি। আমার বন্ধুদের মুখগুলো এক এক করে ভেসে উঠছে। কারুর সাথে কারুর মিল নেই। প্রত্যেকেই আলাদা। আমি আহীরকে দেখতে পাচ্ছি, তবে সামগ্রিক ভাবে নয়। চোখ কান নাক ঠোঁট আলাদা আলাদা ভাবে দেখছি। সবকটাকে জুড়ে সাজাতে চাইছি, কিন্তু পারছি না; কেমন ঘেঁটে যাচ্ছে। আমি খেলা করছি আহীরকে নিয়ে বোকার মত ছেলেমানুষের মত। হাতে যেন একটা ওয়াটার গেম, বুড়ো আঙুলের প্রেশার দিয়ে সবুজ বাস্কেটে সবুজ বল লাল বাস্কেটে লাল বল ফেলার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে লাল বল ফ্লুইডে ভাসতে ভাসতে সবুজ বাস্কেটে চলে যাচ্ছে। সেটাকে বের করতে গিয়ে কতগুলো সবুজ বল বেরিয়ে এল। এতক্ষণ অনেক কষ্টে যেগুলোকে ঠিক স্থানে ফেলেছিলাম। কিন্তু বিরক্ত লাগছে না আমার। মনে হচ্ছে আমি অনন্তকাল ধরে এ লেখা চালিয়ে যেতে পারব। আহীরকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। ওর একটা ছবি চাইব! না থাক, কি ভাববে! কি আবার ভাববে! ও ও তো আমার ছবি চেয়েছে। সে তো আমি পাত্রী বলে চেয়েছে। ও কি পাত্র! নাইবা হল পাত্র, চাই একটা। না না সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করছি। আবেগ আর বুদ্ধির লড়াই লেগেছে। আমার ঘুম আসছে। চোখ বন্ধ করেই-এ লড়াই প্রত্যক্ষ করছি। বুঝতে পারছি বুদ্ধিই জিতছে, আবেগ পিছু হোটছে। এক সময় পরাজিত আবেগের উপর বুদ্ধি তার ঝান্ডা গাড়ল।—অসম্ভব, ছবি চাওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। উনি ভুল বুঝতে পারেন। একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই নষ্ট হয়ে যাবে। বুদ্ধি আবেগ কে ভৎসনা করছে—হঠকারী, আনফর্মাল বলে। আবেগ মাথা নিচু করে আছে। এই ফাঁকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হল। আধ ঘুম অবস্থায় প্রথমে বাপির কথা কানে এল—'মেয়েটা কি কাল রাত্রে সিনেমা দেখেছে?'

'না তো—'

'তাহলে এখনো ঘুমাচ্ছে কেন?'

'রাত্রে ঘুম হয়নি বোধ হয়।'

না, আর শুয়ে থাকা ঠিক হবে না। চোখে আলো লাগতেই জ্বালা জ্বালা করে উঠল। আবার চোখ বন্ধ করে নিলাম। বাবা! কাল কত রাত পর্যন্ত জেগেছি, উঠতে পারছি না কেন!

'সমি—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি, উঠছি।'

ফ্রেস হয়ে অ্যাকটিং-এর খাতাটা খুলে বসেছি। কিছু টাং টুইস্টার প্র্যাকটিশ করছি। ঠিক মত বলতে না পারলে স্যার ভীষণ বকেন।

'কি পড়ছিস? তোর রেজাল্ট বেরিয়েছে?'

বাপির দিকে তাকালাম—'কিসের রেজাল্ট?'

'গত মাসে যে বললি কম্পিউটারের পরীক্ষা হয়েছে!'

'ও, না বের হয়নি। আবার তো পরীক্ষা।'

'সেকি, শুধু পরীক্ষাই হচ্ছে, রেজাল্ট দিচ্ছে না!'

'রেজাল্ট একেবারে ফাইনাল পরীক্ষায় দেবে।'

'রেজাল্ট না দিক নাম্বার টাম্বার তো জানাবে।'

'এখনো বলেনি।' সত্যিই বলেনি।

'বাপি'—বাপি চলে যাচ্ছিলেন আমার ডাকে ফিরে এলেন।

'কি?'

'আমার কম্পিউটার ক্লাসে যেতে একদম ভালোলাগে না।'

'তার মানে?'

'আমার একদম পড়তে ইচ্ছে করছে না।'

'বের কর—বই বের কর—কোথায় বুঝতে পারিস নি, আমি বুঝিয়ে দেব।' চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অ্যাকটিং-এর খাতা দূর করে সরিয়ে দিলেন—'সরা এসব, যতসব ফালতু জিনিস—কি হল বই কোথায়? বের কর—'

আমি জড়িয়ে মড়িয়ে বলতে লাগলাম—'না না আমি সব বুঝতে পারি। কেবল মুখস্থ হতে চাইছে না। তুমি তো জা'ন আমার মুখস্থ বিদ্যে একদম নেই। বাঙলা হলে না হয় একটু পড়ে বানিয়ে লিখে দেওয়া যায়, কিন্তু ইংরাজী কত বানাব? বড় বড় শব্দগুলোই তো মুখস্থ হচ্ছে না।'

বাপি রেগে গেছেন—'তুই পড়িস, যে মুখস্থ হবে! সারাদিন তো অ্যাকটিং খুলে বসে আছিস। এতগুলো মাস শিখলি আর কটা দিন ধৈর্য্য ধরে পড়ে কোর্স'টা কমপ্লিট করতে পারছিস না!'

সত্যি আর পারছি না। আসলে প্রতি শনিবার নিয়মিতভাবে একটা করে ক্লাস অফ্ হয়ে যায়। অ্যাকটিং ক্লাসের পর কম্পিউটার ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরতাম। এখন কম্পিউটার ক্লাসের টাইমটা চেঞ্জ করে দিয়েছে। তাই অ্যাকটিং ক্লাস সেরে ফিরতে ফিরতে এই ক্লাসটা শেষ হয়ে যায়। আমি গ্রুপ চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। বাপিকে একথা বললে উনি বলবেন অ্যাকটিং ছেড়ে দে। ওসব ছাই পাঁশ করে লাভ নেই। মন দিয়ে এটা কর। তাই বলিনি। আর একটা ক্লাস অফ্ হলে পরের ক্লাস করতে ভীষণ অসুবিধা হয়। কাঁহাতক্ বন্ধুদের হেল্প নেওয়া যায়! এভাবে আর চলছে না।

মা হঠাৎ রান্না ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কিচ্ছু হবে না তোমার দ্বারায়।

সব কিছু এ রকম মাঝ রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে পালাবে। এতগুলো টাকা খরচা করে ভর্তি করা হল—তার কোন মূল্য নেই! আজ থেকে বাইরে বের হওয়া বন্ধ। শিখতে হবে না অ্যাকটিং। আমাদের বাড়ির মেয়েরা অভিনয় করে না। যত সব উদ্ভট চিন্তা ভাবনা। মাউথ অর্গান শিখব, গীটার শিখব, সব আধ খ্যাঁচড়া করে শিখে ফেলে রেখে দিলি—'

মা শেষ করেন নি বাপি শুরু করলেন—'মনের কোন স্থিরতা নেই। এত ফিক্‌ল মাইনডেড্‌ হলে কি কিছু করা যায়!'

টেবিলে মাথা রেখে আমি কাঁদছি। বাপি বেরিয়ে গেছেন ঘর থেকে। দুজনে মিলে একসাথে বকছেন। এই সময় নিজেকে খুব অসহায় লাগে। মনে হয় আমার কেউ নেই। এ পৃথিবীতে আমি একদম একা। অভিমানে দুঃখে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। মনে পড়ছে অনেক বছর আগেকার একটা ঘটনা। তখন আমি বেশ ছোট। কি হয়েছিল সেদিন আজ আর মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু মনে আছে, কোন একটা কারণে বাপি মা দুজনেই আমার উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। সম্ভবত পড়তে চাইনি বলেই বোধ হয়। তখন ছোট ছিলাম তাই বকুনির সাথে সাথে মারও পড়েছিল। সারাটা দিন নাকের জলে চোখের জলে কেটেছে। সন্ধ্যে বেলা আমার হঠাৎ মনে হল আমি আর বাঁচব না। সময় যত রাত্রির দিকে এগোয় আমার মরণ প্রতিজ্ঞা ততই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। মনে মনে প্ল্যান করছি কিভাবে মরা যায়! কেন জানি না প্রথমেই মাথায় এল গলায় দড়ি—সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ঝুলন্ত শরীর। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি আমাদের দেশের বাড়ির পিছনে বিরাট আম গাছটায় কে না কি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। চোখ দুটো আগুনের গোলার মত ঠিক্‌রে বেরিয়ে এসেছিল। মা কালির মত জিভটা এই এত্তটা বেরিয়ে ঘাড়টা একদিকে কাৎ হয়ে গেছিল। আমি নিজেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমার ফ্রক পরা ছোট্ট শরীরটা আম গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। পায়ের হাওয়াই চটি দুটো গাছের গোড়ায় খোলা আছে। ঠিক ঠাকুর ঘরের বাইরে যেমন খোলা থাকে। আমি শুনতে পাচ্ছি মা বাপি ঠাকুমা পিসি সবাই কাঁদছেন। ঠাকুমা মাথা কুটে কুটে কাঁদছেন আর বাপিকে মাকে খুব বকছেন। তোরাই মেয়েটাকে মেরে ফেললি—দিন রাত শুধু পড়া আর পড়া—কেন এত মারলি ওকে কেন এত বকলি। পিসিমা সুর করে কাঁদছেন—ও সমি রে—এ তুই কি করলি—কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলি—গাছ থেকে নেমে আয় মা। আহাঃ! নেমে আয় বললেই বুঝি নেমে আসা যায়! নামব কি করে, আমি তো মরে গেছি। পুলিশ আসুক, তারাই আমাকে কলে করে নামাবে। পুলিশের কলে উঠব ভেবে মজা লাগছে। বেঁচে থাকতে কোনদিন উঠিনি। এই যাহঃ! মা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সবাই ব্যস্ত হয়ে জল জল করছে। সামনে এক বালতি ভর্তি জল অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তালকানা হয়ে গেছে যেন। আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কিছু বলতে পারছি না।

কি মুশকিল ! মা এক গ্লাস দুধ এনে টেবিলের উপর রাখলেন। মরা মানুষ আবার দুধ খায় না কি !

'একটুও যেন পড়ে না থাকে, সব খেয়ে নিবি ।'

তাকালাম মার দিকে। এই তো মা, অজ্ঞান তো হননি। ও! আমি এখনো বেঁচে আছি। এতক্ষণ আমগাছ থেকে নয় কল্পতরু থেকে ঝুলছিলাম। মার দিকে তাকিয়ে আছি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। কল্পনা থেকে বাস্তবে আসতে একটু সময় লাগছে। সেই ফাঁকে মা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কি হল, তাকিয়ে আছিস কেন ? কোনো বাহানা নয়, সবটুকু খেয়ে নিবি।'

আমি গ্লাস তুলে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলতে লাগলাম। দুধ খাওয়া শেষ হয়নি বাপি নাকের সামনে আঙুল নেড়ে বলছেন, 'এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলি কেন ? পড়া হয়েছে ? খাতা বের কর। লেখ।'

কি করে পড়া হবে ! এতক্ষণ তো গলায় দড়ি দেবার ছক কসছিলাম। চুলের ঝুটি ধরে একবার নেড়ে দিয়ে, মন দিয়ে পড়তে বলে চলে গেলেন। আমি ভাবছি এটা তো শহর। এখানে আশে-পাশে কোথাও বড় আম গাছ নেই। কয়েকটা নারকেল গাছ এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে। নারকেল গাছে গলায় দড়ি দেওয়া যায় না। সুতরাং পজিশানের অভাবে গলায় দড়ি ক্যানসেল। রেলে মাথা দিলে কেমন হয় ! এক কোপেতেই ঘ্যাচাংকু। কিন্তু এখান থেকে রেল লাইনটা কতদূর আমার তো জানা নেই। তাতে কি হয়েছে ! রাস্তায় কাউকে জিগ্যেস করে নেব। দাদা রেল-লাইনটা কোন দিকে ? না না রেল লাইন বললে সন্দেহ করতে পারে। এতটুকু মেয়ে একা একা রেল লাইনে যেতে চাইছে কেন ! তখন হয়ত দেখব সেই ভদ্রলোকই আমার হাত ধরে বাপির কাছে দিয়ে যাবেন। আর বাপি যদি একবার জানতে পারেন আমার এ কু-কীর্তির কথা তাহলে আর আমাকে কষ্ট করে আত্মহত্যা করতে হবে না, মেরে মেরেই মেরে ফেলবেন। বাপির মারের কথা কল্পনা করতেই ভয়ে সিটিয়ে গেলাম। হাতটা অটোমেটিক চলে গেল খানিক আগের মার খাওয়া জায়গায়। উফ ! হাত পড়তেই জ্বালা জ্বালা করছে। চোখ ফেটে জল আসছে আমার। সেই সঙ্গে নিজের উপর বিরক্ত লাগছে খুব। এতক্ষণ ধরে আত্মহত্যার একটা উপায় বের করতে পারলাম না ! এমনই নিষ্কর্মা আমি। বাপি ঠিকই বলেন আমার দ্বারায় কিছু হয় না। গোঁ গোঁ করে বই-এর শব্দগুলো পড়ে যাচ্ছি। কিছুই মনে ঢুকছে না। নতুন কোন উপায়ের কথা চিন্তা করছি। মাঝে মাঝে বাপি তাড়া লাগাচ্ছেন—কিরে, হয়েছে ? এখনো মুখস্থ হল না ! ঐটাকু পড়া কতক্ষণ সময় লাগে ! ও রকম মিন্ মিন্ করছিস কেন ! জোরে পড় না। এবার আমি গেলে কিন্তু আর রক্ষে রাখব না। শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। বাবার ধমক শুনে আমার বাথরুম পেয়ে গেল। কঠোর অনুশাসন, বাবার অনুমতি না নিয়ে বই ছেড়ে ওঠা যাবে না। তাই কাঁপা কাঁপা গলায় আর্জি পেশ করলাম। যাওয়ার অনুমতি মিলল। জল খাওয়া বা অন্য কোন সমস্যা হলে বাপি হয়ত নিজেই মুখের সামনে

যোগাড় করে দিতেন কিন্তু বাথরুমটাকে তো আর ঘরের ভিতর আনা যায় না। অগত্যা যেতে দিতে বাধ্য। সঙ্গে একটা বাক্যবাণ, এই তো সবে পড়তে বসলি, এর মধ্যেই···। বাথরুমে ঢুকে চোখ পড়ে গেল চওড়া র‍্যাকে অবস্থিত সার সার কেরোসিন তেলের ব্যারেলের দিকে। আর্কিমিডিসের মত মনটা আনন্দে চিৎকার করে উঠল 'ইউরেকা' বলে। আর্কিমিডিস তখনো আমাদের পাঠ্য নয়। এসব গল্প বাপির কাছে শোনা। অলিভার টুইস্ট, গ্যালিভার ট্রাভেলস্ এর সাথে সাথে আর্কিমিডিসের গল্প, নিউটনের আপেল পড়া, বেঞ্জামিন ফ্রেমিং এর বর্ষার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে সিল্কের ঘুঁড়ি ওড়ানোর গল্প, গ্যালিলিওর দূরবীন আবিস্কার কলোম্বাসের আমেরিকা আবিস্কার, গ্রীসের ট্রয় নগরী ধ্বংস-এ সব গল্প আমার জানা। ভবিষ্যতে এই ব্যাপার গুলো নিয়ে যে পড়তে হবে তখন সে ধারনাই ছিল না। যাগ্গে, তেলের ব্যারেলটা দেখে আগুনে পুড়ে মরার জন্য মনটা যতটা উতলা হয়েছিল অগ্নিদগ্ধের যন্ত্রনার কথা কল্পনা করে মনটা ততটাই উদাস হয়ে গেল। মা বলেন, গরম কড়ায় একটু ছ্যাঁকা লাগলেই যা জ্বালা করে! আমার অত সহন ক্ষমতা নেই যে দহন জ্বালা সইব।

'কি রে—বাথরুমের ভিতর ঘুমিয়ে পড়লি না কি?'

বাপির কণ্ঠস্বর কানে যেতেই চমকে উঠলাম। দেখি তখনো বাথরুমে রয়েছি। ফিরে এলাম পড়ার টেবিলে। আমি যেন ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা বদ্ধ, আজ আমি মরবই। এতবার ফেলিওর হচ্ছি তবু হার মানছি না। এইটুকু পুঁচকি মেয়ের মনের জোর আছে বলতে হয়! বুকের মধ্যে একটু গর্ব গর্ব ভাব অনুভব করলাম। নতুন উদ্দমে ভাবতে শুরু করলাম, নতুন পন্থা। সবচেয়ে সহজ বিষ খেয়ে মরা। এতক্ষণ এই বুদ্ধিটা মাথায় আসেনি। কিন্তু বিষ পাই কোথায়; ঘরে ইঁদুর মারা, ছুঁচো মারা ছারপোকা মারা, কিছু নেই। মনে হল বাপিকেই বলি এক পুরিয়া বিষ এনে দাও। মরার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না বলে দুঃখে আরও মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডুবেও যে মরব তারও উপায় নেই। আমি যে সাঁতার জানি। যতবার দেশে গেছি ততবার বাপি জোর করে পুকুরে নামিয়ে সাঁতার শিখিয়েছেন। এখন তো মামার বাড়ির বিশাল পুকুরটা অবলীলায় পার হতে পারি। ডুবে মরতে গেলেই ফোলা বেলুনের মত ভেসে উঠব। আমি কাঁদছি। মরতে পারছি না বলে কাঁদছি। আর চোখে জল আসা মানেই নাকে জল আসা। চোখের জল টপ্‌টপ্ করে পড়ে বই ভিজছিল কিন্তু নাকের জল তো আর বই-এ ফেলা যায় না! সে বড় নোংরা ব্যাপার। তাই ফোঁস্ করে ভিতর দিকে টানতেই বাপি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন আমার দিকে—

'কি হল রে কাঁদছিস কেন? পড়া বুঝতে পারছিস না? বুঝিয়ে দেব? সহজ করে বুঝিয়ে দি, তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে যাবে!'

এঁড়ে বাছুরের মত আমি ঘাড় গোঁজ করে বসে আছি। কোন উত্তর দিচ্ছি না। মা ঘরের বাইরে থেকে বলছেন, 'ছেড়ে দাও আজ আর ওর পড়া হবে না। সকাল থেকেই পড়া পড়া করে মাথাটা বিগড়ে গেছে।'

'কেন, মাথা বেগড়াবার কি হল! যত সব ফাঁকি বাজি বুদ্ধি। এই—যা, চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। যা—আ—'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বাইরে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে এলাম। 'এই নে—' বাপি আমার দিকে গামছা এগিয়ে দিলেন। মুখ যত মুছি কিছুতেই আর শুকোয় না। যত মুছছি চোখের জলে তত ভিজে যাচ্ছে।

'হয়েছে নে, এই পড়াটা করে নে আর পড়তে হবে না, ছুটি।'

তবুও বললেন না যে আজ থাক আর পড়তে হবে না। এই হলেন আমার বাবা। পড়াশুনার ব্যাপারে নো কম্প্রোমাইজ। আমার মনে হয় যদি যমও আমাকে নিতে আসেন তো বাপি তাঁকে বলবেন, আপনি বাইরে একটু ওয়েট করুন ও এই পড়াটা করে নিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র অসুখ করলে তবে যদি একটু রেহাই পাই। আমিও চালাক ছিলাম। একটুতেই এমন উঃ আঃ কোঁ ক্যাঁ করতাম যেন হস্‌পিটালে ভর্তি করলে তবে হয়। ছোটবেলায় হস্‌পিটালটা ছিল আমার কাছে স্বর্গ। ভীষণ যেতে ইচ্ছে করত ওখানে। মামার বাড়ি বা দেশে বেড়াতে গেলে জামা কাপড়ের সঙ্গে বইও বেঁধে নেওয়া হত। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়ার মত, সকাল দুপুর সন্ধ্যে তিন টাইম নিয়ম করে বই নিয়ে বসতে হত। পাশের ঘরে মামাত ভাই বোনেদের হয়ত পড়া হয়ে গেছে। ওদের চেঁচামেচির আওয়াজ পাচ্ছি। আমি এ ঘরে বাঘের সামনে বই নিয়ে বসে আছি। বাপি বুঝতে পারছেন আমার পড়ায় মন নেই। পড়া হচ্ছে না। তবুও ছাড়বেন না। পড়া মুখস্ত হচ্ছে না অংক বের কর, অংক হচ্ছে না পুরানো পড়াগুলো লেখ। আমি বুঝতে পারছি ছোটগুলো দরজার আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে। ওদের ফিসফাস্ কথা শুনতে পাচ্ছি। কেউ হয়ত দরজা দিয়ে দু একবার উঁকিও মেরেছে, কিন্তু ব্যাঘ্র সম পিশেমশাই-এর ভয়ে কেউ ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। আর আমাকে ফেলে যে খেলতে চলে যাবে তাও পারছে না। আমি ছিলাম ওদের পালের গোদা, এখনো আছি। লিডারের প্রতি ক্যাডারদের কি অসম্ভব ভালোবাসা, কি নিদারুণ আনুগত্য বোধ। আমাকে আপ্লুত করে ওদের এই ব্যবহার। মাঝে মাঝে ওদের ডিস্‌টারবেন্সের জ্বালায় বিরক্ত হয়ে বাপি আমাকে ছেড়ে দিতেন। এই ভাবে বেশ কয়েক বার খুদেগুলো আমাকে শত্রু শিবির থেকে উদ্ধার করেছিল। আর যে কদিন বাপি মামার বাড়ি থাকতেন না সে কদিন আমাকে ধরে কে! মামারা বলতেন—'অ্যায়, এবার বাঁধা গরু ছাড়া পেয়েছে।' সত্যিই তাই সরস্বতী ঠাকুরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দড়ি ছেঁড়া বাছুরের মত মাঠ ময় দাপিয়ে বেড়াতাম—'হা রে রে রে রে রে আমায় রাখবি ধরে কে রে—' আমি পাগল হয়ে যেতাম, মাতাল হয়ে যেতাম, আর আমার এই বাঁধন ছাড়া অবস্থায় মা আমাকে সামলাতে নাকানি চোবানি খেতেন। সবাই বলত কি দস্যি মেয়ে রে! এত ডানপিটে এত গেছো ওকে যে ধরাই দায়। পুকুরে নামলে গোটা পুকুর তোলপাড়। কারুর বাগানে ঢুকলে ফল পেড়ে একাকার। মনে হত পৃথিবীটাকে উল্টে দি। উপরের মাটি নিচে, নিচের মাটি উপরে করে দি। আমার এক মামিমা বলতেন কুকুরের পায়ের

স্থিরতা আছে কিন্তু তোর পায়ে নেই। সারাদিন বই ছুঁতে হত না বলে কি যে আনন্দ তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। কিন্তু রাত্রি বেলা বিছানায় শুয়ে বাপির জন্য বড্ড মন কেমন করত। মনে হত বাপি আমার থেকে অনেক দূরে। কাউকে যেন বলি, আমাকে এক্ষুনি বাপির কাছে দিয়ে এস। কান্না পেত বাপির জন্য। কিন্তু সারাদিনের দৌরাত্ম্যে ক্লান্ত শরীরে বেশীক্ষণ জেগে থাকতে পারতাম না। ঘুমিয়ে পড়তাম।

এবার সত্যিই আমার ঘুম পাচ্ছে, সেই সঙ্গে মাথারও যন্ত্রণা হচ্ছে। এত কাঁদলে মাথার যন্ত্রণা হবে না! সেই থেকে তো বই নিয়ে কাঁদছি পড়ছি আর কই! ঢুলছি মাঝে মাঝে। বাপি অন্য দিকে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন তাই বুঝতে পারছেন না।

'নাও, অনেক হয়েছে, আর পড়তে হবে না। ওঠ, খেয়ে শুয়ে পড়।'

মার কথায় যেন একটু প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু বাপির অনুমতি না পেলে তো উঠতে পারছি না। তাই একই ভাবে বসে রইলাম। আড় চোখে দু-একবার তাকালাম বাপির দিকে; একই ভাবে কাগজটা ধরে শুয়ে আছেন। আমি অপেক্ষা করে আছি কখন উঠে বলবেন—বই রেখে দে। মা খাবার এনে ডাকতে উনি উঠলেন। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ে গেল।

'হয়েছে?'

'একটু একটু।'

'ঠিক আছে রেখে দে। খেয়ে বাকিটা মুখস্ত করে নিবি।' আমার মনে হল এক্ষুনি আছাড় খেয়ে খাট থেকে নিচে পড়ে যাব। আমার সব এনার্জি শেষ হয়ে গেছে। আমি মোমবাতির মত গলতে গলতে বিছানার সাথে মিশে যাচ্ছি। মনে পড়ছে সেই লোকটার কথা যে প্রথম বই আবিষ্কার করেছিল। সেই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। মনে হচ্ছে তাকে যদি একবার নাগালের মধ্যে পাই তো ব্লেড দিয়ে তার সর্বাঙ্গ ফালা ফালা করে একটু লঙ্কা মাখিয়ে দি। খেতে বসে খেতে পারছি না। কপালটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে বার বার বোলাচ্ছি সেখানে। তাই দেখে মা বললেন—'যন্ত্রণা হচ্ছে?' আমি ঢুক্ ঢুক্ করে ঘাড় নেড়ে বললাম হ্যাঁ। মনে হল বাপি আমার দিকে তাকালেন কিন্তু আমি তাকালাম না। উনি মাকে বলছেন, 'খেয়ে উঠে একটু অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে দিও।'

অমৃতাঞ্জন! শব্দটা কানে আসতেই আমার জাবর কাটা বন্ধ হয়ে গেল। মুখের মধ্যে খাবারটা ধরে বসে আছি। মনে পড়ছে, আমি অমৃতাঞ্জনে হাত দিলেই বাপি বলতেন, 'ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুবি। ওটা বিষ, পেটে গেলে মরে যাবি।'

আনন্দে আমার পেট ভর্তি হয়ে হয়ে গেছে। আমি পেয়ে গেছি, একদম নাগালের মধ্যে। আর খেতে পারছি না। মার ধমকানিতে কোন রকমে একটা রুটি খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এই মুহূর্তে ঘরে কেউ নেই। বাপি বাইরে মুখ ধুচ্ছেন। মা বাসন গুছিয়ে রাখছেন। আমি মশারী তুলে নেমে অমৃতাঞ্জন খুঁজছি। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলতে হড়াস্ করে শব্দ হল। শুনতে পেয়ে মা বলছেন।—

'কি রে, তুই ঘুমাস নি ! কি করছিস ?'

'অমৃতাঞ্জন খুঁজছি ।'

'তুই শুয়ে পড়, আমি গিয়ে দিচ্ছি ।'

মার হাতের ছোঁয়ায় আরামে চোখ বুজে আসছে । ঘুম পাচ্ছে । কিন্তু ঘুমালে চলবে না । এটা আমার জীবনের শেষ রাত । কথাটা মনে হতেই বুকটা খালি হয়ে গেল । নিরবে কাঁদছি । নিজের মৃত্যু শোকে নিজেই কাঁদছি । কত কিছু বাকি রয়ে গেল দেখার । মা কপালে অমৃতাঞ্জন লাগাচ্ছিলেন, হাতে জল লাগতেই বললেন ।

'আবার কাঁদছিস কেন ? চুপ কর—'

আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন । যেন আগুনে ফোঁটা ফোঁটা ঘি পড়ছে । ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম ! সব কষ্ট অভিমান অশ্রু হয়ে গলে গলে পড়তে লাগল । মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন আদর করছেন । বাপি এসে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন । বলছেন, 'তুই কেন এত দুষ্টুমি করিস বল ! তোকে মারতে বকতে আমার কি খুব ভালোলাগে ! তোকে মারলে আমারও যে কষ্ট হয় । একটু মন দিয়ে পড়তে পারিস না ?' আমার কান্নার স্পিড বাড়ছে । ফুলে ফুলে কাঁদছি । মার শরীরের উষ্ণতায় আমি বিগলিত । বাপি-মা আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছেন আমাকে । সারা দিনের অসহায়তা ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে । আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে । চিরকাল এমনি করে বাপি মার কোলের কাছে শুয়ে থাকতে চাইছে মন । তখন সময় থেমে যাওয়া কাকে বলে বুঝতাম না । এখন বুঝি । সেই মুহূর্তে নিশ্চই ভেবেছিলাম সময়টা থেমে যাক । এবার মা, বাপিকে খুব বকছেন—'তোমারও দোষ আছে । সারাদিন পড়া পড়া করে এমন অশান্তি করলে ! মেয়েটাকে একটু খেলতেও দিলে না ।'

বাধ্য ছেলের মত বাপি বলছেন—'আচ্ছা আমার অন্যায় হয়ে গেছে । চুপ কর, আর কাঁদিস না ।'

'কাঁদিস না বললেই হল, ওর বুঝি কষ্ট হচ্ছে না !'

কান্না আর এককদম এগিয়ে গেল । এটা এখনো হয় । বাপি মা যখন বকেন তখন হয়ত গোঁজ হয়ে থাকি, পরে সান্ত্বনা দিলে অশ্রুজলের বান ডাকে । এদিকে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথার যন্ত্রনাও বাড়ছে । মনে হচ্ছে কপালটা খুলে পড়ে যাবে । কান্না থামছে না দেখে দুজনেই চুপ করে গেছেন । এক সময় শান্ত হলাম । কেঁদে কেটে মানসিক যন্ত্রনা একটু কমলো বটে, শারীরিক যন্ত্রনা বেড়ে গেল দ্বিগুণ । আপাতত তাই নিয়ে বিব্রত । মনে হল এর থেকে বেশ জ্বর আসে তাহলে কয়েকদিন পড়ার থেকে ছুটি পাওয়া যাবে । তৎক্ষনাৎ মাথার ভিতর দুম্ করে কে যেন হাতুড়ি মারল । আমার তো আজ রাত্রেই মরে যাওয়ার কথা আমি কালকে অসুস্থ হবার সুখ স্বপ্ন দেখছি কেন ! ও, তার মানে এত আদর খেয়েও

আমার ভিতরকার সেই অভিমানী জেদী মৃত্যুপ্রতিজ্ঞ মনটা এখনো মরেনি! আর সেই এভাবে জীবনবিমুখ হয়ে আমার জীবন অভিলাসী মনটাকে হাতুড়ি পেটা করছে! শুধু হাতুড়ি পেটা নয়, আমার ভিতরে তার প্রভাবই বেশী দেখতে পাচ্ছি। মাথার বালিশের চারপাশে হাত বুলিয়ে অমৃতাঞ্জন খুঁজছি। এক সময় হাতে ঠেকল শিশিটা। শক্ত মুঠোয় সেটা চেপে ধরে বুকের কাছে নিয়ে এলাম। দুদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। একপাশে মা একপাশে বাপি ঘুমাচ্ছেন। আমি সেই অন্ধকারে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। বন্ধু-বান্ধব, ছোটকাকু, মামাতো ভাই-বোন সবাইকে। মনে পড়ছে ওদের সাথে কাটান সুখকর মুহূর্তগুলো। আমি মরে গেলে ওরা খুব কাঁদবে। হ্যাঁ, ঐ তো কাঁদছে। আমি ওদের সাথে সাথে নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি। ফুল ধূপ দিয়ে সাজান একটা খাটে আমাকে শোয়ান হয়েছে। কপালে চন্দনের ফোঁটা গলায় রজনীগন্ধার গোড়ে মালা। আমার পা থেকে গলা পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা। মরা মানুষকে কেন সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে জানি না। কোনদিন কাউকে জিগ্যেস করিনি; আর পাঁচটা কৌতুহলের মত এ কৌতুহলও বুকে নিয়ে মরে যেতে হচ্ছে। তবে বাপি বলতেন সাদা শান্তির প্রতীক। তাই শান্তি মিছিল শুরু করার আগে সাদা পায়রা ওড়ান হয়। আমাদের জাতীয় পতাকার মাঝখানটাও সাদা। তাহলে মৃত্যুও কি শান্তির প্রতীক! কার শান্তি! যে মরে যায় তার না, যারা রয়ে গেল তাদের! না না তা কেন হবে। তাহলে কেউ মরে গেলে সবাই এত কাঁদত না; শান্তি হয়েছে বলে আনন্দ করত। যে মরে শান্তি তার। যেমন আমি মরে গেলে আমাকে আর বই পড়তে হবে না। বাব্বাঃ! বাঁচা গেল। এর চেয়ে বড় শান্তি আর কি হতে পারে! ভাবতেই মনটা শান্তিতে ভরে গেল। আমি আমার মৃতদেহের চারপাশে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাপি মাকে দেখতে পাচ্ছি না কেবলই মনে হচ্ছে ওনারা আমার পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, ঠাকুমা কই! মনে হয় এখনো খবর পাননি। ঠাকুমার কথা মনে পড়তেই কান্না পাচ্ছে, তবে আর কাঁদতে পারছি না। এ পৃথিবীতে একমাত্র ঐ মানুষটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। ঠাকুমা শুধুই ভালোবাসেন; পড়ার কথা বলেন না মারেন না। তবে খুব ছোটবেলায় না কি একবার মেরেছিলেন। সে এত ছোটবেলায় যে আমার মনে পড়ে না। এ গল্প ঠাকুমার কাছেই শোনা। তখন গ্রামে থাকতাম। পাশের বাড়ির কারা চাল ধুয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছে। আমি সেখান থেকে এক-মুঠো ভিজে চাল নিয়ে খেয়েছি। তাই না দেখে, যাদের চাল তারা সে কি ঝগড়া শুরু করে দিল। আমি ততক্ষণে মুঠো ভর্তি চাল নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছি। কোথাও আড়ালে বসে খাচ্ছিলাম হয়ত। বেশ অনেকক্ষণ পর বাড়ি ঢুকেছি। চাল চুরির ঘটনা যে বাড়ির লোকের কানে পেঁৗচেছে তা বুঝব কি করে! ঠাকুমা বসে কাঠ চেলা করছিলেন। আমি পিছন থেকে পা টিপে টিপে এসে ঠাকুমা বলে আদর করে দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছি। ঠাকুমা রেগেই ছিলেন আমাকে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে হাতের চেলা কাঠ দিয়ে সপাটে দমাস্ করে পিঠের মধ্যে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাস্! ঐটুকু শরীর অতর্কিতে আক্রমণ সামলাতে না পেরে পোঁ-ও-ও করে ঘুরে পড়েছিল। তারপর ঠাকুমার সে কি কান্না! সারা গ্রাম আমাকে কোলে করে নিয়ে ঘুরেছেন আর কেঁদে কেঁদে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমি যত কাঁদি ঠাকুমা তত কাঁদেন। আমার কান্না এক সময় থেমে গেছিল কিন্তু ঠাকুমা আজও কাঁদেন। ঈশ্বরের সামনে কন্‌ফেস করার মত মাঝে মাঝেই এ গল্প আমাকে শোনান। এখনো আবেগে ওঁর গলা বুজে আসে। প্রবীন দু চোখে এখনো যেন উনি স্পষ্ট দেখতে পান আমার নেতিয়ে পড়া ছোট্ট শরীরটা, আমার আহত পিঠ। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে—'কেন মারলাম? ও তো ছেলেমানুষ ওর কি দোষ?' আসলে আমার উপরে নয়, যাদের চাল খেয়েছিলাম তারা না কি ঝগড়া করার সময় আমাকে রাক্ষুসি বলেছিল তাই ঠাকুমা ওদের উপর রাগ করে আমাকে মেরেছিলেন। সেই, চোরের উপর রাগ করে কলাপাতায় ভাত খাওয়ার মত গল্প। পরে আমিও ভেবেছি এক মুঠো চাল খেলে কেউ রাক্ষুসি হয়ে যায় না। আর ঐটুকু ছোট্ট মুঠোতে কতই বা চাল ধরেছিল। ঐ কটা চাল ভিখারীকেও দেওয়া যায়। নিজের উপরও রাগ হল, কি দরকার ছিল অন্যের বাড়ির চাল না বলে নেবার! আমাদের কি চাল ছিল না! মা কে বললেই হত একমুঠো চাল ভিজিয়ে দাও খাব। মা কি দিতেন না! সন্দেহ আছে, নাও দিতে পারতেন। হয়ত বলতেন, 'খাসনে পেটে যন্ত্রণা হবে।' তাছাড়া ভিজে চাল কি এতই সুস্বাদু! রোজই তো ভাত খাই, সেও তো ভিজে চাল। তাহলে আবার ঘটা করে চুরি করার কি ছিল! যাগ্গে, সে তর্কে গিয়ে লাভ নেই। আমার মরুভূমির মত উত্তপ্ত তৃষ্ণার্ত জীবনে ঠাকুমাই একমাত্র ওয়েসিস্। তাই আজ আসন্ন মৃত্যুকালে ওনার কথাই বড্ড বেশী মনে পড়ছে। আমি জানি খুব কাঁদবেন উনি। এখনো মনে আছে, তখন কেউ জিগ্যেস করলে বলতাম, ঠাকুমা আমাকে আকাশের মত বেশী ভালোবাসেন। মা অন্য দিকে ঘুরে শুলেন। অন্ধকারেও বুঝতে পারছি বাপি মা দুজনেই আমার দিকে পিছন ফিরে ঘুমোচ্ছেন। এই সুযোগ, আস্তে আস্তে শিশির ঢাকনাটা খুললাম। ডান হাতের তর্জনীটা ভিতরে চালিয়ে দিয়ে ভাবলাম, বাপি মাকে একটা প্রণাম করা উচিত। জীবনের শেষ প্রণাম। আস্তে আস্তে উঠলাম—না থাক, পায়ে হাত দিলে যদি ঘুম ভেঙে যায়! তাহলে কেলেংকারী হয়ে যাবে। বলবেন, মাঝ রাতে উঠে প্রণাম করার কি হল! তার চেয়ে বরং দেব-দেবীদের প্রণাম করার মত কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে কাজটা সেরে নেওয়া ভাল। শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। শুতে গিয়ে পায়ের নূপুরটা ছুন্ করে বেজে উঠল। বাপি এ সব গয়না-পাতি পরে স্কুলে যাওয়া একদম পছন্দ করেন না। মা ই জোর করে পরিয়ে রেখেছেন। স্কুলে যাওয়ার সময় মোজার ভিতর ঢুকিয়ে দেন। আমি ভাবছি মৃত সন্তানের শরীর থেকে গয়না খুলে নেওয়া খুবই প্যাথেটিক ব্যাপার, তাই এই দুরূহ কাজটা আমিই করে দি। শিশিটা জামার মধ্যে

রেখে পায়ের নূপুর খোলার চেষ্টা করছি, কিন্তু এসব খোলা কি আমার কম্ম! তাও আবার অন্ধকারে। কোন রকমে হাতড়ে হাতড়ে পা থেকে সে দুটো মুক্ত করলাম। এবার কানের রিং দুটো খুললেই ব্যাস্, আর কিছু নেই। হাজার চেষ্টা করেও সে দুটো খুলতে পারলাম না। মৃত্যুর আগে শেষ পরাজয়। শুয়ে শিশির খোলা মুখটা নাকের কাছে ধরলাম। ঝাঁঝাল গন্ধটা আমার খুব ভালো লাগে। এছাড়া ডেটল, জানালা কপাটে রং করার গন্ধ, স্পিরিট, নেলপালিশের গন্ধ, আলকাতরার গন্ধ, সোঁদা মাটির গন্ধ এসব আমার খুব প্রিয়। এখনো ভালোলাগে। না, আর দেরি করা ঠিক হবে না। খানিক পরেই হয়ত ভোর হয়ে যাবে। মরতে কতক্ষণ সময় লাগে কে জানে! আঙুল ঢুকিয়ে শিশির ভিতর থেকে এক খাবলা অমৃতাঞ্জন বের করে আনলাম। আঙুলটা মুখের কাছে এগিয়ে এনে মনে হচ্ছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। চোখ বন্ধ করে অমৃতাঞ্জনটা আচারের মত জিভ দিয়ে চেটে নিলাম। তারপর কোন রকমে কোঁৎ করে কণ্ঠনালীতে ঠেলে পাঠিয়ে দিলাম। মাগো—কি বিচ্ছিরি খেতে! একটু আগে যে দুধ রুটি খেয়েছি সব যেন উঠে আসছে ভিতর থেকে। মুখের ভিতরটা ঝাঁঝে ভর্তি হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে হাঁ টা ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে। জিভটা ছট্‌ফট্ করছে ভিতরে। দাঁত দিয়ে বার বার কামড়াচ্ছি। মৃত্যুর আগে বুঝি এ রকম হয়! কি জানি এর আগে তো কোনদিন মরিনি, তাই কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা, এইটুকুতে হবে তো না আর একটু খাব! কি জঘন্য স্বাদ! আর খেতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ মনে হল মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে, শরীরটা অবশ হয়ে আসছে। আমি মারা যাচ্ছি। শিশির ঢাকনাটা আটকাব সে ক্ষমতাও নেই। কোন রকমে ল্যাট্‌প্যাট্ করতে করতে পৃথিবীর শেষ কাজটা সারলাম, বিষের শিশির ঢাকা আটকে। তখন বোধহয় জানতাম না আত্মহত্যা করার আগে একটা সুইসাইড নোট লিখতে হয়। পুলিশের উদ্দেশ্যে চিঠি—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় অথবা অমুকে দায়ী। যাশ্‌গে, লিখিনি বলে সে যাত্রায় বড় রেহাই পেয়েছি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি দিব্য দৃষ্টিতে আমার শব যাত্রা দেখছি। আমার বন্ধু বান্ধবদের তেমন দেখতে পাচ্ছি না। তারাও তো আমার মত ছোট। ছোটরা শ্মশানে যায় না। আমি আত্মীয় স্বজনদের দেখছি। ছোটকাকুর গলায় লাল গামছা। সেই গামছায় চোখ মুছছেন, আর বাঁ হাতে ধরে থাকা ঠোঙা থেকে রাস্তায় খই ছড়াচ্ছেন। আচ্ছা, আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছালে স্কুলে একদিন ছুটি দেবে! নিশ্চয়ই দেবে, এই তো কদিন আগে একটা মেয়ে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেল। ভবানীদি ক্লাসে নোটিস আনতেই ছুটি হয়ে গেছিল। শুধু কি তাই! আমার আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে গোটা স্কুল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করবে। দিদিমনি বলতেন চোখ বন্ধ করে দাঁড়াও। মন সংযোগে সুবিধা হবে। আমিও করেছিলাম সেই মেয়েটির জন্যে। সকলের অলক্ষে

দাঁড়িয়ে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে অনুপম দৃশ্য। গর্বে বুকটা ভরে উঠছে। তবে মনিষীদের মৃত্যু দিবসে নিরবতা পালন করতে গিয়ে ভীষণ হাসি পেত। আসলে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হয় তো, আর অতবড় ক্লাসে কারুর না। কারুর সর্দি করবেই। তখন উক্ত তরল পদার্থটি সুযোগ পেয়ে নিম্নমুখী সুড়ঙ্গ দিয়ে হুড়হুড় করে নিচের দিকে বয়ে আসে। মেয়েটি তখন মনিষীর আত্মা ছেড়ে দিয়ে নিজের নাক সামলাতে ব্যস্ত। তড়িঘড়ি করে বিশাল একটা শব্দ তুলে বস্তুটিকে ভিতর দিকে টানার চেষ্টা করে। সেই বা শুনবে কেন। তরল পদার্থ সর্বদা তো উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এটাই তার ধর্ম। আর সর্দির বেলাতেই বা ব্যাতিক্রম হবে কেন। সেও পাহাড়ী ঝর্ণার মত নিচের দিকে নামতে থাকে। অথচ সেটাকে ব্যাগের উপরও ফেলতে পারছে না। তাই নাকের মধ্যে শুরু হয়ে যায় অদৃশ্য এক টাগ অফ ওয়ার। ধরেও রাখতে পারবে না, ফেলবেও না। সেই উৎকট্ আওয়াজে আশেপাশে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে ফিক্‌ফিক্ হাসি। চোখ বন্ধ থাকলে কি হবে, কান তো খোলা। তারপর রিলে সিস্টেমের মত হাসির দাবানল গোটা ক্লাস ছেয়ে ফেলে। যে না হাসবে তাকে পাশের জন ঠেলা মেরে হাসাবে। ডিফারেন্ট টাইপস্ অফ হাসি। এক একটা হাসির এক এক রকম আওয়াজ। কেউ আবার হাসি চাপতে গিয়ে বিচ্ছিরি একটা শব্দ করে ফেলল। সবচেয়ে বিপদ হয় যারা ফার্স্ট বেঞ্চে বসে। দিদিমণির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসা, সে বড় সাহসের কাজ। নিরবতা শেষ হলে রোজ বকুনি খেতাম।

—'এমন দুষ্টু মেয়েরা এক মিনিট একটু শান্ত হয়ে থাকতে পারে না। রোজ এক প্রবলেম। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে দাঁড়াতে পার না? কে—কে এমন অসভ্যতা করছিলে?'

কারুর সাড়া নেই, তখন সবাই স্বদেশী সৈনিক, বিশাল একতা, বন্ধুর সাথে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর করবেই বা কেন এতক্ষণ তো বেশ মজাই হচ্ছিল। আসল কালপ্রিট তখন মার খাবার ভয়ে নাক টিপে দম বন্ধ করে বসে আছে। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত দিদিমনি তার উদ্দেশ্যে বাক্যবান ছুঁড়ছেন আর বেঞ্চের দুটো রো এর মাঝখানে পিছনে হাত বেঁধে পায়চারি করছেন। যেন বাইচান্স ফাঁক ফোকর দিয়ে যদি একবার নাক টানার আওয়াজ পান তো খপ্ করে তাকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি।

আমার শবযাত্রা স্কুল ছাড়িয়ে অচেনা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে শ্বশানের দিকে। এসব রাস্তায় আগে কোনদিন আসিনি. এক সময় গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। বাস্তবে কোনদিন শ্বশান দেখিনি, সিনেমায় দেখেছি। মার সাথে 'হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা' দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি শৈব্যা তাঁর মৃত সন্তান রহিতাস্যকে কোলে নিয়ে শ্বশানে বসে কাঁদছেন। অন্ধকার বড় একটা মাঠের মধ্যে কিছুটা দূরে দূরে কাঠের স্তূপ জ্বলছে। মা বলেছিলেন ও গুলোকে চিতা বলে। প্রথমে

কাঠের উঁচু বিছানা করে তার উপর মৃত ব্যক্তিকে শোয়ান হয়, তারপর কাঠে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ও রকমই একটা চিতায় আমাকে শোয়ান হয়েছে। নিয়ম মত কাঠে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হল। দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের লকলকে জিভগুলো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। আমি পুড়ছি—পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি, অথচ একটুও কষ্ট হচ্ছে না, একদম জ্বালা করছে না। তবে মা যে বলতেন পুড়ে গেলে জ্বালা করে। আমিও তো দেখেছি, মোমবাতি নিয়ে খেলা করতে করতে ছ্যাঁকা লেগে গেছিল। কি প্রচণ্ড জ্বালা। তাহলে আজ করছে না কেন? মরে গেলে কি জ্বালা করে না।

চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এক সময় ধুলো-ধোঁয়া আগুন-অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমার দুঃস্বপ্নের পথ রাতের গহ্বর থেকে বেরিয়ে সকালের আলোয় পা রাখল। মায়ের স্নেহমাখা ডাকে ঘুম ভাঙল। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে মনে হল মাথাটা ভারি হয়ে আছে। মুখের ভিতরে কি অদ্ভুত এক বিজাতীয় স্বাদ। শুনতে পাচ্ছি মা দালান থেকে বলছেন, 'সমি, কাল রাত্রে নূপুর খুলেছিলি কেন? এইজন্য তোকে কিছু পরাতে চাই না। এখানে ওখানে খুলে রেখে দিবি আর হারিয়ে গেলে। সেদিনও সোনার আংটিটা পরব বলে বের করে স্কুলে যাবার সময় এমন জায়গায় খুলে রাখলি খুঁজে খুঁজে এক সপ্তাহ পর পেলাম।'

মা চেঁচিয়েই চলেছেন। আমি পায়ে হাত দিয়ে দেখছি সত্যি নূপুর নেই, কখন খুললাম মনে পড়ছে না তো। কাল শোবার সময়ও তো পায়ে ছিল, আমি উঠে বিছানায় হাতড়াচ্ছি। 'বিছানায় নেই, টেবিলে রেখেছি'। মার কথায় মশারীর ভিতর দিয়েই তাকালাম টেবিলে। নূপুর জোড়া ভাল করে রাখা, পাশেই রয়েছে অমৃতাঞ্জনের শিশি। চমকে উঠলাম। এক এক করে সব মনে পড়তে লাগল। ফটোর নেগেটিভের মত কালো কালো ঝাপসা। আবার শুয়ে পড়লাম, আফসোস্ হচ্ছে, মরা আর হল না। অমৃতাঞ্জন কি তাহলে বিষ নয়! বাপি কি মিথ্যে বলেছিলেন! না কি পরিমাণে আরও একটু বেশী খেতে হয়! কালই কথাটা মনে হয়েছিল। ইস্ তখনই যদি একটু বেশী খেতাম! মনের মধ্যে এসব প্রশ্নের ঝড় উঠছে হঠাৎ বাপির গলা কানে এল, 'কই রে সমি, এখনো উঠিস নি! দেখ তোর জন্য কি এনেছি। চিংড়ি এনেছি রে বাজার থেকে। ভাজা খাবি তো? উঠে পড়। ওকে দুটো বেশী করে দিও তো—'

মশারী উঁচু করে বিছানা থেকে একেবারে কোলে তুলে নিলেন। দুহাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে বাপির কাঁধে মুখ গুঁজে দিয়ে ভাবলাম, না মরে ভালোই করেছি। না, চিংড়ি ভাজা খাবার লোভে নয়। বাপির আদর খাবার লোভে। আমার বেশ মনে আছে অনেক বড় বয়স পর্যন্ত বাপির কোলে উঠে ঘুরেছি। আমাকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে দালানে বের হওয়া যেত না, দরজায় আমার মাথা ঠেকে যেত।

বাপি মাথায় হাত দিয়ে নিচু হয়ে বেরিয়ে আসতেন। কিন্তু বাপির এ মূর্তিটা ছিল স্বপ্নের মত ক্ষণস্থায়ী। সপ্তাহে যদি দুদিন ভালোবাসতেন তো বাকি পাঁচদিন চালাতেন ভালোবাসার অত্যাচার। যত স্বপ্ন আমাকে ঘিরে। আমিই বাপির দুনিয়া। একমাত্র সন্তান, অনেক বড় করব। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব। লেখাপড়া শিখিয়ে বিদ্বান করব। অসাধ্য সাধন করব। দিন রাত কানের কাছে পড় পড় করে পাগল করে দিয়েছেন আমাকে। পড়ার প্রতি চরম ভীতি সঞ্চার করেছিলেন আমার মনে। যখন যা কিছু চেয়েছি সব আটকে গেছে কেবল পড়ার জন্য। এমন একটা সময় এল যখন পড়া শব্দটাকে ঘেন্না করতে শুরু করলাম। বই দেখলেই মনে হত আগুনে ফেলে দি। এ ঘেন্না এতটাই চরমে উঠেছিল যে গল্পের বইও পড়তাম না। যে বয়সে বাচ্ছারা পাঠ্য বই এর মলাটের মধ্যে লুকিয়ে কমিকস্, ঠাকুমার ঝুলি পড়ে সে বয়সে আমি লুকিয়ে লিখতাম। আমার কথা, আমার ক্ষোভ আমার দুঃখের কথা; যা আমি কাউকে বলতে পারতাম না। মা কে ও না। মা যদি বাপিকে বলে দেন! ভয় হত। সেই থেকে শুরু হয়েছে আমার লেখার অভ্যাস। আজও অকপটে স্বীকার করি—আমি কোনদিন পড়াশুনাকে ভালো-বাসতে পারিনি। জানি এ কথা একজন স্টুডেন্টের মুখে বড়ই বেমানান। কিন্তু আমি নিরুপায়, সত্য ভাষণের জন্য একথা বলতেই হচ্ছে। আরে, ভালোবাসা তো দূরে স্বাভাবিক ভাবেও মেনে নিতে পারিনি। ঘেন্না করে এসেছি। ভগবানের অভিশাপ হিসাবে মেনে নিয়েছি। ছোট বেলায় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে কোনদিন কাউকে পড়াব না! এমন কি নিজের ছেলে মেয়েকেও নয়। আজ টিউশনি করি। গত কয়েক বছর ধরে করছি। নিজের ছোট ছোট প্রয়োজন গুলো নিজেই মিটিয়ে নি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি ঠিকই কিন্তু প্রতিজ্ঞর কথা ভুলিনি। ভুলিনি কোন যন্ত্রনাদায়ক পরিস্থিতিতে একটা শিশু ঐ রকম একটা অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করেছিল। আমার একটু অসুখ করলে বাপিকে কি প্রচণ্ড অস্থির হতে দেখেছি। ডাক্তার বদ্যি ওষুধ পথ্যের কোন ত্রুটি নেই। ফল মিষ্টি বিস্কুট দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতেন আমাকে অথচ পড়ার সময় হলেই বলতেন—

'একটু পড় না ; ঠিক পড়তে পারবি, শুয়ে শুয়ে পড়।'

মা হয়ত বলতেন—'থাক না, দেখছ না বেচারি মাথা তুলতে পারছে না। আজ থাক।'

'না না, থাকবে কেন! একটুখানি পড়ে নিক, বেশী পড়তে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে পড়তে হবে না, কয়েকটা অঙ্ক করে নে।'

মাঝে মাঝে ঐ অবস্থায় ধমকও খেয়েছি—'ও সব কিচ্ছু না। ও পড়ার ভয়ে ওরকম করছে। এই ওঠ ; ঠিক পড়তে পারবি।'

সেদিনকার সেই শিশুটা তার অপরিণত বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই বিচার করতে পারত না বাপির কোন রূপটা আসল আর কোনটা মুখোস। এখন পারি।

উপরের শক্ত মোড়কের তলায় নরম মনের মানুষটাকে ছুঁতে পারি। আমার বাপিকে ছুঁতে পারি এখন। অবশ্য আমিও মাঝে মাঝে শয়তানি করতাম তখন। প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায় বাপির ধমকানি খেয়ে যেমন পড়েছি আবার একটু অসুস্থতায় এমন জবরদস্ত অ্যাকটিং করেছি যে বাপি বাধ্য হয়ে বলেছেন—'শুয়ে পড় আর কাতরাতে হবে না।' পুজোর দিনেও পড়ার রেহাই ছিল না। 'অষ্টমী তো কি হয়েছে! পুজো রাত্রি বেলা দিনের বেলা কি? পড়।' সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে হলেও বই নিয়ে বসতে হত। হায়রে অষ্টমী! অন্যদিনে রাত্রি বেলাও ছুটি নেই। আমার জীবনের অধিকাংশ দুর্গাপুজো কেটেছে আমার গ্রামের বাড়িতে। বাপির কলেজের একমাস পুজোর ছুটি। তাই শহরের আলোয় ঘেরা ঝলমলে রাস্তা, সুন্দর সুন্দর পুজো মণ্ডপ, বিয়ের কোনের মত সাজান দুর্গা প্রতিমা সবই আমার কাছে গল্পে শোনা চরিত্রের মত ঝাপসা কাল্পনিক। দেশে অনেক দূরে দূরে ঠাকুর উঠত। আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা পুজো মণ্ডপ। মনে পড়ে ঠাকুমা বাপিকে বলতেন 'যা না; আজকের দিনেও মেয়েটাকে বই মুখে করিয়ে বসিয়ে রাখবি! একটু ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আয় না'। বাপি বলতেন, 'দাঁড়াও না, ঠাকুর কি পালিয়ে যাচ্ছে। এই পড়াটা করে নিক, নিয়ে যাচ্ছি।'

মিথ্যে বলব না, নিয়ে যেতেন। যেতে আসতে যতটুকু সময় লাগে। বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বাড়ি ফিরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। মোমের পুতুলকে আর কতক্ষণ অরক্ষিত রাখা যায়! কিছু হয়ে গেলেই সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাড়িতে পা দিতেই ঠাকুমা জিগ্যেস করতেন, 'কি রে, এর মধ্যেই ঠাকুর দেখা হয়ে গেল?' বাপি বলতেন, 'একটা ঠাকুর দেখতে কতক্ষণ সময় লাগে!'

'আরে বাবা, ঠাকুর তলায় তো কত বাচ্ছারা খেলা করছে ওকে নিয়ে একটু থাকতে পারতিস তো। ওরওতো একটু থাকতে ইচ্ছে করে'।

ওর ইচ্ছে করে তো কি হয়েছে! ওর বাবার যে ইচ্ছে নেই। আর সেই ইচ্ছে টাই তো বড়। এত বড় একটা মানুষের কাছে ঐটুকু একটা পুচকি মেয়ের ইচ্ছের কি মূল্য!

শুধু দুর্গাপুজোয় নয় অন্য যে কোন পুজোয় বন্ধুদের সাথে ঠাকুর দেখতে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ওরা যদি বাড়িতে ডাকতে আসত, বাপি ভীষণ রেগে যেতেন। না, ওদের সাথে কোন অভদ্রতা করতেন না। নানা কথার ফেরে ওদের ফিরিয়ে দিতেন। ওরা চলে গেলে সব রাগ পড়ত আমার উপর—'তুই ই ওদের আসতে বলেছিস। জানিস নিজে বললে আমি যেতে দেব না। তাই ওদের দিয়ে বলালি।'

আমি বলতাম, 'না বাপি, তুমি বিশ্বাস কর আমি ওদের নিষেধ করে ছিলাম তোমার কাছে আসতে। ওরা জোর করে এসেছে। শোনেনি আমার কথা।'

বাপিও শুনলেন না। মিথ্যে সন্দেহ করে বকুনি দিলেন খানিক। বন্ধুরা চলে

গেল। আমার ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছি যেতে দেননি বলে। বাপি কেন যেতে দিলেন না! আমি তো শুধু ওদের সাথে যাচ্ছি না। ওদের বাড়ির লোকও যাচ্ছে। বাপি ভাবতেন, আমি যদি ভিড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে যাই! যদি কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়! যদি শরীর খারাপ হয়! আমাকে ঘিরে বাপির এই মিথ্যে আশঙ্কার বলি আমি, নিজেও নিয়ে যাবেন না কারুর সাথে যেতেও দেবেন না। এতদিন এই থিওরিতে বাপি মানুষ করেছেন আমাকে, আর আজ বদলে গেছে সে থিওরি। পুজোর জামা বের করে বলেন, 'পরে নে, ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাব'—

অনেক অনুনয় বিনয় করলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য, 'চল না। ভালো ভালো ঠাকুর দেখাব, বেশী দূরে যেতে না চাস দুচারটে দেখে আসব'।

আজ বাপি বদলে গেছেন, কিন্তু বাপি কি করে আশা করলেন যে আমি বদলাব না! আমার মধ্যে আজও সেই ছোট্ট সমি বেঁচে আছে, যে ঠাকুর দেখতে যেতে চায় কিন্তু তার পাশে পাশে বেঁচে আছে সেই ক্ষোভ, সেই কান্না, সেই নিষেধের যন্ত্রণা, যেগুলো পুজোতে আনন্দ করার ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলেছে।

আজ মহা অষ্টমী। মিঠু ওর দাদা বৌদির সাথে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে; বার বার অনুরোধ করছে আমাকে। বাপি মাও উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে ওদের সাথে পাঠাবার জন্য। আমি কাঁদছি। হাউ হাউ করে কাঁদছি বাচ্ছা মেয়ের মত। সেই ছোট্ট সমিটার জন্য বড্ড কান্না পাচ্ছে আজ; যে একদিন যেতে পারেনি। সেদিন তোমরা যেতে দাওনি, আজ আমি যাব না। আজ গেলে যে আমি হেরে যাব সেই ছোট্ট সমির কাছে। তোমরা দেখ, পুজোর দিনে সকলের ছেলেমেয়েরা যখন নতুন জামা কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে আনন্দ করছে তখন তোমাদের একমাত্র সন্তান, ঘরে বসে গুমরে গুমরে কাঁদছে। তোমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে তবু খুঁজে পাবে না এ কান্নার কারণ। কেন সমি কাঁদছে? কেন সমি ঠাকুর দেখতে গেল না? প্রশ্ন করবে, উত্তর পাবে না। আমি দেব না উত্তর। এ আমার জেদ। তখন তো দশমীর দিন সন্ধ্যে বেলাও রেহাই ছিল না। একটু রাত বাড়লে, মানে এই ঘণ্টা দুই আড়াই পড়ার পর যখন বন্ধুরা মিষ্টির প্লেট নিয়ে প্রণাম করতে আসবে তখন আমার ছুটি। আমিও মিষ্টির প্লেট নিয়ে তাদের বাড়ি যাব কাকু কাকিমাকে প্রণাম করতে। চাতক পাখির মত কান খাড়া করে বসে থাকতাম কখন মেঘ ডাকবে, এ—সরি! কখন বন্ধুরা ডাকবে। প্রণাম করার ভক্তির চেয়ে না পড়ার আনন্দটাই বেশী ছিল। ডেইলি এক ছক, স্কুল খোলা থাকলে দুটাইম, ছুটি থাকলে তিন টাইম। কালি পুজোর দিন শুধু রাতটুকু ছুটি। তাও আবার সেদিন বিকেলে ছুটি ছিল না। দুপুর বেলা পড়তে বসে একেবারে সন্ধ্যে বেলা উঠতে হত। মানে লম্বায় কাটলে চওড়ায় পুশিয়ে নেন। কি যে ছাতার মাথা পড়া হত জানি না। চার ঘণ্টা বই নিয়ে বসলে সর্বসাকুল্যে হয়ত একঘণ্টা পড়তাম বাকি তিন ঘণ্টা হাওয়ায় ভেসে বেড়াতম। আমার মনে

পড়ছে এক সিদ্ধ ব্যক্তির কথা। বোধহয় সাধুটাধু হবেন, আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। আমাকে দেখে উনি মাকে বলেছিলেন—'আপনার মেয়ে তো ভীষণ খেয়ালি! আপনারা যে যার মত বকে যান ও কিন্তু নিজের খেয়ালেই মত্ত থাকে, ভীষণ কল্পনা প্রবণ মন ওর—'

অবাক হয়েছিলাম, সত্যিই তো আমার মনের কথা উনি জানলেন কেমন করে! অবশ্য জিজ্ঞাসা করে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, ভাই ফোঁটার দিনটা ছুটি পেতাম, বাপি আমাকে নিয়ে ছোট পিশির বাড়ি যেতেন, পিশি বাপিকে ফোঁটা দিতেন, আমি দিতাম পিশতুতো দাদাকে। সারাদিন ধরে পিশি বাপির কাছে অনুনন বিনয় করতেন—'দাদা, সমিকে রেখে যাও। ও একটা দিন অন্তত এখানে থাক। তুমি আসতে না পার, ওর পিশেমশাই ওকে দিয়ে আসবে। সমি আজ থাকুক।'

বেশীর ভাগ সময়ই আবেদন মঞ্জুর হত না। 'না না থাকলে পড়ার ক্ষতি হবে। সামনে পরীক্ষা'। তখন অ্যানুয়াল পরীক্ষা পুজোর পর হত। সুতরাং সন্ধ্যে বেলা টানতে টানতে ঘরে নিয়ে আসতেন। পিশি সজল চোখে আমাকে বিদায় দিতেন। আমিও ঝাপসা চোখে বাপির হাত ধরে বাড়ি ফিরতাম। আবার একটু তাড়াতাড়ি ফিরলে বলতেন—

'সারাদিন তো ঘুরলি একটু বোস। দুচারটে অংক করে নে।'

আমার পিশির জন্য মন কেমন করত। কান্না পেত খুব। আজ দীর্ঘ আট বছর হয়ে গেল ছোট পিশি মারা গেছেন। ক্যানসার হয়েছিল। ওনার কণ্ঠস্বর আমার এখনো মনে পড়ে। চোখ বন্ধ করে একা ঘরে বসে মন দিয়ে ভাবলে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। আট বছর হয়ে গেল পিশির বাড়ি যাই না। এখনো পরিষ্কার মনে পড়ে সেই দিনটা। পুজোর সময়, ষষ্ঠী না সপ্তমী কোন দিনটা আমার ঠিক মনে নেই। আমাদের বাড়ি খবর এল ছোট পিশি মারা গেছেন। ফাঁকা অ্যাম্বুলেন্স ফিরে গেল। বিছানায় শোয়ান আছে পিশিকে। জীবনে প্রথম দেখলাম প্রিয়জনের মৃত্যু। কি মর্মান্তিক! সেদিন যে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি আর যাইনি। পিশির শ্রাদ্ধেও যাইনি। পিশির বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে হেঁটে আধ ঘণ্টার পথ। এখন ভাবি, ছোট বেলায় বাপি না নিয়ে গেলে যেতে পারতাম না। এখন যেতে পারি কিন্তু পিশি নেই, কার কাছে যাব? ছোট বেলায় যাবার জন্য খুব কান্নাকাটিও করতাম। বাপি অবশ্য এটাকে অনেকবার টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আমার কাছে বাপির কথার কোন দাম ছিল না। বেয়াড়া কিডন্যাপার্সদের মত বাপি সর্বদা আমার সাথে কথার খেলাপ করতেন। কিছু কিছু কিডন্যাপার্স আছে, কাউকে কিডন্যাপ করে তার বাড়িতে ফোন করে জানাল, অমুক জায়গায় এত টাকা নিয়ে চলে আসুন আপনাদের লোককে পেয়ে যাবেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল চালাকি করে তারা টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল অথচ লোকটাকে আর ফেরত দিল না। বাপিও প্রায়ই এরকম করতেন। আমি একটু বেয়াড়াপনা করলেই, মানে পড়তে না

চাইলে বাপি বলতেন, 'পড়ে নে আজ পিশির বাড়ি নিয়ে যাব।'

আমি হুড়মুড় করে পড়া তৈরী করতাম। পড়তে পড়তে থামলেই বলতেন—'তাড়াতাড়ি পড়ে নে। যত তাড়াতাড়ি পড়বি তত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাব।'

পড়া শেষ করে বলতাম—'বাপি নিযে চল এবার।'

উনি হেসে বলতেন—'আজ থাক, অন্য দিন নিয়ে যাব।'

আমার মুখটা বেত্রাহতের মত ফ্যাকাসে হয়ে যেত। বায়না করতাম—'না, আজই নিয়ে চল।' সঙ্গে অভিযোগ—'তাহলে বললে কেন নিয়ে যাব?'

এক দাবড়ানি দিলেন—'বলেছি বলেই নিয়ে যেতে হবে! বলছি তো আজ আমার কাজ আছে। অন্য দিন নিয়ে যাব।'

আমার বুদ্ধিতে কুলোত না। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে হঠাৎ কি এমন কাজ পড়ে গেল যে যাওয়া যাবে না। প্রশ্ন করার সাহস নেই। মুখ ভার করে উঠে গেলাম। বাপি এভাবে আমাকে অনেক বার বোকা বানিয়েছেন। আর আমি একই ফাঁদে পা দিয়েছি বার বার। শুধু পিশির বাড়ি যাওয়া নিয়ে নয়। মাঝে মাঝে হয়ত কিছু কিনে দেবেন বলে আর দিতেন না। একই টোপ কতদিন আর চলে! সেটা পুরানো হয়ে গেলে নতুন টোপ। এসব ছিল আমার পড়া আদায়ের ব্ল্যাকমেলিং পদ্ধতি। একদিন তো বাপি আমার ধৈর্যে'র সীমা পার করে দিলেন। মনে আছে, তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। কতবড় হব! এই বছর বার। সেদিন বিকেলে সব বন্ধুরা মিলে কিসের একটা আয়োজন করেছিলাম; মনে করতে পারছি না। দুপুর বেলা বাপির কাছে পড়তে বসেছি। একটু রোদ কমতেই বন্ধুরা বাড়িতে ডাকতে এসেছে—'সমি খেলতে যাবি না?'

ওদের গলা শুনে উসখুস করতে লাগলাম। বাপি উঠে গিয়ে বললেন—'তোরা যা, ও একটু পড়ে নিয়ে তারপর যাবে।'

তারাও সুবোধ সন্তানের মত ঘাড় নেড়ে মাঠে চলে গেল। বাপি আমার কাছে ফিরে এসে বললেন—'পড়াটা করে নে তারপর যাবি।'

আমি একটু করে পড়ি আর জানালার দিকে তাকাই। রোদ ক্রমশ পড়ে আসছে। পড়ায় মন নেই, থাকবে কি করে! বন্ধুরা এসেছিল তারাই তো মনটাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে চলে খেছে। বেগতিক দেখে বাপি বইটা টেনে নিয়ে বললেন—'পড়া আর মাথায় ঢুকছে না তো? খাতা বের কর।' নিজে বই খুলে দিলেন, 'এই অঙ্ক কটা কর।' অঙ্কের বহর দেখে আমার মুখ চুন হয়ে গেল।

'কি হল কর। যত তাড়াতাড়ি করবি তত তাড়াতাড়ি যাবি।'

আমি দেখলাম বসে থাকলে চিরকাল বসেই থাকতে হবে। এগুলো না করলে বাপি কোথাও যেতে দেবেন না। তাড়াতাড়ি অঙ্ক শেষ করে খাতাটা বাপির কাছে জমা দিয়ে উঠে পালাচ্ছি। বাধা পেলাম।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মাঠে। সব কটা তো করেছি, এবার যাই।'

'বোস। কি করেছিস সেটা দেখে যা।'

অগত্যা বসতেই হল। তাড়াহুড়োর চোটে কয়েকটা ভুল করেছি। বাপি গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

'এখন যাই, সন্ধ্যে বেলা এসে করে দেব।'

'না। এক্ষুনি কর। করে তবে যাবি।'

করলাম। কিন্তু করে যখন উঠলাম তখন সূর্যদেব পশ্চিম দীগন্তে ঢলে পড়েছেন। এবার বাপি রায় দিলেন অঙ্ক ঠিক হয়েছে। বই ফেলে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছি—'কোথায় যাচ্ছিস?'

'মাঠে।'

'বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ, এখনো খেলার সময় আছে? সন্ধ্যে হয়ে গেছে তো।'

'আমি এক্ষুনি চলে আসব।'

'তুই মাঠে গেলে এক্ষুনি আসবি! বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়া। অন্ধকার হয়ে এসেছে আর মাঠে যেতে হবে না।'

আমি হতবাক। গেলাম না মাঠে। আমি একটুতেই কাঁদি। কিন্তু কাঁদছি না। কাঁদতে পারছি না। বুকের মধ্যে বন্দী পাখির মত কান্নাটা ছটফট করছে, বের হতে পারছে না। গুম হয়ে শুধু একটা কথা ভাবছি। মা যে বলেন, 'তোর বাপি তোর ভালোর জন্যই এ সব করেন।' তাহলে আমি এত কষ্ট পাই কেন? এতে আমার কি ভালো হবে? আমার বুকের মধ্যে এখন যে যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। এও কি আমারই ভালোর জন্য?

প্রশ্ন করি নিজেকে, উত্তর পাই না। সেদিন কাঁদিনি। কিন্তু তারপর যতবার এ ঘটনা মনে পড়েছে ততবার কেঁদেছি। আজও কাঁদছি। লিখতে লিখতে থমকে যাচ্ছে কলম। এ ঘটনা এগার বছর আগেকার। অথচ আমি এখনো অনুভব করতে পারছি সেই দমবন্ধ করা যন্ত্রণা। এখনো আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এগার বছর আগেকার সেই দিনটাতে। এখনো আমার মধ্যে বেঁচে আছে সেই বার বছরের বাচ্চা মেয়েটা। আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা হাতকাটা ফ্রক পরে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে বসে আছি গুম হয়ে। আশে পাশে কেউ নেই। আমি একা। নিজেকে নিয়ে কিছু দুর্বোধ্য প্রশ্ন জট পাকাচ্ছে মাথার মধ্যে। তারই মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করছি বাপির অপরিমেয় ভালোবাসা। নিজেকে অসহায় লাগছে। মনে হচ্ছে আমি এইটুকু একটা মেয়ে কি বলতে পারি বাপির বিরুদ্ধে। ছুটে পালিয়ে যাব মাঠে! কি লাভ, এতক্ষন হয়ত বন্ধুরা খেলে বাড়ি ফিরে গেছে। তাছাড়া এখানেই তো ফিরে আসতে হবে। চলে তো আর যেতে পারব না কোথাও। এ অসহায়তা শুধু

পায়ে হাত

আমার ছিল না। মা ও ছিলেন এমনি অসহায়, হয়ত আমার মত এতটা। আচ্ছা, বাপি না হয় যেতে দেন নি কিন্তু মা তো দিতে পারতেন! দেননি, বাপি. মতের বিরুদ্ধে কথা বলবেন সে সাহস ওনার ছিল না। মনে পড়ছে আরও ছোট বেলাকার একটা ঘটনা। সেটা ছুটির দিন ছিল। সারাদিন বাপি ঘরেই ছিলেন। আমার বন্ধুদের কাছে রবিবারটা ছিল মহা আনন্দের দিন। ওদিন কেউ পড়ে না, ঘোরে, আনন্দ করে, সারা সপ্তা তো পড়েছে। আবার সোমবার পড়বে। আমার ছিল অন্য নিয়ম। সকালে ঘুম থেকে উঠে টিফিন খেয়ে বই নিয়ে বসতে হত, চলত দশটা এগারটা পর্যন্ত। উঠেই সঙ্গে সঙ্গে স্নান, ভাত খওয়া, ঘুম। দুপুরে বেলা না ঘুমালে রাত্রে যে বেশীক্ষন পড়তে পারব না, তাই ঘুম; ঘণ্টা দেড়েক। তারপর উঠে মুখ ধুয়ে পড়তে বসা। চলল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তারপর খেলতে যাওয়া। কিন্তু সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফেরার নির্দেশ ছিল, বেশীর ভাগ দিন সন্ধ্যে পেরিয়ে যেত। মাঠে গেলে আসতেই ইচ্ছে করত না। হাত পা ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পড়তে বসা। চলল যতক্ষন না ঘুম পায় ততক্ষন। তারপর রাত্রে খেয়ে শুয়ে পড়া। এই ছিল আমার ছুটির দিনের রোজ নামচা। সেদিন সকালে বাপির কাছে খুব মার খেয়েছি। দুপুরে ভাত বন্ধ। আর সারা দুপুরে বাইরের দালানে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। এই হল শাস্তি। দেওয়াল থেকে সরিয়ে চক্রাকারে খড়ির দাগ। বাপিই কেটেছেন। ভিতরে আমি দাঁড়িয়ে আছি কান ধরে। খুব খিদে পাচ্ছে। অথচ একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল ওভাবে। এক সময় ঘর থেকে মা বেরিয়ে এলেন। হাতে কয়েকটা নাড়ু। ঠাকুমা দেশ থেকে পাঠিয়েছেন। তারই একটা আমার মুখের দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি ভয়ার্ত চোখে তাকালাম ঘরের দিকে। মা নিচু স্বরে বললেন বাপি ঘুমিয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে মা আমাকে খাওয়াচ্ছেন আর চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল পড়ছে। মার কান্না দেখে আমিও কাঁদছি। কি অনুপম সে দৃশ্য! আমি কান ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছি আর নাড়ু খাচ্ছি। চোখের জলে নাড়ুর মিষ্টি স্বাদ নোনা হয়ে যাচ্ছে। আর মা অসহায়ের মত কাঁদতে কাঁদতে আমাকে খাওয়াচ্ছেন আর চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন। ইশারায় আমার কান থেকে হাত দুটো নামিয়ে ফেলতে বললেন। সরাতে গিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল দুটো কনুই। খেতে পেলে শুতে চাওয়ার মত আমারও একটু বসতে ইচ্ছে করছে। পা দুটো বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, দেওয়ালে যে একটু হেলান দেব তারও উপায় নেই। আমার অঙ্কিত গণ্ডী থেকে দেওয়ালের দুরত্ব বেশ খানিকটা। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেই বুদ্ধি খাটিয়ে ওটা করা হয়েছে। আমিও কাঁদছি মাও কাঁদছেন। এ অশ্রুপাত বিনা কারণে নয়। এ তো আমার ভালোর জন্য। এখন কষ্ট কর ভবিষ্যতে সুফল পাবে। নিজেকে বুঝিয়েছি এ অমোঘ সত্যটা। সেদিন মার অসহায়তা আমাকে ভীষণ ভাবিয়েছিল।

ভাত দিতে পারতেন। পারতেন হাত ধরে গণ্ডীর বাইরে
তা হয় নি। যিনি নিজেই গণ্ডীর মধ্যে, তিনি আমাকে
করে? আমাদের পরিবারে বাপিই একচ্ছত্র অধিপতি।
...র অনুমতি ছাড়া কোন কাজ হয় না। ওঠানো কদম থেমে থাকে ওনার অনুমতির অপেক্ষায়।

সেই থেকে আমার মনে বাসা বাঁধল বিয়ে না করার প্রবণতা। পিতার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে পতির কারাগারে আত্মসমর্পন! সে তো আর এক পিতা। সেখানে নতুন অনুশাসন। মানতে না পারলে সেই মানসিক উৎপীড়ন। আবার এরই পাশাপাশি আমার সূক্ষ্ম অনভূতিতে বেড়ে উঠতে লাগল এক বন্ধুর বাসনা। অবশ্যই সে পুরুষ। যাকে আমি আমার কথা বলতে পারব। যার বুকে মাথা রেখে প্রাণ ভরে কাঁদতে পারব। যার ভালোবাসার শীতল ছায়ায় জুড়িয়ে যাবে আমার সব যন্ত্রণা সব ক্ষোভ। আমি কল্পনা প্রবণ। তাই তামার সেই কল্পনার মানুষটার চারপাশে ঘোরা ফেরা করতে কোন অসুবিধা হত না। এ বাস্তবটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমি বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতাম তার সাথে, এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাই কোনদিন মূল্য পায়নি আমার কাছে।

আমার মনটা শিল্পীর মন। সেই ছোট্ট বেলা থেকে ক্রিয়েটিভ কিছু একটা করার জন্য সর্বদা উতলা হয়ে থাকত। মনে পড়ছে সাত আট বছর বয়সের একটা কথা। সেদিন প্রথম আমার ভিতরকার শিল্প সত্ত্বা মাথা উঁচু করে ঘোষণা করেছিল নিজের উপস্থিতি।

স্কুলের কালচারাল ফাংশান ছিল সেদিন। এমনিতে প্রতি বছর স্কুলের ফাংশান স্কুলের হলেই হত। কিন্তু সে বছর কেন জানি না একটা সিনেমা হল ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। হলটা স্কুলের কাছেই। নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি পাঠ অনেক কিছু হয়েছিল। আমি ছিলাম দর্শকাসনে। প্রথমে ছোটদের প্রোগ্রাম ছিল। আমার বন্ধুদের দেখলাম স্টেজের উপর। মুহূর্তে মনটা অদৃশ্য দুই ডানা মেলে উড়ে গেল ওদের কাছে। আমার পার্থিব শরীরটা পড়ে রইল চেয়ারে আর মনটা নেচে বেড়াচ্ছে স্টেজের উপর। ভ্রম ভাঙতেই মনে হল আমি এখানে কেন! আমিও তো পারতাম ওদের মত নাচতে গাইতে। কিন্তু আমি তো কিছু শিখিনি। স্টেজে গিয়ে করবটা কি! হ্যাঁ, শিখতে পারতাম। এই প্রথম মনে হল আমিও কিছু পারি, এবং আমিও কিছু করব। এ আসন আমার জন্য নয়। ঐ স্টেজ আমাকে ডাকছে। ওর হাতছানি উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওটাই আমার আসল জায়গা। উঁচু ক্লাসের দিদিরা নাটক করল, কয়েকজন আবৃত্তি করল। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে একটা গান। বাংলায় নয়—অনেকটা পুজোর মন্ত্র পাঠের মত শোনাল, বড় হয়ে জেনেছি ওটা গান নয়, সংস্কৃতে মঙ্গলাচরন। কোন শুভ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে মঙ্গলাচরণ পাঠ করতে হয়। অনুষ্ঠান শেষে

হলের বাইরে বেরিয়ে দেখলাম বাপি দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলছেন—

'কি রে, শরীর খারাপ লাগছে?'

'না তো।'

'এ রকম শুকনো লাগছে কেন?'

কোলে তুলে নিলেন। আমার পিঠে ব্যাগ। আমি দুহাতে বাপির গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে আছি। বাপি কত কথা জানতে চাইছেন—ফাংশান কেমন লাগল—কে কি করল—আমি সব শুনতে পাচ্ছি, কিছু বলছি না। হঠাৎ ব্যাগে হাত দিয়ে বললেন—'সমি, টিফিন খেয়েছিস?'

মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম—'না'।

'কেন খাসনি?'

'মনে ছিল না।'

এখনো মনে আছে ময়দা আর চিনি দিয়ে মা একটা দারুন খাবার তৈরী করে দিয়েছিলেন টিফিনে। সারাটা রাস্তা বাপির কোলে করেই বাড়ি এলাম। ভীষণ অসুস্থ। কেন যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম জানি না। অনেক ভেবে বাপি মাও খুঁজে পাননি কেন এমন হল। বাপি বলছেন—'ও তো যাওয়ার সময় সুস্থ ছিল। আর অসুস্থ থাকলে আমিই কি যেতে দিতাম নাকি!'

তবে আমার মনে আছে। দুদিন আচ্ছন্ন গ্রস্থের মত ছিলাম। কেবলই ঘুমের মধ্যে দেখতে পেতাম একটা লম্বা ফর্সা মেয়ে লাল পাড় সাদা শাড়ী পরে মঙ্গলাচরণ করছে। আমাদের স্কুল ড্রেস লাল পাড় সাদা শাড়ী। বহুদূর থেকে ভেসে আসত সুন্দর কণ্ঠের সংস্কৃত স্তোত্র। জুড়িয়ে যেত মন। সেই মেয়েটাকে দেখলে আমি এখনো চিনতে পারব। তৃতীয় দিন একটু সুস্থ হলাম। ঐ দিনই মাকে বললাম—

'মা আমি গান শিখব।'

'কি শিখবি?'

'গান। আমাকে একটা হারমনিয়াম কিনে দেবে?'

'আমি কি করে কিনে দেব! বাপিকে বলবি, বাপি দেবে।'

'তুমি বলবে।'

'কেন তোর বলতে কি হয়েছে? তুই-ই চাইবি।'

চাইলাম কিন্তু পেলাম না। বাপির অকাট্য যুক্তি, 'তোমাকে লেখাপড়া শিখে বড় হতে হবে। ওসব ফালতু জিনিসের প্রতি সময় নষ্ট করলে পড়রে ক্ষতি হবে। রেজাল্ট খারাপ হবে।'

'পড়ার ক্ষতি হবে না। আমি পড়ব গানও করব।'

'কি করবি গান করে? আমাদের বংশে কেউ গান টান শেখেনি।'

'তাতে কি হয়েছে, আমি শিখব।'

'একবার তো বললাম, না। পড়ার ক্ষতি হবে।'

'কেন পড়ার ক্ষতি হবে! আমার বন্ধুরাও তো শেখে।'

'ওরা শিখুক। তোমাকে শিখতে হবে না।'

এরপর কি প্রশ্ন করব। কি প্রশ্ন করা উচিত খুঁজে পেলাম না। ক'দিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে মায়ের কাছে বায়না করলাম, কাঁদলাম। কোন ফল হল না। মা একটি বারের জন্যেও বাপিকে বললেন না আমার কথা। আমার শিল্প সত্ত্বা প্রথম হোঁচট খেল; তবে মরেনি, নিজেকে সামলে নতুন আশায় সোজা হয়ে দাঁড়াল। কেন জানিনা একদিন মনে হল হারমনিয়াযের বুঝি অনেক দাম তাই বাপি কিনে দেননি। তাহলে নাচ শেখাই ভালো—দুটো ঘুমুর হলেই চলে যাবে; আর বাপি যদি কিনে না দেন তাহলে মা নিশ্চই দেবেন। আর একান্তই যদি না দেন তাহলে আমার তো রুপোর নূপুর আছে তা দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। মন বাসনার কথা মার কাছে ব্যক্ত করলাম। মা আবার ঠেলে দিলেন বাপির দিকে। ভয়ে ভয়ে বললাম। বাপির সেই এক কথা —পড়ার ক্ষতি হবে।

কিন্তু আমি যে শিল্পী হতে চাই। নাচ গান আঁকা গীটার কিছু একটা করার সুযোগ দাও। একটু সাহায্য কর আমায়। আমি একদিন অনেক বড় হব। ভি. আই. পি. হব। সবাই চিনবে আমায়। আমাকে একটু সাহায্য কর তোমরা। এটা যে আমার স্বপ্ন। তোমাদের সাহায্য না পেলে আমার স্বপ্ন যে শেষ হয়ে যাবে—

যে স্বপ্ন মূল্যহীন, সে স্বপ্নের আবার শেষ আর শুরু! আমার পরিবারে আমার স্বপ্নের কোন মূল্য নেই। সেদিনও ছিল না আজও নেই। আমাকে নিয়ে সব স্বপ্ন তো আমার বাপিই দেখছেন, তাহলে আমার আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখার কি আছে! নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার অধিকার আমার নেই। আমি তা পারি না। আমার কানের কাছে দিন রাত শুধু একটাই শব্দ বাজত—পড়, শুধু পড়ে যা—সব সময় পড়—এটা পড়, ওটা পড়—দিন রাত পড়—এক্ষুনি পড়—শুধু পড় আর পড়।

কেবল গাদা গাদা বই খাতা আর কলম। আমি যে রবিঠাকুরের তোতা কাহিনীর সেই তোতা পাখিটার চেয়েও দুর্ভাগ্যবান। তোতো পাখিটা পড়তে পড়তে মরে গেছিল, কিন্তু আমি মরিনি। ধুঁকে ধুঁকে আজও বেঁচে আছি।

"ওগো রবি ঠাকুর, আমি যদি তোমার তোতা পাখি হতাম তো কত ভালো হত—"

ঐটুকু বয়সেই বুঝতে পারতাম বুকের মধ্যে তিল তিল করে দানা বাঁধছে

ক্ষোভ। আমি না চাইলেও সে একটু একটু করে জমা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পড়ার প্রতি ঘৃণা ; আরো ঘৃণা। এই ঘৃণাটা শুধু যদি পড়ার প্রতি থাকত তাহলে হয়ত এতটা ক্ষতি হত না যতটা ক্ষতি আজ হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম। কারণ বাপি আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি জানি আমার কিছু হলে বাপি ভীষণ কষ্ট পাবেন। তাই নিজেকে কষ্ট দিতে শুরু করলাম। খাওয়ার পরিমাণ কমাতে লাগলাম। খেতে দিলে অর্ধেক খাবার লুকিয়ে ফেলে দিতাম। অসুখ করলে ওষুধ খেতাম না। সুযোগ পেলে ফেলে দিতাম। বুকের মাঝে ঘৃণা আর ক্ষোভের পাহাড় নিয়ে এ ভাবেই বড় হয়ে উঠছি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। প্রতি পদক্ষেপে কম্প্রোমাইজ। আমার সব চাওয়া না পাওয়া রয়ে গেছে শুধু লেখাপড়ার জন্য। বার বার আশা হত হয়েছি আমি। মুহূর্তে মুহূর্তে ঘটেছে আমার বিশ্বাসের মৃত্যু। অথচ কি আশ্চর্য! আমি এখনো বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, মানুষকে বিশ্বাস করি।

এভাবে নিজেকে স্লো পয়েজন করতে করতে কবে যে একদিন অ্যানিমিক্ পেসেন্টে পরিণত হলাম বুঝতে পারি নি। এক সময় স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে কলেজে গেলাম। তখনই পেলাম জীবনে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ। একটু খানি স্বাধীনতা। সেইটুকু স্বাধীনতা নিয়ে আজও সন্তুষ্ট আছি। আমি বাপির স্বপ্নকে স্বার্থক করতে পারি নি। আমার স্বপ্নও আমার নাগালের বাইরে। আমার বাপি একজন গুনী ব্যক্তি। মাস্টার অফ্ অল ট্রেডস্। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব পারেন। অমন একজন মানুষের মেয়ে হয়ে আমি কেন যে এত নিষ্কর্মা হলাম জানি না। হোমেও লাগলাম না যজ্ঞেও লাগলাম না। মাই লাইফ ইজ্ এ বিগ জিরো। এতো জীবন নয় এ শুধুই বেঁচে থাকা। মরে যাওয়া যায় না বলেই বেঁচে থাকা। এভাবেই এলোমেলো পথ ধরে চলতে চলতে যখন উদ্দেশ্যহীন একটা পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি তখনই পেলাম আহীর কে। আমার জীবনের একটা নতুন মোড়।

১৩ই এপ্রিল, শনিবার। অ্যাকটিং ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরেছি বিকেল বেলা। আজ প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন দিলুদা। বাপি মার সাথে আলাপ করলেন। গল্প হল খানিকক্ষন। তারপর দিলুদাকে রিক্সস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যখন বাড়ি এলাম, মা আমাকে একটা খাম দিলেন—'সমি, তোর চিঠি এসেছে।'

চিঠিটা হাতে নিলাম। খামের উপর ঠিকানা লেখার স্টাইল দেখেই বুঝতে পারলাম এ কার চিঠি হতে পারে—আমার হাত কাঁপছে। উল্টো দিকে লেখা 'rom—AK.

'কার চিঠি অলকের ?'

মার প্রশ্নের উত্তরে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালাম হ্যাঁ। জানি আমি মিথ্যে

বলছি। একটা অপরাধ বোধ মনের মধ্যে একটু উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল। অলক আমার মামাতো দাদার নাম। বুঝলাম মা ^K. লেখাটা দেখে অনুমান করেছেন। দাদার ইংরাজী লেখা আহীরের মত সুন্দর। বেশ খানিকটা মিল আছে তাই মার কোন সন্দেহই হয় নি। মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করলাম। বুকে দুরু দুরু কম্পন। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। এর আগে কোনদিন এমন হয় নি। বুঝতে পারছি না কেন আমার ভিতরটা এমন হচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি আগ্রা থেকে চিঠি আসবে ভাবিনি, একদম ভাবিনি। খামের উপর ঠিকানা দেখার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবিনি ওটা আহীরের চিঠি হতে পারে। আমি পড়তে পারছি না। দীর্ঘ চিঠিখানা উল্টে পাল্টে দেখছি। দুটো ফুলের স্টিকার মারা, একেবারে শেষ পাতায় তাজমহলের একটা রঙিন ছবি। চিঠির ফোল্ড খুলতেই ভিতর থেকে একটা চিরকুট পড়ল। আগে সেটাই পড়তে শুরু করলাম—

কুহেলি,

ও ব্যাপারে কতদূর কি করবে জানাবে…জানাবে! আহীর আমাকে তুমি সম্বোধন করেছে! ও গড! আমি ওর এতটা আপন হলাম কি করে! আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আনন্দে আমি পাগল হয়ে যাব।

তোমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। Notning do mind. পাত্রী হিসাবে Photo যদি নাও পাঠাতে চাও কিছু মনে করব না। তবে আমার দাবী অন্য রকম। ভুল না কিন্তু—আহীর।

'ও আহীর, আই লভ ইউ—আই লভ ইউ।'

নিজের হাতেই মুখটা চেপে ধরলাম। সতস্ফূর্ত ভাবে আমার অবচেতন মনের কথাটা নিতান্তই অবাধ্যের মত বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। চিঠি ফেলে ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। না, আশে পাশে কেউ নেই। বাপি মা দুজনেই ছাতে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছিল। ঘরে ফিরে এসে চিরকুটটা খামের মধ্যে ভরে চিঠিটা পড়ছি·

সুভাষিণী কুহেলি,

Its really unbelivable, এমন একটা সুন্দর জিনিস সত্যিই আমার হাতে আসবে ভাবিনি। খুশি তো হয়েছি, রোমাঞ্চিত ও বটে। চিঠি লেখা একটা শিল্প আপনা চিঠি পড়ে আবার মনে পড়ে গেল। দারুন লিখেছেন। কথা যেমন সহজ সুন্দর ভাষা তেমনই প্রাঞ্জল। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সবলীল গতি। নিজের ভাব এ সুন্দর প্রকাশ করেছেন প্রশংসা করার ভাষা আমার নেই। আসলে অনেক কিছুই মনে আসছে কিন্তু প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। কারন বাংলা সাহিত্যটা আমা কখনোই favoarite ছিল না। তাই হয়ত আপনাকে যথার্থ মূল্যায়ন করা পারলাম না। এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। জানেন তো ক্ষমা পরম ধর্ম। তাই কুহেলি দেবী, এই 'আজনবি' দোস্ত যে আপনার ক্ষমাথেকে বঞ্চিত হবে না তা আমি নিশ্চিত

এই দেখুন, কথায় কথায় আসল কথাই বলা হচ্ছে না। আপনার বিবরণ, আপনার প্রতিটি লাইন আমার ভালোলেগেছে। আশা করি আপনার মত বুদ্ধিমতির জন্য এইটুকুই যথেষ্ট। "সমঝদার কে লিয়ে ইশারাই কাফি হোতি হ্যায়।" আপনি এক যায়গায় বলেছেন Computer GDCA মাঝপথে ছেড়ে দেবার আশঙ্কা আছে। আসল কারণ বোধগম্য নয়। আপনার মত মেয়ের মুখে একথা মানায় না বোধ হয়। তবে আপনার Hobby-টা ভীষণ Interesting. দাবিহীন পাত্রকে স্বাগত জানানো। অবশ্য এটা আপনার মত স্বাধীনচেতা মেয়ের পক্ষে বেমানান নয়। তবে এটাও যদি নেশার বসে লেখা হয় (negative mood-এ) তাহলে বোধ হয় দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। যাগ্‌গে সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপাততঃ আমার দায়িত্বটা পালন করতেই হবে। আপনার আজনবি দোস্ত হবার হাতছানি উপেক্ষা করি কি করে বলুন! জানেন তো, ভারত মাতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। Training আমাদের শিখিয়েছে—কাউকে যদি আনন্দ দিতে না পার তো অন্তত দুঃখ দিও না। তাই আপনার বন্ধুত্বের আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করলাম। 'মুঝে তুমসে দোস্তি কবুল হ্যায়।' তাই তুমি কুহেলি, আমি আহীর। কুহেলি, তোমার দুটো কথা আমাকে হতাশ করেছে। প্রথমতঃ এখনো তুমি আমাদের সমাজকে পুরুষ শাসিত বলেছ। আমি মানতে পারলাম না। একথা সত্য যে পুরুষদের প্রভাব এখনো বেশী। কিন্তু পুরোপুরি Dominant নয়। আর একথা তোমার মত স্বাধীনচেতা, আধুনিক, সাহসী মেয়ের জানা উচিত। তুমি বললে কি হবে—তোমাকে চিনতে আমার যে ভুল হয়নি তা এখনো জোর করে বলতে পারি। তুমি যথেষ্ট bold. 'রাজিয়া সুলতানা' বা 'ঝাঁসী কি রাণী' না হলেও, অন্তত আর পাঁচটা মেয়ের মত নয়। তাই বড়দার অফিসে গিয়ে নিজের photo দেওয়া তোমার অসাধ্য হবার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ তোমার pass port photo থাকা স্বত্বেও না পাঠানো। কারণ দেখিয়েছ কি? না চার পাঁচ বছরের পুরানো আর সুন্দর উঠেছে। I am sorry Kuhally. আবার বলি Unacceptable. পুরানো হবার কারণটা না হয় মানা গেল কিন্তু সুন্দর হওয়াটা যদি না পাঠানোর কারণ হয় তা হলে বলব আমার Bad luck. সুন্দরের তারিফ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। রাগটা ক্যামেরার উপর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও বেচারার কি দোষ বলুন, আপনি হলেনই সুন্দর। আপনি বরং—এ sorry, তুমি এবার একটা খারাপ করে photo তুলবে। তাহলে তো আর পাঠানোর সমস্যা থাকবে না। বন্ধু হয়ে এইটুকু দাবি তো করতেই পারি। না কি? অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করলে—মাপ কোরো। তবে একটা কথা Studio-তে গিয়ে নিজেকে ধোঁকা দিয়ে খারাপের চেয়েও খারাপ করে নিজেকে তুলে ধরলেও তোমার 'inner beauty' কে কিন্তু ঢাকা দিতে পারবে না। যা ক্যামেরায় ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে পুরুষের চোখে। প্রথম পত্রালাপেই আমি

দেখে নিয়েছি। আপনার মতই আমারও আশঙ্কা হচ্ছে—তোমাকে বোর করছি না তো ? ও হ্যাঁ—তুমি বোর করার চেষ্টা করেছ কি না জানি না, তবে আমি যে হইনি তা আশা করি বুঝেছ। তবে উল্টোটা হলে বলে দিও। কখনো ভুল করবো না। তবে তোমার কথা মতই লিখে বদলা নিলাম। তোমারও সময়ের দাম আছে। তাই মনে হয় থামা উচিত। লিখলে "চিঠি" দিও—"উত্তর" নয়। অবশ্য অনুরোধ করলাম। আশা করাটা হয়তো বেশী হবে। তবে চিঠির প্রতীক্ষায় নিশ্চয়ই থাকবো। ভালো থেকো। অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। আর রইল তাজমহল দর্শনের সাদর আমন্ত্রণ।— আহীর।

From the
City of Taj.

আফসোস্ হচ্ছে, ইস্! ওর দাদার অফিসে ফটোটা না পাঠালেই ভালো হত। তার চেয়ে আগ্রায় পাঠালে ঠিক ছিল। আহীর আমাকে ওর দাদার পাত্রী হিসাবে নয় নিজের বন্ধু হিসেবেই আপন করেছে। চিঠিটা আবার পড়লাম।—'তুমি বললে কি হবে—তোমাকে চিনতে আমার যে ভুল হয়নি তা এখনো জোর করে বলতে পারি।' লাইনটা বার বার পড়ছি। ঐ লাইনটার ভিতর দিয়ে আমি আহীরকে চেনার চেষ্টা করছি। আত্মস্থ করতে চাইছি শব্দ কটা। তুমি আমার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকবে ? কেন ? আমি তো নিছকই একটা অচেনা মেয়ে, আর পাঁচ জন প্রার্থীর মত আমার চিঠি গিয়ে পড়েছিল তোমাদের বাড়ি—তাহলে আমার চিঠির প্রতীক্ষা তুমি করবে কেন ? না, এ লাইন তুমি শুধু চিঠির ফর্মালিটি রক্ষা করার জন্য লিখেছ—মানতে পারলাম না। মানতে পারলাম না ! না আমার মন মানতে চাইছে না ? জানি না। এ তর্ক ভালো লাগছে না। আমার আহীরের সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে ওর সাথে। কিন্তু ও তো অনেক দূরে, দেশের বাড়িতেও নেই যে দেখা করা যাবে ! আর সবে মাত্র গেছে। আবার কবে ছুটি পাবে তাই বা কে জানে ! আচ্ছা, ও করেটা কি ! লিখেছিল তো ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে চাকরি করে। এয়ার ফোর্সে তো কত রকম বিপদজনক কাজ করতে হয়, যাতে লাইফ রিস্ক থাকে। ও সে রকম কিছু করে না তো ! বুকের ভিতরটা চড়াৎ করে উঠল। না না তা কেন হবে ! তবে যে লিখেছে 'ভারত মাতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি'—কি ধরনের সেবা ! বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই, বা সেই ধরনের কিছু ! না কি ও প্লেন চলায় ! না প্লেনের মধ্যে অন্য কোন মেকানিক্যাল কাজ করে ! দুদিন ছাড়াই তো শোনা যায় প্লেন ক্র্যাস হচ্ছে। ওকে কি সর্বদা প্লেনে থাকতে হয় ! মাথার মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন কিলবিল করছে। ব্যাগ খুলে আগের চিঠিটা বের করলাম। যে দিন থেকে এসেছে ব্যাগে করে নিয়ে ঘুরছি। মাঝে মাঝে বের করে পড়তাম। পারিবারিক বিবরণটুকু বাদ দিয়ে, যেটুকু আমাকে নিয়ে লেখা সেটুকু বেশী পড়ি।

ছোট ভাইঃ আমি নিজে। Graduate…বর্তমানে Indian Air Force-এ Radar dipartment-এ কর্মরত,…র‍্যাডার ডিপার্টমেণ্ট! র‍্যাডার ডিপার্টমেণ্ট-টা কি! ভাবছি, ঐ ডিপার্টমেণ্টে কি কাজ হয়। ইয়েস! ডিক্সনারী দেখি। ওখানে নিশ্চই পাব র‍্যাডার মানে কি। পড়ার বই-এর র‍্যাক থেকে সংসদের লাল কভারের ইংলিশ টু বেঙ্গলী ডিক্সনারী পাড়লাম। পাতা উল্টে উল্টে বের করলাম র‍্যাডার শব্দটা। লেখা আছে Radar মানে—The system of ascertaining direction and range of aircraft, ships etc. by means of electromagnetic waves. (তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গসমূহ দ্বারা বিমানপোত জাহাজ প্রভৃতির দিগ্ নির্ণয় প্রণালী।)

এয়ার ক্রাফ্টের দিক নির্ণয় কি প্লেনে বসে সম্ভব! না কোন অফিসে, মানে কোন ঘরের মধ্যে বসে করতে হয়! কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসতে ইচ্ছে করছে। কে বলে দেবে আমায়! চিন্তা করছি, একদিন দমদমে যাব। এখানেও নিশ্চই র‍্যাডার ডিপার্টমেন্ট আছে। থাকা তো উচিত। ওখানে গিয়ে কাউকে জানতে চাইলেই বলে দেবে। যদি না বলে? যদি সন্দেহ করে? করতেই পারে; কারণ জানতে চাইলে কি বলব! অনেকক্ষণ ভেবে একটা উপায় পেলাম। বলব—আমি একজন জার্নালিস্ট। র‍্যাডার ডিপার্টমেন্টে কি ধরনের কাজ-কম্ম হয় তার উপর একটা থিসিস্ লিখছি তাই একটু এনকোয়্যারি করতে এসেছি। ভাবতেই বেশ থ্রিল হচ্ছে, কিন্তু ওরা যদি আমার আইডেন্টি কার্ড দেখতে চায়! তাহলে কি হবে! তখন থ্রিল একেবারে বেরিয়ে যাবে। মিথ্যে বলার দায়ে জেল। অথবা বিদেশী শত্রুর এজেন্ট সন্দেহে ফাঁসি। বাপ্ রে! কিউরিসিটির কি নিদারুন পরিণতি! আচ্ছা, ফাঁসির আগে তো অপরাধীর শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়া হয়। আমাকে যখন জানতে চাওয়া হবে আমি কি বলব! আহীরের কথা মনে পড়ছে। হ্যাঁ, আহীরকেই একবার দেখতে চাইব। জীবনের প্রথম এবং শেষবারের মত। আমি গরাদের ভিতরে আর ও বাইরে। কি বলব! কিচ্ছু বলতে পারব না। শুধু তাকিয়ে থাকব। আহীর মন খারাপ করে বলবে—এ তুমি কি করলে কুহেলি! কেন এমন করলে? তুমি আমার কথা একবারও ভাবলে না? লেকিন তুম ফিকর মত করো না। তুমহারী আজাদিকে লিয়ে ম্যাঁয় বড়ে সে বড়ে ওকিল লে আউঙ্গা। ফির ভী তুমহে আজাদী না মিলে তো ম্যাঁয় জেল তোড়কে তুমহে বাহার লে আউঙ্গা। ম্যাঁয় তুমহারে বগার জী নেহী সাকতা কুহেলি—নেহী জী সাকতা…

এ কি অসভ্যতা! চিঠিতে তো কোথাও লেখা নেই—আহীর মেরে বগার জী নেহী সাকতা! আমি এসব কি ভাবছি! তাহলে কি আমি আহীরকে বগার জী নেহী সাকতী! ধ্যাৎ! এটা কি হিন্দী সিনেমা হচ্ছে না কি! তা না হোক, আমার ভাবতে বেশ মজা লাগছিল। আমার হাসি পাচ্ছে। হাসছি আমি।

'কি রে একা একা হাসছিস কেন ?'

চমকে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি বাপি দাঁড়িয়ে। আমার হাসি গায়েব। বাপি হাসছেন—'একা একা হাসছিস কেন বোকার মত ?' এবার আমি হাসার চেষ্টা করছি—'এমনি—এমনি। একটা কথা মনে পড়ে গেছিল তাই।'

বাপি যদি ঘরে ঢোকেন তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। আহীরের চিঠিগুলো চারিদিকে ছড়ান। পটা পট্ ভাঁজ করে ডিক্সনারীর ভিতর ঢুকিয়ে ফেললাম। বাপি পাশের ঘরে চলে গেলেন। কি আশ্চর্য! ফাঁসির হুকুম শুনে আমার আহীরকে দেখতে ইচ্ছে করল! মৃত্যুর আগে বাপি মার কথা একবারও মনে পড়ল না! যে বাপি মা আমার ফাঁসির খবর শুনেই হয়ত হার্টফেল করবেন, তাঁদের কথা একটিবারের জন্যেও মাথায় এল না! অবাক লাগছে নিজেকে। হোক না কল্পনা, কল্পনা তেও কি কেউ এমনি করে বাবা মাকে ভুলতে পারে! কি অসম্ভব স্বার্থপরতা!

তুমি কে আহীর? আমাকে এমনি করে আচ্ছন্নগ্রস্থ করছ কেন? কেন আমার বাপি মাকে পর করে দিচ্ছ আমার কাছ থেকে? আমি তোমাকে চিনি না। দেখিনি কোনদিন। তাহলে এমনি করে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছ কি ভাবে? এমন তো নয় যে তুমি আমার জীবনের প্রথম পুরুষ বন্ধু! আমি কোয়েড কলেজে পড়েছি, আমার অনেক বন্ধু। তারা সবাই আমাদের বাড়িতে আসে; তাদের সাথে ফ্র্যাংকলি মিশতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। তারা আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। কোনদিন কারুর জন্যে তো আমার মনের কোনে এমনি করে প্রেম জমা হয়নি!

এই মুহূর্তে মনে পড়ছে কলেজ জীবনের কয়েক জনের কথা। এক সময় আমি নিজে ভি. আই. পি. হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। তাই আমার আনাগোনা ছিল উপর মহলে। আমার জীবনের প্রথম আবেগ ছিল এক ফুটবল প্লেয়ার। সে বছর মাধ্যমিক দিয়েছি। পরীক্ষা শেষ হতেই বাড়িতে টি. ভি. এল। একদিন মোহন বাগানের ফুটবল ম্যাচ দেখতে বসে প্রথম দেখলাম সেই প্লেয়ারটিকে। কাদের সাথে খেলা হচ্ছিল আমার মনে নেই। তবে উক্ত প্লেয়ারটি মোহনবাগানের স্ট্রাইকার। দারুন খেলছিল, দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু নাম জানি না। জার্সি নাম্বারটা খেয়াল করে বাপির কাছে জানতে চাইলাম। তারপর কল্পনার তরী বেয়ে স্বপ্নের ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ান। সেই ছোট বেলাকার অভ্যাস। তবে ভুল করেও কোনদিন ভাবিনি এ স্বপ্ন বাস্তব হবে। ওটা আমার কাছে কেবলই নিছক কল্পনা, চোখের ভালোলাগা মাত্র। সে সময় আমার কয়েকজন কাছের বন্ধু ঐ প্লেয়ারটির নাম ধরে আমাকে রাগাত। মিথ্যে বলব না, উপরে রাগ দেখালেও মনে মনে খুশী হতাম, ভালোলাগত। মোহনবাগানের খেলা থাকলে টি. ভি.-র সামনে থেকে নোড়তাম না। দর্শক বল ফলো করে, আমি ফলো করতাম প্লেয়ারটিকে। আমার চোখ

দুটো জোঁকের মত সেঁটে থাকত তার গায়ে। বিভিন্ন নিউজ পেপার থেকে ম্যাগাজিন থেকে ভি. আই. পি.দের ছবি কেটে কেটে সংগ্রহ করা আমার হবি। সাইজ এবং কলার অনুযায়ী আলাদা আলাদা প্যাকেটে গুছিয়ে রাখি সেগুলো। মনে পড়ছে, একদিন কোচিং ক্লাস করতে গেছি স্যার তখনো এসে পৌঁছননি, কেবল একজন বন্ধু ছিল। সেখানে একটা ইংলিশ প্লে ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে চোখে পড়ল ঐ প্লেয়ারটির ছবি। কাল বিলম্ব না করে নিজের বায়লজি বক্সের কাঁচি দিয়ে ছবিটা বই থেকে কেটে নিয়েছিলাম। ওটা অন্য কারুর ছবি হলে এ ধৃষ্টতা করতাম না। ঐ বন্ধুটি আমার কথা রেখেছে। কাউকে বলেনি ছবি চোরের কথা। শুধু ছবি নয় ঐ প্লেয়ারটির নামও কেটে নিতাম কাগজ থেকে। খেলতে নেমে গোল করতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যেত। আর গোল করলে আনন্দের পরিসীমা থাকত না। সে সময় আমার সব ডায়েরির ফ্রন্ট পেজে ওর ছবি মেরে-ছিলাম। সে ডায়রি খুললে এখনো চোখে পড়ে ছবিগুলো। মনে পড়ে যায় ছোটবেলাকার পাগলামির কথা। একদিন কাগজে পড়লাম প্লেয়ারটির বিয়ে। সেই প্রথম একটা মন কেমন করা যন্ত্রণা আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি অবাক ; এরকম তো হবার কথা নয়! নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ও তো আমার কেউ নয়। ভাই, বন্ধু, দাদা, প্রেমিক কেউ তো নয়! তাহলে এ কষ্ট কিসের ? বহুদিন পর যেন আমার ঘুম ভাঙল। বিয়ের দিন একটা চিঠি সহ গ্রিটিংস কার্ড পাঠালাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে সে চিঠির উত্তর এল একদিন—

"...তোমার বাংলা ভাষা খুব সুন্দর। বড় হয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ো, ভবিষ্যতে উপকৃত হবে।...ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তোমার একটা খুব সুন্দর স্বামী হোক।"

এ যে আমার কতবড় উপহার সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে আবেগ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই ধীরে ধীরে সেটাও মুছে গেল। কিন্তু আমার বই-এর র‍্যাকে এখনো সেই প্লেয়ারটির ছবি বাঁধান আছে। অতীতের স্মৃতির মত নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রেখে চলেছে নীরবে।

মনে পড়ছে আরও একজনের কথা। যার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল বন্ধুর প্রেমিক হিসাবে। পরে জানলাম সে আমার বন্ধুটিকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে আমাকে। আমি স্তম্ভিত। এও কি সম্ভব! এতগুলো দিন ধরে যে মেয়েটা মনে মনে জানে যে তার ভালোবাসার মানুষটি তাকেই ভালোবাসে ; সে যখন জানবে তার ধারণা ভুল, তখন! এ কথা ভেবে লজ্জায়, দুঃখে কুঁকড়ে গেছি আমি। আমার বন্ধুটি যেদিন এ কঠোর সত্যের মুখোমুখি হল—হ্যাঁ, এই ঘরে এই বিছানায় বসে কেঁদেছিল খুব। আমি বাধা দিই নি। চেয়েছিলাম ওর সব কষ্ট অশ্রু হয়ে বেরিয়ে যাক, ও ভার মুক্ত হোক। এ ঘটনার পর দীর্ঘদিন আমি ওর সাথে দেখা করি নি। একটা অপরাধ বোধ আমাকে কিছুতেই ওর মুখোমুখি হতে দেয় নি।

এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম যে আমার জন্যই এ অঘটন ঘটল।

একদিন বন্ধুটি নিজেই এল আমাদের বাড়িতে। জানতে চাইল—

'আমার সাথে এতদিন দেখা করিস নি কেন সমি ?'

'সময় করে উঠতে পারি নি রে—'

'সময় করে উঠতে পারিস নি. না অন্য কিছু ?'

'অন্য কিছু ! মানে ?'

'মানে. সেই ঘটনাটা তুই এখনো ভুলিস নি'—

'তুই ভুলতে পেরেছিস ?'

ও মাথা নিচু করে নিয়েছিল। পরক্ষনে মুখ তুলে বলল—'তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস সমি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিস।'

'এ সব কি বলছিস তুই !'

'ঠিক বলছি। এভাবে তুই যদি আমাদের মাঝখানে এসে না পড়তিস তাহলে ওর ব্যবহার, ওর কথা আমাকে কোনদিনই আসল সত্যটা জানতে দিত না। আমাদের সম্পর্কটা আরও অনেক দূর এগিয়ে যেত। যেখান থেকে ফিরে আসা অসম্ভব। ভবিষ্যতের অঘটনটা আগেই ঘটে গেল। ভালোই হয়েছে। আজ নিজেকে সামলে নিয়েছি, সেদিন পারতাম না। শেষ হয়ে যেতাম আমি। ধ্বংস হয়ে যেতাম। সমি, তোর এ উপকার আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

আমি মূক হয়ে গেছি ওর এ বৃহৎ মনের পরিচয় পেয়ে। এক মুহূর্তে ও আমার মনের সব বোঝা হালকা করে দিল। সেদিন দু বন্ধুতে খুব কেঁদেছিলাম। মনে পড়ে, ও বলেছিল—'আমাদের দুজনকে আলাদা করে এমন সাধ্য কারুর নেই। আমি একটা ছেলের জন্য কখনোই তোকে ভুল বুঝতে পারি না। ওর সাথে তো দুদিনের আলাপ তুই তো আমার চিরদিনের বন্ধু।'

সেই ছেলেটির লেখা কিছু চিঠি এখনো আমার কাছে আছে। কত লোভনীয় কথা যে লেখা আছে তার ঠিক নেই। কত ভালোবাসার কথা। পড়লে যে কোন মেয়ের হৃদয় গলতে বাধ্য। কিন্তু আমার মনকে নাড়া দেয়নি একটুও। আমি তার ভালোবাসাকে যথাযথ মূল্য দিতে পারি নি বলে কষ্ট হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এ রকম হয় নি। আমার জীবনে আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। কোনটাই আমাকে এভাবে উতলা করে নি। সাধারণ ঝোড়ো হাওয়ার মত বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে। আমাকে হেলানো তো দূর একটা শুকনো পাতা পর্যন্ত খসাতে পারে নি। আমার মত একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিশাল মহীরুহকে আহীর তার ছোট্ট এক ফুৎকারে উৎপাটিত করতে চাইছে। আর আমি সেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছি তার কাছে। আমার আর ধৈর্য্য ধরছে না। উঠে গেলাম পড়ার টেবিলে। খাতা পেন নিয়ে বসলাম। এখুনি লিখব চিঠি—

আমার

অচেনা বন্ধু,

আপনার কাছে unbeliveable মনে হতে পারে। আমার কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। উপরে আমার নাম লেখা একটা খাম সেই সুদূর তাজমহলের দেশ থেকে উড়তে উড়তে একদিন আমার কাছে এসে পৌঁছবে; এ আমি জানতাম। Belive me. এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। আজ আপনার সচিত্র চিঠি খানি আমার সে বিশ্বাসের লাজ রাখল। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। না, ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। ধন্যবাদের উপরে যদি কিছু থেকে থাকে (যার উপরে আর কিছু হয় না।) 'সেটাই' আপনাকে জানাই। আমার লেখা অন্তঃসলিলা ফল্গু কিনা জানি না। তবে যদি তাই হয় তো আপনার ভূমিকাও কম কিছু নয়। আমার এ ফল্গু ধারা আপনি যদি ফিল না করতেন তো এর কি মূল্য থাকত বলুন! সৃষ্টিতে প্রান সঞ্চার করে স্রষ্টা নয়, দ্রষ্টা। আর আপনি এখানে সেই দ্রষ্টার ভূমিকাই পালন করছেন। আপনাকে অস্বীকার করলে আমার যে আর কোন অস্তিত্বই থাকে না বন্ধু! ভাগ্যিস বাংলা সাহিত্যটা আপনার favoarite নয়। হলে আমি যে হালে পানি পেতাম না। এতেই যা লিখেছেন প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। আপনি খামোকা ক্ষমা চেয়েছেন কেন! আপনার না বলা কথার মধ্যে দিয়েই তো সব কথা বলা হয়ে গেছে। আর আপনিই তো লিখেছেন—'সমঝদার কে লিয়ে ইশারা হী কাফি হোতী হ্যায়।' তো ম্যায় সমঝ গায়ি আপকী ইশারা। অব তো খুশ?

এবার আসি Computer-এর ব্যাপারে। সত্যি কথা বলতে কি, Computer সম্বন্ধে একটু আধটু জানার আগ্রহ আমার ছিল। কিন্তু এটা নিয়ে পড়াশুনা করে চাকরি করব সে কথা কোনদিন ভাবিনি। ওটা বাপির কথা মত পড়তে শুরু করেছি। বিশ্বাস করুন এখন আর ভালোলাগছে না। ধরা বাঁধা ছকের মধ্যে শুধু গাদা গাদা ইংরাজী শব্দ মুকস্থ করা। তার চেয়ে বরং অন্য লাইনে যাব ভাবছি। বাংলায় এম-এ পড়ব। আগে প্রাইভেটে বি এ টা করে নেব, তারপর। কি, আসল কারণটা বোঝাতে পারলাম? আর হ্যাঁ, পাত্রপাত্রী কলম পড়া আমার নেশা, দাবিহীন পাত্রকে স্বাগত জানানোটা নয়। এই স্বাগত জানানোটা আমার কাছে যতটা সহজ, একজন দাবিসম্পন্ন রাজকুমারকে refuge করাটা ঠিক ততটাই সহজ।

আচ্ছা, আপনি লিখেছেন, 'কাউকে যদি আনন্দ দিতে না পার তো অন্তত দুঃখ দিও না। তাই আপনার বন্ধুত্বের আহ্বান সানন্দে গ্রহণ করলাম'। তাহলে কি আমি ধরে নেব, যে আমার বন্ধুত্ব কে প্রত্যাখ্যান করলে আমি কষ্ট পাব, আর আপনি আমাকে কষ্ট দিতে চান না; তাই আমার বন্ধুত্বকে গ্রহণ করলেন? আপনার নিজের তরফ থেকে কি কোন সায় ছিল না? অবশ্য এটা আমার ধারণা মাত্র,

আর এ ধারণা ভুল হলে আমিই সবচেয়ে বেশী খুশী হব। আমার দুটো কথা আপনাকে হতাশ করেছে—এ আমি চাইনি। আমি তো শুধু সত্যি কথাটাই বলেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার হতাশা কিছুটা দূর করার চেষ্টা করি। প্রথমতঃ আপনার দাদার অফিসে আমার photo সহ একটা চিঠি পাঠিয়েছি। অবশ্যই by post. আচ্ছা, যে সমাজের অধিকাংশ নারী আজও পুরুষ দ্বারা domenant হচ্ছে সে সমাজকে পুরুষ শাসিত বলব না তো কি বলব বলুন! মানছি তুলনা মূলক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে কিন্তু আশানুরূপ নিশ্চই নয়। আপনিই বলুন, এখনো কোন পুরুষ কি মেনে নিতে পারে তার স্ত্রী তার চেয়ে কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাক? স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর মাইনে বেশী হলে স্বামী হীনমন্যতায় ভোগে। আর আমাদের সমাজে একটু স্বধীনচেতা মেয়েদের তো স্বেচ্ছাচারী খেতাব দেওয়া হয়। আমার এ কথাগুলো আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন? আবার দেখুন, একটা ছেলে আর মেয়ে হোটেলে বা রেস্টুরেণ্টে ঢুকলে ওয়েটার এসে প্রশ্ন করে, 'কেয়া লেঙ্গে সাহব?' কেন এমন হবে! মেয়েটাকেও তো জিজ্ঞাসা করতে পারত! কিন্তু প্রায়ই তা হয় না। আবার বিল পে করার সময় দেখুন ছেলেটাই পয়সা বের করে। কেন, মেয়েটাও তো দিতে পারত! গাড়িতে উঠলে ছেলেটাই তার বান্ধবীর টিকিট কাটবে। এগুলো করে ছেলেরা কি প্রমান করতে চায়! বন্ধবী Lady বলে তাকে আলাদা করে সম্মান দেয়? না বান্ধবীর পয়সায় ট্রাভেল্ করতে বা খাবার খেতে তাদের ইগোতে বাধে? কোন্‌টা ঠিক? তবে শুধু পুরুষদের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই! আমাদেরও দোষ আছে বৈকি। অধিকার কোনদিন যেচে আসে না, অধিকার নিজেকে অর্জন করে নিতে হয়। আর সেই অর্জন করে নেবার ক্ষমতা যতদিন না হবে ততদিন নারী শোষিত হবে। এই! আপনি ভাবছেন না তো যে আমি আপনার সাথে ঝগড়া করছি? মোটেই ঝগড়া করছি না। আপনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মতামতটুকু জানাচ্ছি মাত্র। যাক্, এবার দ্বিতীয়তঃ আপনার দাদার অফিসে ছবি দেবার পর ভেবেছিলাম আপনাকেও একটা পাঠাব। এখন ভাবছি না; আর পাঠাব না। আমি নিজে আপনার সাথে দেখা করব। অবশ্য আগ্রাতে গিয়ে দেখা করতে পারব না। পারব, কিন্তু বাড়ি থেকে ছাড়বে না। কারণ কিন্তু সেই একটাই, আমি মেয়ে বলে। তাই আপনি যখন কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে ফিরবেন তখন একবারটি আমায় inform করে দেবেন। তারপর ঠিক করে নেব আমরা কবে কোথায় মিট্ করব। একবার ভাবুন তো; আরে বাবা ভাবুনই না একবার—

রবি ঠাকুর তো বলেই গেছেন—"মনে মনে হারিয়ে যেতে নেই মানা।" ভাবুন —আমরা কেউ কাউকে চিনি না। হয়ত কলকাতার নন্দনে আমাদের মিট্ করার কথা। আমরা যথা সময়ে পৌঁছে গেছি। কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে দুজনে অপেক্ষা করছি। হঠাৎই একটা সুন্দরী মড্ মেয়েকে দেখে আপনি এগিয়ে গেলেন। হেসে

বললেন, 'হ্যালো, কাইন্ডলি আপনার নামটা একটু বলবেন !' মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে ঝট্ করে তাকাল আপনার দিকে। আরে না না. ভয় পাবেন না। (আমি তো আছি।) সুন্দরী মেয়েরা এমনই হয়। এরা রাস্তা ঘাটের সব অচেনা ছেলেদের দেখে ভাবে সবাই বুঝি ওদের সাথে প্রেম করতে চায়। আপনি হেজিটেডলি বললেন, 'না মানে, আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি, তাকে চিনি না কিন্তু নামটা জানি। সেই জন্য—' মেয়েটি তখন স্টাইলে বলল, 'আমার নাম, বনলতা সেন।' আপনার মুগ্ধ দৃষ্টি মেয়েটার মুখের উপর। ভাবছেন জীবনানন্দ দাশ কি একে সামনে রেখেই কবিতাটা লিখেছিলেন। 'নামটা মিলল'? আপনি বললেন, 'না'। মনে মনে বললেন মিললে খুশী হতাম। ফিরে গেলেন পূর্বের স্থানে। এবার আপনার চোখ পড়ল একটা অত্যন্ত সাদামাটা মেয়ের দিকে। যার কাঁধে ঝুলছে একটা হলুদ রঙের কাপড়ের সাইড ব্যাগ তার উপর কালো জেব্রা স্ট্রাইপ। পরনে সাদা সুতির চুড়িদার। Unconsciously ভাবলেন, এই কি কুহেলি ! আপনার six scence বলল, impossible. এতটা সাধারন। আপনি আমার চিঠির সাথে মেয়েটিকে মেলাবার চেষ্টা করলেন। No ; কোন মিল খুঁজে পেলেন না। এবার আমার পালা। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম আপনার সামনে। Boldly জিজ্ঞাসা করলাম, 'exquase me, আপনি কি কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন ? I meen অচেনা কেউ !' আপনি আমার দিকে তাকালেন ; দেখলেন সেই সাধারন মেয়েটা। ঘাড় নেড়ে জানালেন হ্যাঁ। আপনার মনে কিন্তু তখনো অবাধ বিচরণ করে চলেছে বনলতা সেন। আমি বললাম, 'তাহলে আমিই আপনার সেই অচেনা বন্ধু'। কথাটা শোনা মাত্রই আপনি আমার মধ্যে খুঁজতে লাগলেন আপনার কল্পনা inner beauty. তবে খুঁজে পাবেন কি না জানি না। বলুন, কেমন লাগল আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত ? আমার তো ভাবতেই দারুণ লাগছে। Realy, এই আপনাকে ছুঁয়ে বলছি বিশ্বাস করুন, ওফ, আপনাকে আমার ফিলিংস্টা যদি বোঝাতে পারতাম—কি দেখছেন ? Sorry কি ভাবছেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তো ? সেটাই তো স্বাভাবিক কারণ আপনি যে কুহেলি নন।

আজ আপনার চিঠিটা পেয়ে আমার বহু পুরানো একটা ধারণা বদলে গেল। আজ 13 তারিখ, আর পাঁচজন superstitious এর মত আমিও ভাবতাম 13 তারিখে কোন শুভ কাজ হতে পারে না। 13ই মার্চ (ইডেনে ডালমিয়া প্রহসন) সে ধারণা আরো দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। অথচ দেখুন আমার সে ধারণাকে বদলে দিতে আজ উড়ে এল আমার নতুন বন্ধুর চিঠি। আপনার এক একটা চিঠি আমার পুরানো ধারণা গুলোকে বদলে দিয়ে নতুন ইতিহাস লিখতে চাইছে। আজ থেকে আর ভাবব না Unlucky thirteen. আজ আপনার মত একজন বন্ধু পেলাম। এমন বন্ধু কজনার আছে বলুন। আমার আছে, আমি প্রীত।

আমি জানি আপনার সময়ের দাম আছে। কিন্তু বন্ধু বলে যখন স্বীকৃতি

দিয়েছেন, তখন এ ভালোবাসার অত্যাচারটুকু যে সইতেই হবে বন্ধু। এই **tocktive**-এর হাত থেকে আর তোমার রেহাই নেই। কাল শুভ নববর্ষ। এই নতুন বছরের প্রাক্কালে আপনি যে আমায় কি দিয়েছেন আপনি নিজেও জানেন না। বিনিময়ে আমি আপনাকে কি দি বলুন তো! আচ্ছা বেশ, আমারই লেখা একটা কবিতা পাঠালাম। কেমন লাগল জানতে চাইব না। কারণ আমি জানি আপনি বলবেন ভালো, আর আমি তারিফ নয় সমালোচনা শুনতে ভালোবাসি।

লিখলাম। এটা 'চিঠি' না 'চিঠির উত্তর' আপনি বুঝে নেবেন। অনুরোধ বা আশা কোনটাই নয় দাবি করতে শিখুন। সে অধিকার আপনার আছে। বেশী দিন অপেক্ষা করাব না খুব শীঘ্রই এ চিঠি পোস্ট করে দিচ্ছি। এত দীর্ঘ চিঠি লিখেও মনে হচ্ছে কত কথা বাকি রয়ে গেল। জানি না এত কথা আমার আসে কোথা থেকে! নাহ্ এবার লোভ সম্বরণ করতেই হচ্ছে। আপনিই তো আমাকে লোভী করে তুলছেন। বাকি কথা পরের এপিসোডের জন্য তোলা থাক। ভুলে যাবেন না প্লীজ।—কুহেলি।

আমি নারী

আমি কে?
কি আমার পরিচয়?
আমি অমুকের মেয়ে
অথবা অমুকের স্ত্রী
কিংবা অমুকের মা,
এই আমার পরিচয়?
আমার পরিচয় 'আমি' নই কেন?
আমি নারী বলে?

তোমার জীবনের চলার পথ
তুমি নিজে বেছে নাও।
তাহলে তোমার বেছে দেওয়া পথে
আমাকে চলতে হবে কেন?
কেন আমি আমার পথে চলতে পারব না?
কেন আমি বঞ্চিত হব সে অধিকার থেকে?
আমি নারী বলে?

একদিন রাতে তুমি বাড়ি ফিরতে পারনি
যে কোন কারনেই হোক
আটকে পড়েছিলে মাঝ পথে।

কাল রাতে আমারও বাড়ি ফেরা হয় নি
ঠিক একই কারনে।
আজ তোমার পরিচিত চোখ দুটো
বড়ই অচেনা, বাঁকা চাউনিতে ভরা।
সন্দেহের ইশারায় আমাকে
টেনে নামাতে চাইছে রাস্তায়।
দোষ জানার আগেই
দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছি।
কেন,
আমি নারী বলে ?

সন্তান কে জন্ম দেবার যন্ত্রণা
ভোগ করব আমি।
অথচ সে সন্তান আমার
পরিচয় নিয়ে বড় হতে পারবে না।
কেন,
আমি নারী বলে ?

তোমার ভবিষ্যৎ তুমি নিজে
ঠিক করে নিয়েছ।
সে পথে কেউ তোমায় বাধা দেয়নি।
তাহলে আমার ভবিষ্যৎ
আমায় গড়তে দিচ্ছ না কেন ?
কেন বার বার বাধার
দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিচ্ছ
আমার চলার পথে ?
আমি নারী বলে ?

তোমার ভাগ্য তুমি
জয় করে নিয়েছ দুই হাতে।
তাহলে আমার হাত দুটো
কেন বেঁধে রেখেছ অমন করে ?
কেন আমি পারি না
আমার ভাগ্যকে জয় করে নিতে ?
আমি নারী বলে ?

নারী হওয়া কি অপরাধ ?
নারী হওয়া কি পাপ ?
এভাবে কেন নারীকে বঞ্চিত করলে ?
তাহলে তুমি জন্ম নিলে কেন
এক নারীর জঠর থেকে ?

তোমাকে দেখে আমার এখন
বড় করুণা হচ্ছে ।
পুরুষ সিংহ তুমি ।
অথচ, আমার একটাও 'কেন'-র
জবাব দিতে পারলে না ।
এতটাই অসহায়
এতটাই অজ্ঞ তুমি !
আদমের পৌরুষের অহঙ্কারে তুমি মত্ত ।
অথচ, সেই পৌরুষের রূপকার—
ঈভের নারীত্ব কে
মর্যদা দাওনি কখনো ।
'কেন'-র প্রশ্ন তুলে
তোমাকে লজ্জা দেব না আর
কারণ আমি জানি
তুমি এমনি করে
থাকবে নিরন্তর চিরকাল ।

✻ ✻ ✻

অনেকদিন হয়ে গেল আহীরের কোন চিঠি আসছে না । প্রায় দেড় মাসের উপর হয়ে গেল । এতদিনে একটা অন্তত আসা উচিত ছিল । অনেক কথা মনে আসছে । আমি কি অশালীন কিছু লিখে ফেলেছি ! বা অপমান জনক কিছু, যাতে আহীর রাগ করতে পারে ! মনে করার চেষ্টা করছি চিঠিটা । এলোমেলো ভাবে হলেও লাইনগুলো মনে পড়ছে । কই ! সে রকম তো কিছু লিখিনি । এটা মানুষের মনের ধর্ম সর্বদা সু-এর আগে কু-টাই মাথায় আসে । হঠাৎ মনে হল চিঠিটাই হয়ত গিয়ে পৌঁছোয়নি । তা কি করে হয় এতদিন হয়ে গেল ! ইস্, কত কষ্ট করে কত বড় চিঠিটা লিখলাম যদি না পৌঁছোয় ! অথবা ও চিঠি দিয়েছে আমার কাছে আসছে না ! পোস্ট অফিসের উপর রাগ হচ্ছে ! সেবারে কত ধৈর্য্য ধরে ফ্রান্সেস-এর জন্য একটা গ্রিটিংস কার্ড তৈরী করেছিলাম । সোয়েট পেপারের উপর সূচ দিয়ে

এঁকে ব্যানাকাঠি চিরে চিরে আঠা দিয়ে তার উপর নক্সা করে বসিয়েছিলাম। হাতে সময় নিয়ে পাঠালাম যাতে পঁচিশে ডিসেম্বরের আগে গিয়ে পৌঁছোয়। তারপর যে কতগুলো বড়দিন চলে গেল তার ঠিক নেই। সে গ্রীটিংস ফ্রান্সেস আজও পায়নি, আর এ জন্মে পারেও না। খুব গালাগালি দিতে ইচ্ছে করছে। পোস্ট অফিস যদি কোন মানুষ হত তো এক্ষুণি ছুটে গিয়ে তার সাথে ঝগড়া করে আসতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। আমার আর ধৈর্য্য ধরছে না। এতদিন আহীরকে দেখার ইচ্ছে একটুও কমেনি বরং বেড়েছে বললে ভুল হবে না। সারাদিনের কাজের ফাঁকে ফিরে ফিরে মনে পড়ে ওর কথা, চিঠি দুটো প্রায়ই খুলে পড়ি। নতুন করে কিছু খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। আমি এখন লেখা নিয়ে একটু ব্যস্ত। সবে মাত্র দুটো নাটক শেষ করলাম। দুরদর্শনে মাইম এর উপর একটা কমেডি সিরিয়াল তৈরী হবার কথা হয়েছে। তারই গল্প এবং স্ক্রীপ্ট লেখার অফারটা আমি পেয়েছি। কাজ শুরু করে দিয়েছি। বেশ খানিকটা এগিয়েছে। লিট্ল ম্যাগাজিনে গল্প দেবার প্রস্তাবও পেয়েছি। এই সব নিয়ে মোটামুটি ব্যস্ত আছি। তবুও আহীরের চিন্তা মাথা থেকে একটুও সরেনি। সারাদিন টিউশনি, কম্পিউটার, অ্যাকটিং, নিয়ে তবু কেটে যায় কিন্তু রাতের অন্ধকারে বিছানায় পিঠ ঠেকালেই সেই অচেনা ভাবনাগুলো কিল্‌বিল্‌ করে ওঠে।

সেদিন ও রকম একটা ভাবনা কিল্‌বিল্‌ করতে করতে হঠাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে আটকে গেল—আমি আগ্রা যাব। যাওয়াটা কোন সমস্যা নয়। ও এমন একটা জায়গায় চাকরি করে খুঁজে বের করতেও নো প্রবলেম। কিন্তু বাপিকে ম্যানেজ করাটাই একটা বিগ প্রবলেম। আমাকে একা ছাড়বেন না। কি আশ্চর্য! আমি একা পারব অথচ আমাকে যেতে দেবেন না; কিন্তু ছেলে হলে ঠিক যেতে দিতেন। বড়জোর বলতেন সাবধানে যাস্। জীবনে আজ দ্বিতীয় বার আফসোস্ হচ্ছে আমি মেয়ে বলে। প্রথম বার আফসোস্ হয়েছিল বছর খানেক আগে—যেদিন সঞ্জয় এসে বলল, 'আমি আর বাঁচব না কুহেলি; আমি আত্মহত্যা করব…'। সঞ্জয় আমার কলেজের বন্ধু। আমরা একসঙ্গে গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করেছি। আমাদেরই ক্লাসের একটা মেয়েকে সঞ্জয় ভালোবাসত। শুধু ভালোবাসত বললে ভুল হবে, উন্মাদের মত ভালোবাসত। যাকে বলে অন্ধ ভালোবাসা। তার গুণটাও গুণ দোষটাও গুণ। কিন্তু শেষে দেখা গেল একেবারে বেগুন। একদিন মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল ওর। ছেলেরা যে ওভাবে কাঁদে সেদিন ওকে দেখে বুঝলাম। কিছুতেই শান্ত করতে পারছিলাম না। ও ঝগড়া করে সন্ধ্যেবেলা সোজা আমার কাছে চলে এসেছে। কাঁদছে আর বার বার বলছে আমি আত্মহত্যা করব। কি বিপদ! ওকে একলা ছাড়তেও ভরসা হচ্ছে না আমার। কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। যতই বোঝাই সেই এক কথা। রাতও বাড়ছে, অনেক কষ্টে শান্ত করলাম। বললাম চল তোকে বাড়ি দিয়ে আসি। ও কিছুতেই

আমাকে যেতে দিল না। বলল আমি একাই যেতে পারব। রাত নটা নাগাদ ও যখন বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, সে এক অসম্ভব শূন্যতা গ্রাস করল আমায়। কেবলই মনে হচ্ছে, ইস্ কেন ওকে যেতে দিলাম! আমি যদি ছেলে হতাম্ তাহলে কিছুতেই ওকে যেতে দিতাম না। আজ রাতটা আমার কাছে রেখে দিতাম। ও যে মেণ্টালি ডিস্ব্যালেন্সস্ট্, যদি কিছু করে বসে! সঞ্জয়ের যদি কিছু হয় আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করব না। ও ওর কষ্টের কথা আমাকে বলতে এসেছিল আর আমি কিছু করতে পারলাম না ওর জন্য! ঐ অবস্থায় কেউ শত্রুকেও একা ছাড়ে না আর আমি বন্ধুকে ছেড়ে দিলাম। হে ঈশ্বর, তুমি ওকে রক্ষা কর। সেদিন রাত্রে আমিও ঘুমাতে পারলাম না। মনে হচ্ছে, সঞ্জয় বাড়ি যায়নি অন্য কোথাও চলে গেছে, বা অন্য কিছু ঘটেছে। একটা অশুভ চিন্তা আমাকে তাড়া করে বেড়াল সারাক্ষণ। আমি মেয়ে বলে আমার বন্ধুত্বে কোনদিন কোন ঘাটতি হয়নি। ছেলে আর মেয়ে বন্ধুদের মধ্যে কখনো কোন পারসিয়ালিটি করিনি। সকলের সাথে সমান ভাবে মেশার ক্ষমতা রাখি, অথচ আজ একি হয়ে গেল, আমার 'বন্ধু' পরিচয়টা হারিয়ে গিয়ে প্রকট হয়ে উঠল আমি একটা 'মেয়ে'। আমি ছট্ফট্ করছি দেখে মা জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে সমি! ঘুমাচ্ছিস না কেন?'

মাকে বললাম সব কথা।

'কি আশ্চর্য! আমাকে আগে বলিস নি কেন?'

মা ওদের প্রেমের ব্যাপারটা জানতেন। শুধু ও কেন, আমার কোন বন্ধুর প্রেম কাহানী মার কাছে গোপন নয়। আমাদের বাড়ি এসে বন্ধুরা কখনো ফিরে যায় না। আমি না থাকলে মার সাথে গল্প করত। মা শুধু আমার বন্ধুই ছিলেন না আমার বন্ধুদেরও বন্ধু। সঞ্জয়ের অনেক প্রেম প্রবলেম মা সলভ্ করে দিয়েছেন। আমার বাড়ির দরজা বন্ধুদের জন্য সব সময় খোলা থাকে। এমনকি যারা আমার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিল তারাও বাড়িতে আসত। মা সব জানতেন, অথচ কোনদিন ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন নি। অপমান করা তো দূর তারা বুঝতেই পারত না, মা তাদের গোপন মন বাসনা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। মা অন্তর্যামীর মত ব্যবহার করতেন ওদের সাথে। সবই জানেন কিন্তু কিছুই জানেন না। কখনো এমনো হয়েছে আমি ভ্রূ কুঁচকেছি অথচ মার মুখে হাসির অভাব ঘটেনি। মা ভীষণ বন্ধু বৎসল, বন্ধুরা বলে এই গুণটা নাকি মার কাছ থেকে পেয়েছি। কিন্তু আজ একি বন্ধু বৎসলতার পরিচয় দিলাম! খুব রাগ হচ্ছে নিজের উপর, কেন আমি ছেলে হলাম না! মা আমাকে বোঝাচ্ছেন, 'চিন্তা করিস না—কিচ্ছু হবে না ওর! আমি সঞ্জয়কে চিনি—আত্মহত্যা করার সাহস ওর নেই। তাছাড়া ও কেঁদে হালকা হয়ে গেছে। মনের বোঝা কমে গেলে আত্মহত্যার চিন্তা মাথা থেকে মুছে যায়। সঞ্জয়ের কিচ্ছু হয়নি। ও ভালো

আছে। বড় জোর এখন বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে; কষ্ট পাচ্ছে। এর বেশী কিছু হয়নি। তুই ঘুমো। কিছু হয়নি ওর।'

সত্যিই, ভগবানের অসীম করুণা। পরদিন সকালে একজন বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেল, 'সঞ্জয় ভালো আছে। ও কাল রাতে বাড়িই ফিরেছিল।'

সঞ্জয় ই ওকে পাঠিয়েছে। ও জানে কুহেলি চিন্তা করবে। তাই সাত সকালেই কুশল সংবাদ পাঠিয়েছে। আমি মুক্তি পেলাম মেয়ে হওয়ার যন্ত্রণা থেকে। এর আগে স্বাধীনতা থেকে এত বঞ্চিত হয়েছি অথচ কখনো নিজেকে এতটা অসহায় মনে হয়নি। সেদিন নিজের অক্ষমতাকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। যেন চোরা বালিতে পা পড়ে গেছে। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমার শরীরটা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। বালুকা সমাধি ঘটছে আমার।

যাগ্‌গে, অনেক ভেবে চিন্তে একটা প্ল্যান মাথায় এল। সপ্তাখানেকের জন্য মামার বাড়ি যাওয়ার নাম করে আগ্রা থেকে ঘুরে আসলে কেমন হয়! মনটা আনন্দ নেচে উঠল; যেন এক্ষুণি গেলাম বলে! কিন্তু পরক্ষণেই উর্বর মস্তিষ্কে বুদ্ধির চারাগাছ ডালপালা মেলে গজিয়ে উঠল। আমি তো মামার বাড়ি যাচ্ছি বলে আগ্রায় চলে গেলাম—আর তখন মামার বাড়ি থেকে যদি কেউ আসে! অথবা, মামা প্রায়ই বাপিকে ফোন করেন—বাপি জানতে চাইবেন—

'সমি ওখানে ঠিক মত পৌঁচেছে তো?

'সমি! সমি কোথায়! ও এখানে আসেনি তো।'

সর্বনাশ! বাপি রিসিভারটা যথাস্থানে রাখতে পারবেন কিনা সন্দেহ। সোজা পুলিশ স্টেশান; মিসিং রিপোর্ট লিখিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবেন। সমি হারিয়ে গেছে—মামাও ছুটে আসবেন হারানো ভাগনিকে খুঁজতে। মা, ঠাকুমা চিৎকার করে কাঁদবেন। ওনারা কল্পনাও করতে পারবেন না আমি আগ্রায় গেছি। আমি যে কোন ছেলের সাথে পালাতে পারি সে ভাবনাও ওনাদের মাথায় আসবে না। কারণ সবাই জানেন আমি এমন নির্দয় অমানবিক নই যে নিজের সুখের জন্য স্বার্থপরের মত বাবা মাকে একা ফেলে চলে যেতে পারি। আর একটা ভাই বোন থাকলে না হয় ভেবে দেখা যেত। কিন্তু তা যখন নেই, বাবা মার প্রতি সমস্ত কর্তব্য আমার একার। আমি কিছুতেই সে কর্তব্য অস্বীকার করতে পারি না। আমার এ উচ্চ চিন্তা ভাবনা, এই বড় মনের খবর আমার বাড়ির লোকের কাছে অজানা নয়। তবে আজকাল যে অতল জলের স্বাদ গ্রহণের জন্য পানকৌড়ির মত প্রেমের সাগরে ডুব দিয়েছি শুধু সে খবরটুকু অজানা রয়ে গেছে। এই বয়সের মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে পালালে লোকে যা ধারণা করে মামা তাই করলেন।

নিচু স্বরে মাকে বললেন, 'হ্যাঁ রে, অন্য কোন ব্যাপার নয় তো?' মা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে আছেন। বাপি কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে জিগ্যেস করলেন—'অন্য ব্যাপার মানে?'

'মানে—এই' ভরসা পাচ্ছেন না বলতে। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া তো, জায়গা মত না লাগলে মান হানির মামলাও হয়ে যেতে পারে। রেকর্ডে পিন আটকে যাওয়ার মত এক কথাই আওড়াচ্ছেন—'মানে এই—না মানে এই,—

'মানে কি বলুন না।' বাপি অভয় দিচ্ছেন, যেন ভুল বললে নাম্বার কেটে নেওয়া হবে না।

দৌড় প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা যেমন অন ইওর মার্ক স্টেট বলা পর্যন্ত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দুলে দুলে ছোটার জন্য প্রস্তুতি নেয়, তারপর গো বললেই পোঁ—ও—ও করে বুলেটের মত দৌড় মারে। মামার মুখের কথাটাও ঠিক ঠোঁট পর্যন্ত এসে অন ইওর মার্ক স্টেট হয়ে আটকে ছিল। বাপির সিগ্‌ন্যাল পেতেই ফস্‌ করে বেরিয়ে এল—

'মানে, এই কোন ছেলে টেলের সঙ্গে—'

'ইমপসিবল্‌।' বাকিটা শোনার ধৈর্য্য বাপির নেই। 'আমার মেয়েকে আমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিনি। সমি কখনো এ কাজ করতে পারে না। আমি ওকে সে ভাবে মানুষ করিনি…' মামা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। বাপি সে চান্সই দিলেন না—'তাছাড়া কারুর সাথে ওর যদি কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ও মাথা উঁচু করে সে কথা বাড়িতে বলবে, আমি জানি সে সাহস ওর আছে। ও ভীষণ স্পষ্ট বাদী। লুকিয়ে চুরিয়ে বিয়ে করার মেয়ে ও নয়…'

অ্যাক্সিলেটারে চাপ মেরে মামা ওভার টেক্‌ করবেন বলে পোজ নিচ্ছেন। বাপি আবার ট্যাকল করে বেরিয়ে গেলেন, 'যে মেয়ে না বলে বাড়ির বাইরে পা রাখেনি; কলেজ পালিয়ে কোথাও বেড়াতে যায়নি, সে কি না বাবা মাকে না জানিয়ে পালিয়ে বিয়ে করবে! নাহ্‌, সমি এতটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে না। ইমপসিবল্‌!'

মামা যেন স্টেনগানের ট্রিগারে চাপ মেরেছেন। বাপির মুখ দিয়ে খালি কথার গুলি ছুটছে। এত বড় একটা বদনাম হজম করতে না পেরে বাপি প্রগলভ হয়ে উঠেছেন। একটু মওকা পেয়েই মামা সাফাই গাইতে শুরু করলেন—'না না আমি কনফার্মলি কথাটা বলিনি। আসলে—'

'আসলে নকলে কিচ্ছু না…' আবার ট্রিগারে চাপ পড়েছে। মামা এরকম একটা অশালীন মন্তব্য করে মহা ফ্যাঁসাদে পড়েছেন। নিজের মতের সপক্ষে আর্গুমেন্ট পেশ করার চান্সই পাচ্ছেন না। এ তো মহা বিপদ হল! হয়ত ভাবছেন, কেন যে পরের ধনে পোদ্দারি করতে গেলুম কে জানে! বাপিরও রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক। দাঁত আর জিভের অবস্থানের মত আমার আর বাপির অবস্থান। একই ছাতের তলায় থাকি, দিনে আশি বার ধাক্কা খাই। এত কাছে থেকে বাপি একটু ধোঁয়া দেখতে পেলেন না, অথচ শালা (এটা সম্বন্ধ, গালাগালি নয়।) এসে মশাল দেখাচ্ছে! তেতে তো যাবেনই। এ দিকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত যাত্রাপালায় দুঃখের সিনে যেমন হাঁই হাঁই করে গান গাইতে গাইতে বিবেক

ঢুকে পড়ে ঠিক তেমনি করে বিবেকের গানের মত ঠাকুমা কেঁদে উঠলেন, 'ওসব কিছু না ; তোরা হাসপাতাল গুলোতে খবর নে। যদি…'

আর বলতে পারলেন না। কথা আর কান্না একসাথে মিলেমিশে সে যেন কি রকম একটা আওয়াজ বের হচ্ছে…সে এক বিজাতীয় সাউন্ড। অনেকটা ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাওয়া রেডিওর মত।

সত্যিই তো! নাহ্, বিবেক শুধু যাত্রাতেই পথ দেখায় না, বাস্তবেও দেখায়। এতক্ষণ এ ব্যাপারটা কারুর মাথায় আসেনি। আসবে কি করে! মা বাপির মাথায় তো তালগোল পাকাচ্ছে কিডন্যাপং কেস্। টিভিতে হিন্দী সিনেমা দেখে দেখে একটা পেটেন্ট আইডিয়া হয়ে গেছে। ভিলেনদের শেষ অস্ত্র। নায়ককে কাবু করতে না পারলে—লে আও শালে কি ঘরওয়ালে কো উঠাকে। শালে আপনে আপ আ জায়েগা। প্রত্যেকটা বই এর শেষে দেখো, নায়কের গোটা গুষ্টি মোটা মোটা থামের সঙ্গে কাতা দড়ি দিয়ে বাঁধা ; আর নায়ক একাই তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন। একেবারে দম বন্ধ করে একসাথে কংস বধ, জরাসন্ধ বধ, রাবণ বধ, কুম্ভকর্ণ বধ, মেঘনাথ বধ করে চলেছেন। শুধু রামায়ণ বা মহাভারতের নায়ক নয় ; এরা মহায়নের নায়ক, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের অবতাররা দু একটা ভিলেন মারতে হিমসিম্ খেয়ে যেতেন অথচ কলিযুগের অবতাররা একসঙ্গে গোটা ভিলেন কুল সাবাড় করে দেবার মত ক্ষমতা রাখে। মহাভারতের যুদ্ধে সপ্তরথী মিলে অভিমন্যু কে মেরেছিল আর সিনে যুদ্ধে আজকের অভিমন্যুরা একাই সপ্তরথীকে স্বর্গের দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসছে। হবে না কেন, এরা যে চক্রব্যুহে শুধু ঢোকা নয়, ঢুকে বেরিয়ে আবার ঢোকার রাস্তাটাও চেনে। সে যুগে কৃষ্ণ যে ভুল করেছিলেন এ যুগের রাইটার ডিরেক্টররা সে ভুল করেন না। তাঁরা শিখিয়ে পড়িয়ে তবেই যুদ্ধে পাঠান। যাগ্‌গে, আমিও ধান ভানতে শিবের গাজন গাইতে বসেছি।

বাপি ছুটলেন হসপিটালে। মামাকেও সঙ্গে নিলেন। একবার ভুল করে ফেলেছেন বলে কি বার বার করবেন! সারা সপ্তাহ ধরে থানা-পুলিশ, হস্পিটাল-মর্গ করে গোটা পরিবারটাই থ্রী কোয়াটার ডেড। শুধু কোনরকমে শ্বাসটুকু চলেছে। আর যথাসময়ে আমি যখন মিস্টার আহীরের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরলাম ; চারিদিক থম্‌থমে, বাড়ির দৃশ্য দেখে চোখ চড়কগাছে উঠে গেছে। সাজানো সংসারটা একেবারে শুঁড়িখানায় পরিণত হয়েছে। কোন জিনিস জায়গা মত নেই ; চারিদিকে ঘটি বাটি উল্টে পড়ে আছে। মানুষগুলোই উল্টে গেছে আর ঘটি বাটি! অদ্ভুত দৃষ্টিতে সবাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে একাবার শেষ দেখার জন্য ওনারা বেঁচে আছেন। শুনেছি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বহু বুভুক্ষু মানুষ এত পেট ভরে খেয়েছিল যে ডাইজেস্ট করতে না পেরে মারা গেছিল। আমার বাড়ির লোকের অবস্থাও তাই, এত দিনের মন্বন্তরের পর আমাকে যেন ডাইজেস্ট করতে পারছেন না। এক্ষুণি হার্টফেল

করবেন। আর করবেন নাই বা কেন! খরচের খাতায় চলে যাওয়া সন্তান সশরীরে অক্ষত অবস্থায় সামনে উপস্থিত। যে কেউ আনন্দে হার্ট ফেল করতে পারেন।

বাপ্ রে বাপ্! চুরি করে আগ্রায় যাওয়ার কথা ভাবতেই এই দক্ষযজ্ঞ। চুরি করে যাওয়া আর আমার সাহসে কুলোচ্ছে না। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না। একটা চিঠি এলে ল্যাটা চুকে যায়, তাও আসছে না। আমার যেন ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, না পারছি স্কুলে গিয়ে রেজাল্ট জানতে, না পারছি ঘরে স্থির থাকতে। টেনশানের গুঁতোয় পেন্ডুলামের মত দালানের এ মাথা ও মাথা করছি। বাপিকেও যে বলব আগ্রায় বেড়াতে নিয়ে চল সে উপায় নেই। কলকাতার বাসিন্দা হয়ে কলকাতাই দেখলাম না আবার আগ্রা! সেই কোন ছোটবেলায় চিড়িয়াখানা, বেলুড়মঠ, দক্ষিনেশ্বর আর মানত করা পুজো দিতে একবার কালিঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাস্, কোটা কম্প্লিট। সেই থেকে খালি থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়ের মত মামারবাড়ি, দেশ, নিজের ঘর আর নিজের ঘর, দেশ, মামারবাড়ি করে বেড়াচ্ছি। তারে বাঁধা খেলনা স্প্রীং বাঁদরের মত অবস্থা আমার। ঐ তারটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। ছেলে মেয়েরা কলেজে পড়ার সময় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে চুরি করে কত জায়গায় হাওয়া খেতে যায়। গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া বি-গার্ডেন চষে ফেলে। সপ্তাহে একটা করে সিনেমা থিয়েটার তো রয়েইছে। আর আমি সারা জীবন প্রভুভক্ত কুকুরের মত লেজ নেড়ে নেড়ে বাপির পিছন পিছন ঘুরে মরলাম। কবে বাপি নিয়ে যাবে তবে যাব। বাপিরও সময় হয়নি আমারও ভাগ্যে সিকে ছেঁড়েনি। সুতরাং বাপির সঙ্গে আগ্রায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার চেয়েও দুঃসাহসিক কাজ। আমি সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। এক নাক জলে দাঁড়িয়ে আঁকুপাঁকু করছি, হাত ধরে তোলার কেউ নেই। কি বিপদেই ফেললে বন্ধু! আমার সলিল সমাধি ঘটতে চলেছে। উদ্ধার কর এসে। আসতে না পার একটা চিঠি দাও।

সঙ্গীর অভাবে আমার আগ্রা যাবার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হতে বসেছে। অন্য কোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে যাব সে রাইটও নেই। পুজোর সময় বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যেতে দেন না, আবার আগ্রায় যেতে দেবেন, তাহলেই হয়েছে। আরে! হঠাৎ সর্ট সার্কিটের মত মগজে একটা স্পার্কিং হল। বিদ্যুতের ফুলকির মত চিড়িক্ করে মনে পড়ল রমাদির কথা। আমার মুসকিল আসান। আমার ত্রাণকর্ত্তা সরি কর্ত্রী। ইয়েস, রমাদিকে একবার বলে দেখলে হয়। ওর ভীষণ বেড়ানোর ঝোঁক। একা একাই হিল্লী দিল্লী বম্বে গোয়া করে বেড়ায়। রমাদির সাথে গেলে বাপি আপত্তি করবেন না। যতই হোক ম্যারেড ওম্যান। একটা বড় সড় ছেলের মা। ট্রাভেল অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। অনেক ঘাটের জল মাথা হয়ে গেছে। যদিও রমাদিকে বাপি চেনেন না। সে চিনিয়ে দিতে কতক্ষণ! একদিন

বাড়িতে আনলেই হবে। কিন্তু আনি কি করে, গত দুসপ্তা ধরে রমাদি ক্লাসে আসছে না। সেই যে মাইম পরীক্ষা দিয়ে ডুব মারল আর টিকিটা দেখা যাচ্ছে না। সামনের সপ্তাহে নিশ্চই আসবে। HMV-তে যাওয়ার কথা আছে। এটা আশাকরি মিস্ করবে না। যাক্ বাবা, যাওয়ার প্রবলেম মোটামুটি মিটল। এতক্ষণ ঘাম ঝরিয়ে মাটি কোপানো তাহলে ব্যর্থ হয়নি। এবার পরবর্তী ভাবনা। আগ্রা স্টেশানে নেমে ট্যাক্সি ওয়ালাকে বলব, ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স। এয়ার ফোর্সের দরোয়ানকে বলব, মিস্টার আহীর কুমার বাসু। ব্যাস্, আহীর আমার হাতের মুঠোয়। কি রকম তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। যাওয়ার আগে এ রকম লম্বা চওড়া ট্রেলার আর গিয়ে টেলি ফিল্মের মত ফুস্ করে শেষ হয়ে গেল! আর একটু বড় রিলের বই হলে বেশ তেঁতুলের আচার খাওয়ার মত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যেত। আমি তো রিল বাড়ানোর ওস্তাদ। দেখি ট্রাই করে—গিয়েই সরাসরি নিজের পরিচয় দেওয়াটা ঠিক হবে না। একটু সাসপেন্স রাখা ভালো। তবেই দর্শক ভক্তি ভরে নেবে। কিন্তু আহীরকে চিনব কি করে! আর সরাসরি গিয়ে আলাপ করলে যদি উল্টো পাল্টা কিছু ভাবে। ভাবুক গে, পরে ভুল ভাঙার একটা দৃশ্য রাখলেই হবে।

বাপিকে কোন রকমে ম্যানেজ করে রমাদির হাত ধরে লটবহর সমেত হাওড়ার স্টেশানের সন্ধ্যে সাতটা পনেরোর কালকা মেলে কিংবা সকাল সাড়ে নটার উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। বাপির আবার অনেক ফ্যাগড়া, দুটো মেয়ে যাবি সারারাত ট্রেনে থাকার চেয়ে দিনের বেলা যাওয়াই ভালো। দিনের বিপদ রাতে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আগ্রায় নেমে এয়ার ফোর্সের কাছাকাছি কোন হোটেলে উঠলাম। তারপর একটু রেস্ট নিয়েই মিশন্ শুরু। চুড়িদারের উপর একটা কালো বোর্খা চাপিয়ে রহস্য উপন্যাসের খতরনাখ্ নায়িকার মত বের হতে যাচ্ছি ;

রমাদি বলল, 'কি রে আমি যাব ?'

'নো থ্যাংকস্! তুমি আমাকে আগ্রায় নিয়ে এসেছ এই যথেষ্ট। যতক্ষণ না বিপাকে পড়ছি ততক্ষণ তোমার ছুটি।'

'অচেনা রাস্তা সাবধানে হাঁটা চলা করবি। তোর বাবা বিশ্বাস করে ছেড়েছেন ; আমার তো একটা রেস্পনসিবিলিটি আছে।'

'ও কে ; সাবধানে যাব, কিচ্ছু ভেবো না। তুমি এনজয় কর।'

বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। অটোতে চেপে সোজা এয়ার ফোর্স। ভাড়া মিটিয়ে অটো বিদায় করে, মুখের সামনে বোর্খার ঝাঁপটা ফেলে দিয়ে এসে দাঁড়ালাম মেইন গেটে। চোখের সামনে জাল জাল অংশটা দিয়ে দূরে দেখতে পাচ্ছি এয়ার ফোর্সের সাইন বোর্ড। মনে হচ্ছে ঘরের জানালা দিয়ে পৃথিবীটা দেখছি। এয়ার ফোর্স কি প্রোটেক্টেড এরিয়া! সেটাই তো স্বাভাবিক। জন সাধারনের প্রবেশ নিষেধ। আমি উর্দিপরা সশস্ত্র গার্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'সেলাম আলেকুম ভাই সাহব। ম্যাঁয় এক আদমী সে মিলনা চাহতি হুঁ। ইয়েহি কাম করতে হ্যায়। জরা মদত করেঙ্গে প্লীজ !'

মুসলিম রমণী খুব বিপদে না পড়লে পরাই মর্দের কাছে এভাবে করুণ সুরে সাহায্য চায় না, গার্ডের মায়া হল। তাছাড়া মেয়েদের সাহায্য করতে অনেকেই ভালোবাসে।

সমীহ করে বলল, 'আপ অন্দর যাইয়ে। উও দেখিয়ে এক গার্ড ব্যয়ঠা হ্যায়, উসে যাকর বাতাইয়ে উও আপকো মদত করেগা।'

'সুক্রিয়া,' হাত তুলে ঘাড়টা সামান্য ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ফাস্ট সিকিউরিটি টপকে ভিতরে গেলাম। হিন্দী সিনেমার দৌলতে এই সব আদপ কায়দা আমার ভালোই রপ্ত করা আছে। বি. এসসি. পরীক্ষার পর হিন্দী শেখার জন্য নাইট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। পড়েও ছিলাম এক বছর। সে শিক্ষা আজ কাজে লেগে গেল।

ভিতরের গার্ডকে সেই একই কথা বললাম। সব শুনে গার্ড জিগ্যেস করল, 'কহিয়ে, নাম ক্যেয়া হ্যায় উনকা ? কনসা ডিপার্টমেণ্ট মে কাম করতে হ্যায় ?'

'নাম, মিস্টার আহীর বাসু। উও জো র‍্যাডার ডিপার্টমেণ্ট হ্যায় না! উওহি কাম করতে হ্যায়।'

'ঠিক হ্যায়, আপ ইয়েহি ইন্তেজার কি জীয়ে, ম্যায় দেখতা হুঁ।'

গার্ড চলে গেল। এতক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, আহীর এখানে আছে তো। যদি বাড়ি গিয়ে থাকে! সর্বনাশ! আমার সব পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে। কি হবে তাহলে! ভাবছি আর দেখতে পাচ্ছি সেই গার্ডের সঙ্গে এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, ভদ্রলোক না বলে ভদ্রছেলে বলাই ভালো। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে গার্ড কি যেন বলছে। তাহলে এই কি আহীর!

'স্যার, ইয়েহি ম্যাডাম, আপকো ঢুণ্ড রহে হ্যায়।'

'নমস্তে, কহিয়ে।' আহীর হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করল। আমি অনুরূপ ভাবে প্রতি নমস্কার জানালাম। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না। আমি আহীরকে দেখছি, মশগুল হয়ে দেখছি।

'কহিয়ে, ক্যেয়া বাত হ্যায় ?'

কি সুন্দর পুরুষালী গলা, কত সমীহ করে জিজ্ঞাসা করছে।

'হ্যালো ম্যাডাম! ক্যেয়া সোচ রহে হ্যায় ?'

'জী! আপ ?'

'হ্যাঁ, ম্যায়হি হুঁ আহীর বাসু। আপ মুঝে হি তো ঢুণ্ড রহে থে না ?'

'জী। মাঁয় সায়রা বেগম। ম্যাঁয় ইঁহা আপনে পতিকো ঢুণ্ডনে আয়ী হুঁ।

আহীর তো অবাক। 'আপকা পতি! কন হ্যায় আপকা পতি ?'

এই রে, ভুল হয়ে গেছে। মুসলিম মেয়েরা স্বামীকে পতি বলে না, মিঞা বলে। মনে মনে বললাম, আহা, বলব কেন! জোরে বললাম, 'মেরা মিঞা আপকে পাস কাম করতে হ্যায়।'

'মেরে পাস কাম করতে হ্যায়! ক্যেয়া নাম হ্যায় উন্‌কা?'

'আহীর।'

'ক্যেয়া!!!'

'জী, জী নেহী—জামাল শেখ।'

আগে থেকে ভেবে চিন্তে তৈরী হয়ে এসেছি অথচ মুখ ফসকে আসল নামটা বেরিয়ে গেল। বেবকুফ কঁহিকা! ডায়লগ ভুলে যাওয়ার স্বভাবটা এখনো গেল না। ইডিয়েট! নিজেকেই নিজে গালাগালি দিচ্ছি। আকাশ থেকে পড়ার মত করে আহীর বলছে, 'দেখিয়ে মেরে সমঝমে তো কুছ্‌ নেহী আ রাহা। আপ ক্যেয়া বোল রহে হ্যায়। ম্যাঁয় কিসি জামাল শেখ কো নেহী জানতা। আপকো মেরা নাম কিস্‌নে বাতায়া? আপ জারা খুলকে বাতায়েঙ্গে প্লীজ!'

প্রথম দর্শনের নার্ভাস কাটিয়ে উঠে বললাম, 'জী, ম্যাঁয় আপনে মিঞা সে আপকা নাম শুনা। এক দিন ইয়েহি সে হম গুজর রহে থে, অর উও ইসি বিল্ডিং কো দিখাকে কহা থা কি আপ ইয়েহি কাম করতে হ্যায়। পিছলে দো দিন সে উও ঘর নেহী আয়ে ইসলিয়ে আপকে পাস আয়ি থি। সায়েদ আপকো মালুম হো....'

'দেখিয়ে আপকো কুছ গলতফ্যামি হুয়ি হ্যায়! সাচমুছ ম্যাঁয় কিসি জামাল শেখ কো নেহী জানতা। অর উও মেরে পাস ক্যায়সে কাম করেগা! ম্যায় খুদ ইঁহা নকরী করতা হুঁ। মেরে পাস কোই কাম নেহী করতা।'

মনটা একটু খারাপ করে বললাম, 'জী, তক্‌লিফ দেনেকে লিয়ে মাফি চাহতি হুঁ, সুক্রিয়া।'

পিছন ঘুরতেই—'শুনিয়ে—আপ র‍্যাহতে কাঁহা হ্যায়?'

এই মেরেছে! তা তো জানি না। আগ্রার রাস্তা ঘাট জায়গা জমি কিছুই তো চিনি না। কলকাতা হলে না হয় দুমদাম করে দুচারটে রাস্তার নাম বলে দেওয়া যেত। আর ভাবিও নি এ রকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তা হলে না হয় তৈরী হয়ে আসা যেত। 'দেখিয়ে, মুঝে লাগতা হ্যায় কি আপ বহৎ মুসিবত্‌ মে হ্যায়, ম্যাঁয় আপকি কোয়ি মদত কর সাকতা হুঁ?'

'জী! জী নেহী সাহব। সুক্রিয়া, বহত্‌ বহত্‌ সুক্রিয়া।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ভাণ্ডা ফুট্‌ জানেসে প্যাহেলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। য পলায়তি স জীবতি। বড় গেটের কাছে এসে মনে হল সেই গার্ড ভদ্রলোক আমাকে দেখছেন, সত্যিই তাই, আমি কাছে গিয়ে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম। গার্ড খুশী; ভাবছেন, বাহঃ! মেয়েটা বেশ ভালো তো, কাজের সময় কাজি কাজ ফুরোলেও কাজি। এ, কাজের লোকদের কখনো পাজি ভাবে না।

সত্যিই তাই, আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি। আমার মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধটা বড্ড প্রকট। কারুর সাহায্যের কথা আমি ভুলতে পারি না। সে যেমন সাহায্যই হোক। মনে পড়ছে সেই বৃদ্ধের কথা। নিউজ পেপারে অ্যাড দেখে ঠিকানা খুঁজে অ্যাকটিং ইন্সটিটিউট-এ গেছিলাম। বাস থেকে নেমে এক ওষুধ দোকানের ভদ্র-লোককে জানতে চেয়েছিলাম এই ঠিকানাটা কোথায় পাব। উনি কি শান্ত ভাবে হেসে বললেন, 'তুমি তো অনেক আগে নেমে পড়েছ দিদি!' তারপর ছবির মত সুন্দর করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন রাস্তাটা। আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে। প্রথম প্রথম ভাবতাম আমি যেদিন অভিনয়ের ফাস্ট ব্রেক পাব সেদিন ওনাকে মিষ্টি খাইয়ে আসব। আর যদি কোনদিন সিনেমায় চান্স পাই তো দুটো টিকিট ফ্রী। যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে দেখে আসুন। এখনো প্রতিবার ক্লাসে যাওয়ার সময় বাস থেকে দেখি দোকানটা। কোনদিন ভুলিনি। কখনো দেখি দাদু কাস্টমারকে ওষুধ দিচ্ছেন। কখনো দেখি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আবার কখনো পিছন ফিরে সো কেসে ওষুধ রাখেন বা বের করেন।

'আমি তোমায় কখনো ভুলব না দাদু, কোনদিন না।'

মনে হচ্ছে পাখির জাত। এই এ ডালে আবার ফুড়ুৎ করে ও ডালে। এই আগ্রায় ছিল এই কলকাতায় উড়ে এল। স্থানান্তরে তো সময় লাগে না! বিজ্ঞান বলে, শব্দের চেয়ে দ্রুত গতি আলোর। তাই বজ্রাঘাতের সময় আগে বিদ্যুতের আলো চোখে আসে তারপর শব্দ শোনা যায়। আর মনস্তত্ত্ব বলে আলোর চেয়েও দ্রুত গতি মনের। যাগ্‌গে, মনটাকে আবার আগ্রাতেই ফিরেয়ে নিয়ে এলাম। একটা ছুটন্ত অটোকে হাত দেখিয়ে তাতে চড়ে বসলাম। চাকা দু চার পাক গড়াতেই মুখের ঝাঁপটা তুলে দিলাম। ঘেমে নেয়ে গেছি। পরা অভ্যাস না থাকলে যা হয় আর কি! মুসলিম মহিলাদের কথা ভাবছি, ধন্য বলিহারি বাপু, কি করে যে সর্বক্ষণ এরকম নাকে কাপড় চাপা দিয়ে থাকে কে জানে? আমার তো এইটুকু সময়েই হাঁপ ধরে গেছে। বুঝতে পারছি নরীবাদী মনটা বিদ্রোহ করে উঠল, ওদের পুরুষদের বেলায় যত স্বাধীনতা, আর মেয়েদের বরাতে লবডঙ্কা। সারাটা জীবন পর্দার আড়ালে ভেবসে গেল। এসবই পুরুষ শাসিত সমাজের মামদো-বাজি। নিজেকে বোঝোচ্ছি, কুল ডাউন, কুল ডাউন! রেগে গিয়ে আবার অটো-ওয়ালার মাথাতেই এক ঘা মেরে বোস না যেন! তুমি যে অচেনা মানুষটির খোঁজে কলকাতা থেকে এই সুদূর আগ্রাতে ছুটে এসেছ! এত নাটক করে তার সাথে দেখা করে এলে সেও কিন্তু একজন পুরুষ। নারীবাদী মনটা দাবড়ানি দিয়ে উঠল, তাতে কি হয়েছে! সব পুরুষ সমান নয়। আহীরের কণ্ঠস্বর কানে ভাসছে; এক অচেনা মহিলাকে সাহায্য করার জন্য তিনি প্রস্তুত। এতো বন্ধু বৎসল, সুমানবিক মনের লক্ষণ। আমি ঠিক যেমনটি কল্পনা করেছিলেন।

হোটেলে ফিরে রুমাদিকে এ টু জেড সবিস্তারে বিবৃত করলাম। পিঠ চাপড়ে

বলল, 'তোর সাহস আছে।' একটু উৎসাহিত ও করল, যেন দেশের হয়ে খেলতে এসেছি। তারপর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হলাম, এবং রমাদির হাত ধরে আগ্রা দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। পরদিন আবার অন্য ছদ্মবেশ, পরনে জিন্স-এর প্যাণ্ট, ফুলহাতা সার্ট, জামার হাত থ্রী কোয়ার্টার করে গোটানো তার উপর একটা সুন্দর জিন্সের জ্যাকেট। রমাদি বিউটিসিয়ান তাই আমাকে তৈরী করার দায়িত্বটা ওই নিয়েছে। মানে বুদ্ধি আমার মেক্আপ রমাদির। একদিন ওয়াচ করলেই বোঝা যায় লক্ষ্যবস্তুটির গতিবিধি। সি আই ডি অফিসারের মত দূরে থেকে ওয়াচ করতে লাগলাম কখন কালপ্রিট বের হয়। এক সময় বের হল, ছুটে গিয়ে আহীরের পিছু নিলাম। খানিকটা পিছন থেকেই চেঁচাতে শুরু করলাম, 'হ্যালো স্যার! স্যার—স্যার আপনি এখানে? বেড়াতে এসেছেন স্যার?'

দুম করে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি কিছুটা অপরাধীর মত মুখ করে বললাম, 'ও, সরি স্যার, সরি—প্লীজ এক্সকিউজ মী—আই থট ইউ আর মাই স্যার। বাট আয় অ্যাম রং। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড, অ্যাম সরি। এক্সট্রিমলি সরি স্যার।'

'ও. কে. ও. কে.! ইটস্ অল রাইট। এত ক্ষমা চাইবার কি আছে! ভুল হতেই পারে।'

আমি একটা প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে বললাম,

'ও, আপনি বাংলা বোঝেন?'

'নিশ্চই, আমি বাঙালি।'

'আচ্ছা! আপনার এখানেই বাড়ি বুঝি?'

'না, আমি এখানে সার্ভিস করি। আপনি—'

'আমি বেড়াতে এসেছি।'

'একা!'

'না, দিদির সাথে এসেছি। ও ভীষণ কুঁড়ে জানেন! হোটেলে ম্যাগাজিন নিয়ে বসে আছে। আরে বাবা এতদূরে এসেছি কি ম্যাগাজিন পড়ার জন্য!' ততক্ষণে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছি। 'সে তো কলকাতাতে বসেই পড়তে পারতাম বলুন, তার জন্যে আগ্রায় আসার কি দরকার ছিল। তাই একাই ঘুরতে বেরিয়েছি। হোটেলে বসে বোর হওয়ার চাইতে একা একা ঘোরা অনেক ভালো।'

'আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, আপনি কিছু মনে করেন নি তো?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনাকে এভাবে ডিসটার্ব করলাম বলে?'

'আপনার সন্দেহ এখনো কাটেনি দেখছি—'

'না, আসলে দূর থেকে ঠিক চিনতে পারিনি।' মুখের দিকে তাকিয়ে, 'আপনার সাথে আমার স্যারের অনেক মিল। আমি ভাবলাম স্যার বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছেন। যাক! গল্প করার একজন পাওয়া গেল।'

'আপনার নাম কি?'

প্রশ্ন শুনে থেমে গেলাম। এতক্ষণ ফুটো দিয়ে বালি পড়ার মত হুড় হুড় করে কথা বলছিলাম। 'প্রহেলিকা। প্রহেলিকা সেন। আপনার?'

'আহীর বাসু।'

'আপনার সাথে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগছে। আপনাকে বোর করছি না তো?'

'আরে না না, নট অ্যাট অল। আমিও একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'আমি আপনার সাথে যেতে পারি?'

'ও সিওর, হোয়াই নট!'

'থ্যাংকইউ! আমিও একজন সাথী এক্সপেক্ট করছিলাম। তাছাড়া এখানকার রাস্তাঘাটও আমার অচেনা; ভালোই হল।'

'আপনি এভাবে একা বেরিয়ে এসেছেন আপনার দিদি কিছু বলেন নি?'

'বলেনি আবার! আসতেই দিচ্ছিল না। যতক্ষণ না ফিরব হয়ত চিন্তা করবে। করুক গে। আমি জানি ও বাড়ি ফিরে বাবাকে সব বলে দেবে। সমি একটাও কথা শোনেনি।'

'সমি!' মুখ ফসকে আসল নামটা বেরিয়ে গেছে।

'আমায় ডাক নাম।'

'ও আচ্ছা। কি করেন আপনি?'

'কলেজে পড়ি। এটা বি. এসসি. ফাইনাল ইয়ার চলছে। আপনার বাড়ি?'

'কলকাতাতে নয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, ডায়মণ্ডহারবার।'

'তাই! ওখানে তো আমার মামার বাড়ি।'

'আচ্ছা! তাহলে তো আমরা একই জেলার বাসিন্দা।'

'অথচ দেখুন কতদূরে এসে আমাদের আলাপ হল। ভাবতে কি অবাক লাগছে না! আপনি কাল আমাদের হোটেলে আসুন না; আমার দিদির সাথে আলাপ করিয়ে দেব।'

আহীর হাসছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কি ভাবছে কে জানে। হয়ত ভাবছে, মেয়েটা খুব মিশুকে। একটা অচেনা ছেলের সাথে কেমন ফ্র্যাংকলি কথা বলছে। একটুও জড়তা নেই। পোশাকটা ছেলেদের হলেও মন্দ লাগছে না। স্মার্ট ছিপছিপে মেয়েটা একটু গায়ে পড়া—

ওমা! গায়ে পড়া ভাবতে যাবে কেন? আমার অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে উঠল। আমি গায়ে পড়ার মত কোন ব্যবহার করিনি। আহীরের সাথে যথেষ্ট দূরত্ব বজায়

রেখে চলছি। আর আমি ওর সাথে যে অ্যাকটিং করছি সেটা ও বুঝতেই পারেনি। পারলে এত সুন্দর ভাবে হাসত না আমার দিকে তাকিয়ে।

'কি ভাবছেন?' প্রশ্নটা আহীরের তরফ থেকে এল।

'অ্যাঁ! না, আপনি কিছু মনে করলেন?'

'কেন?'

'আপনাকে আমাদের হোটেলে আসতে বললাম বলে?'

'আপনার চঞ্চলতা দেখে তো মনে হয় না আপনি এত ফর্মাল!'

'আমি জানতাম আপনি মাইন্ড করবেন না।'

'তাহলে জিগ্যেস করলেন কেন?'

'যাতে আপনি কিছু মনে না করেন!'

আহীর হাসছে খুব জোরে জোরে। আমিও হাসছি ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আমরা ভুলে গেলাম আমাদের সদ্য আলাপের কথা। বহু পরিচিতের মত অনেকক্ষণ আগ্রার রাস্তায় ঘুরলাম। কত কথা বিনিময় হল। স্বপ্নের মত মনে হল দিনটা।

পরদিন আহীর হোটেলে এল। হোটেল লবিতে আমি এমন একটা জায়গায় বসে রইলাম যে আমাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। রমাদির একটা খুব সুন্দর শাড়ী পরেছি। হাতে শাঁখা পলা যৎসামান্য গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর, চোখে চশমা। একটা ইংলিশ ম্যাগাজিন নিয়ে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। যথা সময়ে আহীর এল। ওকে আসতে দেখে ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে মুখটা একটু তুলে বসলাম। আমি যা চাইছিলাম সেটাই হল। আহীর আমার দিকে এগিয়ে এল। 'এক্সকিউজ মী!'

আহীরের মুখটা বিস্ময়ে ডুবে আছে। 'আপনি প্রহেলিকা…'

'ও আচ্ছা, আপনিই আহীর বাবু?' ক্যাচিং ডায়লগ। কো অ্যাকটারের ডায়লগ শেষে এমন ভাবে ক্যাচ করে ডায়লগ বলতে হবে যেন শ্রোতা বা দর্শক বোঝেন কো অ্যাকটারের আরও কিছু বলার ছিল। এতে করে সিনের ডেপ্‌থ বাড়ে। অ্যাকটিং ক্লাসে শিখেছি। এখানে কাজে লাগিয়ে দিলাম। ও অবাক হয়ে ঘাড় নেড়ে বলছে,

'হ্যাঁ'।

'নমস্কার। বসুন, আমি প্রহেলিকা নই। ওর দিদি প্রণতি সাহা। প্রহেলিকা আমাকে বলেছে আপনার কথা। আপনি বসুন ও এক্ষুনি ফিরবে।'

আমি খুব শান্ত ভাবে এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটু স্মাইল মিশিয়ে ওর সাথে কথা বলছি। প্রহেলিকার সঙ্গে প্রনতির সিমিলারিটি দেখে মিস্টার আহীরের ভিমি খাওয়ার জোগাড়। কি বলবে বুঝতে পারছে না। ডিক্‌সনারী হাতড়ে ভাষা খুঁজছে বোধ হয়। আমি বাঁদিকে ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে দূরে তাকালাম। রমাদি আমাদের দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই ও ফ্যাক্‌ করে হেসে ফেলল। আমারও হাসি পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিলাম। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে

বললাম, 'আপনি নিশ্চই বোর হচ্ছেন! প্রহেলেকা এক্ষুনি এসে যাবে। আসলে ও ভীষণ চঞ্চল, দু দণ্ড স্থির হয়ে কোথাও থাকতে পাবে না। এই এখানে বসে তিড়িং বিড়িং করছিল, বলল এক্ষুনি আসছি। আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, ওর সাথে কাল একটু আলাপেই বুঝেছি। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি আপনাদের সিমিলারিটি দেখে।'

'শুধু আপনি নন; সবাই অবাক হয়। ছোটবেলায় মা ই গুলিয়ে ফেলতেন। এক জনকে খাইয়ে আবার তাকেই খাওয়াতে যেতেন। অন্য জন খিদের জন্য কাঁদত।'

'আপনাদের কণ্ঠস্বরেও অদ্ভুত মিল। কেবল আপনি শান্তভাবে কথা বলেন আর প্রহেলিকা তো বলতে শুরু করলে থামে না।'

আহীর হাসছে। আমার বদনাম শুনে আমিও হাসছি। মনে মনে ভাবছি, দাঁড়াও তোমাকে একবার বাগে পাই বদনাম করা বের করে দেব! বকে বকে মাথা খেয়ে নেব। এখনো তো চেন না আমায়!

'তবে যাই বলুন, আপনাদের চেহারার হুবহু মিল থাকলে কি হবে স্বভাবে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ।'

'হ্যাঁ, হেমা মালিনীর 'সীতা অর গীতা' সিনেমার মত। চেহারায় জেরক্স কপি, স্বভাবে নর্থ পোল সাউথ পোল।'

আহীর হাসছে, মনে হচ্ছে খুব মজা পেয়েছে। ও সিট্! একজন গম্ভীর স্বল্পভাষী বিবাহিতা মহিলার মুখে এ ধরনের ডায়লগ মানায় না। বড্ড খেলো শোনায়। আমার পূর্ব পরিকল্পিত স্ক্রিপ্টে এ ডায়লগ ছিল না। অ্যাকটিং এর এমারজেন্সিতে হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিজেকে ধরে চাটাতে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছি গম্ভীর হয়ে থাকা কমশ দুরূহ হয়ে উঠছে। প্রণতি সাহার ভিতর থেকে প্রহেলিকা সেন আমড়া আঁটির মত ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বললে হবে! স্বভাবের দোষ। ঢেঁকির স্বভাব ধান ভানা, স্বর্গে গেছে বলে সে কি ফুলের মালা গাঁথবে!

'আচ্ছা, আপনাদের সব সিমিলারিটি মানছি। কিন্তু ছোট্ট একটা তিল সেটাও কি নিখুত ভাবে একই জায়গায় রয়েছে। এটাও কি সম্ভব!'

আমার অবস্থা ঢিলে। এই ধরা পড়ে গেলাম বলে। হে ঈশ্বর রক্ষা কর। দুদিন ধরে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে শেষে কি না তিলে এসে হোঁচট খেলাম! তিলের কথা আমার মাথাতেই আসেনি। সায়রা বেগম বোর্খা পরে ছিল বলে তিলের হাত থেকে বড্ড বেঁচে গেছে। কিন্তু প্রণতি সাহা কোথায় তিল লুকোবে! মনে মনে আহীরের বুদ্ধির তারিফ করছি। ভাবছি এয়ার ফোর্স অফিসার না হয়ে সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার হলে ভালো হত। হাতটা কখন আমারই অজান্তে ঠোঁটের

উপর চলে গেছে। এখন আর চাপা দিয়ে কি হবে যা কেলেংকারি হবার তো হয়ে গেছে! মাথায় বরফ চাপিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে বললাম, 'নকল তো; নকল ওটা। 'প্রহেলিকার তিনটা নকল।'

'তাই না কি!'

'হ্যাঁ, আমারটা আসল, একদিন বলে কি দিদির বিউটি স্পট থাকবে আমার থাকবে না! বলেই আমার একটা ছবি নিয়ে যারা উল্কি আঁকে তাদের কাছ থেকে আঁকিয়ে এনেছে। ব্যাস্, যেটুকু অমিল ছিল সেটুকুও মিল হয়ে গেল।'

'ও গড়! বুদ্ধি আছে মেয়ের।'

সত্যিই বুদ্ধি আছে, তা না হলে এই সিচুয়েশানটা এভাবে ট্যাক্‌ল করতে পারতাম! কিন্তু এ কি! এ আমি কি দেখছি! এ রকম তো কথা ছিল না। এ যে একটা জীবন্ত বিপদ নিজের পায়ে হেঁটে হেঁটে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একে কি করে ট্যাক্‌ল করব! একে তো আর নকল বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না! রমাদি একেবারে আমাদের সীমানায় মধ্যে চলে এসেছে। সর্বনাশ! কি ধান্দা বুঝতে পারছি না। যে রকম হিন্দী সিনেমার ভ্যাম্পের মত বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে তাতে মনে হচ্ছে হাটে হাঁড়ি না ভেঙে দিলে বাঁচি। বিপদের উপর বিপদ, কি হবে প্রভু!

হাত জোড় করে রমাদি হেসে বলল, 'নমস্কার। একটু বসতে পারি?'

'ও সিওর। হোয়াই নট! প্লীজ।'

দেঁতো হেসে রমাদিকে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলাম।

'থ্যাঙ্ক ইউ'। বসল রমাদি।

'আলাপ করিয়ে দি, ইনি মিষ্টার আহীর বাসু; এখানে সার্ভিস করেন। ইনি মিসেস্ অতর্কিতা দত্তা আমাদের পাশের রুমে রয়েছেন।'

ওরা পরস্পর নমস্কার জানাল। রমাদির নামটা শুনে আহীর মনে হয় ঠোক্কর খেল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে হাসতে পারছে না। রমাদি বোধ হয় নিজের নাম শুনে খেপে গেছে। যদিও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়নি। তবে আজ রাতে হবে তুলকালাম। আমার চুলের মুঠি ধরে চারতলা থেকে নিচে ফেলে দেবে, বলবে, বেইমান হতচ্ছাড়া তোর জন্য আগ্রা এলাম। আর তুই আমার নাম নিয়ে তামাসা করলি!

'আপনার বোনকে দেখলাম।' রমাদি টপ্ মারল।

'তাই! কোথায় বলুন তো?'

'এই তো আগের স্টেপেজ থেকে ট্যাক্সিতে উঠল।' আর একটা টপ্।

'দেখেছেন কি শয়তান! আপনাকে আসতে বলে নিজেই চারিদিকে টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসুক আজ মজা দেখাচ্ছি।'

'না না আপনি ওকে কিছু বলবেন না প্লীজ, ওর হয়ত খেয়াল নেই।'

'খেয়াল নেই বললেই হল। অভদ্র কোথাকার, একেবারে আন্‌সোস্যাল। ম্যানারিজিম জানে না।'

নিজেকে চুটিয়ে গালাগালি দিচ্ছি। রমাদি মনে মনে খুশী হচ্ছে। ভাবছে অতর্কিতা দত্তার প্রতিশোধ।

'আচ্ছা আমি তাহলে আসি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আহীর। আমার বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও বলল,

'ওকে বলবেন আমি এসেছিলাম। চলি। নমস্কার।'

রমাদিকে নমস্কার করল। রমাদিও।

আহীর ক্রমশ গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দৌড়লাম।

'শুনুন।' এক ডাকেই দাঁড়িয়ে পড়ল আহীর।

'শুনুন, আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যান প্লীজ।'

আহীর অবাক। একজন বিবাহিতা মহিলা এভাবে ছুটে এসে তার ফোন নাম্বার চাইছে! ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। আমি জানি, এই গম্ভীর বিবাহিতা মহিলার মুখোস ধীরে ধীরে খসে পড়ছে; আহীর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে প্রহেলিকাকে। প্রেমিকা প্রহেলিকার চোখে কাঁচের ঠুলি চাপিয়ে কি বিবাহিতা প্রণতির চোখ করা যায়? বুকের মধ্যে যে অন্তরটা প্রেমের তুফানে ভেসে যেতে চাইছে তার ঢেউ এর ছলকানি স্পষ্ট ভেসে উঠছে আমার দু চোখে, আমি যে আহীরের চোখে আমার সে ভিজে দৃষ্টির প্রতিচ্ছবি দেখছি।

'আমার ফোন নাম্বার! কি করবেন?'

'প্রহেলিকা ফিরলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বলব।'

'না না--তার কোন দরকার নেই।'

'দরকার আছে আপনি দিন, প্লীজ।'

'ও কে, তবে একটা সর্ত আছে।'

'বলুন।'

'কথা দিন, আপনি প্রহেলিকাকে বকাবকি করবেন না।'

আমার আনন্দে কান্না পাচ্ছে। আমি হাসছি। 'কথা দিলাম।'

আহীর পকেট থেকে পেন বের করল। কিন্তু কাগজ নেই। কোথায় লিখবে! এদিক ওদিক পকেট চাপড়ে কাগজ খুঁজছে। আমি ডান হাতটা পেতে দিলাম।

'আমার হাতে লিখে দিন।'

'না না, কাগজ ছিল তো আমার কাছে।'

'আপনি দিন না হাতে লিখে। পরে কাগজে তুলে নেব।'

আহীরের হাসিটা খুব সুন্দর। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাতের

উপর পেনের নিব ঠেকাল। ভেবেছিলাম বাঁ হাতে আমার হাতটা ধরে ডান হাতে লিখবে। কিন্তু না, পেনের নিব ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করল না। পরস্ত্রী মিসেস্ প্রণতি সাহার হাত বলেই বোধ হয়; প্রহেলিকার হাত হলে কি করত! জানি না। ধীরে ধীরে ইংরাজী হরফে ছটা ফিগার বসিয়ে দিল পর পর।

'সাতটার পর করতে বলবেন।'

'ও. কে. থ্যাংকইউ।'

আহীরের সাথে গেট পর্যন্ত গেলাম। ও হেসে বিদায় নিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি কেমন করে জন সমুদ্রে হারিয়ে যাচ্ছে ও। এক সময় দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। কি এক অসম্ভব শূন্যতা গ্রাস করল আমায়। একটু আগে, যখন আমরা বসে গল্প করছিলাম তখন কিন্তু একবারও মনে হয়নি এই শূন্যতার কথা। ভাবিনি আহীর চলে গেলে এরকম কষ্ট হবে। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেলাম।

'ওহ্, রমাদি।'

'কিরে, কি ভাবছিস?'

আমরা কাল কলকাতায় ফিরছি রমাদি?'

'হ্যাঁ, কালকের ডেটেই তো রিটার্ণ টিকিট কাটা আছে।'

রমাদি বুঝতে পেরেছে আমার মনের কথা। আমার গাল টিপে আদর করে বলছে, 'তোদের আবার দেখা হবে। হ্যাঁ রে, হাসছিস! মিলিয়ে নিস্ আমার কথা। রিঅ্যালি, আই মিন ইট।'

'কেমন লাগল ওকে তোমার?'

'হানড্রেড ইলেভেন পার্সেন্ট জেন্টেলম্যান। লক্ষ্য করেছিস, ফোন নাম্বার লেখার সময় ও তোর হাত ধরেনি। শুধু একটা কথা ভাবছি।'

'কি কথা?'

'যদি ও অলরেডি এনগেইজড্ হয়!'

'না না তা কি করে হয়!' আমি যেন প্রিয়জনের অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনলাম। মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না এ প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য।

'কেন হয় না?' রমাদির পাল্টা প্রশ্ন।

'তা জানি না। আমার মন বলছে, আহীর একা।'

'তাই যেন হয়।'

কিন্তু যদি না হয়—আমি ভাবছি। ভাবতে ভালো লাগছে না তবুও ভাবছি। রমাদি প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করছে। ও বুঝতে পারছে এই কথায় আমার মনটা আরো খারাপ হয়ে গেছে।

'চিয়ার আপ্ বেবী! তুমনে বহত হী আচ্ছি অ্যাকটিং কি। তুমহে তো ন্যাশান্যাল্ অ্যাওয়ার্ড মিলনা চাহিয়ে।' রমাদির কথায় আমি হাসছি। 'আচ্ছা,

আহীরের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দেবার সময় ও রকম একটা ভয়ংকর সাংঘাতিক নাম বললি কেন ? ও কি ভাবল বলত !'

'আমি কি করব, তুমি যে রকম অতর্কিতে আক্রমণ করলে ! ভাবলাম অতর্কিতা নামটাই তোমার পক্ষে অ্যাপ্রোপিয়েট হবে।'

'যাই বলিস হেভি বানিয়েছিস কিন্তু। হ্যাঁ রে, আমাকে আসতে দেখে খুব ঘাবড়ে গেছিলিস না ?'

'ঘাবড়ে গেছিলাম মানে! তুমি যেভাবে রহস্যময়ীর মত হাসতে হাসতে আসছিলে, আমি তো ভাবলাম সব রহস্যের উন্মোচন করে তবেই তুমি ক্ষান্ত হবে।'

কথার ফাঁকে হাত ঘড়ির উপর চোখ চলে গেল।

'কটার সময় ফোন করতে বলেছে ?

'সাতটার পর।'

'কে ফোন করবে, মিসেস প্রণতি সাহা, না মিস্ প্রহেলিকা সেন ?

'মিস্ প্রহেলিকা সেন।'

'সে কখন ফিরবে হোটেলে ?'

'এক্ষুনি। তুমি বোস আমি চেঞ্জ করে আসছি।'

আমি ছুটলাম সিঁড়ির দিকে। রমাদি চেঁচিয়ে বলছে, 'নাম্বারটা কাগজে নোট করে নিস।'

'থ্যাংকইউ, মনে করিয়ে দেবার জন্য।'

কিছুক্ষণের মধ্যে চেঞ্জ করে নিচে ফিরে এলাম। ঘড়ির কাঁটা টিক্ টিক্ করে এগোতে এগোতে এক সময় সাতটার ঘরে পা রাখল।

'হ্যালো—হ্যালো, ক্যান আই স্পিক টু মিষ্টার আহীর বাসু প্লীজ !'

'ইয়েস, হোল্ড অন।'

'থ্যাংকইউ।'

'কি ব্যাপার ?' রমাদি জানতে চাইল।

'অন্য কেউ ফোন তুলেছিল।' ডাকতে গেছে।'

পরক্ষণেই ওপাশ থেকে ভেসে এল সেই পরিচিত কণ্ঠ, 'হ্যালো, প্রহেলিকা !'

'ইয়েস, কি করে বুঝলেন ?'

'আমি জানতাম আপনি ফোন করবেন। দিদির কাছে বকুনি খেয়েছেন তো ?'

'না, দিদি আপনার কথা রেখেছে। সরি অ্যান্ড থ্যাংকইউ।'

'দুটো এক সাথে ?'

'হ্যাঁ, আমি কথা রাখতে পারিনি তার জন্য সরি। আর হোটেলে আসার জন্য এবং দিদির বকুনি থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'আর বলবেন না, জ্যামে আটকে পড়েছিলাম। যাস্ট লাইক ক্যালকাটা। এত দেরি হবে বুঝতে পারিনি। আমার দিদিকে কেমন লাগল?'

'সত্যি বলব? প্রথমে দেখে চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম এক রাতে এতটা পরিবর্তন হল কি করে আপনার! 'হাসছেন যে রিঅ্যালি আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

আমি হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললাম, 'আহীর বাবু—আমি কাল—'চলে যাচ্ছি বলতে গিয়েও থেমে গেলাম।

'হ্যালো—হ্যালো, প্রহেলিকা—'

'শুনছি।'

'কি ব্যাপার, চুপ করে গেলেন? আপনি কাল কি? কি বলছিলেন?'

'কিছু না, রাখছি, বাই।' ফোন নামিয়ে রাখলাম।

'লাইনটা ও ভাবে কেটে দিলি কেন?'

'আর মিথ্যে বলতে পারছি না রমাদি।'

'কিন্তু তুই যে কাল চলে যাবি এটা তো সত্যি, তাহলে বলতে গিয়ে থেমে গেলি কেন?'

'জানি না।'

পরদিন ফিরে এলাম। কয়েকদিন পর আহীর একটা চিঠি পেল। সঙ্গে তিনটে রঙিন ছবি। একটা ছবি বোর্খা ধারী সায়রা বেগমের, একটা জিনস্ পরিহিতা মিস্ প্রহেলিকা সেনের আর একটা বাঙালী বধূর সাজে মিসেস্ প্রণতি সাহার। আহীর তো অবাক, বোরখা পরা মেয়েটাতে প্রহেলিকা। দেখিতো চিঠিতে কি লেখা। কাগজের ফোল্ড খুলে মেলে ধরল সামনে।

হ্যালো আহীর,

ছবি তিনটে দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছেন? হ্যাঁ, আপনার ধারনাই ঠিক, তিনটে ছবি একজনেরই। অনেকটা থ্রি-ইন-ওয়ান এর মত ব্যাপার। কি ভাবছেন, মেয়েটা ফ্রড তাই না? ঠিক হ্যায়, তাই সই। তবে আমি যেই হই, আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে। না, এবার আর আমি আপনার সাথে দেখা করতে যাব না। আপনি আসবেন আমার সাথে দেখা করতে। চলে আসুন তাড়াতাড়ি। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু সায়রা বেগম, প্রহেলিকা বা প্রণতির সঙ্গে আর দেখা হবে না। এবার অন্য একজন, অন্য এক নামে অপেক্ষা করবে আপনার জন্য।—মিস্ ফ্রড।

ওফ্ঃ! ভাবতেই মজা লাগছে। আহীর খুব চিন্তা করবে। ভাববে, মেয়েটা কে হতে পারে! কি চায় ও আমার কাছে! কে ও! তারপর কলকাতায় যখন আমাদের দেখা হবে, ও প্রথমে রেগে যাবে আমার উপর, পরে নিজেই পিঠ চাপড়ে তারিফ করবে আমার অভিনয়ের। ব্যাস্, ব্লু প্রিন্ট রেডি অপারেশান স্টার্ট।

সেই সপ্তাহে অ্যাকটিং ক্লাসে গিয়ে রমাদিকে বললাম, 'রমাদি, তুমি তো বেড়াতে যাবে বলছিলে। চল না এবারে আগ্রা যাই।'

'আগ্রা যাবি! এই উৎকট গরমে আগ্রা! যাওয়ার আর জায়গা পেলি না?'

প্রথম ধাক্কাতেই একটু দমে গেলাম, 'খুব কি গরম?'

'নিশ্চয়ই, শুধু গরম! ওখানে এখনো ইলেকশানের গণ্ডোগোল থামেনি। এখন কেউ যায় ওখানে!'

'সেকি! গণ্ডোগোল এখনো চলছে! কাগজে তো পড়লাম সব শান্ত হয়ে গেছে। কাল টি. ভি নিউজেও বলল—'

'তোর মুণ্ডু। আচ্ছা এত জায়গা থাকতে তুই হঠাৎ আগ্রা যেতে চাইছিস কেন?'

'এমনি, খুব একটা দূরেও নয় খুব একটা কাছেও নয়, তাই। আসলে ঘরে থাকতে একদম ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। বাপি তো একা যেতে দেবেন না তাই তোমাকে বললাম।'

'হুঁ, শুধুই বেড়াতে যাওয়া না অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু মানে?'

'অন্য কিছু মানে—' আমার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসছে। 'আগ্রায় তোর কে যেন চাকরি করে! এবার আমি হাসছি। ধরা পড়ে গেছি হাতে নাতে।

'চিঠি পত্র আসেনি বুঝি?'

'এসেছে। সে অনেকদিন হয়ে গেল। যেতে লিখেছে।'

'ও! তাই বলি, হঠাৎ এত আগ্রা যাবার আগ্রহ হল কেন!'

'য্যাঃ! তুমি ওভাবে ভাবছ কেন, আমি এমনি যাব বলছি।''

'ঠিক আছে, আর একটা সপ্তা থাক, গরমটা একটু কমুক, যাব।'

সেদিন খুশী খুশী মনে অ্যাকটিং ক্লাস থেকে বাড়ি ফিরেছি। খুশীর কারণ সমীরদা আমাকে একটা চাকরির অফার দিয়েছেন। সত্যি এখন আমার সুবর্ণ সময় চলছে। আমার লেখা আত্মপ্রকাশের এত সুযোগ তার উপর আবার চাকরি। ক্রেডিটটা আহীরকে দিতে ইচ্ছে হল। ওর প্রথম চিঠিটা আসার পর থেকেই এক এক করে এসব কাণ্ডগুলো ঘটে চলেছে। নাহ্ মানতেই হবে সময়টা ভালো যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে বাপিকে বললাম, মাড়োয়াড়ী ফার্মের চাকরি; অফিসিয়াল কাজ কর্ম, সারাদিন টেবিল চেয়ারে বসে ফাইল ওল্টানো। মাথার উপর পাখা ঘুরবে। এখন সাড়ে আটশ, পরে বাড়বে। মা তো শুনেই রাজি। করুক হোক মাইনে কম। একটা অভিজ্ঞতা তো হবে। কাজও শিখতে পারবে। পরে আরো বড় কোন ফার্ম থেকে চাকরির সুযোগ আসতে পারে। বাপি ফাস্টটাইম টোটালি না করে দিলেন। নেভার! যেমন টিউশানি করছিস কর। আবার

চাকরি করার কি হল ! অফিস টাইমে পুরুষদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বাসে ওঠা যে কি প্রবলেম তা তো বোঝনি এখনো ! ডেইলি দশটা পাঁচটা ডিউটি—'

'পাঁচটা নয় ছটা ।'

'ওরে ব্বাবা ! তার মানে তো বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে ! গাঁট গুনে হিসেব করে বললেন—'বাড়ি ফিরতে আটটা বেজে যাবে । না না, চাকরি করতে হবে না ।'

মা অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন । 'করুক না—খুব একটা দূরে তো নয় । এমনিতে সাতটা সাড়ে সাতটায় আসে, আর না হয় আধ ঘণ্টা পরে আসবে ।'

'যা বোঝ না সেটা নিয়ে কথা বোল না তো । চাকরি ক্ষেত্রে মেয়েদের কতরকম প্রবলেম ফেস করতে হয় তা তুমি জান ?' মা চুপ ।

এবার আমার পালা, 'তুমি চিন্তা কোর না বাপি, সে সব প্রবলেম ফেস করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি আর স্ট্যামিনা আমার আছে ।'

'ঘোড়ার ডিম আছে । একা একা একটু রাস্তায় বের হচ্ছিস বলে ভাবছিস সব শিখে গেছিস ।'

'তা কেন ! আমি এখন বড় হয়েছি—'

'সেই জন্যই তো আরও বেশী চিন্তা ।'

'আমার কথাটা শেষ করতে দাও । দেখো, ছোট বেলায় রাস্তা ক্রস করতে পারব না গাড়ি চাপা পড়ে মরব । বড় বেলায় দুষ্ট চক্রের লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়ে দুবাই-এ পাচার করে দেবে । আমার যদি অপঘাতে মৃত্যু থাকে তাহলে তা ঘটবেই, হাজার কসরত করেও তোমরা ঠেকাতে পারবে না । মৃত্যুর ভয়ে ঘরে বসে থাকলে পাকা ছাদ ভেঙে মাথায় পড়ে মরে যাব । আটকাতে পারবে না । শুকনো মেঝে স্লিপ করে পড়ে আর্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে । নিদেন পক্ষে সুদর্শন চক্রের মত ঐ ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটা ঠিকরে এসে আমার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দিতে পারে—'

'তুই চুপ কর তো । যত সব অলক্ষুণে কথা ।' মা এক ধমক দিয়ে সিলিং ফ্যানটার দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন ।

'বাদ দে তো, চাকরি করতে হবে না । তাছাড়া তোর যা চেহারা ! ও রকম আধপেটা খাওয়া শরীর নিয়ে বাসে-ট্রামে জার্নি করা যায় না ।'

বুঝতে পারছি মার মুখ দিয়ে বাপির কথাগুলো বের হচ্ছে । বাপির ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার সাহস মার নেই ।

'তোমরা এমন করছ, যেন আমি চাঁদে যেতে চাইছি ।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বাপি বললেন—'ঠিক আছে, অফিসের ঠিকানাটা দিস্ । আমি আগে দেখে আসব ; তারপর ভেবে দেখা যাবে ।'

সব শুনে সমীরদা বললেন, 'তুই তো আমাকে চিন্তায় ফেললি রে—অচেনা কেউ গিয়ে অফিসে এনকোয়্যারি করলে—বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি ! মানে ব্যাপারটা—একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে তো—'

'হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি।'

দুম্ করে বলে বসলাম আমি এ চাকরি করব না।' খুব বিরক্ত লাগল নিজের উপর। মনে হল সত্যিই আমার দ্বারায় কিছু হবে না। ছোটবেলা থেকে এ কথাটা বাপি মার মুখে খুব শুনে এসেছি। একটু কিছু হলেই বাপি বলতেন, যে পড়াশুনা করতে চায় না, তার দ্বারা কিছু সম্ভব নয়। কিচ্ছু হবে না তোর। কিছু করতে পারবি না জীবনে…'

একজন সুস্থ মানুষের কানের কছে দিনরাত যদি ক্রমাগত বলা হয় তুই পাগল তুই পাগল, তাহলে সেই মানুষটা সত্যিই একদিন পাগল হয়ে যেতে বাধ্য। আমারও সেই অবস্থা; আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আমার দ্বারা কিছু হবে না। কলেজে পড়ার সময় চুরি করে মাউথ আর্গান শিখতাম, আমার এক বন্ধুর কাছে। ও ও বলেছিল মেয়েরা মাউথ অর্গান বাজায় না। সা রে গা মা-ই টপকাতে পারে না গান তুলবে কি। আমি বলেছিলাম, আমি শিখব এবং গানও তুলব এটা আমার চ্যালেঞ্জ। গোটা বার গানও তুলেছিলাম। বকুনি খাবার ভয়ে বাপির সামনে কখনো বাজাতাম না। তারপর হঠাৎ-ই একটা ছোট্ট ঘটনা পথ আগলে দাঁড়াল। একটা ছোট্ট প্রতিবন্ধক। এ বাধা অবশ্য বাপি বা মার কাছ থেকে আসেনি। আঁতে ঘা দেওয়া একটা কথা। ব্যাস্! আমার সেন্টিমেন্টাল মাইন্ড থমকে গেল। আর এগোবার ক্ষমতা তার নেই। সেই থেকে অর্গান বাজানো তো দূর, ঘরের এমন একটা কোনে তাকে নির্বাসিত করেছি যাতে আর কোনদিন চোখে না পড়ে। সেই ছোট বেলাকার স্বপ্ন গীটার শিখব। টিউশনির পয়সা জমিয়ে একটা কিনলামও! শিখতেও শুরু করলাম, বেশ চলছিল। একদিন কর্তব্য এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। মনে করিয়ে দিল এভাবে বিলাসিতা করার মত যথেষ্ট উপার্জন আমি এখনো করি না। অন্য একটা গুরুত্ব—পূর্ণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে টাকার জন্য। ব্যাস্! যেমনি চিন্তা করা সঙ্গে সঙ্গে কাজ। ছেড়ে দিলাম গীটার। বাপিকে আমার এ সমস্যার কথা বললে, আমি নিশ্চিত বাপি আমাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু আমি বলিনি। বলব না। এটা আমার জেদ। গীটার কিনে আনার পর বাপি ওটার দাম দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিইনি। নেব না। নিলে আমার সেই ছোট বেলাকার চোখের জলকে অপমান করা হবে। বিক্রি করা হবে সেগুলোকে। আমি হেরে যাব আমার কাছে। না, তা হয় না। টাকার অভাবে গীটার যদি নাও শেখা হয় তাও ভালো কিন্তু অন্য কোন উপায়ে এ স্বপ্ন আমি সার্থক করব না। তাই তো প্রায়ই শুনতে হয়, 'কিচ্ছু শিখতে পারবি না তুই। কিনে আনবি দুদিন বাজাবি তারপর ছেড়ে দিবি।' ছেড়ে দিয়েছি সবাই জানে। কিন্তু কেন ছেড়েছি কেউ জানে না। জানতে চায় না। আর জানতে চাইলেও জানাব না! কোনদিন না। অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় এগুলো কোন কারণই নয়। বড় হবার পথে কতই তো বাধা আসে! প্রতিবন্ধকই যদি না অতিক্রম করতে পারলাম, তাহলে এগিয়ে যাব কি করে! আসল কথা সেটাই। আমিই অক্ষম। আমিই নিষ্কর্মা। আমিই অপারক। ছোটবেলা থেকে একটু একটু করে শিখেছি

কি ভাবে নিজেকে আণ্ডার এস্টিমেট্ করতে হয়। প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেকে হেরে যেতে দেখেছি। নিজেকে ঘৃণা করতে শিখেছি নির্দ্বিধায়। তাই তো কাজ অবলীলায় বলতে পারি—আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি সফলতার উল্টো পিঠ। ব্যর্থতাই যার জীবনের আর এক নাম আমি তেমনই একটা মেয়ে। আই ক্যান নেভার ডু এনি থিং। আই অ্যাম এ বিগ বোগাস।'

আমাকে কোনদিন কিছু করতে দেওয়া হয় নি। বই-এর মলাট, খাতার মার্জিন, পেন্সিল ছোলা, পেনের কালি ভরা, বই-এর ব্যাগ গুছানো···কিছু না। সংসারের কোন কাজতো নয়ই। কিছু করতো গেলেই কানে আসত, 'না না থাক, এসব তোকে করতে হবে না; তুই পড়। এসব করলে সময় নষ্ট হবে। যতক্ষণ এগুলো করবি ততক্ষণ তোর অনেক পড়া হয়ে যাবে।' আমার এ রাজকীয় সুখের কথা সবাই জানত। বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজন সবাই। সকলের মুখে এক কথা—'তোকে তো কিছু করতে হয় না. তোর আরো ভালো রেজাল্ট করা উচিত। পড়াশুনায় আরো ভালো হওয়া উচিত! তোর দিকে তোর বাবা মার এত নজর তুই একি রেজাল্ট করেছিস! তুই তো দিন রাত বই নিয়ে বসে থাকিস, কত ভালো রেজাল্ট করা উচিত তোর। তুই তো আর কিছু শিখিস ও না, শুধু পড়াশুনা করিস, তোর আরো ভালো হওয়া দরকার।' বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলত—'তোর মত সুযোগ পেলে দেখতিস আমি কি করতাম! কত ভালো রেজাল্ট করতাম। কত ভালো মেয়ে হতাম।'

মা, বাপি বলতেন—'অমুক কে দেখতো, সে তো তোরই মত একটা মেয়ে. নিজের কাজ করছে আবার পড়ছে। তোর মুখের কাছে সব জোগাড় করে দেওয়া হচ্ছে অথচ পড়ার কি ছিরি! যারা খেতে পায় না তাদের ঘরের ছেলে মেয়েরা ভালো রেজাল্ট করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তোর খাওয়া পরার কোন অভাব নেই, কেন তুই পড়তে চাস না! পড়ার প্রতি কেন তোর এত অবহেলা!'

আমি এক ঘরে হয়ে গেছি। - আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়েছে। এ পৃথিবীর সবাই একদিকে আর আমি একা একদিকে। সবাই তো আর ভুল হতে পারে না, সুতরাং আমিই ভুল। আমিই অকর্মন্য। সত্যিই আমি খারাপ। আমি কনফার্ম, আই অ্যাম ব্যাড। ভেরি ভেরি ব্যাড। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কাঁদছি। হা ঈশ্বর। আমাকে এভাবে নিগুর্ন করে তৈরী করলে কেন? ছোট্ট একটা গুণ তো আমাকে দিতে পারতে! সবাই সব কিছু পারে, আমি কিছু পারি না। বই নিয়ে বসলেই মন হারিয়ে যায়—কখনো দেখি আমি অনেক বড় স্টেজে গান করছি। কখনো বা সুন্দর পোশাক পরে সোনার গয়না ফুলের মালা পরে রঙিন আলোর মাঝখান দিয়ে পরীর মত নেচে চলেছি। কখনো বা নদী পাহাড় বন ডিঙিয়ে অনেক দূরে কোন অচেনা মরুপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে কেউ বোঝে না। আমার কথা কেউ বুঝতে পারে না। আমি দুর্বোধ্য। নিজের প্রতি ঘৃণা আর সংসারের প্রতি ক্ষোভ

অভিমান থেকেই জন্ম নিয়েছে আমার অধিকাংশ কবিতা। একদিন লিখলাম—'প্রতিবন্ধী'।

একজন সুস্থ মানুষের
শারীরিক গঠনের সাথে
আমার কোথাও কোন অমিল নেই।
প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
শাণিত ছেনির নিখুঁত আঘাতে
প্রথিত আছে যথা স্থানে,
তবুও আমি পঙ্গু।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
কেবলই খোঁজার চেষ্টা করি
আমার সেই প্রচ্ছন্ন বিকলাঙ্গতা কে।
দেখি আয়নার ভিতরে
দাঁড়িয়ে থাকা চরিত্রটা
একরাশ কৌতূহল নিয়ে
আমারই দিকে তাকিয়ে আছে।
তার জিজ্ঞাসু চোখ দুটো
আমার সারা শরীর তন্ন তন্ন করে
কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।
প্রতিটি শিরার গভীরে অনুভব করি
সেই খুঁজে ফেরার আহ্বান।
সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
চরম অপরাধীর মত কুঁকড়ে যাই।
দৃষ্টির আঘাতে ঝাঝরা
হয়ে যাওয়া চেহারাটা
নগ্ন কংকালের মত দেখায়।
তবুও পারি না—
কিছুতেই পারি না নিজেকে গুটিয়ে নিতে।
কঠোর বাস্তবের আদেশ
মানতে চায় না এ মন।
নিষেধের গন্ডীবদ্ধ জীবনে
এ তাজা প্রাণে বিদ্রোহের হল্‌কা ওঠে।
আমি কিছু একটা করতে চেয়েছিলাম।
আজও যা করা হয়ে ওঠেনি;
হয়ত কোনদিনও আর করা হবে না।

ব্যর্থতার সোপান পেরোতে পেরোতে
আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
ঈশ্বরের দেওয়া সুস্থ জীবনটা
এ কঠোর বাস্তবের যাঁতা কলে পিষে
আজ পঙ্গু হয়ে গেছে।

আমি শিল্পী হতে চেয়েছিলাম ; শিল্পী শব্দের অর্থ যখন বুঝতাম না সেই তখন থেকে। মনে পড়ছে সেই ভদ্রমহিলার কথা। আমাদের অ্যাকটিং ইন্সটিটিউটে এসেছিলেন। অফিস ঘরে চাঁদ দাদুর সাথে বসে গল্প করছি। ঐ ভদ্রমহিলাও ছিলেন। উনি অ্যাস্ট্রোলজার। চাঁদ দাদুও অবশ্য এ ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমাকে বললেন – 'দেখি তোমার হাতটা।'

তারপর হাতটা উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন—'তুমি গান শেখো ?'

'না তো'।

'তাহলে কি নাচ শেখো ?'

'তাও নয়।'

'লেখাপড়া ছাড়া আর কি শিখেছ ?'

'কিছুই না। শুধু লেখাপড়াটাই শিখেছি। তাও আবার শেখার মত করে শিখিনি।'

আমার কথা শুনে দাদু হাসছেন। ভদ্রোমহিলা বললেন—তা কি করে হয়। তোমার তো শিল্পীর হাত। তুমি কিছু নিশ্চই একটা কর। তোমার চেহারাটা তো সুন্দর, বেশ রোগা রোগা। নাচ শেখনি কেন ? এ তো নাচের ফিগার।'

আমি হাসছি। আজ নতুন নয়। এ প্রশ্নের মুখোমুখি এর আগে অনেক বার হয়েছি। আর প্রতিবারই কোন সঠিক জবাব দিতে পারিনি। শুধু হেসেছি। পরিহাস করেছি নিজের ভাগ্যকে। সবচেয়ে আনন্দ হয় যখন কেউ বাপি বা মার সামনে আমাকে এ প্রশ্ন করেন। আমি তখনো হাসি। আমি কেন কিছু শিখিনি ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজি বাপির মুখের দিকে তাকিয়ে। বাপি তখন চুপ। বাপির এ নিরবতা, এই উত্তর দিতে না পারা—এটা যে আমাকে কি অসম্ভব আনন্দ দেয় আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। আমার ভিতরের আধমরা শিল্প সত্ত্বাটা একটু শান্তি পায়। বাপির এ অসহায়তা আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি। আরও মজা হয় যখন আমার বিয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব আসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির। পাত্র পক্ষের ইন্টারভিউ। প্রথমে নাম, তারপর কতদূর পড়াশুনা কবে পাশ করেছ। তারপরই সেই বিখ্যাত প্রশ্ন—লেখাপড়া ছাড়া আর কি শিখেছ ?

'এক কথার উত্তর—'কিচ্ছু না।'

'কিছু শেখনি ?' অবাক প্রশ্ন।

আমি বাপির মুখটা দেখছি। সেই অপূর্ব অসহায়তা। আজকাল আবার আমি ওনাদের সামনে যাবার আগে দুই পক্ষের আলোচনার সময় বাপি বলেন, 'আমার মেয়ে লেখে। ছোটবেলা থেকেই লেখে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস বেশ অনেকগুলোই লিখেছে।'

কিন্তু ওনারা আমার কাছে যখন জানতে চান আমি বলি—'না না ও সব কিছু না। একটু আধটু লিখি। তেমন কিছু নয়।'

বাপির দিকে তাকাই। মনে মনে ভাবি—কি ভাবছেন মিস্টার মহেন সান্যাল! আপনার এ খোটা সিক্কা কেউ নেবে না। আপমার নিষ্কর্মা মেয়ে তিল তিল করে আপনারই চোখের সামনে শেষ হয়ে যাবে। তবুও আপনি মনের মত পাত্রে একমাত্র আদরের কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে পারবেন না। কেন নেবে তারা আমায়! কি গুণ আছে আমার! আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী গুণবতী তারা পেয়ে যাবে। কেন নেবেন আমাকে! আয়নায় পড়া প্রতি বিম্বের মত সচ্ছ হয়ে ওঠে আমার অতীত। একসময় এই গল্প কবিতা লেখার জন্য মার খেয়েছি আমি। চুরি করে লিখতে হয়েছে আমায়। বাইচান্স কোন চিরকুট বাপির হাতে পড়ে গেড়ে ঠাট্টা করেছেন, 'অ্যাঁ! কাব্যি হচ্ছে! পড়াশুনার নমে অষ্টরম্ভা; লেখিকা হবেন! কিচ্ছু হবে না তোমার দ্বারায়। যে লেখাপড়া করতে চায় না তার পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়।'

ভুলিনি সে সব কথা। পোড়া ঘায়ের মত দগদগে হয়ে আছে সেগুলো। আমিই শুকাতে দিইনি সে ঘা; কুরে কুরে রক্তাক্ত করে রেখেছি। মানব জীবনের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো করতে ন্যূনতম সে সময়টুকু লাগে সেই সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় শুধু পড়া। সময় আর সুযোগের অভাবে আমার কত কল্পনা যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। ভুলে গেছি সে গল্প, সে সব কাহিনী। তাই আজ যখন পাত্র পক্ষ আমাকে রিজেক্ট করেন আমার সে রক্তক্ষরন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়। মনে হয়, এই দিনটার জন্য আমি অনেক অপেক্ষা করেছি। তাছাড়া এ আমার স্বতস্ফূর্ত গুণ। তোমরা কেউ আমাকে গল্প লিখতে শেখাও নি। নিজেকে বিয়ের বাজারে বিক্রি করার জন্য এটা আমি কিছুতেই কাজে লাগাতে দেব না। ফাংশানে যখন আমারই বয়সী কোন ছেলে-মেয়েকে অংশগ্রহণ করতে দেখেছি, মনে পড়েছে সেই ছোটবেলাকার দিনটার কথা। বুকের হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় তখন। মনে হয় আমি কিছু করতে পারিনি। আজীবন এইভাবে সকলের পিছনে দর্শকাসনে বসে থাকতে হবে আমায়। কোনদিনই সামনে যেতে পারব না। সে যোগ্যতা আমার নেই। স্টেজের আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। অন্ধকার হলে বসে মুখ ঢেকে কেঁদেছি। বন্ধু-বান্ধবদের কিছু করতে দেখলে নিজের অক্ষমতার কথা বড্ড বেশী মনে পড়ে। চোখের জল বাগ মানতে চায় না।

একদিন এক বন্ধুর বাড়ি গেছি—সেও আমার সঙ্গে মাধ্যমিক দিয়েছিল। সপ্তাহ খানেক হয়েছে আমাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি ও নতুন

হারমনিয়াম নিয়ে বসেছে। বলল—এটা ওর পাশ করার উপহার। হারমনিয়াম বাজিয়ে নতুন তোলা সরগম আমাকে শোনাতে লাগল। আমি শুনছি। বেশ বুঝতে পারছি আমার মনটা অভিমানে ভারি হয়ে উঠছে, চোখদুটো ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমাগত। এ কি অসহায়তা! আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছি না যেন! এক্ষুনি বুঝি টপ্ টপ্ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়বে। কি হবে! সামনেই বন্ধু বসে আছে। ও যে এক্ষুনি দেখতে পেয়ে যাবে আমি কাঁদছি। কি কৈফিয়ৎ দেব তখন! না, এভাবে আর থাকা যায় না। কোন রকমে মাথা নিচু করে চোখের জল লুকিয়ে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে। মনে পড়ে, বাড়িতে এসে প্রাণ ভরে কেঁদেছিলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল ঠিক ওমনি একটা হারমনিয়াম আমি চেয়েছিলাম। বাপি আমাকে কিনে দিতে পারতেন। কেন দিলেন না? ভীষণ বাজাতে ইচ্ছে করছিল। যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়লাম ততক্ষণ কাঁদলাম। আমার সে চোখের জলের কোন সাক্ষী নেই! কজন রেখেছে সে লুকনো কান্নার খবর। কেউ না। যারা সকলের সামনে চিৎকার করে কাঁদে তাদের চোখের জলের মূল্য আছে। আর যারা রাতের অন্ধকারে সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে কাঁদে তাদের চোখের জলের কোন মূল্য নেই। আর সেই জন্যই বোধ হয় আমার অশ্রুও মূল্যহীন। এ আমার আর এক অভিমান।

আমরা যে ক'জন মাধ্যমিকে পাশ করলাম তাদের সকলেরই কিছু না কিছু হয়েছে। কেউ এমনি পেয়েছে কেউ চেয়ে নিয়েছে। আমার কিছু হল না। কেউ কিছু দেয়নি আমায়। এসব আবেগ বাপির কাছে মূল্যহীন। আমিও চাইনি, আমার চাইতে ভালোলাগে না। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, আমি, বাপির আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারিনি তাই কিছু দেননি। আরো ভালো ফল করলে নিশ্চই দিতেন। তাই দোষ আমারই। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত আমারও চাহিদা ছিল। অতি সাধারণ সব চাহিদা। একবার চাই, না পেলে দ্বিতীয় বার মনে করিয়ে দি। তারপরও না পেলে আর কোনদিনই চাই না। যত প্রয়োজনীয় বস্তুই হোক না কেন সেটাকে ছাড়াই নিজেকে বাঁচতে শিখিয়েছি। বন্ধুদের কাছে শুনেছি তাদের কত বায়না। আনন্দ করে আবদার করে বাবা-মার কাছে কত কিছু চায়। আমি অবাক হয়ে শুনি। ভাবি আমি কেন বায়না করতে পারি না! আমি কেন বায়না করি না! ওদের মত বায়না করে আমি কেন বাপির কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারি না! কই বাপিও তো কোনদিন জানতে চাননি, সমি তুই বায়না করিস না কেন?

এই কদিন আগে বাপি কাকার কাছে জানতে চাইছিলেন একটা ভালো হারমনিয়াম কি রকম দাম। আর আজ আমাকে বললেন।

'একটা হারমনিয়াম কিনে দি গান শেখ না।'

আমি অবাক, 'হাসালে তুমি!'

আমার অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে এল তাচ্ছিল্যের হাসি।

'কেন, হাসানোর কি হল ! শিক্ষায় আবার বয়স আছে না কি !'

'শিক্ষায় না থাক, সাধনায় আছে। এই বয়সে গান শিখে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না।'

'যারা গান শিখছে তারা কি সবাই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য শিখছে ?'

'তাদের কথা জানি না। আমি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্যই শিখতে চেয়েছিলাম।' মনে মনে বললাম, বিয়ের বাজারে দর বাড়ানোর জন্য নয়। আমি জানি বাপি, পাত্র পক্ষের ইন্টারভিউ-এ পাশ করানোর জন্য আমাকে গান শেখাতে চাইছ। কিন্তু ও ফাঁদে আমি পা দেব না ; কিছুতেই না। তাহলে যে আমি নিজের কাছে হেরে যাব। তখন তোমাকে ভুল প্রমানিত করব কি করে! আমি নিজেকে কথা দিয়েছি ; প্রয়োজনে নিজেকে ধ্বংশের অন্তিম চূড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব তবু এ কথা আমি রাখবই। আমার শৈশব ছিল পাহাড়ী নদীর মত উচ্ছল। তার নিজস্ব একটা গতি ছিল। আর পাঁচটা নদীর মত সেও নিজের ধারায় বইতে চেয়েছিল। মিশে যেতে চেয়েছিল সাগরে। কিন্তু তুমি তা দাও নি। আমার চলার পথে কৃত্তিম বাঁধ খাড়া করে সেই অপ্রতিরোধ্য গতিকে রুদ্ধ করেছ। ঘুরিয়ে দিয়েছ আমার পথের দিশা। সে দিশায় চলতে চলতে আজ আমি হারিয়ে গেছি মরুর গর্ভে যার তপ্ত বালু আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করেছে। আমি জানি বাপি, আমার এ পরিণতি তুমি চাও নি। কখনো চাওনি। তুমি তো আমার ভালো চেয়েছিলে। এ পৃথিবীর সব চাইতে ভালো জিনিসটা, সব চাইতে শুভ জিনিসটা আমাকে দিতে চেয়েছিলে। যে কোন মূল্যে বড় করতে চেয়েছিলে আমায়। তোমার এ চাওয়ার উন্মাদনায় কোনদিন কাউকে পরোয়া করনি তুমি ; এমন কি আমাকেও নয়। আমার সকল চাওয়া পাওয়াকে ধূলিসাৎ করে তার উপরে খাড়া করতে চেয়েছিলে তোমার স্বপ্নের ইমারত। নিজের জীবনের অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলে আমার উপর দিয়ে। তোমার স্বপ্ন তোমার কাছে এতটাই মূল্যবান ছিল যে আমার স্বপ্নের কথা তোমার একবারও মনে পড়েনি। মনে করিয়ে দিলেও তুমি মনের দরজা বন্ধ করে নিয়েছ। আমারও যে নিজস্ব একটা অস্তিত্ব আছে—তাকে কখনো স্বীকৃতি দাওনি। শুনতে চাওনি আমার কথা। সেদিন একবারও ভেবে দেখোনি তোমার স্বপ্ন সার্থক করার যোগ্যতা আমার আছে কি না! কখনো বুঝতে চাওনি আমার অক্ষমতার কথা। তুমি আমার মত একটা কাঁটা গাছের কাছ থেকে ফুল আশা করেছিলে। আমি কি করে দেব বাপি ? ঈশ্বর যে আমাকে তৈরী করার সময় কার্পণ্য করেছেন। তোমার স্বপ্নের ফুল তিনি চুরি করে রেখে দিয়ে ছলনা করেছেন তোমার সঙ্গে! আমি হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে ফুল দিতে পারব না। আমি যে আমার সহজাত কাঁটার আঘাতে তোমাকে রক্তাক্ত করতে এসেছি। আমার আঁচল ভর্তি শুধু কাঁটা আর কাঁটা। যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না তোমায়। কিন্তু তুমি পারতে, আমার এ কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে একমাত্র তুমিই পারতে। ঈশ্বরের সে কার্পণ্যতাকে উপেক্ষা করে তাঁর ছলনার জবাব দিতে পারতে তুমি। যদি একবার আমার চোখ দিয়ে আমাকে দেখতে—আমার

মন দিয়ে আমাকে বোঝার চেষ্টা করতে—আমার হৃদয় দিয়ে আমাকে অনুভব করতে—তা তুমি করো নি।

প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় যে ছোট্ট চারাগাছটি বড় হয়ে উঠতে পারত ; তাকে তুমি সেখান থেকে সমূলে উৎপাটিত করে নিজস্ব খেরাটোপে কৃত্রিম আলো বাতাস দিয়ে সস্নেহে সযত্নে বড় করতে চেয়েছ। সে গাছ হয়ত না মরে বেঁচে থাকে কিন্তু ফুল দেয় না। ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে না।

তুমি বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে তার কাছ থেকে গান শুনতে চেয়েছ। তাই কি হয় বাপি! তুমি তাকে যতই গাইতে বলবে সে হয়ত তার মনিবকে গান শোনাতে চাইবে, কিন্তু তার গলা দিয়ে গান বেরোবে না। বেরোবে শুধু কান্না, হৃদয় বিদারী কান্না। আমি এই অমোঘ সত্যটা তোমাকে উপলব্ধি করাতে চাই। বিশ্বাস করাতে চাই আমার 'বন্দী স্বপ্নে'র কাহিনী—

সোনার খাঁচায় বন্দী
তোমার ঐ পোষা পাখিটাকে
ভালো করে দেখেছ কখনো ?
যাকে তুমি ভীষণ ভীষণ ভালোবাস !
যাকে দু বেলা দু মুঠো খেতে দেবার
কথা কখনো ভোল না তুমি !
প্রচন্ড শীতে. যার খাঁচার চারিদিকে
সযত্নে জড়িয়ে দাও পশমের ওড়না !
প্রখর রোদের খরতাপ থেকে
যাকে তুমি আগলে রাখ
আপন স্নেহ ছায়ায় !
মনের চোখ দিয়ে ঐ বন্দী পাখিটাকে
কখনো লক্ষ্য করেছ কি ?

দূরে গাছের ডালে
কোন এক নাম না জানা পাখি
যখন মনের সুখে বাসা বাঁধে !
ও তখন ঠোঁটের মাঝে
কেমন শক্ত করে চেপে ধরে
খাঁচার সোনার গরাদগুলো
কখনো তা দেখেছ কি ?

ঐ পাশের বাড়ির চালে
দুটো কপোত কপোতি যখন
মত্ত থাকে প্রেমের আদিম খেলায়

তখন ওর বুকের মাঝখানটা
কেমন তির্ তির্ করে কেঁপে ওঠে
কখনো সে ব্যথা অনুভব করেছ কি ?

উঠানের এক ধারে
এক দায়িত্বশীল চড়ুই মা
যখন তার সদ্য উড়তে শেখা শাবকের
ঠোঁটের মধ্যে খাবার গুঁজে দেয় !
তখন তোমার বন্দী পাখিটি
কেমন অপথ্য স্নেহ পিপাসু চোখে
সে দিকে তাকিয়ে থাকে ।
তার সে চোখের ভাষা
কখনো পড়েছ কি ?

দিনের শেষে উঁচু আকাশে
উড়াল দেওয়া এক ঝাঁক পাখি
যখন ডানা মেলে ঘরে ফেরে !
তখন সেদিকে তাকিয়ে সে অনুভব করে
তারও এক জোড়া ডানা আছে ।
যা ও প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল ।
মুহূর্তে মেলে ধরে সে দুটি
অর্ধ প্রসারিত ডানা
আটকা পড়ে সোনার জালে ।
ঝট্ ফট্ শব্দ তুলে
ওড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে
এ শব্দের মর্ম
কখনো বুঝতে চেয়েছ কি ?

নির্মল উষা কালে ঐ বাগানের
ঘন সবুজের বন থেকে
যখন কোন অচেনা সাথীর
গান শুনতে পায়,
নিজের উপস্থিতি জানান দিতে
তখন চিৎকার করে
ও গলা মেলায় তার সাথে ।
তোমার আদরের পাখির সে গান
কখনো শোনার চেষ্টা করেছ কি ?

ও গো বন্দী পাখির আবার মালিক—
বন্দী পাখির গলা থেকে
কখনো গান বের হয় না।
যেটা বের হয় সেটা কেবলই কান্না,
বন্দী স্বপ্নের গুমরে মরার কান্না।
সোনার খাঁচার দরজাটা
একবারটি খুলে দাও।
দেখো কেমন করে উড়ে যায় পাখিটি।
সত্যিই যদি তুমি ওকে ভালোবাস
তাহলে ও আবার ফিরে আসবে
তোমার কাছে।
ওকে আসতেই হবে
তোমার ভালোবাসার টানে।
তোমার কাঁধটিতে বসে
কানে কানে বলে যাবে—
'বন্দীর মধ্যে নয়, মুক্তির মধ্যেই
ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ়তর হয়।"

* * *

সকালে ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টি হয়ে গেল। মাঝে একটু রোদ উঠেছিল কিন্তু দুপুরের মুখটায় আবার মুসলধারে বৃষ্টি নামল। বিছানায় শুয়ে টি ভি দেখতে দেখতে ঠান্ড আমেজ কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। ঘুম ভাঙল মার ডাকে।

'সমি—সমি ওঠ ; কি ব্যাপার এত ঘুমাচ্ছিস কেন! রাত্রে ঘুম হয়নি না কি?'

'কটা বাজে?'

'তিনটে বেজে গেছে।'

'সে কি! আগে ডাকোনি কেন!'

'ডেকেছি, তুই শুনতে পাসনি।'

'বাবা! মরে গেছিলাম না কি গো! দিবানিদ্রা, তাও এত গভীর! ভেরি ব্যাড।'

পড়াতে যেতে হবে। আজ আর কেউ মাসীর বাড়ি যায় নি, সুতরাং সব কটাকে পড়াতে হবে। তৈরী হচ্ছি আর ভাবছি বৃষ্টিটা আর না এলে বাচি। এতেই রাস্তা ঘাট প্যাচ-প্যাচে হয়ে গেছে। নাহ্ঃ! আজ আর চামড়ার চটি পরে যাওয়া যাবে না। স্যানডাকের খড়খড়িটা গলাতে হবে। রাস্তার দিকের দালানে আমাদের জুতোর র‍্যাক। জুতোটা আনার জন্য দালানে যেতেই থমকে গেল পা। বিস্ফারিত চোখে

তাকিয়ে আছি দালানে পড়ে থাকা হলুদ খামটার দিকে। বাড়িতে লেটার বক্স নেই তাই রাস্তা দিয়েই গ্রীল গলিয়ে দালানে চিঠি ফেলে যায়। চিঠির থেকে হাত তিনেক দূরে আমি দাঁড়িয়ে আছি থ হয়ে। অদ্ভুত! রোজ দুপুরে বার কয়েক দালানে চক্কর মেরে যাই চিঠির খোঁজে, অথচ আজ সারাদিন চিঠির কথা একবারও মনে হয়নি। আমি নিশ্চিত ওটা আহীর ছাড়া আর কারুর চিঠি নয়। অথচ নিতে পারছি না। কে যেন রিমোট দিয়ে আমাকে ফ্রিজ করে দিয়েছে। দরজায় হেলান দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার নড়ার ক্ষমতা নেই। একটা গরম তরল প্রবাহ সাপের মত এঁকে বেঁকে সির্ সির্ করে বয়ে চলেছে সর্বাঙ্গে।

'সমি—কিছু খেয়ে যাবি তো?'

তাড়াতাড়ি চিঠিটা কুড়িয়ে নিলাম। কোথায় লুকাব খুঁজে পাচ্ছি না। পাশের ঘর থেকে মা এসে গেলে আবার মিথ্যে বলতে হবে।

'সমি—কি করছিস?'

'কিছু না, শাড়ী পরছি।'

'শাড়ী পরছিস! শাড়ী পরা তো হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ—না—জুতো নিতে এসেছি।'

চিঠিটা শাড়ীর আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে ঘরে এলাম।

'কি খাবি?'

'কিচ্ছু না। সব সময় খা খা করে বিরক্ত কোর না তো।'

'এই, বেশী কথা বলবি না। দুধ গরম করছি, একটু খেয়ে যাবি।'

মা রান্না ঘরে যেতেই খামটা ছিঁড়ে পড়তে লাগলাম।

কুহেলি—

অভিমানীষু,

জানি তুমি আমার উপর অনেক অনেক অভিমান করে বসে আছ। কি করবো বল, Actually গত বিশ দিনেরও বেশী আমি এখানে (আগ্রায়) ছিলাম না।...

আমার আর পড়ার শক্তি নেই। এতদিন আমি কত উল্টো-পাল্টা ভেবেছি। আমি ওর উপর অভিমান করেছি এ কথা ও বুঝল কি করে! দুটো চিঠিতেই কেউ কি কারুর এতটা আপন হতে পারে! যার উপর অভিমান করা যায় আমার অভিমানের অধিকারকে আহীর স্বীকৃতি দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আমরা পরস্পরকে অনেক দিন থেকে চিনি। না, এ আমার কল্পনা নয়। এ বাস্তব, এ সত্য, অস্বীকার করা যায় না এমন সত্য। আমি কি অদ্ভুত ভাবে বিশ্বাস করছি, আহীরের সাথে আমার অনেক দিনের প্রেম। গত মাসে ও আমাকে চিঠি দিতে পারেনি তাই এত বিনয় করে লিখেছে। যাতে আমি রাগ না করি। এই মুহূর্তে আমার মনেই হচ্ছে না যে ওকে আমি এখনো দেখিনি। আহীর আমার অভিমানের মূল্য দিয়েছে। ভালো না বাসলে এ মূল্য কেউ দেয় না। সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই।

আহীর আমার—আহীর আমার! ও আর কারুর নয়। ও-ই একমাত্র মানুষ যে আমাকে এভাবে তিল তিল করে বদলে দিচ্ছে। আমাকে অন্য রকম স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করাচ্ছে। আনন্দে, উত্তেজনায় আমি কাঁদছি। আমি বুঝতে পারছি মা এক্ষুনি দুধের গ্লাস নিয়ে এ ঘরে আসবেন। দেখতে পাবেন একটা কাগজ হাতে সমি বসে বসে কাঁদছে। অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইবেন। হয়ত আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আমার কান্নার কারণ অনুসন্ধান করবেন। আমি সব বুঝতে পারছি। এক্ষুনি মার কাছে ধরা পড়ে যাব। অথচ কিছুতেই নিজেকে লুকোতে পারছি না। অসতর্ক হয়ে বসে আছি। আমি কাঁদছি কেন! আনন্দে তো চোখে জল আসে, এমনি করে কাঁদে না কি কেউ! আমি কি বোকা! যে মানুষটাকে চোখেই দেখিনি তার জন্য এত কষ্ট হচ্ছে কেন! কেন এত কান্না পাচ্ছে! তাহলে কি এটাই ভালোবাসা! না শুধুই আবেগ! আমি জানি না, কিচ্ছু জানি না। কোন যুক্তি তর্ক মানতে চাইছে না মন। মার হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

'কি হয়েছে সমি! কাঁদছিস না কি?'

কই না তো! কাঁদব কেন!'

'হ্যাঁ—আমার মনে হচ্ছে, চোখ দুটো একটু লাল, গলাটা ভার ভার।'

'দূর—তুমি আমাকে খালি কাঁদতেই দেখ।'

ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। ছাতা খুলে ঢেকে ফেললাম নিজের মুখটা। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে রাস্তা হাঁটার অভ্যাস আমার আছে। অনেকেই বাড়িতে এসে অভিযোগ করে—তোকে অমুক দিন রাস্তায় ডাকলাম সাড়া না দিয়ে চলে গেলি। আরে বাবা সাড়া দেব না কেন, শুনতে পেলে তো দেব। মা বলেন—'কোন্ দিন গাড়ি চাপা পড়ে মরবি। কি অত চিন্তা করিস?'

'সে তুমি কি বুঝবে! গল্পের প্লট ভাবি।'

'গল্পের প্লট ভাবতে ভাবতে কোন্ দিন নিজে গল্প হয়ে যাবি।'

ভাবছি দু লাইন পড়ে আমার এই হাল—হাল না বলে বেহাল বলাই ভালো। তাহলে সম্পূর্ণ চিঠিটা পড়লে কি হবে! চিঠিটা তো ব্যাগে করে নিয়েছি ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে পড়ব বলে, বাড়ি ফিরতে পারব তো! ভীষণ পড়তে ইচ্ছে করছে। হাঁটতে হাঁটতে যদি পড়া যেত তাহলে রাস্তাতেই বের করে পড়তাম। বাসে-ট্রেনে যাওয়ার সময় দেখেছি অনেকে খবরের কাগজ গল্পের বই পড়তে পড়তে যায়। আমি চেষ্টা করে দেখেছি, কোন দিন পড়তে পারিনি। কেবলই মনে হয় শব্দ টপকে চলে যাচ্ছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে চোখ লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। আর জোর করে পড়লে কি পড়ছি বুঝতে পারি না। ব্যাগের চেনটা খোলাই আছে। একবার বের করে পরের লাইনটা দেখি। বিশ দিন আগ্রায় ছিল না কোথায় গেছিল দেখি। দেখি—দেখি করতে করতে ছাত্রীর বাড়ি দেখতে পেলাম।

নাহ্ থাক, একেবারে গিয়েই পড়ব।

ছাত্রীকে বললাম—'গত দিন যা পড়া ছিল লেখ।'

আমি চিঠি খুলে বসলাম। সে তার মত খাতা খুলছে।

কুহেলি—

অভিমানীষু,

জানি তুমি আমার উপর অনেক অনেক অভিমান করে বসে আছ। কি করবো বল. Actually গত বিশ দিনেরও বেশী আমি এখানে (আগ্রায়) ছিলাম না। Promotion Exam-এর জন্য ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম। অবশ্য এক সপ্তাহ আগেই আসতে পারতাম। ইচ্ছে করে Ouer stay করেছি। একটু enjoy করলাম। যদি জানতাম তোমার অপূর্ব কবিতা আমার রাহা দেখছে, পরীক্ষা শেষ হতেই পালিয়ে আসতাম। I am very very sorry friend. আসলে কি জান কুহেলি চাকরি পাবার পরও পড়াশুনো, পরীক্ষা পিছা ছাড়ছে না। কথায় বলে না—'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।'

হাম আপসে মিলনে কে লিয়ে ছুট্টি লেকর আ রহে হ্যায়। আপসে খুব সারে বাতে করেঙ্গে 7th June leave নিয়েছি। কি, আশা করি এবার তোমার মান ভঞ্জন হয়েছে! তোমার দীর্ঘ চিঠির প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিঠিতে নয় মুখে মুখে দিতে চাই। Your letter is really exciting. তোমার ভাবনাকে জানাই আমার লাল সেলাম। কবিতা—Fantastic, revolutionary. তবে শুধু ভাবলেই হবে না। নারী জাগরনের দায়িত্বটাও নিতে হবে। তবেই হবে তোমার প্রচেষ্টা—a real tribute to the right of woman. কোথায় যেন পড়েছিলাম—

—"কতোই স্বাধীন তুমি বনের হরিণ
আমি যে বাঙালীর মেয়ে চির পরাধীন—"

আজ বাঙালীর ছেলেরাও জানতে শিখেছে বাঙালীর মেয়েরা আজ চিরপরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ নেই। ধীরে হলেও জাগছে। আর জাগরনের জন্য তোমাদের মত বিদ্রোহী মেয়ের ঘরে ঘরে জন্ম নেওয়া উচিত।

এবার বলি বনলতা সেনকে কোথায় খুঁজবো। 13 Junc (তোমার Lucky No.) হাওড়ার নতুন Computerised resurvation counter-এ দাঁড়াবে। আমি সাদা চুড়িদার পরিহিতা কুহেলিকে খুঁজে নেব—বনলতা সেনকে নয়। সাদা চুড়িদার না হলে তোমার ব্যাগটা বাঁ হাতে বা বাঁ কাঁধে থাকবে। সময়—ঠিক বিকেল তিনটে (3 p. m.)। You also try to find out me. চোখে Sun glass থাকলেও থাকতে পারে। তোমার জন্য বলি। ওখানে যাকে সবচেয়ে কালো আর কুৎসিত মনে হবে সেই হবে তোমার বন্ধু। দেখা যাক—Who can win the game. Till then good bye.—

আহীর।

সত্যি আজ আমি বাড়ি যেতে পারব না। তুমি আমার ডাকে এভাবে সাড়া দেবে ভাবিনি। তোমার সাথে দেখা হবে জানতাম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি! আজ দশ

তারিখ—তের তারিখ মানে মাঝে আর মাত্র দুটো দিন। আজ কি বার! মনে করতে পারছি না। কি বার—কি বার—ছাত্রীকে জিগ্যেস করলাম—'এই আজ কি বার রে?'

'সোমবার!'

'ও সোমবার, তাই তো! কাল তো রবিবার গেছে—টি. ভি. তে মহাভারত দেখলাম। তুই লেখ। তার মানে মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার তের তারিখ পড়ছে। বৃহস্পতিবার—

'বৃহস্পতিবার কি পিশিমনি?'

'তোমার হলি ডে।'

'আমার হলি ডে! হলি ডে কি পিশিমনি?'

'হলি ডে মানে ছুটির দিন।'

'বৃহস্পতিবার ইস্কুল ছুটি! কারুর জন্ম দিন না মৃত্যু দিন?'

'ধ্যাৎ! স্কুল ছুটি হবে কেন! ও দিন আমি আসব না।' ছাত্রীর মা সরবৎ নিয়ে ঢুকলেন।

'বৌদি, এই বৃহস্পতিবার আসতে পারব না। ও দিন আমার এক বন্ধু আসছে আগ্রা থেকে। তার সাথে—'

'ঠিক আছে—তুমি যেও।'

চিঠিটা আবার পড়ছি। আজ ছাত্রীর পোয়া বারো। বসে আছে, পেন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছে—যা পারিস কর! আমার আজ পড়াতে ভাললাগছে না। অন্যদিন হলে পেটানি খেত। আমি ভাবছি, হাওড়ার নতুন Computerised resurvation counter-টা কোথায়! এর আগে তো কোনদিন যাইনি। হাওড়ার স্টেশানের ভিতরেই ঢুকিনি কোন দিন। কোন ছোট বেলায় একবার ঢুকেছিলাম কিছু মনে নেই। বাপি একদিন বলছিলেন প্ল্যাটফর্ম টিকিট না কেটে ঢুকলে না কি ফাইন করে। Counter-টা কি স্টেশানের ভিতরে! কাকে জিগ্যেস করি! বাপিকে করা যাবে না। হাজারটা প্রশ্ন। হাউ—হোয়াট—হোয়েন—হোয়্যার—হোয়াই—হুইচ—অত মিথ্যে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পথ প্রদর্শক খুঁজছি। কোন বন্ধু আমার অভিসারের পথ দেখিয়ে দেবেন! বাহঃ! কথাটা বেশ সুন্দর মনে এল তো! অভিসার—প্রিয়ের মিলন আশে নিভৃতে সংকেত স্থানে গমণ। রবি ঠাকুরের অভিসার মনে পড়ছে—

> "নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।
> অঙ্গে আঁচল সুনীলবরন
> রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ
> সন্ন্যাস-গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা॥"

আমি বাসবদত্তা নই। তবু অভিসারে যাব—দূর! এসব কি ভাবছি! আমার

শুদ্ধ মন ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে। ধমকাচ্ছে আমাকে। খুব অসভ্য হয়ে যাচ্ছ। ভেরি ব্যাড।

ছাত্রীর বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে উনি মোটামুটি একটা ডিরেকশান দিয়ে দিলেন—ওতেই হবে—বাকিটা আমিই খুঁজে নিতে পারব—এর আগে অনেক অচেনা ঠিকানা একা খুঁজে বের করেছি। এবার উনি জানতে চাইলেন—'তুমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ না কি ?'

এখানে মিথ্যে বলার প্রয়োজন নেই। 'না না—আমার এক বন্ধু আসবে আগ্রা থেকে ওর সাথেই মিট্ করতে যাব।'

'আগ্রায় কি বন্ধুর বাড়ি ?'

'না, ওখানে সার্ভিস করে। আসলে অনেক দিন পড় আসছে তো, এতদিন পর আমাদের দেখা হবে যে একে অপরকে কেমন দেখতে সেটাই আমরা ভুলে গেছি।'

'সে কি! তাহলে চিনবে কি করে ?'

'ও ঠিক চিনে নেব—'

ভদ্রলোক হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি একটু ঢপ্ দিলাম। ঢপ্ কেন, সত্যি কথাই তো বলেছি! কি দরকার ছিল এতটা বাড়িয়ে বলার! কোন দরকার ছিল না তবুও বললাম। আসলে আহীরের কথা কাউকে ভীষণ বলতে ইচ্ছে করছে। কাকে বলব? বাপিকে বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। মাকে বলা যেতে পারে। আমার এমন কোন বন্ধু নেই যার কথা মা জানেন না। কিন্তু আহীর কি কেবলই বন্ধু! আমি আহীরকে ভালোবাসি সে কথা মাকে বলতে পারব! পারবনা। কেউ আমকে ভালোবাসতে চাইলে, প্রেম পত্র দিলে সে সব কথা সঙ্গে সঙ্গে মাকে এসে বলি। কিন্তু নিজের ভালোবাসার কথা বলতে পারব না। এই মুহূর্তে তো নয়ই। আমি জানি, মাকে বললেই মা বাপিকে বলবেন। আর বাপি ছেলের নাম ঠিকানা নিয়ে আমার বিয়ের তোড়-জোড় শুরু করে দেবেন। তবে এ ঘটনা যদি স্কুল বা কলেজে পড়ার সময় ঘটত তাহলে বাপি নিশ্চত আমাকে আইনত ত্যাজ্যপুত্র, সরি ত্যাজ্যকন্যা করতেন। বলতেন, 'পড়ার ক্ষতি করে এই সব দুষ্কর্ম হচ্ছে!' সেই কোন্ ছোট বেলায়, প্রেম কথাটার অর্থই যখন ভালো করে বোধগম্য হয়নি। তখন থেকেই মা আমার ব্রেন ওয়াস্ করে দিয়েছেন। 'কোন ছেলের সাথে যদি কোনদিন প্রেম ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়িস তাহলে বাপি তোর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তোকে ছেড়ে চলে যাবেন।' আর বাপি আমাকে যতই শাসন করুন, যতই বকুন মারুন সব সহ্য হবে, কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন এ কথা ভাবলেই চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যায়। এ পৃথিবীর সব সুখ মুহূর্তে ফিকে হয়ে যায়। তাই আজীবন প্রেমের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। প্রেম নেপাল দিয়ে গেলে আমি গেছি নিমতলা দিয়ে, প্রেম জাপান দিয়ে গেলে আমি গেছি জামতলা দিয়ে। এভাবেই লুকোচুরি খেলে এসেছি এতকাল। কিন্তু কি করে জানি না এবারে আহীরের সাথে

ধাক্কা লেগে গেল! কোথায় আগ্রা আর কোথায় কলকাতা। দূরত্ব যথেষ্টই ছিল কিন্তু হোনি কো কন্ টাল সাকতা হ্যায়! যা হবার সেটা হবেই। আর তাই জবরদস্ত একটা ধাক্কা খেয়ে বর্তমানে আমি কাত খাচ্ছি। ধাক্কাটা লেগেছে একেবারে মোক্ষম জায়গায়। তবে আহীরের যে কোন চোট লাগেনি সে আমি জানি। আমাকে আহত করে দিয়ে ও বহাল তবিয়তে আছে। এমন কি আমার চোটের খবরটাও রাখেনি। ভালোই হয়েছে তা না হলে আহীরও আমার মত কষ্ট পেত। যা আমি কখনোই চাইতে পারি না। কেউ আমাকে ভালোবেসে কষ্ট পাচ্ছে ভাবলেই বুক ফেটে কান্না আসে। সিনেমায় দেখেছি, কোন মেয়ে কাউকে ভালোবেসে বাবার অমতে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে সুখের ঘর বাঁধল। আর এদিকে বাবা সেই দুঃখে অপমানে কষ্ট পেয়ে হয়ত মারাই গেলেন বা কোন অ্যাক্সিডেণ্টে পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলেন। আবার দেখা যায়, কোন বাবা জোর করে তাঁর মেয়েকে অন্য কারুর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। প্রকৃত অর্থে সুখী না হলেও মেয়েটি মোটামুটি সুখে সংসার করতে লাগল। অথচ তার প্রেমিক শোকে দুঃখে অনাহারে নিজেকে প্রায় শেষ করে এনেছে। পাগলের মত জীবন অতিবাহিত করছে। না না, এ দুটোর কোনটাই আমার কাম্য নয়। আহীরকে কষ্ট দিয়ে বাপীকে সুখী করা অথবা বাপিকে কষ্ট দিয়ে আহীরকে সুখী করা—এ দুটোর কোনটাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার চাইতে বরং তৃতীয় পন্থাটাই শতগুণে ভালো, নিজেকে কষ্ট দাও। সুখের মুখে পদাঘাত করে বাবা এবং প্রেমিকের সামনে তিল-তিল করে নিজেকে ফুরিয়ে আ'ন। এ রাস্তা অনেক সোজা। এটাই আমার পথ। আমি কৃচ্ছ্র সাধনে পারঙ্গম। ছোটবেলা থেকে এ অভ্যাস আমার আছে। নিজেকে কষ্ট দিতে আমি পটু। প্রচণ্ড খিদের মুখে নিজেকে অভুক্ত রেখে শাস্তি দিয়েছি আমি, মিথ্যে সুখের আশ্বাস দিয়ে নিজেকে ঠকাতে আমার জুড়ি নেই। মিথ্যে স্বপ্নের জাল বুনে নিজের সাথে ছলনা করতে আমি বেশ পারি। পারি না আমার জন্য কেউ কষ্ট পাক এটা মেনে নিতে। আহীর যদি আমায় কোনদিন ভালো নাও বাসে আমি মাথা পেতে নেব ঈশ্বরের সে অভিশাপ। কিন্তু আহীর আমাকে ভালোবেসে কষ্ট পাক…।

দূর! এসব ভাবছি কেন! বাপি তো বলেছেন, 'সমি যদি কাউকে পছন্দ করে ও আমাকে বলুক আমি নিজে গিয়ে ছেলের বাড়ির লোকের সাথে কথা বলব।' আর আমি নিশ্চিত আহীরকে অপছন্দ করার তুলাগ্র কারণ বাপি খুঁজে পাবেন না। তাই আমি নিশ্চিত কাউকে কষ্ট দেবে না আমার প্রেম। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবলেই ভয় লাগে। চোখের সামনে একটা সুন্দর সোনার খাঁচা দেখতে পাই। সোনার বল্লম হাতে ব্যাধ বেশে আহীর দাঁড়িয়ে আছে গেটে।

'তুমি আমাকে বন্দী করবে আহীর?'

আমার ঘুম আসছে না। রাত কত হল কি জানি! মা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে আমার কানে। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এখন

ঘুমের রাজ্যের বাসিন্দা। আহীর ও ঘুমোচ্ছে এখন। সাত তারিখ ছুটি নিয়েছে মানে এখন দেশের বাড়িতে। ওর ঘুমন্ত মুখটা কল্পনা করছি। সেই আগের মত ঝাপসা মুখ। শুধু চোখ দুটো বন্ধ দেখতে পাচ্ছি। আহীরকে স্বপ্নে দেখেছি অনেক বার। সেই ছোট বেলায় বাপি-মা বকলে আমার যে বন্ধুর কথা মনে পড়ত, সেই আহীর। আমার মননের গোপন অন্তঃকরণে সে ও একটু একটু করে বড় হয়ে উঠেছে। ভাবলে অবাক লাগে, আমার সেই মানস বন্ধু যে চিরকাল প্রহেলিকার অন্তরালে থেকে আমাকে তার অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে, তাকে যখন ছোট বেলায় কল্পনা করতাম সে তখন ছিল আমারই মত একটা শিশু, অথচ আজ সে যুবক। যেন সে তার অদৃশ্য হাত দিয়ে আমার হাত ধরে আমার সাথে প্রতিটি কদম মিলিয়ে শৈশব কৈশোরের চৌকাঠ পেরিয়ে আজ যৌবনের দ্বার প্রান্তে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা যেন একে অপরের পরিপূরক ; এককে বাদ দিলে অপর জন অসম্পূর্ণ। আহীরের প্রথম চিঠিটা পাবার পর যতবারই ওর কথা ভেবেছি সেই কুয়াশাচ্ছন্ন মুখটাই বার বার ভেসে উঠেছে আমার সামনে ; একবারও ভুল হয়নি। হ্যাঁ আহীর—ওই আমার 'বিমূর্ত' ভালোবাসা।' 'বিমূর্ত ভালোবাসা !' অনেক দিন পর মনে পড়ল কবিতাটা। বহু আগে এটা লিখেছিলাম ! একমাত্র এই কবিতাটাই মাকে শোনাই নি। শোনাতে লজ্জা লাগছিল। এ কবিতা শুনে মা যদি ভাবেন মেয়ে আমার সয়ম্বরা হয়েছে ! না না, সে ভারি লজ্জার। তাছাড়া এ যে আমার একান্তই নিজের কথা। এ কবিতা শুধু তাকে বলা যায়, যাকে নিয়ে লিখেছি। ও গো মোর 'বিমূর্ত' ভালোবাসা' তুমিই কি আহীর হয়ে আমার কাছে এলে ? তাহলে আজ তুমিই শোন এ কবিতা—

তুমি কোথায় ?
কবে আসবে তুমি ?
কেন এত দেরি করছ ?
কেমন আছ তুমি ?
কি করছ এখন ?
আমার কথা কি তোমার
একবারও মনে পড়ে না ?
আমার যে প্রতি নিয়ত কাটে
শুধু তোমারই প্রতীক্ষায়।
দিনের আলোয় কল্পনার রঙে
রাঙিয়ে নি তোমার বিমূর্ত মূর্তিকে।
নিগূঢ় একাকিত্বের মাঝে
অনুভব করি তোমার গোপন স্পর্শ।
শিরায় শিরায় বয়ে যায়
এক অনাবিল শান্ত অনুভূতি।

রাতের অন্ধকারে তুমি কতবার এসেছে
আমার ঘুমের রাজ্যের অতিথি হয়ে।
এ দুনিয়ার অগোচরে
নিস্তব্ধ পদক্ষেপে—
তুমি এসে দাঁড়িয়েছ
আমার মনের দুয়ারে।
আমার অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ হয়ে
কতবার শান্ত করেছ
আমার অশান্ত মনকে।
ঝাপসা দু চোখে তোমাকে স্পষ্ট দেখার
চেষ্টা করেছি কতবার।
কতবার তোমার দুই বাহুপাশে বন্দী হয়ে
অসাড় হয়ে গেছি আমি।
তোমার হৃদয়ের গানে
কতবার মুগ্ধ হয়েছে আমার হৃদয়।
আমার অধরের কানে
তোমার অধরের গোপন ভাষা
ব্যক্ত হয়েছে কতবার।
আমার পিয়াসী দু চোখে
কতবার প্রতিফলিত হয়েছে
তোমার তৃষ্ণার্ত চোখের ছবি।
কে তুমি?
তোমার নাম কি?
কি তোমার পরিচয়?
কিছুই জানিনে আমি;
শুধু জানি—
তুমি আমার বিমূর্ত ভালোবাসা।

আমার বিমূর্ত ভালোবাসাকে মূর্ত কর আহীর। আজ আমি অনন্ত নিদ্রায় ডুবে যাচ্ছি। তুমি আমার স্বপ্নে এস। আমার স্বপন পুরীতে রইল তোমার সাদর নিমন্ত্রণ। আমি অপেক্ষা করব তোমার পথ চেয়ে, তুমি এস বন্ধু। আহীরের রূপ ধরে এস—এস—এস। আমি নিজেকে সম্মোহিত করছি। জোর করে ঘুম পাড়াতে চাইছি, স্বপ্ন দেখার লোভে। না, স্বপ্নে আহীরকে দেখার লোভে। আমার ঘুম আসছে না। কিছুতেই আসছে না। সারা রাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিচ্ছি। নিজেকে বোঝাচ্ছি আহীর আসবে তো কি হয়েছে! আমি এত অস্থির

হচ্ছি কেন। আচ্ছা, আহীর কি তার দাদার পাত্রীকে দেখতে আসছে, না তার বন্ধু কুহেলীকে দেখতে আসছে! আমার ফটোগুলো তো এখনো ফেরত এল না! আমি যে লিখেছিলাম পছন্দ না হলে ছবি ফেরত পাঠাতে! তাহলে কি আমাকে ওনার পছন্দ করেছেন! না না, আর তা সম্ভব নয়। আমি তা পারব না। কেন যে বোকার মত ছবিগুলো পাঠাতে গেলাম! নিজের বোকামির জন্য কাঁদতে ইচ্ছে করছে। যদি পছন্দ করেন কি করে ফেরাব! হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, ওনারা যেন আমাকে অপছন্দ করেন। আমাকে যেন ওঁদের মুখের উপর না বলতে না হয়। আহীরের সাথে আমার বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই ওর দাদাকে বিয়ে করার চিন্তা মাথায় এসেছিল। কিন্তু এ বন্ধুত্ব আজ বন্ধুত্বের সীমারেখা পেরিয়ে অনেক গভীরে স্পর্শ করেছে। হা ঈশ্বর, কি জটিল মন আমার! আমি নিজেই নিজের কাছে দুর্বোধ্য। কোন মানুষকে না দেখে কি এমনি করে ভালোবাসা যায়! আমি কি সত্যিই আহীরকে ভালোবাসি! না এ আমার মিথ্যে আবেগ! কি অদ্ভুত পরিস্থিতি আমি নিজেই নিজেকে সন্দেহ করছি। বিশ্বাস করতে পারছি না। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। ভাবছি, এ রকম ঘটনা আগে কোনদিন কারুর জীবনে ঘটেছে কি না। আমার কোন বন্ধু-বান্ধব, বা কোন গল্প নভেলে অথবা সিনেমায়! না তো তেমন তো শুনিনি কখনো। এ হয় না। এ রকম ছন্নছাড়া ঘটনা ঘটতে পারে না। এ শুধুই আমার আবেগ প্রবন কল্পনা, আর আবেগ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমি আহীরকে ভালোবাসি না। কিন্তু এত কষ্ট হচ্ছে কেন তাহলে! এর আগে তো কোনদিন হয়নি। কেন একটু ঘুমাতে পারছি না! আমার সব কাজ ওলোট পালোট হয়ে গেছে। আমি কিছুতে মন দিতে পারছি না। মা কিছু বললে শুনতে পাচ্ছি না। একটা কাজ বললে অন্য কাজ করছি। বাপির পেন্ট বাথরুমে রাখতে গিয়ে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। তাই দেখে মা বলছেন, 'কি হয়েছে রে তোর! তুই এত অন্যমনস্ক কেন?' আমি হাসছি। কারণে অকারণে হাসছি। আমার গল্প লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। টেবিলের এক কোণে ডায়রি পেন পড়ে আছে। দিন রাত মাথার মধ্যে এক চিন্তা, আহীরকে এই বলব, ঐ বলব। অনেক গল্প করব। ওর কথা জানতে চাইব; ওর পছন্দ অপছন্দ। ওর ইন্টারভিউ নেব, সিনে সাংবাদিকের মত। নন্দনে যাব। আচ্ছা, আমাকে খুঁজে নিতে পারবে তো! কেন পারবে না! আমার সাদা চুড়িদার আর হলুদ ব্যাগের কথা ওকে আগেই জানিয়েছি। হাজার ভিড়ের মধ্যে থেকেও ঠিক খুঁজে নেবে। এমন শয়তান ছেলে নিজের একটা ক্লু পর্যন্ত দেয়নি যাতে করে আমি খুঁজে নিতে পারি। চোখে সানগ্লাস থাকলেও থাকতে পারে—এটা কোন আইডেন্টিটি হল! তাও আবার কনফিউশান—থাকলেও থাকতে পারে। তার মানে নাও থাকতে পারে। তখন কি করব? ব্রুট! খুঁজে নেবার সামান্যতম সুযোগটুকু আমাকে দিল না। সারা জীবন ধরে খোঁটা দেবে; বলবে—আমি তোমাকে খুঁজে নিয়েছি। আমিও হারার মেয়ে নই, বলব—পাত্র-পাত্রীর লাখ লাখ বিজ্ঞাপন পড়েছি অথচ তার মধ্যে থেকে তোমার ঘরটা ঠিক খুঁজে বের করেছি। বিজ্ঞাপনে কিন্তু ক্লু ছিল না। তোমাকে খোঁজার জন্য আমি

নিজের আইডেনটিটি দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে বিনা আইডেনটিটিতে খুঁজে নিয়েছি আমি। তাই আমার ক্রেডিট বেশী। আচ্ছা, এ চিঠি আহীরদের বক্স নাম্বারে না দিয়ে যদি অন্য কোথাও দিতাম! তাহলে তো আহীরকে পেতাম না! অন্য কোন একজন—অন্য কোন খানে—না না দূরে! অন্য কারুর কথা ভাবতেই বিরক্ত লাগছে। অথচ বিজ্ঞাপনে আহীরের ডেসক্রিপশান ছিল না, ছিল ওর দাদার। আর ও যদি আমার চিঠির উত্তর না দিত, হয়ত ওর বাবাই দিতেন যেমন সবাইকে দিয়ে থাকেন—আমি তো সে চিঠির জবাবও দিতাম না। তাহলে কি হত! কি হলে কি হত জানি না। কি হয়েছে সেটুকু জানি। এতদিনের অহঙ্কারকে চূর্ণ করে আজ ভাগ্যকে মানতে ইচ্ছে করছে। এ ভাগ্যচক্র নয় তো কি! অন্য কি নাম দেওয়া যায় একে! আমার নিজেকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে। আমি ঠিক মানুষটাকে খুঁজে নিতে পেরেছি। কোন ভুল হয়নি আমার! যাকে ভীষণ বলতে ইচ্ছে করছে আমার এ বিজয়ের কথা। যার কাছ থেকে কথা লুকোনোর অভ্যাস আমার নেই। মনে হচ্ছে পেট ফেটে যাবে। যাগ্‌গে, এখন বলা ঠিক হবে না। তাহলে হয়ত বলবেন বাড়িতে নিয়ে আয়। বিয়ের আগেই জামাই আদর শুরু করে দেবেন, দরকার নেই বাবা।

চিঠিটা পড়ছি—'ওখানে যাকে সবচেয়ে কালো আর কুৎসিত মনে হবে সেই হবে তোমার বন্ধু...'। এই তো দিয়েছে নিজের ডেসক্রিপশান। মিথ্যেবাদী কোথাকার! আমি জানি তুমি কুৎসিত নও। আর সত্যিই যদি কুৎসিত হও; সে তো অন্যের চোখে, আমার চোখে তো নও। এ পৃথিবীতে, প্রেমিকের মুখের চাইতে সুন্দর মুখ আর কারুর হয় নাকি! যে ভালোবাসে একমাত্র সেই বোঝে এ রূপ। তোমাকে কখনো স্পষ্ট দেখিনি ঠিকই, যতবার দেখেছি মনে হয়েছে ঘষা কাঁচের উল্টো দিকের ঘটনা। তবুও বলব তুমি সুন্দর। কারণ আমি জানি তুমি সুন্দর—

আমি দেখেছি তোমায়
কুয়াশা ঝরা প্রাতে,
মিলেছি মোরা পরস্পরে
চাঁদ ডোবা নিশুতি রাতে
দেখি দেখি করে, দেখা হয় নাই
তবু দেখেছি তোমায়
আমারই দুটি আঁখিতে।

আজ তের তারিখ। তিন রাতের বিনিদ্র চোখ দুটো কেমন যেন ছোট হয়ে গেছে। চুম্বকের আকর্ষণে ভিতরের দিকে টানছে। শরীরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। শুধু তো ঘুম নয়, আমি খেতেও পারিনি। কালই শরীরটা অসুস্থ লাগছিল, আজ আরো বেশী মনে হচ্ছে। সারা শরীরে যত রাজ্যের অশান্তি—ডান চোখের উপরের পাতায় আধখানা মটর কড়াই-এর মত বেশ বড়সড় একটা আনজিনি হয়েছে। এই তিন দিনেই তার যত বাড় বাড়ন্ত। করকর করছে, যেন চোখে বালি পড়েছে। ডান গালে

একটা ছোট্ট ব্রন হয়েছিল। কোথায় যেন রূপচর্চায় পড়েছিলাম কাঁচা রসুনের রস লাগালে নাকি ভালো হয়ে যায়। লাগাও কাঁচা রসুন। গত দুদিন ধরে সর্বক্ষণ কাঁচা রসুনের ছোপ লাগিয়ে রেখেছি। প্রচণ্ড জ্বালা জ্বালা করছিল, ভাবলাম বুঝি দ্রুত কাজ হচ্ছে। ও মা! এ রকম কাজ হচ্ছে কি করে বুঝব! সকালে রসুনের আস্তরণ সরিয়ে দেখি সেই জায়গায় বেশ ডাগর মত একটা ফোস্কা পড়ে গেছে। নিজের ডাক্তারিতে নিজেই কাৎ। তাড়াতাড়ি সারাবার জন্য এমন ওভার ডোজ চাপিয়েছি যে জায়গাটা পুড়ে গেছে। সব সময় মনে হচ্ছে গালের উপর একটা মাছি বসে আছে। যতই তাড়াও উড়তে চাইছে না। অর্থাৎ এই তিন দিনে আমার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সকালে মুখের দিকে তাকিয়ে বাপি অবাক—'কি করেছিস রে?'

'আর কি করেছিস। কেউ কি ইচ্ছে করে এমন করে! হয়ে গেছে আর কি করব।'

'কিন্তু হলটা কি করে? কাল তো ওটা ছিল না। এক রাতেই এত বড় ফোস্কা তৈরী করলি কি করে?'

বাপির কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি আমার ক্রেডিটের তারিফ করছেন। কিন্তু কি কেরামতি করেছি শুনলে তেড়ে মারতে আসবেন। না বলেও উপায় নেই। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করছেন।

'ব্রন হয়েছিল, তাতে কাঁচা রসুন লাগিয়েছি।'

'কাঁচা রসুন! কে লাগাতে বলেছিল?'

সেই পরোপকারী বিউটিসিয়ান বন্ধুর নামটা মনে নেই, থাকলে না হয় বলা যেত। তাই বললাম, 'কাগজে পড়েছিলাম।'

'উজবুক! গর্ধবের মত বুদ্ধি। মুখের নরম চামড়া রসুনের রসে পুড়ে যাবে তুমি জান না? এর আগে তো কোনদিন লাগাস নি! আজ হঠাৎ ডাক্তারি করতে গেলি কেন! ভাল হয়েছে, খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে।'

বাপির বকুনি খেয়ে আরো দুর্বল হয়ে গেছি। শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। দূর! নিকুচি করেছে- গুলি মা'র শরীরে, মনের জোর আমার অফুরন্ত। আমি পারব যথা সময়ে ঠিক জায়গা খুঁজে নিতে। এইটুকু অসুস্থতায় কাৎ থাবার বান্দা আমি নই। সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। সুযোগ খুঁজছি বাপির অনুমতি নেবার। না বলে তো যাওয়াব উপায় নেই। আর আজ অ্যাক্টিং ক্লাসেরও দিন নয়। তাই উইদাউট পার্মিশানে বাইরে যাওয়ার রাইট নেই। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না। সাত সকালেই ব্রন নিয়ে কারিকুরি করে একটা তুলকালাম হয়ে গেছে। বাপি এখনো তেতে আছেন। কথা বলতে গেলাম পাত্তাই দিচ্ছেন না। ভয়ও পাচ্ছে; একবার না করে দিলে কেল্লাফতে। আমার অভিসারে যাওয়ার পথে পানি। মনে মনে বলছি, ওসব ছাড়। এতদিন অনেক নিষেধ মেনেছি, কখনো মুখের উপর তর্ক করিনি, বা অবাধ্যের মত আঙুল নেড়ে জানতে চাইনি একটাও কথা। কিন্তু আজ আমার মরণ-বাঁচন সমস্যা।

বিদ্যাসাগরের মত দামোদর পেরিয়ে যেতে হলেও যাব। তারপর ইতিহাস হয়ে যাব আমি। কত প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেরণা পাবে আমার এ কীর্তি পড়ে। একটা কংক্রীট এগজামপ্‌ল হয়ে যাব প্রেমের দুনিয়ায়। আমার পোট্রেট সবাই ঘরে বাঁধিয়ে তাতে ফুলের হার চড়াবে। দূর! মুখেই যত লম্বা লম্বা বোলচাল; অত মনের জোর কোথায়! এদিকে বলে পিলে আমার শুকিয়ে শুঁটকি মাছ হয়ে গেল; বসে বসে খালি লেকচার মারছে। কংক্রীট এগজামপ্‌ল হবে না ছাই হবে! একটা সুবৃহৎ হস্তি ডিম্ব হবে। জানোয়ারদের মিউজিয়ামে জায়গা পাবে; রেয়ার স্পিসিস্‌ হিসাবে। নিজেকে হতচ্ছাড়া জানোয়ার ফানোয়ার বলে একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। হঠাৎ অন্তরাত্মা কাল কেউটের মত ফোঁস্‌ করে উঠল। এ কি আত্মা অবমাননা! না, দিস ইজ নট ফেয়ার। আমি যথেষ্ট ওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড বুদ্ধিমতি। নিজের সম্বন্ধে ঐরকম জঘন্য ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। অন্তরাত্মা আমাকে অনুপ্রাণিত করছে—'যাও. অ্যান্ড টেল ইওর ফাদার হোয়াটস্‌ দা প্রবলেম'। আমাকে যেন কেউ ড্রাগ ইনজেক্ট করে দিয়েছে। আমি ডোপ করে অলিম্পিকে খেলতে নামছি। ধরা পড়ে যাবার চিন্তা আমার মাথায় নেই। বাপিকে কি বাহানা দেখাব সে ডায়লগ আগেই রেডি করা ছিল। গত দুদিন ধরে রিহর্স করেছি রীতিমত। আর্জি পেশ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে চিফ্‌ জাস্টিস-এর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার কাছে দাঁড়াতেই বাপির চোখে চোখ পড়ে গেল। আমার ভিতরের কেউটেটা টুক করে ফণা নামিয়ে নিল। যেন নাকের ডগায় কেউ বশীকরণ শিকড় চেপে ধরেছে। ভেংচি কাটলাম নিজেকে, অ্যাঁ! বিষ নেই তার আবার কুলো পানা চক্কর।

'কিছু বলবি?'

গলার সুর নরম। একটু সাহস পেলাম বুকে।

'হ্যাঁ, আজ একটু শিয়ালদায় যাব।' দুম করে বলে ফেললাম।

'কেন?' কলেজে যাবেন বলে ড্রেসিং করছিলেন। ডান পায়ের পাতা অর্ধেকটা মোজার ভিতর। হাত থমকে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ তো বৃহস্পতিবার অ্যাকটিং ক্লাস তো নেই! কি জন্য যাবি?'

'আজ ওখানে একজন লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক আসবেন। আমার একটা লেখা দেব ওনাকে। তাই—'

'শুধু ঐ সামান্য কারণের জন্য যেতে হবে!' মোজা ধীরে ধীরে গোড়ালি গ্রাস করছে। 'যেদিন ক্লাস থাকে সেদিন কাজগুলো সেরে নিতে পারিস না?'

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম জপছি। যেন মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। মুখ ফসকে যদি একবার না বেরিয়ে আসে তাহলে আমার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে। ভাবছি, না বললেই এক ছুটে বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে; যেদিকে রাস্তা পাব চলে যাব। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে নো কম্প্রোমাইজ।

'আজ তোর কম্পিউটার আছে না? আজ তো প্র্যাকটিক্যাল আছে!'

'প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস চেঞ্জ হয়ে গেছে। কাল আছে।' এটা মিথ্যে নয়।

'টিউশনির কি হবে?'

'ওদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি।'

'ও, আগে থেকে সব ঠিক ছিল! আর আমাকে এই শেষ মুহূর্তে বলতে এসেছিস! যখন আমার কথা বলার সময় নেই।' নিজের চালাকিতে হাসি পেল। এর আগেও কয়েকবার এ রকম করেছি। ঠিক কলেজে বের হবার মুখে বাপি যখন খুব তাড়াহুড়ো করেন, সেটাই আর্জি পেশ করার মোক্ষম সময়। তবে সব সময় যে বিল পাশ হয় তাও নয়। মাঝে মাঝে দুম করে না বলে দিয়ে বেরিয়ে যান। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে তারপরও আবার বাইরে পা রাখবে! আমার ঘাড়ে তো একটাই মাত্র। তবে বেশীর ভাগ সময় হ্যাঁ হয়। তবুও, একটা রিস্ক থেকেই যায়। সেটুকু তো আমাকে নিতেই হবে, কথায় আছে নো রিস্ক নো গেইন।

'ভদ্রলোক কটার সময় আসবেন?'

'তিনটে।'

'তুই কখন যাবি?'

'দুটো নাগাদ বের হব।'

যাক্ বাবা বাঁচা গেল। খাঁড়া সরে গিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে। মনে মনে বাপির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

'তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। রাতে ঘুমাসনি না কি?'

'না তো, ঘুমিয়েছি তো। আমি ঠিক যেতে পারব।'

আমি জানি এটা বাপির লাস্ট অজুহাত। বলবেন তোর শরীর খারাপ আজ কোথাও যেতে হবে না। তাই আগে ভাগে বলে দিলাম আমি যেতে পারব।

'সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরবি। একদম দেরি করবি না।'

আগে তো যাই তারপর বাড়ি ফেরা। নানা জোরে নয়, মনে মনেই বললাম। আমার যত সাহস সবই তো মনে মনে। বহিঃপ্রকাশের পথে পাহাড়। ডিঙোবার সাধ্য নেই। মনে হচ্ছে আমি স্পোর্টস-এর পজিশান বক্সের সবচাইতে উঁচু ধাপটায় দাঁড়িয়ে আছি। অলিম্পিকে সোনা জেতার মত আনন্দ হচ্ছে। অন্তরাত্মার ডোপে কাজ হয়েছে তাহলে। থ্রি চিয়ার্স ফর অন্তরাত্মা। আহা! ফণা দুলিয়ে নাচছে দেখ!

বাপি কলেজে বেরিয়ে যাবার পর আমি হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছি। ছোটা-ছুটি করে ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি, জামা বের করছি, জল তুলছি, স্নান করতে যাচ্ছি, ভাত দাও জল দাও করছি। কি অসম্ভব ব্যস্ততা। মা আর থাকতে না পেরে বললেন 'তুই তো যাবি দুটোর সময় এখনই অত তাড়াহুড়ো করছিস কেন?'

কি জানি! আমি তো নিজেই জানি না, তোমায় বলব কি! এ ডায়লগগুলো মনে মনে আওড়ালাম। আমি সত্যি সত্যিই প্রেম করতে যাচ্ছি। যেমন সবাই যায়। বাড়িতে না বলে, বাবা মাকে মিথ্যে বলে, চুরি করে দেখা করতে যায়। এতদিন বন্ধুরা এসব করত। শুনে ভাবতাম কি ক'রে! আজ আমিই সে পথে পা

বাড়িয়েছি। আমার প্রথম পদক্ষেপ ভারি হয়ে আছে মিথ্যের ভারে। যাব হাওড়ায় বললাম শিয়ালদায়। দেখা করব আহীরের সাথে বললাম লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। কি ডাহা মিথ্যেবাদী আমি! না না ডাহা নয়, শুধু মিথ্যেবাদী। কারণ এ মিথ্যে বলতে আমার কষ্ট হয়েছে। পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। তবে পুরোটা মিথ্যে নয়। গত সপ্তাহতেই সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন এবং তাঁর ম্যাগাজিনের জন্য আমার একটা লেখা নিয়ে গেছেন। আমি তো কেবল অতীতে যেটা ঘটে গেছে সেটা ভবিষ্যতে ঘটবে বলে আমার বর্তমানটাকে বাঁচিয়েছি। এর বেশী কিছু অপরাধ করিনি। অপরাধ নিও না বাপি।

ঘড়িতে দেটটা বাজে। আমি তৈরী। পরনে সাদা সুতির চুড়িদার। কাঁধে হলুদ ব্যাগ কালো জেব্রা স্ট্রাইপ ওয়ালা। আর আধ ঘণ্টা পর বের হব। কিন্তু ঘড়ির কাঁটাগুলো যেন থমকে গেছে। সেকেণ্ডের কাঁটাটা যেন রিকেট রুগীদের মত পা টেনে টেনে অতি কষ্টে হাঁটছে। টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে না। হার্টফেল করা মানুষের মত স্পন্দন হীন। হাত ঘড়ির সাথে দেওয়াল ঘড়িটা মেলাচ্ছি। দুটো ঘড়িই যেন যুক্তি করে আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। আধ ঘণ্টা কাটল এক ঘণ্টা পর। দুটো বাজতে পাঁচে বেরিয়ে পড়লাম। মাকে বললাম, 'ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করবে না।' মা বললেন, 'ওসব আমি জানি না। বাপি তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে ফিরবি। দেরি হলে খুব রাগারাগি করবে কিন্তু, তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

বাসে বসে আছি। কোন টেনশান নেই। বাস এগিয়ে চলেছে নিজের গতিতে। আমার মন স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে আমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। পরীক্ষার রুটিন হাতে নিয়ে টেনশান হত। পরীক্ষার কথা ভাবলে টেনশান হত। পরীক্ষা দিতে যাবার সময় হয়ত একটু হত, কিন্তু ক্লাসে ঢুকে টোটালি টেনশান ফ্রী। এ আমার এক অদ্ভুত মানসিকতা। আমি কাউকে এমন অদ্ভুত কথা বলতে শুনিনি। পরীক্ষার সময় আমার খুব আনন্দ হত। কেমন একটার পর একটা পেপার কম্প্লিট হয়ে যাচ্ছে! আট দিন পর কিছুদিনের জন্য অন্তত পড়া থেকে একটু রেহাই পাব। কি লিখব কখনো ভাবতাম না, পরীক্ষার পর ছুটি পাব সেটা ভেবেই আহ্লাদিত হতাম! শুধু একটা দিন ব্যাতিক্রম ঘটেছিল। মাধ্যমিকে অঙ্ক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি বাপির সাথে। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও স্বাভাবিক ভাবেই যাচ্ছিলাম। অঙ্ক পরীক্ষা বলে এক্সট্রা কোন টেনশান মাথায় ছিল না। যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম সেখানেই কিছু বাচ্চা ছেলে ফুটবল দিয়ে ক্রিকেট খেলছিল। ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটতেই সে এমন একটা শট্ মারল ফুটবলটা সোজা এসে লাগল আমার মাথায়। আমি বোঁ—ও—ও করে এক পাক ঘুরে গেলাম। মনে হল আমি আর নেই। বাপি ধরে ফেলেছেন আমাকে। ছেলেগুলো ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কে মেরেছে আমি দেখিনি কিন্তু সামনে যাকে পেলাম তার দিকেই তেড়ে গেছি—'জ্যান্ত পুতে ফেলব একেবারে। রাস্তায় খেলা হচ্ছে না! মামদোবাজি পেয়েছ!' বাপি গিয়ে হাতটা না ধরলে ঠেসে এক চাঁটি কসিয়ে দিলাম। বাপি বললেন, 'ওরা খেয়াল করেনি লেগে গেছে, চল।' আমি যে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি ভুলে গেছি। কি রকম অ্যাবনরম্যাল লাগছে। এক

ঘায়েতেই শালারা আমার সাড়ে সব্বনাশ করে দিয়েছে। আমাদের পরীক্ষার সেণ্টা বাসে যেতে হত। মাঝে মাঝে রিক্সয় যেতাম। সেদিনও বাপি রিক্স করলেন। সা রাস্তা আমি গুম হয়ে আছি। বাপি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন আমার হে অফিসের অ্যান্টেনা ঘুরে গেছে। অভয় দিচ্ছেন, কত কিছু বোঝাচ্ছেন আমাকে সব আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে; পিকচার টিউবে কিছুই ধরা পড়ছে না সেণ্টারে গিয়ে খাতা খুলেও একবার দেখলাম না। ওয়ার্নিং বেল বাজতেই বায় ধরলাম আমি পরীক্ষা দেব না। কিছুতেই ক্লাসে যাব না। বাপির হাতটা শ করে ধরে কাঁদছি। মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে যথাস্থানে কিচ্ছু নেই। জ্যামি চলে গেছে পরিমিতির ঘাড়ে, পাটিগণিত চলে গেছে বীজগণিতের মাথায়। সে কেলেংকারি! মাথার ভিতরে যেন উদো আর বুদো ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে একে অপরে পিণ্ডি খাচ্ছে, আর আমার প্র্যাকটিশ করা অংকগুলো নিয়ে লাথালাথি করে ফুটব খেলছে। আমাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে বাপির ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে। আমা বন্ধুদের গার্জেনরা এসে আমাকে বোঝাচ্ছেন, 'তুমি পরীক্ষা দাও—যা পারবে তা দাও। ক্লাসে যাও, কোশ্চেন পেপার হাতে পেলে দেখবে কত জানা অংক পাবে বাপি গায়ে পিঠে হাত বোলাচ্ছেন, 'সমি, যা মা লক্ষ্মীটি। আমি বলছি তুই পারবি তোর সব অংক করা। আমি নিচে অপেক্ষা করছি, তোর শরীর খারাপ লাগে পরীক্ষা দিতে হবে না, চলে আসিস। আমি এখানেই থাকব। যা।'

অগণতি গুরুজনের আশির্বাদ মাথায় নিয়ে ক্লাসে ঢুকলাম। এক সময় নেমে এলা ঠিকই কিন্তু লাস্ট ঘণ্টা পড়ার পর। ঝাড়া তিন ঘণ্টা বাকি সতীর্থদের সাথে ব উদো আর বুদোর অংক নিয়ে লোফালুফি খেলার পিণ্ডি চটকে ছাড়লাম। লাস বেল পড়তে নেমে এসে দেখলাম বাপি সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। চো ফেটে জল এল আমার। মনে হল বাপিকে জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদি। আমার পরীক্ষ খারাপ হয়েছে বলে নয়। বাপিকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল এই তিন ঘণ্টা বাপি যে কি অসম্ভব টেনশানের মধ্যে কাটিয়েছেন সে ওনার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। আমার চোখে জল দেখে শান্ত ভাবে বললেন—

'কাঁদছিস কেন? কিছু অংক করেছিস তো?'

'আমি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললাম।'

'ওতেই হবে।' কোশ্চেন উল্টে পাল্টে দেখে বললেন, 'এই তো তোর জানা অং পড়েছে। চিন্তা করিস না, একটা স্ট্যাণ্ডার্ড মার্কস্ এর থেকে পেয়ে যাবি।'

বাপির এই এক মস্ত বড় গুণ। শুধু ঐ দিন বলে না। বরাবর দেখেছি। ব গার্জেনকে দেখেছি পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে এটা কি লিখেছিস ওটা কি লিখেছি করে ছেলে মেয়েদের উত্তক্ত করে মারেন। মনের মত উত্তর না পেলে রাস্তাতেই চেঁচামে হাতাহাতি শুরু করে দেন। অথচ আমার বাপি; কোনদিন তা করতেন না কোশ্চেন পেপারে যা দাগ দেওয়া থাকত তাই কাউণ্ট করে একটা নাম্বার কোশ্চেনের ফ্রণ্ট পেজে লিখে রাখতেন। রেজাল্টের সাথে প্রায়ই তা মিলে যেত

মাধ্যমিকেও মিলেছিল। রেজাল্ট হাতে নিয়ে সেই বলমারা ছেলেটার কথা মনে পড়েছিল। আমি কতটুকু পারি না পারি সেটা আমার চাইতে বাপি বেশী ভালো জানতেন। আর যে বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে এলাম সেটা খারাপ হোক, ভালো হোক তা নিয়ে আর কোন আলোচনা করতেন না। পরের দিনের বিষয়ের সব বই খাতা এক জায়গায় গুছানো থাকত, সেটাই হাতে তুলে দিতেন। পরীক্ষা কটা দিন আমি যেন বাদশাহী বেগম। মারা তো দূরের কথা একটুও বকুনি খেতাম না। আমাকে বাপি তুলোয় করে রাখতেন। মাঝে মাঝে নিজের উপর খুব রাগ হয়। আমি এমন একটা অকম্মার ঢেঁকি বাপির স্বপ্নকে সার্থক করতে পারলাম না। ভীষণ অপরাধী মনে হয় নিজেকে। বাপি চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই। পয়সার অভাবে উনি যা হতে পারেননি, জলের মত পয়সা খরচা করে আমাকে সেটাই তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার শরীর মন দুটোর কোনটাই ডাক্তার হবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমার পিশতুতো দাদার এক মাস্টার মশাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি বড় হয়ে কি হবে?' এখন যেমন আমরা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করি আর কি। সিম্পলি কৌতুহল বশত, যে বাচ্চাটা কি বলে! আমি বলেছিলাম ডাক্তার হব। ডাক্তার হতে গেলে যে অনেক লেখাপড়া করতে হয় তখন তা জানতাম না। আর যেটা বলেছিলাম ওটা আমার নিজের মতামত নয়। ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম বাপি চান আমি বড় হয়ে ডাক্তার হই; তাই বলেছিলাম। অবশ্য উনি পাল্টা আর একটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'ডাক্তার যে হবে বলছ, কি ডাক্তার হবে?'

আমি বলেছিলাম, 'হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।'

আমার উত্তর শুনে উনি হেসেছিলেন মনে আছে। কি ভেবেছিলেন বা আদৌ কিছু ভেবেছিলেন কি না আমি বলতে পারব না। কারণ তখন আমার অত বোধশক্তি হয়নি। তবে এটুকু জানতাম হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মানেই কাগজ মুড়ে পুরিয়া করো আর লজেন্সের মত মিষ্টি মিষ্টি গুলি গুলি ওষুধ দাও। কাজটা খুবই সহজ। এ ওষুধ খেতেও মজা দিতেও মজা। দশটার জায়গায় বিশটা খাওয়া যায়। যদিও অ্যালপ্যাথি ওষুধগুলো খুব সুন্দর সুন্দর দেখতে হয়। তা হোক, অ্যালপ্যাথি ডাক্তার মানে তো ছুরি কাঁচি দিয়ে মানুষের পেট কাটে, অপারেশন করে। সুচ ফুটিয়ে মানুষের রক্ত নেয়। ইনজেকশান দেয়, আর তেতো তেতো ওষুধ খেতে দেয়। এগুলোর একটাও আমার ভালোলাগে না। আমি নিজে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বায়না করতাম 'আমাকে ইনজেকশান দেবেন না ডাক্তারবাবু। যত শক্ত অসুখই হোক ওষুধ দিয়ে ভালো করে দিন। তেতো ওষুধ নাক টিপে খেয়ে নেব কিন্তু ইনজেকশান নিতে পারব না।' উনি আমার কথা রেখেছেন, এত বড় হয়ে গেছি এখনো গায়ে সুচ ফোটান নি। তবে একটুতেই খচখচ করে লিখে দেন ব্লাড টেস্ট করাতে হবে। ছোট বেলায় ব্লাড দেবার সময় বাপিকে শক্ত করে চেপে ধরতাম। বাপির বিশাল বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে চোখ বুজিয়ে ভাবতাম, মৃত্যুর এত ক্ষমতা নেই যে বাপির কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে যায়। বাপির প্রতি আমার অগাধ

আস্থা, সীমাহীন নির্ভরতা। একবার গালে ডট পেনের নিব ফুটে গেছিল. সে কি রক্তারক্তি কাণ্ড। তখন কলেজে পড়ি। ভাই জোর করে নিয়ে গেছিল টিটেনাস দেওয়াতে। মনে আছে ওকে এত জোরে চেপে ধরেছিলাম যে আমার পাঁচটা নখের দাগ বসে গেছিল ওর হাতে। শুধু কি তাই! আমার হাতের মধ্যে সুচের ডগা বেঁকে গেছিল। সে ডাক্তারের কি বকুনি! 'এত বড় মেয়ে এখনো ইনজেকশান দেখে এত ভয়! সুচের ডগা ভেঙে যদি ভিতরে রয়ে যেত! মারাত্মক কাণ্ড হত। তখন হাত কেটে বের করতে হত।' সে আরও কত কি। আর রক্তের কথা না বলাই ভালো। কারুর যদি একটু কেটে গিয়ে রক্ত বের হতে দেখি তো আমার হাত পা অবশ হয়ে যায়। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, একটা ফুল ছেঁড়ার মত ক্ষমতা থাকে না। সেই সময়কারই একটা ঘটনা। একদিন আমার এক জেঠুর বাড়ি গেছি। উনি দাঁতের ডাক্তার। মার একটা দাঁত তোলানোর জন্যই বাপি মা আমি আর ঠাকুমা চারজনে গেছিলাম। দাঁত তোলার সময় আমি দেখিনি; অত সাহস আমার নেই। আমি বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেছিলাম পাছে মার যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পাই। দাঁত তোলার পর জেঠু মাকে এক গ্লাস বেগুনি রঙের জল দিয়ে বার বার সেটা মুখে নিয়ে কুলি করে ফেলতে বলেছিলেন। জেঠু বললেন ওটা দিয়ে মুখ ধুলে রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যাবে। সবাই দালানে বসে গল্প করছেন। উঠান পেরিয়ে একটা নালা আছে মা সেখানে বসেই বেগুনী তরলটা দিয়ে কুলি করছেন, আর আমি বাঁশের একটা খুঁটি জড়িয়ে ধরে মার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি মা যত কুলি করছেন মুখ দিয়ে তত তাজা তাজা রক্ত বের হচ্ছে। আমি মাকে জিগ্যেস করছি, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? মা ঘাড় নেড়ে না বললেন। হঠাৎ মনে হল আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! আমি বাপির কাছে গিয়ে একটু বসি। কিন্তু যেতে পারছি না। সারা শরীর টলছে; মাথা ভারি হয়ে গেছে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা। বাপি ঠাকুমা, জেঠুর মুখগুলো সব বড় বড় হয়ে গেছে। আমার মুঠো আলগা হয়ে আসছে। আমি পড়ে যাচ্ছি অথচ কাউকে ডাকতে পারছি না। পরে যখন জ্ঞান ফিরল. দেখি বিছানায় শুয়ে আছি। চোখ খুলে দেখি সবাই উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন। ঠাকুমা তো কেঁদেই ফেলেছেন। জেঠু বাপিকে বলছেন, 'ওর নার্ভ ভীষণ উইক: একটু সাবধানে রাখিস।'

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন. 'কিরে, কষ্ট হচ্ছে আর? কি হয়েছিল, পড়ে গেলি কেন হঠাৎ?'

'মার রক্ত দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল।'

'কষ্ট হচ্ছিল তো দেখছিলি কেন! এখানে চলে আসতে পারতিস।'

'আসতে চেষ্টা করছিলাম, পারিনি। মাথাটা কেমন হয়ে গেল।'

আর একবার, এই কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। সোনামার হাতে ঘা হয়েছিল, ড্রেসিং করাতে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছিলাম। সোনামা বেডে শুয়ে আছেন, ঘায়ের ওপর থেকে পুরানো ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হয়েছে। ঘাটা দেখে আমার শরীর

মনে সেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সোনামার মুখে যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ দেখে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। দু হাত দূরে চেয়ারটাতে গিয়ে বসব সে ক্ষমতাও নেই! সোনামার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। দুমড়ে মুচড়ে কি অদ্ভুতভাবে পড়ে গেলুম। সেন্স ফিরতে ডাক্তারবাবু সোনামাকে বলছেন, 'আপনি কাকে সঙ্গে এনেছেন, ও আপনাকে প্রোটেক্ট করবে না আপনি ওকে প্রোটেক্ট করবেন!'

আলমারির কোন লেগে পিঠটা চিরে গেছে। একটুর জন্য মাথাটা নাকি বড্ড জোর বেঁচে গেছে। সোনামা বলছেন, 'আর কখনো তোকে আনব!'

এ রকম একটা ওয়ার্থলেস মেয়েকে নিয়ে বাপি যদি ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখেন সেটা কি আমার দোষ! উনি যদি এখন বেলে মাটিতে ধান বুনতে চান, তা কি সম্ভব! তবে প্রকৃতি আমাকে ডাক্তার হবার অযোগ্য করে তৈরী করেছে ঠিকই কিন্তু নিজের চেষ্টায় আমি নিজেকে একজন পেসেন্টে পরিণত করতে পেরেছি। বাপির স্বপ্নকে সফল করতে না পারার শাস্তি আমি নিজেই নিজেকে দিয়েছি। এটাই আমার বড় সান্ত্বনা। যাপ্‌গে, এখন তো আমার মাথায় বল লাগেনি তাহলে এ রকম ট্র্যাক মিস্ করছি কেন! আমি তো যাচ্ছিলাম আহীরের সঙ্গে দেখা করতে। ঐ তো আমি। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। দুটো পঁয়ত্রিশে গাড়ি হাওড়া স্টেশানে পৌঁছল। বাস থেকে নেমে ডিরেক্‌শান অনুযায়ী গেলাম খানিকটা। দু একজনকে জিগ্যেস করে এগিয়ে গেলাম আরও খানিকটা। দু কদম যাই আর জিগ্যেস করি, পাছে বেলাইন হয়ে যাই। হাতে বেশী সময় নেই, ভুল রাস্তায় চলে গেলে আবার ফিরতে সময় লাগবে। আমি চাই আহীরের আগে যথাস্থানে গিয়ে পেঁাছতে! আমি ওর জন্য দশ মিনিট ওয়েট করব সেও ভালো ও যেন আমার জন্য এক মিনিট ও ওয়েট না করে। এসেই যেন আমাকে দেখতে পায়। শুধু আহীর বলে নয়। এটা আমার প্রিন্‌সিপ্যাল, আমি যাকেই কথা দি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে সেখানে পেঁাছোই। বন্ধু মহলে আমার পাংচুয়ালিটির গুড উইল আছে। তবে এই অপেক্ষা পাঁচ দশ মিনিট করা যায়; নিদেন পক্ষে পনের মিনিট। তার বেশী দাঁড়াতে হলে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে স্টিম বের হতে শুরু করে। রাগের চোটে মনে হয় রকেটের মত মহাশূন্যে উড়ে যাব। যার জন্য অপেক্ষা করছি তার বাপান্ত ছাড়া বাকি সব গালাগালি দি। কি করব সময়টা তো কাটাতে হবে! মুখ বন্ধ করে তো আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আর কতটা যেতে হবে কে জানে! যাকেই জিগ্যেস করি বলে আরও এগিয়ে যান। হাঁটছি তো হাঁটছি, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে না কি! সামনে একটা হালকা রঙের বড় বাড়ি। হাওড়ার ব্রীজের উপর দিয়ে বাসে করে আসার সময় এই বাড়িটা দেখেছি অনেকবার। দুজন ভদ্রলোক আসছেন, ওঁদের একবার জিগ্যেস করে দেখি, যাব্বাবা হিন্দুস্থানী! কোয়ি বাত নেহি—'ভাই সাহব, ইহাঁ জো কম্পিউটারাইজড্ রিজার্ভেশান কাউন্টার হ্যায় না, উও কিধার হ্যায় জরা বতায়েঙ্গে প্লীজ!'

সামনের বড় বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে, 'ইসি বিল্ডিং মে হ্যায়। সেকেণ্ড

ফ্লোর মে ; আপ সিধে চলে যাইয়ে। উও জো প্যাহেলা সিঁড়ি হ্যায়, উঁহাসে দাইনে তরফ মুড় যাইয়ে গা —সিধা নেহী, সিধা প্ল্যাটফর্ম হ্যায়। দাইনে তরফ উপর যানে কি সিঁড়ি মিল জায়েগি।'

'সুক্রিয়া, বহুত বহুত সুক্রিয়া।'

'ওয়েলকাম।'

আমি পুলকিত। মুঝে মেরা মঞ্জিল মিল গায়া। উনি এমন জলবৎ তরলং করে বুঝিয়ে দিলেন আমার সেই শিয়ালদার ওষুধ দাদুর কথা মনে পড়ে গেল। আমি শুধু তেল চেয়েছিলাম, উনি তেল গামছা সাবান জালি সব এনে দিয়েছেন। সেকেণ্ড ফ্লোর দাইনে তরফ প্যাহেলা সিঁড়ি—আমি চটপট ম্যাপ অনুযায়ী এগিয়ে চললাম। সেকেণ্ড ফ্লোরের মুখেই বড় একটা সাইন বোর্ড—

"Computerised Reservation Counter."

পরপর চার পাঁচটা কাউন্টারের সামনে মানুষের দীর্ঘ লাইন। আমি ঢোকার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলাম, দরোয়ানের মত। আমার দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ ঢুকতে পারবে না। কোন সানগ্লাসধারীকে দেখলেই খপাত্ করে হাতটা চেপে ধরব। হাত উল্টে ঘড়ি দেখলাম, তিনটে বাজতে সাত মিনিট বাকি। তারমানে এটা খুঁজতে পনের মিনিটের মত সময় নিয়েছি। বড় বড় টেবিল ফ্যানগুলো দেওয়ালে কাত করে লাগানো আছে। দু পা পেছিয়ে চার পা এগিয়ে পজিশান মত নিজেকে দাঁড় করালাম। পাখার হাওয়া তাক্ করে এসে ফুর্ ফুর্ করে আছড়ে পড়ছে আমার উপর। বাইরে যা প্রচণ্ড রোদ, চামড়া ঝলসে গেছিল। নিজেকে শীতল করছি আর ভাবছি আহীর এসে কোথাও দাঁড়িয়ে নেই তো! ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু ছেলে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আহীরকে চেনার চেষ্টা করছি। দু এক জনের চোখে চোখ পড়ে গেল। দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। এভাবে অপরিচিতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার অভ্যাস আমার নেই। তবুও দেখছি। ঘড়ির কাঁটা পুলিশে তাড়া খাওয়া চোরের মত ছুটছে। তিনটের চৌকাঠ পেরিয়ে দশ পাঁচ পনের হয়ে গেল। কোথায় আহীর! আমার অধৈর্য্য লাগছে। ও নিচে দাঁড়িয়ে নেই তো! মনে হতেই ছুটে নিচে এলাম। অগণিত মানুষের ভিড়। আমি খুঁজে পাচ্ছি না ওকে। লোকের ঠেলাঠেলিতে দুবার ধাক্কা খেলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! পায়ের যন্ত্রণা হচ্ছে। আবার তিন তলায় উঠলাম। আমাকে ওভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে দু একজন এজেণ্ট এসে জিগ্যেস করে গেল, 'ম্যাডাম, রিজার্ভেশান করানা হ্যায়—কাঁহা জায়েঙ্গে? মুঝে বাতাইয়ে ম্যায় করা দেতা হুঁ'।

'নহী চাহিয়ে রিজার্ভেশান। মুঝে কাঁহি নহী যানা।'

আর পারছি না। এবার বসতেই হবে। সারি সারি অনেক চেয়ার ফাঁকা পড়ে আছে ; গিয়ে বসলাম তার একটাতে। আমার সব উচ্ছাস কর্পূরের মত উবে গেছে। মন খারাপ করে তাকিয়ে দেখছি সকলের মুখের দিকে। বাব্বাবা! একটা কালো মত সন্ডা মার্কা লোক প্যাট্ করে চোখ মেরে দিল। চমকে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ

ঁজে মাথা নামিয়ে নিলাম। কি হতচ্ছাড়া গাড়োল লোকরে বাবা! লোকটা আমার াপির চেয়ে কম বয়সী কিছুতেই হবে না। অত বড় একটা লোক আমাকে চোখ মেরে দিল। ছ্যা ছ্যা, কি ঘেন্নার কথা! আমি আর কারুর দিকে তাকাতে পারছি না। কিন্তু কতক্ষণই বা ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে থাকা যায়! আর আহীরকে তো খুঁজতে হবে! দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। কত লোক ঢুকছে বের হচ্ছে। ওদের মধ্যে একজনও আহীর নয়। একটা ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমার থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চ্যালাকাঠের মত লম্বা চেহারা। মুখটা াওয়াই চপ্পলের মত চ্যাপ্টা। ঢ্যালপ্যালে পোশাক। অনেকটা রোগা কাকতাড়ুয়ার ত দেখতে। কি আশ্চর্য! ও এরকম হাসছে কেন! ও কি আমাকে নিজের খুব পরিচিত ভাবছে না কি! আমি ভ্রূ কুঁচকে ঐ মামদো ছেলেটার দিকে তাকিয়েই আছি। ছোপ ধরা দাঁত আরও খানিকটা বিকশিত হল। আবার সেই আদিম পদ্ধতি। পিটিস্ করে একটা চোখ বন্ধ করল। কি বিপদ! শুনেছি চোখ মারার র্থ না কি কাছে ডাকা। কিন্তু এই লোকগুলো আমাকে ডাকছে কেন! স্নেহ রে আইসক্রীম খাওয়াতে বা কুলফি খাওয়াতে নিশ্চয়ই নয়! যত সব বদ লোকে রে গেছে দেশটা। নাঃ! তৃতীয় বার এ ভুল আর আমি করব না। এবার আহীর মাকে খুঁজবে আমি আর ওকে খুঁজতে পারব না। কিছুতেই না। আমার কান্না চ্ছে—আহীর তুমি কোথায় আছ তাড়াতাড়ি এস। মাথা নিচু করে বসে আছি। ড়ে স্পণ্ডেলাইটিস্ হয়ে যাবার জোগাড়! যাগুগে, তবুও তুলব না। ওরকম পমান জনক ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করার থেকে এ ঢের ভালো। মনে হচ্ছে, আমি লগ্ন ভ্রষ্টা য়ে যাচ্ছি। আজ রাতে আর লগ্ন নেই। ঠাকুমার কথা মনে পড়ছে। উনি বলেন—'সেজেগুজে রইনু বসে। বর এলুনি কপাল দোষে।' কপালে হাত দিলাম। ঘামে ামার হাতটাই ভিজে গেল। মাথার উপর পাখা ঘুরছে তবুও ঘামছি। কেন এত র হচ্ছে! ও কি এখানেই আছে আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না! তা কি করে হয়! ামার জামা ব্যাগের ডেসক্রিপশান ওকে দেওয়া আছে। আর ছোটখাট কোন ক্লু নয়। ামি নিজে একটা এতবড় আস্ত ক্লু হয়ে বসে আছি, আমাকে তো অন্ধ লোকেও ঁজে নিতে পারবে, ও কেন পারছে না! নাই পারুক, জীবনভোর এ রকম ঘাড় ঁজে বসে থাকব তবু মাথা তুলব না। আমি শুধু জোড়ায় জোড়ায় জুতো দেখছি। য়েস, যে জুতো দুটো আমার সামনে এসে থেমে যাবে আমি তার মুখের দিকেই কাব। একটা সিনেমার গান মনে পড়ে গেল। মনে মনে গাইছি—"বন্ধু তোমার শায় আশাতে, বসে আছি মাঝ পথে, তবু তোমার দেখা মেলে না, মেলে না মেলে না লে না…।" বাহ্ হেভি তো! সিচুয়েশানের সাথে বেশ মিলে গেছে কথাগুলো। ক্ষণ মনে পড়লে বসে বসে গাওয়া যেত। বার বার আওড়াচ্ছি ঐ কটা লাইন। ওর শী তো আর জানি না। ব্যাগের চেন খুলে আহীরের দেওয়া শেষ চিঠিটা বের িলাম। লাস্ট পেজটা পড়ছি। এই তো লেখা আছে তের তারিখ বিকেল তিনটে। ং মনে হল আজ তের তারিখ তো! না কি তের তারিখ অনেক দিন আগে

পেরিয়ে গেছে! আহীর এসে আমার জন্য অপেক্ষা করে চলে গেছে! তা কি করে হয়! আজ সকালেই ক্যালেণ্ডার দেখেছি। আমি নিশ্চিত আজ তের তারিখ। আমি কি পাগল হয়ে গেলাম! এরকম উল্টো পাল্টা চিন্তা মাথায় আসছে কেন? ঘড়ি দেখলাম। পৌনে চারটে বাজে। ঝাড়া পঞ্চাশ মিনিট অপেক্ষা করছি। আর দশ মিনিট পর এক ঘণ্টা হয়ে যাবে। এরকম অপেক্ষা জীবনে কারুর জন্য করিনি। আহীর না হয়ে অন্য কেউ হলে আমি কখন পালিয়ে যেতাম। আমি সব ভুলে গেছি ওকে কি বলব ভেবেছিলাম, আমার পা দুলিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সত্যি এবার আমি কেঁদে ফেলব। চিঠিটা ব্যাগে ঢুকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইলাম। মনে হচ্ছে, আমি ঘুমাই, আহীর এসে ডেকে তুলবে। সেই মুহূর্তে কে যেন এসে আমার বাঁ পাশের চেয়ারে বসল। পায়ের দিকে তাকালাম। স্যুটেড বুটেড এক জোড়া ঠ্যা মুখের দিকে তাকাতে ভরসা হচ্ছে না। আবার যদি চোখ মেরে দেয়! এই মুহূর্তে আমি ভীষণ রেগে আছি, রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যদি ঠাস্ করে একটা চড়িয়ে দি! পা দুটো আমার দিকে ঘুরছে। কানে এল এক পুরুষ কণ্ঠ, 'তুমিই কি বনলতা?'

পা থেকে ঝট্ করে চোখ চলে গেল সেই ব্যক্তির মুখে। আমি হাসছি, নিরবে। আকর্ণ বিকশিত হাসি। আমার সব রাগ অভিমান কণ্ট স্পিরিটের মত উবে যাচ্ছে। আমি অনুভব করছি সেই লীনতাপের শীতলতা। কিছু বলতে পারছি না। শুধু হাসছি। আমার অভিব্যক্তি দেখে ও বুঝেছে ওর ধারনা নির্ভুল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আহীর ও উঠল। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আলোর উৎসের দিকে যেমন তাকান যায় না, ঠিক তেমনি। আমি গেটের দিকে এগোচ্ছি, ও আমার পাশে পাশে হাঁটছে। 'সরি, আই অ্যাম রিঅ্যালি সরি' মুখের দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইলাম, 'সরি হওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?' আহীরের সাথে প্রথম কথা বললাম; আর প্রথম কথাটাই প্রশ্নের রূপে। আহীর প্রথম এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করেছে। 'তুমিই কি বনলতা?' যে প্রশ্নের উত্তর সর ভাষা দিয়ে নয়, নিরব হাসির মাধ্যমেই দিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তরে ও বলছে 'বলছি বলছি, জ্যামে আটকে পড়েছিলাম। এতটা লেট হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি' আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি। ওর হাতের দিকে তাকালাম; ঘড়ি নেই। লেট হবা প্রধান কারণ। আর হাওড়া কলকাতার রাস্তায় জ্যাম হবে এ আর নতুন কথা কি আমি নিজে ভুক্তভোগী। তাই আহীর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। ও কিন্তু ব চলেছে, 'আমি অনেকক্ষণ এখানে এসেছি। হাতে সময় ছিল বলে একটা কাজ সে আসতে গিয়েই এই বিভ্রাট। কটা বাজে এখন?'

ঘড়ি দেখলাম, 'চারটে বাজতে পাঁচ।'

'তুমি কখন এসেছ?'

'তিনটে বাজতে পাঁচ?'

'ও-নো! আই অ্যাম সরি।'

'ওর মুখটা ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে! কত বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি

মুখটা দেখার জন্য। অথচ কিছুতেই তাকাতে পারছি না। কি বিপদ! প্রথম দৃষ্টিতে এক ঝলক যা দেখেছিলাম সেটাই ভাসছে চোখের সামনে। চোখ মুখ সেই স্বপ্নে দেখা মূর্তিটার মত ঝাপসা, শুধু এক জোড়া গোঁফ দেখতে পাচ্ছি। অনেকটা মিলিটারিদের মত। ও তো আমার পাশেই হাঁটছে, একবারটি দেখিনা মুখটা। ঘাড়টা একটু তুললেই তো দেখা যায়।

'কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না যে!'

'আপনি জানেন, এতক্ষণ একা ওয়েট করছি, এজেন্টগুলো এসে কি বিরক্ত করছিল! ম্যাডাম রিজার্ভেশান করানা হ্যায়! মুঝে দিজীয়ে ম্যায় করা দেতা হুঁ—'

'করিয়ে নিতে পারতে একটা রিজার্ভেশান।'

'বাহ্! কোথায় করতাম?' চুরি করে তাকালাম ওর দিকে।

'কেন! আগ্রায়। আমি তোমাকে তাজমহলে রেখে দিতাম। সবাই তাজমহলের সাথে সাথে তোমাকেও দেখত।'

আহা! বলছে দেখো! তাজমহলটা যেন ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি! আর আমি বুঝি ওর মমতাজ বেগম! কথাটা মনে আসতেই আমি হাসছি।

'এই এই—এক মিনিট'—ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'তখন থেকে তুমি এত হাসছ কেন বলত?'

এবার ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। ও নিজেও হাসছে।

'বলুন, কোথায় যাবেন?'

'সেকি! এটা তো তোমার এলাকা; তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। হাসছ? রিঅ্যালি, আমি এখানের রাস্তাঘাট কিছু চিনি না।'

'বেশ, তাহলে নন্দনে চলুন।'

'বেশ তো, চলো।'

রাস্তা টপকে ভিড় ঠেলে আমরা স্ট্যান্ডে গেলাম। একটা প্রায় ফাঁকা বাস দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইলাম, 'দাদা এটা রবীন্দ্রসদন যাবে?'

সেই ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ যাবে।'

'আসুন'। আহীরকে ডেকে বাসে উঠলাম। একেবারে পিছনের সিটে বসলাম। 'এখানে যে রোদ লাগছে প্রচণ্ড।'

'বোস না। গাড়ি চলতে শুরু করলে রোদ ঘুরে যাবে।' আমার পাশে বসে বলছে, 'আচ্ছা, আমি তো তোমাকে তুমি বলছি। তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন? তুমি বল।'

আমি দেখছি ওকে। খুব ভালো করে। 'বলব, তবে আপনি বলে দিলে নয়—যখন আমার ভিতর থেকে আসবে তখন বলব।'

ও হাসল। কি সুন্দর হাসিটা। একটা আলাদা অর্থ আছে এ হাসির। আমি কি ধরা পড়ে গেলাম! না না, তা কেন হবে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আমি

ওকে ওর দেশের বাড়ির ওখানকার কতকগুলো স্টপেজের নাম বলে জিগ্যেস করলাম 'এ জায়গাগুলো আপনি চেনেন ?'

ও তো অবাক। দু চোখে অগাধ কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করছে,

'এ নামগুলো তুমি জানলে কি করে ? এ তো সবই আমাদের ঐ দিকে।'

আমার খুব মজা লাগছে ওকে অবাক করে দিয়ে। ও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কলকাতার মেয়ে গ্রামের এত রাস্তার নাম জানল কি করে ! তাও আবার ওদের দেশ। আমি মুখ টিপে বসে আছি। কিছু বলছি না, ভাবুক যত পারে।

ও আর কৌতূহল নিবারণ করতে পারছে না। আমাকে তাড়া লাগাচ্ছে, 'এই— বলনা কি করে জানলে ?'

'আমারও দেশ ওদিকে। শুধু দেশ নয় আপনাদের বাড়ি থেকে আমার মামার বাড়ি বাসে মাত্র আধ ঘণ্টা।'

'তাই ! এখানে কবে এসেছ ?'

'তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। ছুটি-ছাটা পড়লে অবশ্য যাই।'

'তারমানে তুমি আমাদের দেশের মেয়ে, তোমার গ্রামে জন্ম ?'

'হ্যাঁ, মামার বাড়িতে। আপনার বাড়ি থেকে মাত্র আধ ঘণ্টা দূরে। আমরা কত কাছে থাকতাম দেখুন, অথচ আলাপ হল কত দূরে এসে। ও হ্যাঁ, আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি।'

ব্যাগ থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করলাম। ও আমার ডান দিকে বসে আছে, বাঁ হাতে ধরে আছে সামনের সিট্‌টা। আমি ওর বাঁ হাতটা ধরে হাতের উপর রুমালটা রাখলাম। স্বপ্নে অনেক বার ছুঁয়েছি ; আজ পেলাম বাস্তবের প্রথম স্পর্শ। কি লোম ওর হাতে !

'কি গো ?'

আমি রুমালের গিঁট খুলে মেলে ধরলাম। এক আঁচলা সাদা জুঁই ফুল।

'ওয়াও ! কি সুন্দর !' হাতটা নাকের কাছে নিয়ে একটা দীর্ঘ ঘ্রাণ নিল। জুঁই ফুলের সুবাসে আমি মোহাচ্ছন্ন হচ্ছি। ঐ সুবাসের মধ্যে দিয়ে মুহূর্তটাকে ধরে রাখতে চাইছি। হঠাৎ ও আমার দিকে সরে এল। আমার ডান পাশটা পুরোটা স্পর্শ করে আছে ওকে। চোখ খুলে দেখি ওর পাশে এক ভদ্রলোক বসছেন। ও আমার দিকে সরে এসে তাঁকেই বসার জায়গা করে দিল।

'তোমাদের গাছের ফুল ?'

'হ্যাঁ।'

'থ্যাঙ্কইউ ! খুব সুন্দর একটা উপহার দিলে আমায়। মনে থাকবে।'

ফুলগুলো মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে আদর করল। জুঁই এর বুক নিঙড়ে এক রাশ দম নিল আহীর। 'কোথায় রাখি, পকেটে রাখলে তো—'

'আমাকে দিন। এখন ব্যাগে রাখি।'

রুমালে গিঁট দিতেই, 'দেখি দেখি'। দুটো ফুল হাতে নিল, 'এবার রেখে দাও।' ফুলগুলো ব্যাগে রাখতে রাখতে, 'একটা কথা ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।'

'কি বলত ?'

'আপনার কাজটা ঠিক কি ধরনের ? মানে আপনি কি করেন ?'

আমার প্রশ্ন শুনে সামনের সিটের ভদ্রলোক পিছন ফিরে আমাদের দেখলেন। সেটা আহীরও লক্ষ্য করল। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছি, বিচ্ছুর মত।

ও ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'চাকরি করি।'

আমি চাইনা আমাদের আলোচনা কেউ শুনুক। তাই কণ্ঠস্বর একটু কমিয়ে নিলাম, 'আচ্ছা, আপনাদের বক্স নাম্বারে তো অনেক চিঠি ছিল। আপনি হঠাৎ আমার চিঠির উত্তর দিতে গেলেন কেন ? বিশেষ করে আপনার বাবা যখন এ ব্যাপারটা দেখেন।'

ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি যে ওর মুখ থেকে সরাসরি আমার চিঠির তারিফ শুনতে চাইছি, তা বুঝি ও বুঝতে পেরেছে।'

'হ্যাঁ—এবারে অনেক চিঠিই ছিল। তবে তোমার চিঠির সাথে অন্য কোন চিঠির মিল ছিল না, একেবারে আলাদা ধরনের। ব্যাপারটা আমার ভীষণ ইণ্টারেস্টিং লেগেছিল। যেখানে পাত্রীর বাবা-মা বর্তমান যেখানে কিনা পাত্রী নিজে বিয়ের জন্য চিঠি দিয়েছে। ব্যাপারটা আমার খুব ভালোলেগেছে। তোমার চিন্তা ধারার মধ্যে যে একটা স্বাতন্ত্র ভাব আছে সেটা ঐ চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। তাই মনে হয়েছিল এ চিঠির উত্তরটা না হয় আমিই দিলাম।'

'আপনাদের বাড়িতে আমার ছবি আছে। দেখেন নি ?'

'আমি তো এখনো বাড়িই যাইনি। এতদিন কলকাতায় ছিলাম। আজ যাব।'

বাসের গায়ে আমার চুলটা আটকে গেছে। একবার ছাড়ালাম আবার আটকে গেছে। আমি বিরক্ত বোধ করতেই ও বলল, 'কি হল ?'

দেখুন না, এমন জায়গায় বসলাম, চুলটা আটকে যাচ্ছে বার বার।'

'লম্বা বেণী সামলানো যাচ্ছে না! তোমার অবস্থা দেখে একটা গান মনে পড়ছে।' বলেই সুর করে গাইতে লাগল, 'লক্ষ্মীটি দোহাই তোমার আঁচল টেনে ধোরো না, লোকে দেখলে বলবে কি দুষ্টুমি আর কোর না…।'

'চুপ! এটা পাবলিক প্লেস। আপনিই দুষ্টুমি করছেন।'

কনডাকটারকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি ব্যাগ খুলতেই ও পকেট থেকে টাকা বের করল। 'আমি কাটব।'

'কখখনো না! আপনি কি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি! আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। টিকিট আমি কাটব।'

আমরা ঝগড়া করছি, কনডাকটার দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ, তাহলে তুমি তোমারটা কাটো আমি আমারটা কাটি।'

ওর কথা শুনে খুব রাগ হল। ছেলেদের এই ইগোটা আমি কিছুতেই সহ্য

করতে পারি না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ও ফ্যাক্ করে হেসে চোখ ঝামটে বলে, 'কাটো কাটো।'

'দুটো রবীন্দ্রসদন।'

'রেগে গেছ? আমি জানতাম তুমি আমায় টিকিট করতে দেবে না। তোমাকে একটু রাগিয়ে দেখলাম।' হাসছে দাঁত বের করে। ওর কথা শুনে আমারও রাগ পড়ে গেছে। আমাদের দেখে কে বুঝবে, এখনো এক ঘণ্টা পেরোয়নি আমাদের আলাপ!

'আপনাকে খুব চেনা লাগছে জানেন!'

'হতে পারে, ওখানে তো তোমার মামার বাড়ি; ছোটবেলায় দেখে থাকবে হয়ত।'

'ধ্যাৎ! আমি ইয়ার্কি' করছি না।'

'আমিও ইয়ার্কি' করছি না।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে জানালা দিয়ে স্টপেজগুলো খেয়াল রাখছি দেখে ও বলল, 'কি হল, তুমি নন্দন চে'ন না? বার বার দেখছ কেন?'

'এটা তো আর নন্দনের সামনে দিয়ে যাবে না যে দেখেই চিনতে পারব। আমার এই বাড়িগুলো কেমন এক রকম মনে হয়। যদি ফেলে চলে যাই।'

'ঠিক আছে, আমি চিনি নামিয়ে দেব তোমায়।'

আমি নিশ্চিন্ত। আসলে এদিকে খুব একটা আসি না।

পাশের ভদ্রলোক অন্য একজনকে একটা রাস্তার নাম জানতে চাইছে। আহীর আমাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, 'এই যে কলকাতার মেয়ে বলে দাও না রাস্তাটা কোথায়।'

'আমি চিনিই না তো বলব কি!'

সাত পাঁচ গল্প করতে করতে হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল নন্দন ফেলে এসেছি।

'এই—আমরা কোথায় যাচ্ছি! নন্দন তো ফেলে এসেছি।' চলন্ত বাসেই উঠে দাঁড়ালাম। কণ্ডাকটরকে জিগ্যেস করলাম।

'দাদা, নন্দন কত আগে ফেলে এসেছি?'

'দুটো স্টপেজ।'

আহীর হাসছে আমার মুখের অবস্থা দেখে।

'হাসছেন যে! আপনার জন্যেই তো হল।'

'বাহঃ! আমার দোষ?' ঝগড়া করতে করতে বাস থেকে নামলাম।

'তবে নয় তো কি! আপনি বললেন কেন চেনেন?'

'তুমি আমাকে নিয়ে আসছ, কোথায় আসছ সেটা চেনো না!'

'তা কেন, আমি আমার মত করে চিনি। নন্দনে আমি প্রথম একাই এসেছিলাম, কেউ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেনি। আমি কলকাতার সব রাস্তা চিনি না, কিন্তু যে কোন ঠিকানা খুঁজে নিতে পারি। আপনি না বললে আমি খেয়াল করে ঠিক স্টপেজেই নামতাম।' রাস্তাতেই ঝগড়া করতে করতে উল্টো দিকে হাঁটছি।

'বারে, নিজে অপরাধ করে এখন আমাকে বকছ !'

'হ্যাঁ, অপরাধ করেছি বৈকি, আপনাকে বিশ্বাস করে অপরাধ করেছি।'

'তুমি খামোকা রেগে যাচ্ছ কেন বলত ! আমরা ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছি। মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতেও তো ইচ্ছে করে না কি ! ধরো না ; আমরা আজ হারিয়ে গেছি !'

আমি তো অবাক। এ ছেলে বলে কি ! এ তো দারুণ রোম্যান্টিক ! যেমন রাগাতে ওস্তাদ তেমন মুহূর্তের মধ্যে রাগ ভাঙিয়ে জল করে দেয়। আমি হাসছি। এত কবিতা লিখি, ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়ার কথা কোন দিন মাথায় আসেনি। আসলে ইচ্ছে করে হারিয়ে যাওয়ার জন্য সাথী চাই। একা একা হারানো যায় না। আজ আমার সাথী আছে...।

'তুমি না, চিঠি লেখ খুব সুন্দর। তোমার চিঠি পড়তে এত ভালোলাগে। তোমার হ্যান্ড রাইটিং ও সুন্দর। জানো, আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর হাতের লেখা অনেকটা তোমার মত। তোমার প্রথম চিঠিটা পেয়ে মনে হয়েছিল সে দেয়নি তো ! তা কবে থেকে চলছে এই সবিনয় নিবেদন ?'

'বেশ বলেছেন তো কথাটা ; সবিনয় নিবেদন। অনেক দিন থেকেই চলছে। চিঠি লিখতে আমার ভালোলাগে। আমাকে চিঠি দিয়ে রিপ্লাই পায়নি এমন কথা কেউ বলতে পারবে না।'

'বুদ্ধদেব গুহ-র সবিনয় নিবেদন পড়েছ ?'

'না।'

'পড়তে পার তো, সুন্দর সুন্দর চিঠির ভাষা পাবে।'

'তাহলে দেখুন, না পড়েই এই। পড়লে না জানি আরো কত সুন্দর চিঠি লিখতে পারতাম।'

'নিশ্চই। পড়ে নেবে, আরো ভালো লিখতে পারবে।'

'না থাক। পড়লে হয়ত লেখার স্টাইল বাড়বে কিন্তু তাতে আমার অরিজিন্যালিটি যদি হারিয়ে ফেলি। আমি তা চাই না।'

আহীর দেখছে আমায়। 'তোমার এই নিজস্বতাটাই এত ভালোলাগে। সত্যি ! তবে পড়লে ভোকাবুল্যারি বাড়ে।'

আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এসছে। একটু মজা করতে ইচ্ছে হল। গম্ভীর মুখে দুম করে বলে বসলাম, 'আচ্ছা, আপনি আহীর তো ?'

আমার চোখে মুখে কৃত্রিম সিরিয়াসনেস।

'আচ্ছা ! এতক্ষণ পর তোমার মনে হল আমি আহীর কি না !'

আমার হাসি পাচ্ছে। জোর করে হাসি চেপে আছি।

'কি মনে হচ্ছে তোমার ?'

'না না, আপনি তো আহীর না হয়ে, আহীরের কোন বন্ধুও হতে পারেন।'

'হ্যাঁ, তা তো পারি। আচ্ছা বেশ, ধর আমি আহীর নই আহীরের বন্ধু। কি

করবে তুমি, গালাগালি দেবে? ইউ স্টুপিড, ননসেন্স! একজন ভদ্রমহিলাকে এভাবে ঠকানো! লজ্জা করে না মিথ্যে বলতে—'

'হে হে হে—যাস্ট এ মিনিট। আমি এসব কিছুই বলতাম না। অতটা অভদ্র আমি নই। শুধু আহীরকে একটা খুব সুন্দর করে চিঠি লিখতাম, যেটা পড়ে ও যেখানেই থাকুক ছুটে আসত আমার আছে।'

'তাই না কি! বেশ, সে না হয় হল। আহীরের বন্ধুকে কি বলবে বল।'

'ইয়ে লো, আপনি তো দেখছি আমার ট্র্যাপে আমাকেই ফেললেন। কি বলি এখন! হ্যালো মিস্টার আহীরের বন্ধু।'

'ও হ্যালো!'

আমার নতুন করে আলাপের অভিনয় করলাম।

'ঐ দেখুন নন্দন। অনেকটা হাঁটতে হল।'

ভিতরে ঢুকে আমপ্রণের পাশে একটা গাছের বাঁধান চাতালে বসলাম। চারিদিকে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। কোথাও একটুও ফাঁকা নেই।

'কি খাবেন বলুন?'

'এবার আমার পালা, আমি খাওয়াব।'

'নো মিস্টার, সেটি হচ্ছে না। এটা কলকাতা; আমি আপনাকে এখানে এনেছি আমিই খাওয়াব। আমি আগ্রায় গেলে আপনি খাওয়াবেন। সিম্পল।'

'কবে আসছ আগ্রায়, চলে এস একদিন।'

'আপনার চিঠি আসছিল না দেখে যাব ঠিক করেছিলাম। রমাদি বলল এখন ওখানে বড্ড গরম কদিন পর যাব। তাই আর যাওয়া হল না। রমাদিকে আপনার মনে আছে?'

'কে রমাদি?'

'যার ঠিকানায় আমাকে প্রথম চিঠি দিয়েছিলেন।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

দুজনে দুটো কোল্ড ড্রিংস নিয়ে বসে বসে গল্প করছি। ও নিজের কথা বলছে আমার কথাও জানতে চাইছে। আমি কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি।

ও হঠাৎ জানতে চাইল, 'তুমি আজ বাড়িতে কি বলে এসেছ?'

'মিথ্যে কথা বলে।'

'সে কি, তুমি তো মিথ্যে বল না!'

'বলি না। মিথ্যে বলতে কষ্ট হয়। তবে একেবারেই বলি না বললে সেটাই বরং মিথ্যে বলা হবে। একান্তই বিপদে পড়লে বলি।'

'কি বললে আজ?'

'ম্যাগাজিনের সম্পাদককে লেখা দিতে যাচ্ছি।'

'কেন, তুমি বলতেই পারতে এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি !'

'না, পারতাম না। কারণ আমার এমন কোন বন্ধু নেই যাকে আমার বাবা মা চেনেন না। আমি বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি বললে, জানতে চাইবেন কোন বন্ধু। মানে আরও একটা মিথ্যে। অপনার নামটা তো বলতে পারব না। আর যে বন্ধুর নাম বলব, আমি চলে আসার পর বাইচান্স সে যদি আমাদের বাড়ি যায়—বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। তাছাড়া বন্ধুদের সাথে দেখা করতে আমি বাইরে যাই না, তারাই আমার বাড়িতে আসে, গল্প করে।

'তুমি আমার কথা কাউকে বলোনি ?'

'না। আপনি বলেছেন আমার কথা ?'

'বলেছি।'

'কাকে বলেছেন ?'

'আমার এক বন্ধুকে। সে আমার সাথেই আগ্রাতে সার্ভিস করে। তোমার চিঠিগুলো তাকে দেখিয়েছি।'

'বারে! দেখালেন কেন ? আমার বুঝি কোন প্রাইভেসি নেই !'

'ও আমার খুব ভালো বন্ধু। তোমার চিঠি পড়ে ও কি বলেছে জান ?'

'কি ?'

'বাহঃ! মেয়েটা তো বেশ রোম্যান্টিক !'

'ওমা! মোটেই নয়। আমার চিঠিতে কোথাও রোম্যান্স ছিল না।'

'ছিল—ছিল—' আহীর বাঁকা চোখে আমায় দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে হাসছে। একটা অর্থপূর্ণ হাসি। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছি না, পাছে আমার চোখ থেকে ও পড়ে নেয় আমার মনের কথা। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। আজ আমি কিছুতেই ওর কাছে ধরা দেব না। কিছুতেই না।

'কি নাম আপনার বন্ধুর ?'

'মহেন সান্যাল।'

'হোয়াট! মহেন সান্যাল ?'

'হ্যাঁ—অ্যাঁ—'

'মহেন সান্যাল তো আমার বাবার নাম।'

'তাই না কি!' আমার মত আহীরও অবাক হয়।

'আপনি মজা করছেন আমার বাবার নাম নিয়ে।'

'দূর! মজা করব কেন! তাছাড়া তোমার বাবার নাম আমি জানতাম না কি ? এই মাত্র তোমার কাছে শুনলাম।'

'কিন্তু কি করে হয়! শুধু নাম বা শুধু টাইটেলের মিল অনেক দেখা যায়। কিন্তু এভাবে নাম টাইটেল একসাথে মিলে যাওয়া—'

'না হওয়ার কি আছে! হতেই পারে! তুমি ভেবে দেখ, এমনিতে তোমার বাবার

নাম আমাকে বলনি। আর যে ঠিকানা দিয়েছিলে তাতেও তোমার বাবার নাম ছিল না। ভালো করে মনে করে দেখো।'

সত্যিই তাই, আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। আহীরকে বাপির নাম জানাই নি।

'হোয়াট এ কোইন্সিডেন্স, না!'

'ইয়েস, কোইন্সিডেন্স।'

কোল্ড ড্রিংস এর খালি বোতল ফেরত দিয়ে দাম মিটিয়ে এসে দেখি আমাদের জায়গায় অন্য এক কাপ্‌ল বিরাজ কর। এ পৃথিবীতে জায়গা ক্রমশ কমে আসছে। না, তার চেয়ে বরং বলি জায়গা আগে যা ছিল তাই আছে বেড়ে যাচ্ছে মানুষের সংখ্যা। জায়গা একবার হাতছাড়া হলে সেটা ফিরে পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। আহীর মজা করে বলছে, 'ওরা তাহলে আমাদের লক্ষ্য করছিল বল; আমরা কখন উঠব, ওরা এসে বসবে।'

আমরা জায়গার সন্ধানে হাঁটছি, 'তুমি সারাদিন বাড়িতে কি কর?'

'কি করব, সকালে ঘুম থেকে উঠি—'

'কটায় ওঠ?'

'সাতটায়।'

'সাতটায়! কতটা জল আছে এতে?'

'একটুও না। আমি অনেক রাতে ঘুমাতে যাই, তাই দেরি করে উঠি। আপনাকে শুধু শুধু মিথ্যে বলব কেন!'

'আচ্ছা বেশ, তারপর কি কর বল।'

'তারপর কিছু খেয়ে পড়তে বসি। যে দিন ইচ্ছে হয় লিখি। খানিক পরে পাশেই এক বন্ধুর বাড়ি যাই—'

'তারপর?'

তারপর একটু বেলা হলে বাড়ি এসে চান খাওয়া সেরে টিভি দেখি।'

'তারপর?'

তারপর দুপুরে পড়াতে যাই। ফিরি সন্ধ্যার পর। এসে আর একজনকে পড়াই। সে অবশ্য বাড়িতে পড়তে আসে। সে চলে গেলে টিভি দেখি। তারপর রাত্রে লিখি। মাঝে মাঝে টিভিও দেখি, ঘুম পেলে শুয়ে পড়ি।'

'তারপর?'

'তারপর আবার বলতে হবে! পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠি। তারপর।'

'তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা...' হেমন্তের গান ধরল আহীর। আমরা ঘুরতে ঘুরতে নন্দনের পিছন দিকে লেকের ধারে গিয়ে বসলাম। এখানে আসতে আমার একদম ভাল্‌লাগে না। এমন সব অসভ্যের মত বসে থাকে তাকান যায় না। মনে হয় জঙ্গলে চলে এসেছি। সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় পরা সব আদিম মানব-মানবি লীলাকর্মে ব্যস্ত। তবে কলকাতার কংক্রীটে ঘেরা জীবন এখানে এসে

দুদণ্ড থমকে যেন দম নিয়ে যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কৃত্রিম হলেও বেশ মোনরম। ফোয়ারার কণ্ঠে শোনা যায় অলস মন্থর জল ঝরার গান। উঁচু উঁচু গাছগুলো ফিস্‌ ফিস্‌ করে পৃথিবীকে জানায় আকাশের গোপন তথ্য। সামনের একটা ছেলেকে সিগারেট খেতে দেখে আমার মনে পড়ল আহীর তো এতক্ষণ একটাও সিগারেট ধরায় নি। আমার অন্য বন্ধুরা হলে এতক্ষণ তো সিনেমার ড্রিম সিকোয়েন্সের মত ধূম্রকুণ্ড বানিয়ে ফেলত! তাহলে কি—

'আপনি সিগারেট খান না?'

'না।'

'সত্যি!'

'সত্যি খাই না।'

থ্যাঙ্ক গড; আমার এতবড় চাওয়াটা তুমি পাওয়া করে দিলে! আমি যে এমনটি চেয়েছিলাম।

'আপনার কোন নেশা নেই?'

'না।'

'মদও চলে না?' ও হাসছে। 'হাসছেন যে! তার মানে চলে।'

'না, নেশা নেই। এমনি তে খাইও না। তবে পার্টি ফাটি হলে—'

'থাক, আর বলতে হবে না, বুঝছি।' তুমি আমার জ্বলন্ত দলিলের স্ট্যাটাসেবল জেন্টলম্যান। যাঁরা স্ট্যাটাসের দোহাই দিয়ে মদ খান, তুমি তাঁদেরই একজন।

'না না, শোন শোন। তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি ড্রাংকার নই। বড়-সড় পার্টিতে দু-এক ঘোঁট খাই আর কি। না খেলেও চলে। তবে রামপাণ্ড বলে আমাদের একটা বড় পার্টি হয় জানতো, বছরে একবার। ঐ দিন একটু খাই।'

'খেয়ে মাতাল হয়ে যান?'

'দূর, মাতাল হব কেন! তুমি কি ভাব যারা খায় তারা সবাই মাতাল হয়? আর না খেলে বাবার বয়সী সিনিয়ারগুলো এসে অফার করেন, তাঁদের কথা ঠিক ফেলা যায় না।'

'আপনি খেয়ে কোনদিন উল্টো-পাল্টা বকেছেন?'

আহীর হাসছে। অনেকটা অসহায়ের মত। 'তুমি আমার কথাই বুঝতে পারছ না!'

'পারছি। দেখুন, পাঁচ টাকা চুরি করলে চুরি, আবার পাঁচ পয়সা চুরি করলেও চুরি। এখন যদি এই পাঁচ পয়সা চুরিটাকে চুরি না বলে আপনি অন্য কোন নাম দেন। সেটা আপনার ব্যাপার—'

'আমি জানি—আমি জানি মেয়েরা মদ খাওয়াটা একদম পছন্দ করে না। বিশেষ করে বাঙালি মেয়েরা। তারা কখনোই চায় না তাদের স্বামীরা মদ খাক। আমার কত বন্ধুকে দেখলাম বিয়ের পর মদ ছেড়ে দিতে।'

'আপনারা তাদের রাগান ?'

'না। রাগাব কেন!'

'আপনিও তাহলে ছেড়ে দেবেন; বিয়ের পর।'

ও হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। নিরব প্রতিশ্রুতি।

'আজ আমাকে চিনতে আপনার অসুবিধা হয়নি ?'

'না; তোমাকে দূরে থেকে দেখে ভাবছি, সেই জামা সেই ব্যাগ নিশ্চই ও বনলতা। তোমার ডাক নাম কি ? কুহেলি থেকে কুহু ?'

'না; সমি! পোশাকি নামের সাথে কোন মিল নেই।'

'তুমি চিঠি পেলে কবে ?'

'দশ তারিখ।'

'তাহলে সময় মতই পেয়েছ! আমার একটু সন্দেহ ছিল। তাই ভেবেছিলাম দেখা করার ডেটটা পিছিয়ে দি। পরে ভাবলাম, তের তারিখটাই সব চেয়ে ভালো হবে। তোমার লাকি নাম্বার।'

ব্যাগ থেকে দুটো ক্যাডবেরি বের করে ওকে একটা দিলাম।

'বাচ্চাদের মত চকলেট খাব ?'

'এটা বড়রাও খায়।'

ক্যাডবেরির কাগজ খুলতে খুলতে আহীর জানতে চাইছে,

'তোমার ভবিষ্যৎ কি বল।'

'ভবিষ্যৎ কি মানে ?'

'মানে তোমার জীবনটা তুমি কি ভাবে নিয়ে যেত চাও—মানে—আমি বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারছি না। মানে তোমার লক্ষ্য—তুমি কি ভাবে বাঁচতে চাও।'

'আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায় বলুন!'

'কেন ? এ কথা তোমার মুখে মানায় না। তুমি না নারী স্বাধীনতার কথা বল! নিজের জীবন নিয়ে তোমার কোন আশা নেই একথা মানতে বলছ ?'

'হ্যাঁ—আশায় মরে চাষার মত আমারও নিজেকে নিয়ে অনেক আশা ছিল। স্বপ্ন ছিল—'

'ছিল কেন বলছ ?'

'কারণ আজ আর নেই। সে সবই পাস্টটেন্স।'

'তার মানে!'

'বাদ দিন আমার কথা। আপনার কথা বলুন।'

নিজের পরাজয়ের পাঁচালি শুনিয়ে আহীরকে বোর করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই।

'আমি একটা মেয়েকে চিনতাম। তার কাজই ছিল নারী স্বাধীনতার নামে

ছেলেদের বিরুদ্ধে মেয়েদের খেপিয়ে তোলা। পরে একদিন সে কি করল জান, একটা ছেলের সাথে পালিয়ে বিয়ে করে ফেলল। যেটা কেউ কল্পনাই করেনি।'

'দূরে মশাই, লড়াই করতে করতে ভালোবেসে ফেলেছে কি করবে।'

'সে কথা বললেও পদে ছিল। জিগ্যেস করতে কি বলল শুনবে। বলে কি. ওসব জ্ঞানের কথা পরের জন্য নিজের জন্য নয়।'

'আমি মোটেও ঐ মেয়েটির মত নই। আমি যা বলি, নিজে শুধু করার চেষ্টা করি না, কাজে করিও বটে।'

'সে তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। তুমি গান শুনতে নিশ্চই ভালোবাস?'

'বাসি বৈকি, পুরনো হিন্দী সিনেমার গান, বাংলা আধুনিক গান তো আমার ভীষণ প্রিয়।'

'ইওর ফেভ্রিট সিংগার?'

'মান্না দে।' এবার ওর অবাক হবার পালা।

'মান্না দে! সে কি গো, মান্না দে তো আমারও ফেভ্রিট।'

আমার অবর্ণনীয় আনন্দ হচ্ছে। আমার সাথে আহীরের এত মিল! একজন মানুষের গানের পছন্দ শুনে খুব ভালোমত অনুমান করা যায় আর মনটা কেমন। মান্না আমার আরো প্রিয় হল। আরো বেশী আপন হল মান্নার গান। ও গাইছে—মান্না দেরই একটা গান। আমি শুধু সুর শুনতে পাচ্ছি। কথাগুলো অস্পষ্ট। আমি আর নন্দনে নেই। অন্য কোথাও অন্য কোন খানে। আমি বুঝতে পারছি ওর গলাটা সুন্দর। ওর সুরের তালে তালে পা ফেলে আমি হাঁটছি। আহীর আমার পাশেই বসে আছে অথচ ও আমার ধারে কাছে নেই। আমি একা, সেই অচেনা জায়গায়। সুর অনুসরণ করে খুঁজে বেড়াচ্ছি ওকে। ওর গানের শব্দার্থ জানি না, বুঝতে পারছি না; কিন্তু তার মর্মার্থ আমাকে উতলা করছে। আমি সাড়া দিচ্ছি ওর গানে।

কোথা তুমি হে বন্ধু মোর
এভাবে কাঁদাইছো ভালোবেসে—
আমি যে যুগান্তের পিয়াসী
তব স্বাপ্নিক চুম্বন আশে ॥

'এই—এই কুহলি! কি ভাবছ?'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। আমার মনের সব কথা ওকে বলে দিতে ইচ্ছে করছে। ওর কাঁধের কাছে আমার মাথা। একটু স্পর্শ করি! মাথাটা রাখি ওর কাঁধে! ও যে আমার। আমার পাশে যে মানুষটি বসে আছে সে আমার। এত বড় পৃথিবীতে একমাত্র আমিই পারি ওর উপর অধিকার ফলাতে, আর কেউ না। জানি না এ অধিকার আমি কোথায় পেলাম। আমি কাঁদছি। অশ্রুবিহীন নিরুচ্চার রোদন।

'কুহেলি—কি এত ভাবছ? বল কিছু!'

'কি বলব ?'

'তোমার কথা বল। এরই মধ্যে সব কথা শেষ হয়ে গেল ?'

আমি তো আমার কথাই বলছি। তুমি শুনতে পাচ্ছ না। কোনদিন কাউকে যা বলিনি, আজ তোমার এত কাছে বসে তোমাকেই তো বলছি সে কথা। আমার এ ভাষাহীন কথা তুমি শুনে নাও আহীর।

'ঠিক আছে, আমিই বলছি। কবে আগ্রায় আসছ বল! আমি কিন্তু আর বেশীদিন ওখানে নেই।'

'কেন! কোথায় যাবেন ?'

'পরের ট্রান্সফার, আন্দামান।'

'সে তো অনেক দূর। একটা আইল্যাণ্ড।'

'হুঁ, শুধু আইল্যান্ড নয় আমার ড্রিমল্যান্ড ও বটে। খুব চেষ্টা করছি পরের ট্রান্সফার যাতে আন্দামানেই হয়। আমি থাকতে থাকতে রমাদিকে নিয়ে একদিন আগ্রায় এস। তোমাকে একটা দারুণ হোটেলে রাখব। একদম তাজমহলের কাছে। তুমি তাজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবিতা লিখবে। হাসছ! তাজমহল তো তোমাদের জন্যই। আমাদের কাছে তো ওটা একটা বাড়ি। তাজমহল তাদের জন্য যাদের—যাদের—কি বলব। ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। যাদের রস আছে।'

আমি খুব হাসছি। রস আছে কি কথা! রসবোধ বল। কিছুতেই হাসি চাপতে পারছি না, বলতেও পারছি না। ও বলছে—

'আমি ভুল বললাম ? তোমার মত আমার অত ভাষা নেই।'

'ভাষা নাই থাক, ভাব তো আছে। ওটাই আসল।'

'তুমি কটায় বাড়ি যাবে বলেছ ?'

'সেভাবে কিছু বলিনি। তবে আটটার আগে ফিরলে ভালো হয়।'

'তাহলে চল, তোমার তো যেতে সময় লাগবে।' ও উঠে পড়েছে।

'আর একটু বসুন। এখনো সময় আছে।'

'আচ্ছা, আমরা নিশ্চই পরে আবার দেখা করব! তুমি চিঠি দেবে তো ?

'দেব। আমরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারি না ?'

'তা পারি। তবে এখান থেকে অনেক চার্জ পড়ে যাবে।'

'থাক। আপনি নাম্বারটা দিন।'

আমি ও আমার ফোন নাম্বারটা দিলাম। 'এটা আমার কাকার বাড়ির ফোন নাম্বার। আপনি রিং করে আমাকে একটু ডেকে দিতে বলবেন।'

'কাকার বাড়ি থেকে তোমাদের বাড়ি কতদূর ?'

'আমি ছুটে গেলে আধ মিনিট লাগে।'

আমার কথা শুনে ও হাসছে। আমি ওকে একটা গিফ্‌ট দিলাম।

'আমার জন্যে এনেছ ? কি গো ? ছিঁড়ি এটা ?'

'নিশ্চই।' সেলোটেপ মারা গোলাপী সেলোফেন পেপারটা ছিঁড়ে প্যাকেট থেকে বের করে পেপার ওয়েটটা। সাদা সচ্ছ কাঁচের ময়ূর। ভিতরটা ফাঁপা, তার মধ্যে লাল সোনালী ছোট ছোট বল ফ্লুইডে ঘোরাফেরা করছে।

'হাউ নাইস! দারুন সুন্দর জিনিস এটা।'

আমি ওর মুখে খুশীর প্রতিফলন দেখছি। ও ময়ূরটা নেড়ে চেড়ে বলগুলোর ওঠা পড়া লক্ষ্য করছে। ময়ূয়ের পেখমে একটা পেন রাখার জায়গা আছে। সেটা দেখিয়ে আহীর জানতে চাইল, 'এখানে কি রাখে?'

'পেন।'

'আমি এখানে লাল গোলাপ রাখব।'

'আমাকে কথা দিন, এটা আপনি নিজের কাছে নিয়ে যাবেন। আর কাউকে দিয়ে দেবেন না যেন।'

'কেন! এটা আমার জিনিস, আমি কাউকে দেব কেন!'

'বলা যায় না, কেউ হয়ত আপনার কাছে চাইল। আপনি—'

'কখখনো না। চাইল বলে দিতে হবে! তবে হ্যাঁ, বন্ধুরা জানতে চাইবে, কোথায় পেলে গুরু এমন সুন্দর একটা জিনিস! খুব সুন্দর এটা। সত্যি কুহেলি, আজকের দিনটা আমার অনেকদিন মনে থাকবে।'

'আপনার অনেকদিন মনে থাকবে, আর আমার চিরদিন মনে থাকবে। এখানেই আপনার সাথে আমার তফাৎ।'

'এই—আমার অনেক দিনটা তো চিরদিনও হতে পারে।'

'তাই না কি! চলুন এবার ওঠা যাক।

'চলো। কিভাবে যাবে তুমি?'

'এস্প্ল্যানেড থেকে বাসে উঠব। আপনার বাসও তো ওখানেই। চলুন না এটুকু হেঁটে যাই।'

'চলো, আমার আপত্তি নেই। তুমি পারবে তো?'

'আমার হাঁটা অভ্যাস আছে।'

'আমার আগে ছিল। এখন আর ভাললাগে না; একপা যেতে হলেই গাড়িতে।'

আমরা ফেরার পথে পা বাড়িয়েছি। তখনো বিকেল। সন্ধ্যে হতে একটু বাকি। ও হঠাৎ বলে উঠল, 'একি অসভ্যতা!'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, এক জোড়া আদিম মানব মানবি নিজেদের প্রেম-লীলায় এতটাই মগ্ন যে ওরা ভুলে গেছে এটা পাবলিক প্লেস। ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে আহীরের দিকে তাকালাম। ও আমাকেই দেখছিল। দৃষ্টি মিলতেই হেসে ফেলল। আমি গম্ভীর—'এগুলো আমি একদম বর্দাস্ত করতে পারি না। এই একান্ত নিজস্ব জিনিসগুলোকে কেন যে রাস্তায় টেনে নামায় বুঝি না।'

'বাদ দাও, যার যা রুচি।'

'এরা কিছুতেই বোঝে না পাবলিক প্লেসে কত দৃষ্টি কটু কত জঘন্য লাগে এগুলো।'

'সেই সেন্স নেই বলেই তো ওরা এত বেপরোয়া।'

'অথচ দেখুন, নিজেদের কাছে ব্যাপারগুলো কত সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবাসি—কথাটা যত জোরে বলব, পাঁচ কান শুনিয়ে বলব এর গভীরতা তত কমে যাবে। শুধু যাকে ভালোবাসেন তাকে যখন বলবেন, তখন এর একটা আলাদা ডেপথ্; একটা স্বর্গীয় সুগন্ধ পাবেন কথাটার মধ্যে দিয়ে।'

'তোমার মত এমন সুন্দর করে কেউ যে ভাবে না গো। তাহলে পৃথিবীর রঙটাই যে বদলে যেত।'

কথায় কথায় আমরা নন্দন থেকে বেরিয়ে এসেছি।

'এই—আইসক্রীম খাবে?'

'নিশ্চই।' সোচ্ছ্বাসে মত দিলাম।

'দুটো আইসক্রীম দাও তো।'

'উঁহু। কাপ চলবে না। আমি কাঠি আইসক্রীম খাব।'

'য্যাঃ! বাচ্চাদের মত কাঠি কামড়াবে। এটা নাও না হেভি খেতে।'

'আমি জানি তো।'

'ঠিক আছে, কাঠিই দাও। কত?'

'চব্বিশ টাকা।'

'এত দাম কেন গো? কোথায় দাম লেখা আছে? নেই, কেন নেই। এবার থেকে লিখে রাখবে।'

'আচ্ছা রাখবে। আপনি চলুন। ধরুন এটা।'

আমার জীবনের পরম সুখকর মুহূর্ত। সবে মাত্র সন্ধ্যে নেমেছে। কলকাতার রাস্তা পোস্টের বাতিতে দিনের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা দুজন আইসক্রীম খেতে খেতে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। আমি জানি সময় মত বাড়ি পৌঁছতে পারব না। স্বভাবতই বকুনি আমার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তবুও হাঁটছি গুটি গুটি পায়ে। যতটা সময় বেশী থাকা যায় ওর সাথে। আমি খুব হাসছি, প্রাণ খুলে। আহীর কথা বলছে। আমি যেন টোয়েের উপর ভর দিয়ে হাঁটছি। আমার পায়ের তলার শক্ত পাথরের রাস্তা মখমলের মত নরম। আমি সে কমনীয়তা অনুভব করছি। আমার শরীর পালকের মত হালকা হয়ে গেছে। আমি ঘুরছি, আমি ভাসছি। প্রগলভার মত কথা বলছি। আজ আমি বাড়ি ফিরব না। সারা রাত এমনি করে তোমার সাথে হাঁটব, পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে তোমারই হাত ধরে—

আজি পিঞ্জর ভেঙে উড়ে এসেছি
আমারই পিয়ার বাহুতে;
ফিরিতে যে তায়, মন নাহি চায়—
প্রাণ চায় শুধু মরিতে।

'তুমি তো কবিতা লেখ। গান লিখতে পার না ?'

'পারি বৈকি।'

'তাহলে লিখে পাঠিও না ; আমি সুর দেব।'

'আপনি সুরও দিতে পারেন ! আমার আবার সুর করা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আইডিয়া নেই। তবে লিখতে ভালোলাগে। লিখেওছি কিছু—

ভালোলাগা যদি ভালোবাসা হয়
তবে ভালোলাগা কারে কয়।
সব ভালোবাসা যদি প্রেম হয়
তবে ভালোবাসা যে নাহি রয়…।

'বাহঃ ! দারুণ লিখেছ তো।'

ভালোবাসার গান শুনে আহীর গাইছে। একটু গলা ছেড়ে—সখী ভাবনা কাহারে বলে… আমি কর্ণ দিয়ে শ্রবনসুধা পান করছি। আহীর একদম আমার পাশে পাশে হাঁটছে। কি যে ভালো লাগছে ! কলকাতার রাস্তায় ভেইকেল সাউন্ড ছাপিয়ে আহীরের গান সগর্বে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি অনুপ্রবেশের সেই স্পন্দন। কথায় আছে—যারে ভালোবাসি তার মুখে গালা-গালিও শ্রুতিমধুর লাগে। আর আহীর তো গান গাইছে। রবি ঠাকুরের গান। এত সুন্দর করে গাইছে ভালো তো লাগবেই। আমরা একটা পার্কের পাশ দিয়ে আসছিলাম। অন্ধকার বাগানে আবছা আলোয় একটা ছেলে আর মেয়ে তখনো বসে আছে মুখো-মুখি। আহীরের জামাটা টেনে ইশারা করে দেখালাম ওদের। ও হঠাৎ দুষ্টুমি করে চেঁচিয়ে উঠল, 'সন্ধ্যে হয়ে গেছে দাদা এখনো প্রেম করছেন ! বাড়ি যান।' সামনেই খাকি ইউনিফর্ম পরা একজনকে দেখে বলে, 'স্যার, এত সন্ধ্যে হয়ে গেছে ওরা এখনো প্রেম করছে।'

'এই ! ওরা প্রেম করছে তো আপনার কি !'

'এত সন্ধ্যে হয়ে গেছে না !'

'যাগ্‌গে, ওরা কি দেখতে পাচ্ছে না সেটা ! এটা ওদের নৈশপ্রেম। শুধু পিছনে লাগার ধান্দা।'

আমরা রোড ক্রস করতে পারছি না। এত ঘন ঘন গাড়ি যাচ্ছে, যাবার জন্য পা বাড়াতেই রাক্ষসের মত তেড়ে আসছে। আমি উল্টো দিকে তাকিয়েছি আহীর হঠাৎ আমার হাত ধরে টানে, 'তাড়াতাড়ি এস, তা না হলে সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন তো ? ধর্মতলা কোন দিকে ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কি জানি, আমিও বুঝতে পারছি না। আমরা আবার হারিয়ে গেছি। কি মজা, সারারাত এভাবে চক্কর কাটি। ধর্মতলা যেদিকে পারে হোকগে।'

আমিও যেন এটাই চাইছিলাম। আজ আমরা এমনভাবে হারিয়ে যাই যাতে আর কেউ কোনদিন আমাদের খুঁজে না পায়। আমরা কলকাতার রাস্তা ধরে হাঁটছি। আমি জানি, আমার পরিচিত যে কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। বাড়ি গিয়ে বাপিকে বলে দিতে পারে—আপনার মেয়েকে দেখলাম একটা ছেলের সাথে পার্ক স্ট্রীট এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বাড়ি ঢুকতেই বাপি রক্ত চক্ষু হয়ে জানতে চাইবেন তুই তো শিয়ালদায় যাবি বলেছিলি ধর্মতলায় কি করতে গেছিস? কে ছিল তোর সঙ্গে?

আমি কি বলব জানি না। বাপির এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েও আমার ভয় পাচ্ছে না। কোন অপরাধ বোধ নেই আমার মধ্যে। অথচ কলেজে পড়ার সময় এই ভয়, এই ধরা পড়ে যাবার ভয়ই আমাকে বন্ধুদের সাথে চুরি করে সিনেমা দেখতে বা বেড়াতে যেতে দেয়নি। কি চরম পরিবর্তন ঘটেছে আমার! এত সাহস আমি কোথায় পেলাম!

'ভাই সাহাব, আপকে পাস পেন হ্যায়?'

গাড়ির মাল খালাসিদের মত দেখতে একজন এসে আহীরকে জিগ্যেস করল; ওর সঙ্গে আরও কয়েক জন।

'কিঁউ ভাই, কোয়া করোগে পেন লেকর?'

পাশেই দাঁড় করান একটা ম্যাটাডোরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'ইস্ গাড়ি কা নাম্বার নোট করনা হ্যায়; টক্কর মার দিয়া।'

'হয়ে লো।' পকেটে গোঁজা নীল রেনলস্‌টা এগিয়ে দিল। সেই লোকটা সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই কয়েকজন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। এদের কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছে, একদল নাম্বার লিখতে চাইছে আর একদল লিখতে দেবে না। ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। কি বিপদ; আমাদের পেনটা দিয়ে যত ইচ্ছে ঝগড়া কর কেউ নিষেধ করেনি। শেষ পর্যন্ত নাম্বার লেখা হল কিন্তু নিচু হয়ে লিখতে গিয়ে অন্ধকারে পেনের খাপটা গেছে পড়ে। তাই শুনে আহীরও চেঁচাতে শুরু করেছে, 'ইয়ে ক্যোয়া কর দিয়া ভাই, ম্যায়নে পেন দেকর উপকার কিয়া, অর তুমনে মেরা ঢক্কন খো দিয়া।' আহীর ওদের সাথে অন্ধকারে ঢক্কন খুজছে আর হিন্দীতে কি সব বকছে। আমি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছি। ঠিক হয়েছে, যেমন পেন দিয়েছ তেমন খোঁজো ঢক্কন।

'ইয়ে লো সাহাব, আপকা ঢক্কন।'

'হাঁ ভাই মিল গ্যয়া! থ্যাংকইউ।'

ঢাকনা পেয়ে গেছে তবু ওদের সঙ্গে বকছে। আমি গিয়ে টেনে নিয়ে এলাম, 'কি বকছেন এত ওদের সাথে, চলে আসুন তো। বাড়ি যেতে হবে না বুঝি?'

'হ্যাঁ চলো, আমি আর হাঁটতে পারছি না।'

'তা পারবেন কি করে, আপনার তো লাক্সারি বাসে চড়া অভ্যাস!'

'এই—এই! নাকে এক ঘুসি মেরে দেব; আমি মোটেও ও কথা বলিনি।'

'বললেন তো আপনার হাঁটা অভ্যাস নেই।'

'যাগ্‌গে বাদ দাও। একটা গান শোনাও তো।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, গান শুনতে শুনতে রাস্তা শেষ হয়ে যাবে।'

'দূর! আমি গান থোড়িই জানি!'

'বাঙালি মেয়ে গান জানে না তাই আবার হয় না কি?'

'খুব হয়। আর আমি যা গাই কাউকে শোনাবার মত নয়।'

'আরে বাবা, তোমাকে তো আর ফাংশানে গাইতে বলছি না। তুমি তো শোনাবে আমাকে। গাও।'

'ধ্যাৎ! আমি পারব না। আমি যে বাথরুম সিংগার।'

'তাহলে চল বাথরুমে।' দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছে। 'কোথায় বাথরুম এখানে?'

'বাথরুম কি হবে! গান গাওয়ার জন্য?'

'হ্যাঁ—অ্যাঁ। তুমি তো তাই বললে।'

আমি খুব হাসছি। ও এরকম দাঁড়িয়ে বাথরুম খুঁজতে শুরু করবে ভাবিনি। এমন সিরিয়াস্ ইয়ার্কি মারে।

'ঐ দেখো, বাঁশটা দেখা যাচ্ছে।'

মনুমেন্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে আহীর বলল। আমি যা হাসছি আমার কপালে আজ দুঃখ আছে। বাপি আজ বাড়ি থেকে বের না করে দিলে বাঁচি। এখানেই সাতটা বেজে গেছে। স্ট্যান্ডে গিয়ে বাস খুঁজে পাই না একটাও। বাস খুঁজতে খুঁজতে আবার আহীরকে হারিয়ে ফেলেছি। চুলোয় যাক বাস। আমি ওকে খুঁজছি। একি! এই জন সমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেল! সেই মুহূর্তে একটা বাস এসে দাঁড়াল। কি করি, চিৎকার করে ডাকব। চারিদিকে চংমং করছি। হঠাৎ দেখি দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে ইশারা করে হাত নাড়ছে। আমি যে ওকে খুঁজছি ও সেটা বুঝতে পেরেছে। ছুটে গেলাম ওর কাছে, 'না বলে চলে এসেছেন কেন? আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আপনাকে।'

চোখে বাঁকা চাউনি। 'বাবা! এইটুকু জায়গায় কোথায় হারাবে তুমি আমায়!'

'করছেন টা কি এখানে?'

'তুমি তো কিছুই চেনো না। তোমার বাস খুঁজছি।'

'আপনাকে বলেছে, চিনি না! ঐ তো আমার বাস। আসুন।'

বাসটা প্রায় ফাঁকা। আমি সিটে রুমাল রেখে আহীরের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

'বল, আমরা কবে দেখা করছি?'

'আপনি কবে আগ্রায় ফিরছেন?'

সে তো পঁচিশ তারিখ। এখনো ঢের দেরি।'

'তাহলে আপনিই বলুন। আপনি যে দিন বলবেন সেদিনই আসব।'

একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা তোমাকে ফোনে দিনটা জানিয়ে দেওয়া যাবে না? কারণ দেখ, আমি তোমাকে যেদিন আসব বললাম সেদিনই হয়ত মেজদা কোন কাজে পাঠাল, আর এমারজেন্সি হলে যেতেই হবে। তাই ফোনে যদি জানিয়ে দি কোন অসুবিধা হবে?'

'না, অসুবিধা হবে না; তবে ফোনের কানেকশান তো দু জায়গায় করা আছে, অফিসে থাকলে কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু ঘরে থাকলে টাইম ফাইম বললে—কাকু কাকিমা থাকেন তো, যদি উল্টো পাল্টা কিছু গেস করেন—'

'হুঁ'—কি যেন ভাবছে। 'ঠিক আছে, যা বলার আমি বলব। তুমি শুধু হুঁ হ্যাঁ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবে।'

বাহ্! কি বুদ্ধিমান ছেলে! লুকিয়ে প্রেম করার উপযুক্ত রসদ মগজে মজুত। আমি হাসছি।

'কি, আর অসুবিধা আছে?'

'না।'

'এবার জায়গা বল।'

'আপনি বলুন।'

'তুমিই বল না। তোমার যেখানে সুবিধা হবে আমি সেখানেই যাব।'

'কোথায় বলি বলুন তো, কোথায় ওয়েট করা যায়। হুঁ, এখানে একটা বাস কাউন্টার আছে, চেনেন? দূরপাল্লা বাসের টিকিট দেয়।'

'হ্যাঁ চিনি। ঐ দিকে তো?'

'হ্যাঁ।'

'বাহ্! আমার তো দেখছি সুবিধাই হল। গাড়ি চেঞ্জ করতে হবে না।'

তোমার অসুবিধা হবে এমন কি আমি কিছু করতে পারি! অসুবিধা থাক আমার জন্য। আমার সকল কষ্ট দিয়ে তোমায় আনন্দ কিনে আনব আহীর। তুমি শুধু আমায় একটু ভালোবাস। একটু আপন কর আমায়।

'এই! কি ভাবছ?'

'ভাবছি।'

'কি?'

'আপনি আহীর তো?'

'এখনো সন্দেহ যায় নি! কি প্রমাণ চাও বল। না না হেসো না। বল, আমি কি করলে তুমি বুঝবে আমি আহীর?'

আমার হাসির মাত্রা বাড়ছে। ওকে রাগিয়ে মজা দেখছি।

'তোমার ঘুম পেয়েছে। বলছিলে না তিনদিন ঘুম হয়নি, শরীর খারাপ। তিন রাত জেগে কাটিয়েছ। বাড়ি গিয়ে আজ ভালো করে ঘুমাও।'

'শুনুন, আপনাদের বাড়ি আমার ছবি আছে। সামনের দিন ওগুলো মনে করে আনবেন প্লীজ।'

'ঠিক আছে—আনব। এই, তোমার গাড়ি ছাড়ছে।'

আমি চমকে উঠেছি। ইঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দের সাথে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। আমি আর হাসতে পারছি না, বোকার মত তাকিয়ে আছি আহীরের দিকে। পা দুটো অসাড়।

'যাও—আমি ফোন করব তোমায়।'

ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওকে ছেড়ে যেতে। এতক্ষণ দাঁত বের করছিলাম, ইয়ার্কি করছিলাম, এ কষ্টের অনুমান পর্যন্ত করিনি। গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করেছে। খানিক গিয়ে থমকে গেলাম। পিছন ফিরতে ও হাত নাড়ল। আমি পারছি না যেতে, কিছুতেই পারছি না। বাসের জানলা দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছি। বাস ছেড়ে দিয়েছে। আমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে ছুটে নেমে যাই বাস থেকে, গিয়ে দাঁড়াই আহীরের কাছে। পরের বাসে না হয় যাব। আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। বাসটি ঘুরে যাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছি না ওকে। আমার কান্না পাচ্ছে। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে আছি। হঠাৎ যেন কি একটা হয়ে গেল! আমি একদম তৈরী ছিলাম না এই অকল্পিত ঘটনাটার জন্য। একই ভাবে বসে আছি অনেকক্ষণ।

'দিদি টিকিট।'

মুখ থেকে হাত সরালাম। কন্ডাকটার সামনে দাঁড়িয়ে। টিকিট করলাম। গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে ডালহৌসি দিয়ে! আহীর এতক্ষণে বাস পেয়ে গেছে নিশ্চই। ওর বাড়ি পেঁছিতে বেশ রাত হবে। হ্যাঁ, তা ঘন্টা দেড়েক তো লাগবেই। বাস-স্ট্যান্ড থেকে বাড়ি অনেকটা ভিতরে বলছিল। কত ভিতরে! আরো আধ ঘণ্টা লাগুক। তাও বেশ রাত হয়ে যাবে। চারিদিকে অজস্র লোকের ভিড়ের মাঝে আমি একা হয়ে বসে আছি! আমি আহীরকে দেখছি—পরনে হফে সার্ট। আমার দেওয়া গিফ্‌টের লাল প্যাকেটটা বাঁ হাতে ধরে আছে বুকের কাছে! ডান হাতটা তুলে বিদায়ের ভঙ্গিতে নাড়ছে। ওকে ছেড়ে আসার মুহূর্তটা ভুলতে পারছি না। এতক্ষণ তো ছিলাম ওর সাথে, আর কোনভাবে ওকে দেখতে পাচ্ছি না কেন! বাড়ি ঢুকতে হাজার প্রশ্নের ঝড়। আমি একটাও উত্তর দিচ্ছি না। উত্তর দিতে গেলেই গাদা গাদা মিথ্যে বলতে হবে। আমি অত বানাতে পারব না। সব বকুনি চুপচাপ হজম করছি। এ রকম যে হবে তা আমি জানতাম। রাতে খেতে বসে কিছু খেতে পারলাম না। আর একদফা বকুনি খেলাম মার কাছে। বাপি আমার সাথে কথা বলছেন না, তাই ইচ্ছে থাকলেও বকতে পারছেন না। বকতে গেলেই তো কথা বলতে হবে। বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই তলিয়ে যাচ্ছে শরীরটা। ক্লান্তি গ্রাস করছে আমায়। দু চোখে তিন রাতের ঘুম জমে আছে। মনে ভীষণ অশান্তি। একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে কি নিদারুণ টানা-পোড়েন! আহীর কি সত্যিই আমায় বিয়ে করতে পারে? এতদিন ভাবের ঘরে কল্পনার রঙিন চাদরের তলায় ঘর বেঁধেছি, এই মুহূর্তে কঠিন হাতে সে চাদর উড়িয়ে নিতান্তই বাস্তববাদীর মত নিজেকে এ প্রশ্ন করলাম।

আহীরের ব্যবহারে কোন অশালীনতা নেই। ও ভীষণ ভদ্র। তবে এটাও পরিষ্কার আমার সম্বন্ধে ওর আলাদা কোন কৌতূহল নেই। ও সুন্দর ; নিশ্চই সুন্দরী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে! সুন্দরের কথা মনে পড়তেই হাসি পেল। আজই নন্দনে ঢুকে কলে মুখ ধুচ্ছি ; ও বলল, 'মুখে জল দিচ্ছ. তোমার কাজল ধুয়ে যাবে না!'

'যাগ্‌গে।'

'যাগ্‌গে কি, কি সুন্দর দেখছে লাগছে!'

আমি ফোঁস্ করে উঠেছিলাম, 'দেখুন, আমার নিজের সম্পর্কে কিন্তু বিন্দুমাত্র ভুল ধারণা নেই। আমি জানি আমি কেমন দেখতে।' আসলে সেই কলেজের অভ্যেসটা এখনো যায়নি। এক এক দিন এক এক জন ছ্যাবলামি করত। কলেজে ঢুকলেই দাঁত বের করে বলত, 'ওফ্! আজ তোমাকে যা দারুণ লাগছে না ডার্লিং। চ'ল কোথাও ঘুরে আসি।'

'সকাল থেকে আর কাউকে পাসনি বোধ হয়?'

'এই তো না! বিশ্বাস করতে চাস না। সত্যি তোকে দারুণ লাগছে।'

'এর আগে কটা মেয়েকে এমন কথা বলেছিস?'

যদিও এগুলো সবই বন্ধুস্থানীয় ইয়ার্কি, কোনটাই সিরিয়াস কিছু নয় তবুও সেই পাল্টা জবাব দেবার স্বভাবটা যায়নি এখনো। আমার কথায় কি আহীর কিছু মনে করল! বোধ হয় না। তবুও নিজেকে জংলী মনে হল ; আনরোম্যান্টিক।

ও হেসে বলেছিল, 'তুমি নিজেকে নিয়ে কি ভাব সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু তোমাকে নিয়ে অন্য কেউ কি ভাববে, সেটা যে তোমার ভাবনার সাথে মিলতেই হবে এমন কথা নেই নিশ্চই! সকলের দৃষ্টিভঙ্গী সমান তো নাও হতে পারে!'

আমি বাধ্য মেয়ের মত কথাগুলো শুনলাম, আর মাথা নিচু করে এই প্রথম হেরে গেলাম এক পুরুষের কাছে। মানেই হল, আহীর আমার কলেজের বন্ধু নয়। তবে এতেই প্রমানিত হয় না, আহীর আমাকে পছন্দ করেছে। এত বোকা আমি নই। কল্পনাতে কুইন ভিক্টোরিয়া সাজা যায় কিন্তু বাস্তবে যে পাতি ইণ্ডিয়ান জনানা সেট তো আর ভুলিনি! আমি কি তাহলে চাঁদ স্পর্শ করতে চাইছি! পারব ওর থেকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে! পারব অন্য কারুর হাত ধরে আমার স্বপ্নগুলোকে ঢেলে সাজাতে! আমার ছোটবেলা থেকে সেই স্বপ্নে দেখা বিমূর্ত ভালোবাসাকে পারব অন্য কোন পুরুষের অবয়ব দিয়ে মূর্ত করতে! কি অসম্ভব কাজ! কি নিষ্ঠুরভাবে আমি যাচাই করছি নিজেকে। নানান সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত প্রশ্নের তীরে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করছি! আমার বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শরীর-মনে চাপ চাপ রক্ত। আমি ছটফট্ করছি শুয়ে শুয়ে। বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। নিজেকে শান্ত করে উপলব্ধি করতে চাইছি, এ যন্ত্রণা শারীরিক

না মানসিক। বুঝতে পারছি না। এ বিজাতীয় যন্ত্রণা শরীর মনকে এক সাথে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছি। মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি অনেক দিন স্টুডিওতে যাইনি। সমীরদাকে জিগ্যেস করতে হবে কবে সুটিং আছে। মাইম এর স্ক্রীপ্টটা আধ খ্যাঁজড়া হয়ে পড়ে আছে। আহীরের চিঠি পাবার পর থেকে একটা শব্দ লিখিনি। ষোল তারিখে স্যারকে গল্পটা শোনাবার কথা আছে। আজ তো তের তারিখ। মাঝে আর মাত্র দুটো দিন। আমি পারব না গল্প কমপ্লিট করতে। কিছুতেই লেখায় মন দিতে পারব না। এ আমার কি হল! এতদিন বন্ধুদের ভালোবাসার গল্প শুনে, তাদের কষ্টের কথা শুনে দু হাত তুলে ভগবানকে বলতাম, আমাকে করুণা করেছ ঠাকুর। এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিয়েছ। আমার মানসিকতা অন্যভাবে গড়েছ তুমি। কিন্তু এ কি হল! এতদিন কোথায় আত্মগোপন করেছিল আমার এ প্রেম। এই দুর্বার ভালোবাসা কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন! আমিও যে ভালোবাসতে পারি সে ধারণাই করিনি কখনো। ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস যেন আজ জেগে উঠেছে। বুক চিরে উগরে দিচ্ছে শরীরের মধ্যে জমে থাকা সব আগ্নেয় জ্বালা। তারই উত্তপ্ত গলিত লাভা ধীরে ধীরে গড়িয়ে আসছে আমার উপর দিয়ে। তরলটা আমাকে পোড়াতে পোড়াতে নেমে আসছে। আমি শুদ্ধ হচ্ছি। সোনার মত খাঁটি হচ্ছি আমি। আত্মদহনে পবিত্র হচ্ছি। আমার এ পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দাও আহীর। শীতল কর আমার এ দহনপীড়া—

আজি মোর রিক্ত হিয়া
কাঁদিছে ডুকারিয়া
তব আলিঙ্গন আশে।
আমি যে তোমারই প্রিয়া
মৌন মুখরিয়া
মরেছি তোমায় ভালোবেসে॥

শিয়ালদার অ্যাসট্রোলজার দাদুর কথা মনে পড়ছে—'তোর জীবনে খুব শিগ্‌গির একটা পরিবর্তন আসছে।' নতুন একটা মোড় নিয়ে অন্য খাতে না কি বইবে এ জীবন ধারা। আমি বিশ্বাস করিনি সেদিন। দূর, প্রমাণ কোথায়! যুক্তিবাদী মন প্রমাণ ছাড়া কিছুই মানতে চায় না। চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি, মিথ্যেটাকে সত্যি ভেবে খানিক আনন্দ পেতে পারি কিন্তু অন্ধের মত সব কিছু বিশ্বাস করে ঠকতে নারাজ। তবে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক নিজের ভবিষ্যৎ জানতে প্রায় সব মানুষই আগ্রহী। আর এই আগ্রহের বশবর্তী হয়ে নিছক কৌতূহল মেটাতেই সেদিন মন দিয়ে শুনেছিলাম চাঁদ দাদুর ভবিষ্যৎ বাণী।

অ্যাসট্রোলজিটা যে একটা বিজ্ঞান সেটা অনেকেই মানতে চান না। এক সময় আমিও মানতাম না। পরে যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখলাম এর মধ্যেও সায়েন্স আছে। মানুষ রোগ মুক্ত হতে স্টোন পরেন। এটা অনেকের কাছে ভাঁওতা। কেন?

কারণ তারা জানেন না যে বিভিন্ন পাথর বিভিন্ন ধরণের রশ্মি শোষণ করার ক্ষমতা রাখে, এটা ফিজিক্স অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞান বলছে। আর মানুষের শরীরে সূর্য্য রশ্মির প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে বায়োলজি অর্থাৎ জীবন বিজ্ঞান। আশা করি এরা ভুল বলছে না। কারণ আমরা জানি ভিটামিন 'ডি', যেটার অভাবে নাকি রিকেট রোগ হয়, সেই ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায় সূর্য্য রশ্মি থেকে, যা মানব দেহ সরাসরি সূর্য্য থেকে গ্রহণ করতে সক্ষম। সেই জন্য বহুকাল থেকে এ নিয়ম চলে আসছে—নব জাতককে সূর্য্যের রোদে শুইয়ে রাখা হয়। কিন্তু সব রশ্মি তো মানব দেহ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটা মিডিয়া বা মাধ্যমের। আর এখানে স্টোনটাই সেই মাধ্যমের কাজ করে। সূর্য্য থেকে নির্দ্দিষ্ট রশ্মি শোষণ করে মানুষের শরীরে পাঠিয়ে দেয়। তাই স্টোন শরীরে লাগোয়া ভাবে রাখতে বলা হয়। এখন কোন্ রোগের জন্য কোন্ রশ্মি দরকার এবং কোন্ পাথর কোন্ রশ্মিকে অ্যাবজরব করার ক্ষমতা রাখে সেটা যথাযথ ভাবে জানা আগে প্রয়োজন। তার জন্য চাই অভিজ্ঞ বিদ্বান মানুষ। আর সেখানেই অ্যাস্ট্রোলজির সফলতা। মানুষের নাড়ী দেখে যদি তার শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া যায় তবে হাতের রেখা দেখে মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে না কেন! এটাও তো শরীরেরই একটা অঙ্গ। মেডিক্যাল সায়েন্স যদি তার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে একজন মানুষকে চেক্আপ করে তার প্রেসক্রিপশান করে দিতে পারে এবং তা যদি গ্রহণ যোগ্য হয়; তাহলে অ্যাস্ট্রোলজি তার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে একজন মানুষকে চেক্আপ করে তার ঠিকুজি তৈরী করতে পারবে না কেন? আর করলে সেটাই বা গ্রহণ যোগ্য হবে না কেন? কেন সেটা কু-সংস্কারের আওতায় ফেলে বাতিল বলে ঘোষিত হবে? এককালে আমাদের দেশে পাত্র-পাত্রীর ঠিকুজি মিলিয়ে বিয়ে হত। এখন কম্পিউটারের যুগে সেটা অট্টহাস্যকর। কিন্তু তখন থ্যালাসেমিয়া, হিমোলাইটিক জন্ডিস এসব রোগের নাম শোনা যেত কি? অথচ এখন বহুল প্রচলিত এই নাম। পিতা-মাতার ব্লাড গ্রুপ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে না মিললে সন্তান জন্মানোর পরই হিমোলাইটিক জন্ডিসে আক্রান্ত হয় আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়। তাছাড়া অসঙ্গত মিলন ঘটলে মাঝে মাঝে খারাপ ফলগুলি তেমন প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায় না ঠিকই তবে অনেক সময় এর সুদূর প্রসারী ফল হিসেবে বর্ণান্ধতা গর্ভপাত, রক্তাল্পতা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি জিন ঘটিত ব্যাধি দেখা যায়। আর নেগেটিভ গ্রুপ এবং পজেটিভ গ্রুপের রক্তের মিলন তো খুবেই বিপজ্জনক। এতে শিশু বা প্রসূতির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ সব প্রতিরোধ করতে এখন পাত্র-পাত্রীর বিবাহের পূর্বে ব্লাড গ্রুপ টেস্ট করে তা ম্যাচ করছে কি না দেখে নিতে বলা হয়। নচেৎ ভবিষ্যতে তাঁদের সন্তানের জীবন এইসব দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিপন্ন হতে পারে। এও তো প্রায় সেই একই পদ্ধতি; ঠিকুজি কুষ্টি বিচারের মত। তবে হ্যাঁ, মেডিক্যাল সায়েন্স যেখানে কনফার্মলি কিছু বলতে পারে; অ্যাস্ট্রোলজি হয়ত এতটা নিশ্চিত করতে পারে না। তবে প্রকৃত জ্ঞানী মানুষের হাতে পড়লে এটাও সম্ভব। আর তেমন মানুষেরই

বড় অভাব। এক গাদা ভণ্ড মানুষের পাল্লায় পড়ে এই বিজ্ঞানটা অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে আছে। সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ভুল বুঝিয়ে ভীষণ ভাবে ঠকানো হচ্ছে। আর মানুষ যত ঠকবে এই অ্যাসট্রোলজির তত বদনাম বাড়বে। যাগ্‌গে, আমি এখানে অ্যাসট্রোলজি সম্বন্ধে কোন ভাষণ বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে বসিনি। এ বিশাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার তিল মাত্র জ্ঞান-ধারণা কিছুই নেই। আমি তো এসব যুক্তি খাড়া করছি নিজের বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য। আমি বুঝতে পারছি দাদুর কথাগুলো ভীষণভাবে বিশ্বাস করতে চাইছে মন। গত বছর ডিসেম্বর মাসের কথা, সেদিন সেই ভদ্রমহিলাও ছিলেন, যিনি আমাকে শিল্পী বলেছিলেন! ওনারা দুজনে সেদিন আমাকে নিয়ে গিনিপিগের মত নমুনা ভেবে এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। দাদু একটা মন্তব্য করেন তো সেই ভদ্রমহিলা আর একটা। দাদু বললেন, 'তিন মাস পর তোর বিয়েও হতে পারে বিয়ের সূত্রপাতও হতে পারে। তবে বাবা মার নয় নিজের পছন্দমত ছেলেকে নিজে খুঁজে তুই বিয়ে করবি। না, প্রেম করে নয়, তবে নিজে খুঁজে নিবি।' আমি অবাক হয়েছিলাম, এ আবার কি ধরণের কথা! প্রেম করে নয় অথচ নিজে দেখে নেব! তবে এ কথা দাদু বলবেন কেন, আমি আগে থেকেই জানি। বিয়ের ব্যাপারে কারুর পছন্দকে আমি কোনদিন পাত্তা দিইনি। এমন কি বাপিরও না। বিয়ের কথা বললে এমন করতাম যেন কামড়াতে পারলে কামড়ে দি। এখন তো বাপি মা আমাকে বিয়ের কথা বলতেই ভয় পান। আমি কোন প্রশ্ন করিনি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। 'বেশী দূরে নয় কাছাকাছির মধ্যেই হবে। তোর মামার বাড়ির কাছে।' এই কথাটা আমাকে ভীষণ ভাবে স্ট্রাইক করছে। আহীরের বাড়ি আমার মামার বাড়ির কাছে। দাদুর কথা মত তিন মাস পর অর্থাৎ জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী—মার্চ। তেইশে মার্চ আহীরের প্রথম চিঠি পাই। দাদুর কথাগুলো শুনে এসে মাকে সব বলেছিলাম। তারপর কবেই ভুলে গেছি সে সব কথা। আজ আহীরকে দেখে কেমন যেন সব মনে পড়ে যাচ্ছে। আহীরের চিঠিগুলো পাবার পরও মনে হয়নি এসব। সেই ভদ্রমহিলা তো অবাক হয়ে দাদুকে বলছেন, 'এ মেয়ে যে ভীষণ পতিপ্রিয়া হবে দাদা! রোহিনী নক্ষত্র, দেখুন।' বলে ওঁদের ভাষায় কার ঘরে কার যেন অবস্থান বললেন, সে আমি বুঝিনি। উনি দাদুকে সাক্ষী করছেন দেখে আমিও দাদুর দিকে তাকালাম। দেখি উনি মুচকি হেসে বলছেন, 'দেখেছি; আগে তো পতি হোক তারপর।'

ওনাদের উচ্ছাস দেখে আমি কিছুতেই কৌতুহল নিবারণ করতে পারলাম না।

'পতিপ্রিয়া কি দাদু?' দাদু হেসে বললেন—

'সাহিত্য চর্চা করছ আর পতিপ্রিয়া মানে জানো না? যে পতির প্রিয়া।'

'ও তাইতো, এই সহজ মানেটা মাথায় ঢোকেনি!'

ঝট্ করে মনে পড়ে গেল সেই আবছা মূর্তিটা। অজ্ঞাত পরিচয় কোন এক ব্যক্তির কথা ভেবে হাসি পেল। দাদু বলে চলেছেন, 'শুধু তাই নয় ওর শশুর ঘরও ভালো হবে। শশুর শশুড়ীর ভালোবাসা পাবে ও।'

হ্যাঁ, কথাটা খুব পরিচিত মনে হল। আগে কোথায় যেন শুনেছি। মনে পড়েছে, আমার এক অ্যাসট্রোলজার বন্ধু ছিল। নাম গৌতম। কলেজের অফ্ পিরিওডে দেখতাম কারুর না কারুর হাত ধরে বসে আছে। আর সামনের জন উৎসুক চিত্তে হাঁ করে গিলছে নিজের ভবিষ্যৎ বাণী। ও আমাকে বলত, 'কুহেলি তোর শশুর ঘর দেখে আমার হিংসে হয়। তুই শশুর-শাশুড়ীর ভালোবাসা পাবি।' ও আরও বলেছিল আমি নিজে দেখে বিয়ে করব কিন্তু প্রেম করে নয়। নাহ্, গৌতমও তাহলে কিছু জানত! এতদিন পর স্বীকৃতি পেল বেচারা। কোথায় আছে এখন কে জানে!

'দাদু, আমার শশুর বাড়ী সম্বন্ধে এত লোভনীয় লোভনীয় কথা বলছেন আমার যে এক্ষুনি বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

উপস্থিত সবাই হেসে উঠেছিল আমার কথা শুনে।

'ফাজিল কোথাকার। বিয়ে করবি কি, এখনো তো তার সাথে তোর দেখাই হয়নি!'

'আপনি তো সর্বজ্ঞ, বলে দিন না কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে সে। গিয়ে খপ্ করে ধরে নিয়ে আসি। সেই যখন হবে আর দেরি করে লাভ কি!'

'বললাম তো, তোর মামার বাড়ির কাছে।'

আমি কখনো আহীরকে খোঁজার চেষ্টা করিনি। সে দিনের আলোচনা আমার মনে তেমন রেখাপাত করেনি। তবে বাড়ি ফিরে স্বভাব মত মাকে এসব কথা বলেছিলাম। আমি নিজের জীবনের সাথে চাঁদ দাদুর কথাগুলো মেলাতে চাইনি অথচ একটা একটা করে মিলে যাচ্ছে পরপর। কি বলব একে! কোইন্সিডেন্স! আহীরের বন্ধুর নামের সাথে বাপির নাম যেভাবে মিলে গেছিল, সে রকম কোইন্সিডেন্স! কি অদ্ভুত এ ভাগ্যচক্র! মানুষ কত অসহায় এই ভাগ্যচক্রের কাছে। কিন্তু আহীরের দাদা যদি আমাকে পছন্দ করেন! তাহলেও তো দাদুর কথা মিলে যাবে। আমার ভাগ্যের সাথে মিলে যাবে। না, অসম্ভব; ভাগ্যের কাছে মানুষ অসহায় হতে পারে তবুও আমি হারব না। জীবনে যদি কোনদিন বিয়ে নাও হয় সেও ভালো। কিন্তু আহীরের সংসারে অন্য কারুর স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আহীর যদি ওর দাদাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলে! ইস্! কি ভুল করলাম আমি। আজই ওকে একথা বলা উচিত ছিল। ওর দাদা পছন্দ করার পর আমি যদি ওকে আমার ভালোবাসার কথা জানাই তাহলে তা গ্রহণ করা আহীরের পক্ষে অসম্ভব হবে। হা ঈশ্বর, এ আমি কি করলাম! এ কথা আমার আগে মনে হয়নি কেন! এত বড় ভুল মানুষ করে! এ ভুলের মাসুল কি আমাকে সারা জীবন ধরে চোকাতে হবে! না, তা হয় না। এ তাহলে লঘুপাপে গুরু দণ্ড হবে। আমি কখনো কারুর ক্ষতি করিনি। আমার এতবড় ক্ষতি হতে পারে না। আহীরকে সামনের দিনই সব খুলে বলব। কিন্তু ততদিনে যদি দেরি হয়ে যায়! ওনারা কোন ডিসিসান নিয়ে ফেলেন! না না, তা কি করে হয়! সেই ছোটবেলা থেকে আমার ভাগ্য, আমার সকল চাওয়াকে বঞ্চিত করে এসেছে। সে জন্য কেঁদেছি, নিজে কষ্ট পেয়েছি কিন্তু কাউকে কষ্ট দিয়ে আমার

সে আশাকে চরিতার্থ করতে চাইনি। ঈশ্বর জানেন, কত অসহায় ভাবে কাটিয়েছি সে সব দিন। আমার সে কষ্টের খবর কেউ রাখেনি। তবুও কারুর ক্ষতির কথা মাথায় আসেনি। আহীরের সাথে দেখা হলে নয়, ওকে ফোনেই বলব সব কথা। কিন্তু বলব কি করে, কাকু বা কাকিমা যদি শুনে ফেলেন! তাহলে তো— আর ভাবতে পারছি না। কি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি কাঁদছি। দিগভ্রান্ত পথিকের মত অসহায় আমি। কে আমাকে পথ দেখাবে!

'সমি—সমি তুই কোথায়? একি! বসে আছিস কেন?'

মা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আমাকে খুঁজছেন। আমার গায়ে হাত দিয়ে বলছেন, 'কি হয়েছে সমি, বসে আছিস কেন? ঘুমাস নি?'

আমি কিছু বলতে পারছি না। নিজেই জানি না কখন উঠে বসেছি। মা বলতে বুঝতে পারলাম আমি বসে আছি। মা আমার মুখে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন। আমার ভেজা চোখে হাত পড়তেই মা কোঁকিয়ে উঠলেন, 'তোর চোখে জল কেন? সমি, তুই কাঁদছিস! কি হয়েছে বল আমাকে। বাপি বকেছে বলে কাঁদছিস? আলো জ্বালি?'

'না থাক।'

'তুই এখনো ঘুমাসনি না? এত রাত পর্যন্ত জেগে আছিস, কি হয়েছে সমি আমাকে বল; চুপ করে থাকিস না বল!'

'কিছু হয়নি মা। তুমি চুপ কর।' আমি শুয়ে পড়েছি।

'কিছু হয়নি মানে! কদিন থেকেই খেয়াল করছি তুই অন্যমনস্ক। আমি জানি কাল রাতেও তুই জেগে ছিলিস। কি ভাবছিস এত? কেন এমন করছিস?'

'মা, তুমি শান্ত হও। আমার কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি তো জেগে আছিস কেন? কাঁদছিস কেন?'

'মন খারাপ লাগছিল—'

'কেন?'

'জানি না।'

'এ আবার কি কথা! তাই কখনো হয়?'

'হয় মা হয়! আমার হয়। তুমি ঘুমাও। আমি ঘুমাতে চেষ্টা করছি।'

আমার কথা বলতে একটুও ভালো লাগছে না। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

'তোর কপালটা এরকম গরম লাগছে কেন রে? শরীর খারাপ লাগছে? সমি—'

'না।'

সত্যিই আমি আর পারছি না। কেউ যদি দয়া করে আমাকে দুটো স্লিপিং ট্যাবলেট এনে দেয়, খেয়ে একটু ঘুমাই। কতদিন ঘুমাইনি। আহীর কবে ফোন করবে! ফোন তুলে ও কিছু বলার আগেই আমি হুড়হুড় করে সব বলে যাব; তারপর যা হয় হবে। কিন্তু সমস্যা তো কাকু কাকিমাকে নিয়ে। ওনারা থাকলে তো সত্যিই কিছু বলা যাবে না। ভাবছি—ভাবছি—আমার ঘুম আসছে।

পরদিন সকালে কম্পিউটার ক্লাস ছিল। যাওয়া হল না। মা—ই যেতে দিলেন না। শরীরটা ঠিক নেই। চোখের আনজিনটা আরো বড় হয়েছে। সারাদিন আর ঘর থেকে বেরোলাম না। অনেক ভেবে একটা রাস্তা বের করেছি। যদি দেখি আহীরের সাথে ফোনে কথা বলার সময় ঘরে কাকু বা কাকিমা রয়েছেন তাহলে গোটা ব্যাপারটা হিন্দীতে বলে যাব। আমি জানি আহীর হিন্দী বোঝে। ওনারা ভাববেন কোন হিন্দুস্থানী বন্ধু আর হিন্দী কথা অত বুঝতেও পারবেন না। আপাতত একটু নিশ্চিন্ত। পরদিন কাকিমাকে বলে এলাম আমার একটা ফোন আসতে পারে। এলে একটু ডেকে দিও।

হায় কপাল! একটা একটা করে ন-নটা দিন কেটে গেল। আজ তেইশ তারিখ। কোথায় আহীরের ফোন। পঁচিশ তারিখ ও আগ্রায় ফিরে যাবে। ও নো! গত দু দিন ধরে আবার কাকিমারা নেই, দীঘায় বেড়াতে গেছেন। ফোন ধরার কেউ নেই। আহীর নিশ্চই ফোন করেছিল আমিই পাইনি। এ কদিন দিনে দু বেলা কাকার বাড়ি গেছি। একদিন কাকিমাতো জিগ্যেসই করে ফেললেন, 'কার ফোন আসবে গো তুমি এত খোঁজ নিচ্ছ?' ছি ছি, কি লজ্জার কথা! রোজ মনে হত আজ আসেনি কাল নিশ্চই আসবে। কাল কাল করে সবকটা দিন পেরিয়ে গেল। একদিন হঠাৎ মনে হল আহীর আমার ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেনি তো! ছোট্ট একটা টুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিলাম। নিশ্চই ওটা হারিয়ে গেছে। অথবা আমাকে ওর বিন্দুমাত্র ভালোলাগেনি তাই যোগাযোগ করার প্রয়োজন মনে করেনি। কিংবা আমার ব্যবহার ওর ভালোলাগেনি। মনে করতে পারছি না ওর সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেছি কি না। যদি তাই হবে ও দেখা করবে বলল কেন! আমি তো আগে বলিনি। যোগাস! যত সব উৎপটাং ভাবনা। তাহলে ফোন না করার কি কারণ থাকতে পারে! তবে কাকার কারখানার লোকেরা তো মাঝে মাঝে ফোন ধরে, এমন ও তো হতে পারে ওরা আমাকে জানাতে ভুলে গেছে! হতে পারে। অনুমানের উপর ভিত্তি করেই ঐ লোকগুলোর উপর রাগ হচ্ছে। আজ রবিবার, বাপি বাড়ি আছেন। আমি ডায়নিং টেবিলে খাবারগুলো ধরে ধরে রাখছি। বাপি আমাকে কি একটা বললেন, আমি কোন উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে গেলাম। পরে মনে হল বাপি কিছু একটা বললেন! ফিরে এসে জানতে চাইলাম, 'কিছু বললে বাপি?'

বাপি হাসছেন, 'কি হয়েছে তোর? তখন শুনতে পাসনি?'

'শুনতে পেয়েছিলাম, খেয়াল করিনি।'

'কি হয়েছে, এত অন্যমনস্ক হয়ে গেছিস কেন?'

গত কয় দিনে এ প্রশ্ন যে কতবার শুনেছি তার ঠিক নেই। ঘরে মাত্র তিনজন প্রাণী। কারুর দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু হবার উপায় নেই। পদে পদে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। খেতে বসে ভাবছি, কাল চব্বিশ তারিখ, পরশু তো চলে যাবে; কাল যদি ও এসপ্ল্যানেডে আসে! চলে যাওয়ার আগের দিন হয়ত আমার সাথে দেখা করার জন্য আসতেও পারে। হ্যাঁ, কাল অবশ্যই যাব। দেখা হোক আর নাই হোক

যাব। মা আমাকে কি জিগ্যেস করছেন। আমি উত্তর দিচ্ছি। হয়ত সঠিক উত্তরই দিচ্ছি। কথা বলতে বলকে কামড় খেলাম খুব জোরে। ভিতরের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। মুখটা বিশ্রী নোনতা স্বাদে ভরে গেল। তরকারি লেগে জ্বালা করছে। আহীর কি আমার কথা ভাবছে! আমি কামড় খেলাম কেন! ও নিশ্চই আমার নামে কিছু বলছে। আজ তো ছুটির দিন, ও আজ আসবে না তো! হয়ত ফোন করে আমাকে আজই যাবার কথা বলেছে! যদি আসে—আমাকে না দেখতে পেয়ে ফিরে যাবে। না, আজই যাব।

মানুষের বুদ্ধি যখন লোপ পায় তখন বুঝি এভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আবেগ। সত্যি হয়ে দাঁড়ায় মিথ্যে কুসংস্কার। মনে আছে ছোটবেলাকার এক বহুল প্রচলিত কুসংস্কারের কথা—'দুই শালিক দেখলে দিন ভালো যায়, এক শালিক দেখলে দিন খারাপ যায়।' রাস্তা ঘাটে স্কুলে যাবার পথে দুই শালিক দেখলে সে কি ঘটা করে পেন্নাম ঠোকার ধুম। কে যেন বলেছিল দুই শালিক মানে রাম সীতা। সাক্ষাৎ দেবদেবী দর্শন দিন তো ভালো যাবেই। আর যখনই ফুড়ুৎ করে একটা উড়ে গেল তখনই অবস্থা হয়ে অলক্ষুণে। দেবতা রাম থেকে একেবারে ডিমোশান হয়ে রাক্ষস রাবণে পরিণত হয়। গেল সারাটা দিন বরবাদ হয়ে। এ যেন একের বোঝা দশের লাঠির মত একের পাপ দুয়ের পুন্য। মনে পড়ে, নিজে এক শালিক দেখে ফেললে বন্ধুদের দুই শালিকের লোভ দেখিয়ে এক শালিক দেখাতাম। সে তখন খুব রেগে যেত। এক এক জন তো ঝগড়া শুরু করে দিত। স্বীকার করতে লজ্জা নেই এখনো দু শালিক দেখলে মনে হয়, আহা! রাম সীতা বসে আছেন। আজকের দিনটা ভালো গেলেও যেতে পারে। তবে ছোটবেলাকার মত পেন্নাম ঠুকি না। তখন সবল মনের বিশ্বাসটাই ছিল অন্য রকম। প্রণাম করার সে এক আলাদা স্টাইল। দুহাত জড়ো করে কপালে আর বুকে ঠেকিয়ে প্রণাম না। কেবলই ডান হাতের তর্জনী নাকের ডগা থেকে যাত্রা শুরু করে গলা পর্যন্ত এসে আবার নাকের ডগায় ফিরে যায়। এভাবেই টকাটক্ টকাটক্ করে চলত শালিক প্রণাম। এখন সে বদ অভ্যাস গেছে। কিন্তু এক শালিক দেখলে মন কিছুতেই মানবে না যে দিনটা খারাপ যাবে। তখন ভাবি যত সব কুসংস্কার। নিজেকে বলি, ছিঃ, লেখাপড়া শিখে এই উন্নত হয়েছে! জঙ্গলে গিয়ে বাস কর।

খেয়ে উঠে বাপিকে বললাম শিয়ালদায় যাব। শনি, রবি অ্যাকটিং ক্লাস থাকে তাই অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না। শুধু বললেন, তোর তো শরীর খারাপ। রাত্রে গা গরম ছিল আজ নাই বা গেলি। আমার জেদের কাছে বাপির নিষেধ টিকল না। তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, সোজা ধর্মতলায়। দেড়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বাস স্ট্যান্ডে বসে রইলাম। এক ভাবে এক জায়গায় দরজার দিকে তাকিয়ে। ঐ দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা কিভাবে বসে ছিলাম আমি নিজেও জানি না। আমার পরিবারে আমার ধৈর্যহীনতা নিয়ে বিশাল বদনাম আছে। আমার সব কাজের বিফলতায় কারণ না কি এই ধৈর্য্যহীনতা। সেদিন অত ধৈর্য্য কোথা থেকে পেলাম জানি না।

পাশে বসে থাকা ভদ্রমহিলা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—

'কোথায় যাবে তুমি ?'

'কোথাও না।'

'কারোর জন্যে অপেক্ষা করছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কার জন্যে ?'

কি বলি! 'মেসোমশাই। গ্রাম থেকে আসবেন তো কলকাতার রাস্তা-ঘাট কিছুই চেনেন না তাই নিতে এসেছি।'

ফস্ করে মিথ্যে বলে দিলাম। কি দরকার ছিল শুধু শুধু পাপের ঝুলি ভারি করা! বন্ধু বললেই হত। বন্ধু বললে তো আবার কত প্রশ্ন; ছেলে না মেয়ে, বিয়েওয়ালা না অবিবাহিত! আরও অনেক মিথ্যে। আর সত্যি বললে হয়ত বাঁকা চোরা কিছু ভাবতে বসে যেত। ভাবত ভাবত, ভারি বয়েই যেত। তাছাড়া ভুল কিছু ভাবত কি! সত্যিই তো এখন বাঁকা চোরা পথে পা বাড়িয়েছ। বদলে গেছ তুমি। আমার ভিতরের কথা আমার শুনতে ভালো লাগছে না। তাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সেই ভদ্রমহিলাকে জিগ্যেস করছি, 'আপনি কোথায় যাবেন ?'

'বাঁকুড়া। ওখানেই বাড়ি। এখানে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম। দেখোনা, রাত সাড়ে আটটায় বাস; ততক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে।'

আমি গেটের দিকে তাকিয়ে আছি। আহীরকে হঠাৎ মেসোমশাই বলে ফেলেছি ভেবে হাসি পেল। অন্য কোন সম্পর্ক মাথায় এল না কেন কি জানি, হয়ত মামার বাড়ির ওখানে বাড়ি বলেই—পালকের ঝুঁটিওয়ালা লাল লাল কুকুরগুলো তিড়িং তিড়িং করে এগিয়ে চলেছে। কুকুরের মালিক সবুজ পাইপের ভিতর দিয়ে এয়ার প্রেসার পাঠিয়ে ও গুলোকে নাচাচ্ছে। প্লাস্টিকের সাবান কেসের মধ্যে ব্যাটারি ভরে কেরোসিন ল্যাম্পের মত ছোট ছোট বাতি বিক্রী হচ্ছে। আমি অহল্যার মত বসে আছি। একটা সুন্দর দেখতে ছেলে ক্যাবলার মত তাকিয়ে বেশ কয়েক বার আমার সামনে চক্কর কেটে গেল। সিনেমার হিরোদের মত গোঁফ ছাঁটা; সাদা শাঁখালুর মত মুখ। অচেনা ছেলেদের মুখের দিকে তাকান বেশ রিস্কের ব্যাপার। সবাই তো সমান নয়। মাথা নিচু করে নিলাম। ঘড়িতে চোখ পড়ল পাঁচটা বাজতে পাঁচ। নাহ্! আজ আর আহীর আসবে না। উঠে দাঁড়াতেই পাশের সেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'এলো না ?' অসহায়ের মত ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলাম। অলস পায়ে এগিয়ে গেলাম বাসের দিকে। নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি ছাড়ল। বসে বসে ভাবছি কালও আসব। তার আগে হাওড়া স্টেশানে নেমে খোঁজ নিয়ে আসব কোন্ ট্রেনে ওর রিজার্ভেশান হয়েছে। কাল টিউশানি কামাই হবে। হোক্‌গে, পরে এক্সট্রা পড়িয়ে দেওয়া যাবে। তাছাড়া পরীক্ষার এখন দেরি আছে। শরীরটা কি ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে। কদিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছে। ফেলে দেওয়ার জিনিষ হলে কবেই টেনে ফেলে

দতাম। সন্ধ্যে নামতে আর কয়েক কদম বাকি। গেট খুলে বাড়ি ঢুকলাম। সিঁড়িতে ় জোড়া অপরিচিত জুতো। একজোড়া সিজন্ খাওয়া বুট গাল হাঁ করে শুয়ে মাছে। তার পাশেই কেতরে পড়ে আছে একজোড়া স্যান্ডেল। মা ঘর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, 'ঐ তো সাম এসে গেছে।' কাদের উদ্দেশ্যে মা এভাবে আমার আগমন বার্তা ছুঁড়ে দিলেন বুঝতে পারলাম না। বাইরে জুতো খুলে কৌতূহল মেটাতে ঘরে ঢুকলাম।

সর্বনাশ! শিয়ালদা থেকে দিলুদা আর প্রদীপ এসেছে। আমি যে আজ শিয়ালদায় যাইনি ওরা বাড়িতে বলে দেয়নি তো! বুকটা চড়াৎ করে উঠল। বাপির মুখের দিকে তাকালাম। না তো, রেগে আছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। মাও তো হাসছেন।

'কি রে কেমন আছিস?' দিলুদা জিগ্যেস করলেন।

'ভালো।'

'দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।'

'বাইরে থেকে এলাম তো, তাই এমন লাগছে।'

'আমরাও তো বাইরে থেকে এসেছি, তোর মত ওরকম অবস্থা আমাদের!'

আমি কিছু বলার আগেই মা ফোড়ন দিলেন, 'তুমি জান না ও শরীরের প্রতি কি রকম অযত্ন করে। আজকাল দেখছি রাত্রের দিকে গা গরম থাকে।'

দিলুদা ভ্রূ নাচাচ্ছেন; যেন চোর ধরা পড়ে গেছে। 'কি রে এসব কি শুনছি! তুই এবার একদিন পেটানি খাবি আমার হাতে। যেগুলো বলেছি করিস?'

'হ্যাঁ করি।'

'ঘোড়ার ডিম করে!' মা আবার অবজেক্শান করলেন। 'গত পনের দিনে ও দু-দিন প্র্যাকটিশ করেছে জিগ্যেস কর।'

দূর, এ রকম করার কোন মানে হয়! আমাকে ধরা পড়ে যেতে দেখে প্রদীপ মুচকে মুচকে হাসছে। শালা! দিলুদার শালা হয়। আপন বউ-এর আপন কাকার ছেলে। আমাদের সাথে অ্যাকটিং শেখে। একদিন ওয়ার্কশপে ওর সাথে অ্যাকটিং করতে গিয়ে বেমালুম ডায়লগ ভুলে বানাতে শুরু করে দিয়েছি; ও ডায়লগের খেই ধরতে না পেরে হ্যাবলার মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন আকাশ থেকে কেউ ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। পরে ও দিলুদাকে বলেছে, 'মেয়েটা বলে ভালো কিন্তু এত ডায়লগ ভুলে যায়...'

ওরা চলে যাবে বলে জুতো পরছে, সঞ্জয় ঢুকলো। ওকে বসতে বলে আমি দিলুদাদের এগিয়ে দিতে গেলাম। রাস্তায় পা দিয়েই দিলুদা জিগ্যেস করলেন।

'কোথায় গেছিলিস?'

'কেন বলুন তো?'

'কেন বলুন তো! তুই তো আজ ক্লাসে যাসনি।'

'আপনি সে কথা বাড়িতে বলেছেন ?'

'আমি কি করে জানব, তুই ক্লাসে যাচ্ছি বলে অন্য কোথাও গেছিস ! আমি ঢুকে যথারীতি জিগ্যেস করেছি, কি ব্যাপার কুহেলি ক্লাসে যাচ্ছে না কেন ! গত সপ্তাহে যায় নি, এ সপ্তাহেও যায় নি। মাসিমা বললেন, সে কি ! ও তো আজ ক্লাসেই গেছে। আমি অবাক হয়ে বলি, কই না তো, আমরা তো এখন ওখান থেকেই আসছি। ও যায়নি তো। প্রদীপ হাওয়াটা আঁচ করতে পেরে বলে, আমরা তো আজ অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে এসেছি ক্লাস থেকে, তারপর হয়ত ও গেছে, তাই দেখা হয়নি। প্রদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর ইশারা বুঝে বললাম, হ্যাঁ তা অবশ্য হতে পারে।'

'থ্যাঙ্কইউ প্রদীপ, খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছিস আজ।'

প্রদীপের একজন প্রেমিকা আছে জানতাম। কিন্তু এ ব্যাপারে ও এত অভিজ্ঞ জানতাম না। বহুদিন থেকে বোধহয় নিজের জন্য এরকম গুল মেরে মেরে ছেলেটা বেশ পাকা-পোক্ত হয়ে গেছে। একেবারে সাইক্লোনের মুখ থেকে জাহাজকে ডাঙায় ফিরিয়ে এনেছে। নাহ্, মানতেই হবে, ক্যালি আছে ছোকরার।

বাড়ি ফিরে দেখি সঞ্জয় বাপির সাথে গল্প জুড়েছে। এই ফাঁকে ফ্রেস হয়ে নি। ভাবছি সঞ্জয়কে জিগ্যেস করলে কেমন হয়, আগ্রার কোন্ গাড়ি কটায় ছাড়ে ! মন্দ হবে না। ওর আগ্রা দিল্লী ঘোরা আছে। মোটামুটি একটা আইডিয়া তো দিতে পারবে। চেঞ্জ করে এসে ওকেই ধরলাম। কোন মেল কখন ছাড়ে কত নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে...। প্রশ্ন শুনে সঞ্জয় অবাক। 'কি ব্যাপার বলত ! কয়েক সপ্তাহ আগেও তুই জানতে চেয়েছিলি, কোন মেল আগ্রায় যায়—যেতে কত খরচ লাগে—হোটেল ভাড়া কেমন—রিজার্ভেশান কদ্দিন আগে করাতে হয়, আবার আজ জিগ্যেস করছিস এসব !'

গতবারে আহীরের চিঠি আসেনি বলে যখন আগ্রায় যাব ঠিক করেছিলাম তখনই এসব জানতে চেয়েছিলাম সঞ্জয়ের কাছে।

'যা জানতে চাইছি সেটা বলনা, এত খবরে তোর কি দরকার !'

'দরকার আছে ; তারপর আমার কাছ থেকে সব ইনফর্মেশান নিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে তুমি কেটে প'ড় আর কি !'

'বোকার মত কথা বলিস না। আমি এমন একজনের সাথে কাটব যে আগ্রা যাওয়ার রাস্তা চেনে না, তোর কাছ থেকে হেল্প নিয়ে তবে যেতে হবে !'

'অসম্ভব কিছু নয়। তার চেয়ে বরং চ, আমি আর তুই আগ্রায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করি।'

'আহা ! কি আবদার ; দেশে কি ছেলের আকাল পড়েছে, তোর সঙ্গে পালাতে যাব কোন দুঃখে !'

'কেন ! আমি খারাপটা কোন দিকে শুনি।'

'ছাগলের মত ইয়ার্কি মারিস না, যা জিগ্যেস করছি বল প্লীজ।'

'আগে কারণ বল, তারপর বলব।'

আচ্ছা নাছোড়বান্দা ছেলে মাইরি। সেই আমাকে দিয়ে মিথ্যে বলাবে। আমার কি! তুই পরম বিশ্বাসে মিথ্যে কথাগুলো সত্যি ভেবে গাল হাঁ করে গিলবি।

'একান্তই শুনবি?'

'হ্যাঁ শুনব।'

'শোন তাহলে—আমার একটু আধটু লেখার স্বভাব আছে তুই তো জানিস।'

'জানি।'

'আমি একটা নতুন গল্প লিখছি। তাতে নায়িকা হাওড়ার স্টেশানে নায়ককে খুঁজতে যাবে। নায়ক আগ্রা যাচ্ছে। এখন তুই বল আমি যদি কিছু না জানি তাহলে লিখব কি করে? সেই জন্যই জানতে চাইছি।'

'গল্পে আমার কথা লিখবি?'

'নিশ্চই লিখব। তুই ডিরেক্‌শান দিয়ে দে. গল্পে লিখব নায়িকা তোর কাছ থেকে হেল্প নিয়ে নায়ককে খুঁজে পেয়েছিল।'

'তুই নিজে নায়িকা নোস তো?'

'কেন, হলে তোর আপত্তি আছে? কথা বাড়াস না তো, বল।'

সঞ্জয়ের এ উপকার কোন দিন ভুলব না। স্টেশানে ঢোকার রাস্তা থেকে শুরু করে কোন্ প্ল্যাটফর্মে কোন্ গাড়ি ক'টার সময় দাঁড়ায় সব বুঝিয়ে দিল। অবশ্য এও বলল, টিকিট না দেখে বলা যাবে না নায়ক কোন গাড়িতে রিজার্ভেশান করিয়েছে। আগে খাতা কলমের ব্যাপার ছিল বললেও বলা যেতে পারত কিন্তু এখন সবই কম্পিউটারাইজ্‌ড। ওরা কিছুতেই বলবে না। ওর কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অন্য রাস্তা খুঁজছি। 'আচ্ছা, মেলায় হারিয়ে গেলে এনকোয়্যারিতে গিয়ে বললে ওরা অ্যানাউন্স করে দেয়; স্টেশানে সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই?'

'কেন থাকবে না! নিশ্চই আছে।'

'তাহলে বলনা এনকোয়্যারি অফিসটা কোথায়? সেখানে গিয়ে খোঁজ করলে নিশ্চই পেয়ে যাব কি বল!'

'পেয়ে যাব মানে! তুই কি পেয়ে যাবি?' ও অবাক হয়।

'ঐ হল: আমি নই, গল্পের চরিত্র।'

'তাই বল।'

শেষটুকুও ভালো করে বুঝিয়ে দিল। আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি বাপি পুরোটা শুনতে পান নি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে ট্রেনে করে দূরে কোথাও যাওয়ার কথা আলোচনা হচ্ছে। উনি ঘরে ঢুকে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় যাবে বলছে, বশ্বে? নায়িকা হতে?' আমাকে বললেন, 'আমাকে বলিস যাওয়ার সব খরচা আমি দেব।'

বাপির এ কটাক্ষ শুনে সঞ্জয়ের হাসি পেলেও আমার পেল না। কারণ নায়িকা

হবার স্বপ্ন আমি কোন দিনই দেখিনি। সে মানসিকতা আমার নেই। তবে এ কটাক্ষ বাণীর কারণ আমি জানি। আমি অভিনয় করি বাপি কোন দিনই চাননি। রীতিমত লিখিত দরখাস্ত দিয়ে বাপির মতামত আদায় করতে হয়েছে। তাও আবার সর্ত সাপেক্ষ ভাবে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। সর্ত—যেখানেই যাও বলে যাবে। এবং সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরবে। প্রথমটা পালন করলেও দ্বিতীয়টা সর্বদিন পালন করা যেত না। সেখানেই বাপির রাগ। ছেড়ে দে, ওসব করতে হবে না। তোর দ্বারা সম্ভব নয়। সেই পুরোনো রেকর্ড। যাগ্গে, ওসব এখন আমার মাথায় নেই। আমি ভাবছি আহীর কোন্ ট্রেনে রিজার্ভেশান করেছে কি করে জানা যায়। ওর সাথে অন্তত একবার দেখা হওয়া দরকার। ও কেন এমন করল বুঝতে পারছি না। সত্যিই যদি ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলে আমার ঠিকানা তো আছে ওর কাছে। একটা পোষ্টকার্ড ড্রপ করে দিলেই পারত! কেন করল না!

'থ্যাঙ্কইউ সঞ্জয়। ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'গল্পে আমার নাম রাখিস কিন্তু।'

হেসে বললাম রাখব। মনে মনে বললাম, সরি বন্ধু, গল্পে নয় আমার স্মৃতিতে তোমার নাম লিখে রাখব; আহীরকে খুঁজতে সাহায্য করার জন্য।

তখন কে জানত, সত্যি সত্যিই একদিন এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে বসব! এভাবে আমার গল্পে সঞ্জয়ের নাম লিখে রাখব! সেদিনের ঠাট্টা করে বলা কথা আজ সত্যি হয়েছে। সফল হয়েছে সঞ্জয়ের ইচ্ছা।

পরদিন আর বাপিকে বলার সাহস হল না। কারণ অনুমতি না পাওয়ার সম্ভবনাটাই বেশী ছিল, তাই বিনা অনুমতিতেই বেলা বারটার সময় বেরিয়ে পড়লাম। মাকে বলে গেলাম বাপি বাড়ি ফেরার আগেই চলে আসব। ব্যাপারটা বেশ রিস্কি তবুও কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লাম; সেই বাহানা, সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। যাওয়ার পথে হাওড়ায় নেমে সেই রিজার্ভেশান কাউন্টারে গেলাম যেখান থেকে আহীর রিজার্ভেশান করিয়েছে। এনকোয়্যারি কাউন্টারের সামনে জনা পাঁচেকের লাইন। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম পিছনে। এগোতে এগোতে এক সময় কাউন্টারের সামনে এলাম। এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন। চোখে মুখে হাজার খোদ্দেরের বিরক্তির ছাপ। পাঁচ জনের ফেয়ার আন-ফেয়ার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ওনার মুখটাই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে গেছে। উনি ভ্রূ কুঁচকে এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যে আমার সব প্রশ্ন চোয়া ঢেঁকুরের মত গলার কাছে এসে তালগোল পাকাতে লাগল। সাহায্য পাব কি পাব না এই সংশয় নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

'স্যার, প্লীজ হেল্প মী স্যার।'

'কি ব্যাপার, বলুন?' ভ্রূ দুটো সোজা হয়ে গেল।

'স্যার, আমার এক রিলেটিভ কালকের ট্রেনে আগ্রা যাচ্ছে। কিন্তু কোন ট্রেনে রিজার্ভেশান করেছে জানি না। কাইন্ডলি একটু বলে দিতে পারবেন?'

'টিকিট এনেছেন ?'

আমি হাঁ করে আছি। আমার কাছে যদি টিকিটটাই থাকবে তাহলে আপনার কাছে আসতে যাব কেন!

'আনেন নি! সরি, তাহলে বলা যাবে না।' ভ্রূ আবার কুঁচকে গেল।

'একটু দেখুন না প্লীজ!'

'অসম্ভব। ওভাবে বলা যায় না।'

মুখ ফিরিয়ে নিলেন আমার থেকে। আমি মন খারাপ করে লাইন থেকে বেরিয়ে এলাম। সঞ্জয় তাহলে ঠিকই বলেছিল। কাউন্টার থেকে বেরিয়ে পা ঘষে ঘষে সিঁড়ি দিয়ে নামছি। ভাবছি ধর্মতলাতেই যাই। হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, কাল সারাদিন আগ্রা যাওয়ার কটা ট্রেন আছে আর সেই ট্রেনগুলো কোন্ কোন্ সময় ছাড়বে এটা যদি জানা যেত, তাহলে সবকটা ট্রেন চেক্ করলে আহীরকে নিশ্চই খুঁজে পাওয়া যাবে। ইয়েস, এই খবরটা নিশ্চই দিতে পারবেন মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন। আশায় বুক বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম। কাউন্টারের সামনে ততক্ষণে লাইন পড়ে গেছে। এবারে আর পিছনে গেলাম না। সামনের ভদ্রলোককে এক্সকিউজ মী বলে একটু জায়গা করে নিলাম। তিনি একটু কাৎ হয়ে নিতান্তই কৃপণের মত যৎ সামান্য সরে গেলেন। ঐটুকু জায়গায় কোনরকমে নিজেকে ফিট্ করে বললাম, 'স্যার—স্যার কাল আগ্রায় যাবার কটা ট্রেন আছে একটু বলবেন প্লীজ ?'

আমার সকরুণ স্যার ডাকটা শুনেই উনি তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। মুখটা দেখে বোধহয় একটু দয়া হল। উনি সামনের ভদ্রলোককে বললেন, 'একটু সরে দাঁড়ান না দাদা।'

ভদ্রলোক সরে যেতে আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

'এবার খুলে বলুন তো আপনার সমস্যাটা কি।'

মনে সাহস পেলাম। পুরনো কথা রিপিট করে একটু খোলসা করে বললাম। উনি মন দিয়ে সব শুনে বললেন, ঠিক আছে আপনি ঐ দরজাটা দিয়ে ভিতরে আসুন। ওখানে একজন গার্ড আছে, ওকে আমার কথা বলে বলুন আমি আপনাকে ভিতরে ডাকছি।'

আমি যেন একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। লম্বা হল পেরিয়ে ওনার নির্দেশ মত দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ক্যোয়া বাত হ্যায় ?'

'মুঝে অন্দর যানা হ্যায়।...সাহব নে বুলায়া।' মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন নিজের টাইটেলটা আমাকে বলেছিলেন।

'ঠিক হ্যায়, আপ ইয়েহি ঠ্যায়রিয়ে। ম্যায় পুছকে আতা হুঁ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে গার্ড ভিতরে গেলেন। মিনিট খানেক পর আবার ফিরেও এলেন, 'আপ যাইয়ে।'

'সুক্রিয়া।'

গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরো দুটো দরজা টপকে এ. সি. রুমের ভিতরে ঢুকলাম। ভদ্রলোক কাউণ্টার ছেড়ে উঠে এসেছেন।

'হ্যাঁ, বলুন তো কি ব্যাপার।'

বুঝলাম, মুড়োগাছির যাত্রার মত 'আহীর অন্বেষণ' পালা আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। বিলম্ব না করে শুরু করলাম, 'আমার এক রিলেটিভ কালকের ট্রেনে আগ্রা যাচ্ছে। কিন্তু কোন্ ট্রেনে যাচ্ছে আমি জানি না। অথচ জানাটা ভীষণ প্রয়োজন—'

'আত্মীয় না আত্মীয়া?' প্রথম প্রশ্ন।

'আত্মীয়।'

'কি নাম?'

'আহীর কুমার বাসু।'

'বয়স কত?'

'এই—সাতাশ আঠাশ হবে।'

'আপনি ঠিক জানেন কালকের ট্রেনেই যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমি সিওর।'

'ঠিক আছে. আপনি কাউণ্টারে আসুন আমি কম্পিউটার দেখে বলছি ঐ নামের কোন রিজার্ভেশান কালকের ডেটে আছে কিনা।'

যে পথ দিয়ে ঢুকেছিলাম সেই পথেই বেরিয়ে এলাম। ফেরার সময় সেই গার্ডের দিকে তাকিয়ে একটু কৃতজ্ঞার হাসি হাসলাম। কাউণ্টারের সামনে আসতেই মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন কম্পিউটারটা কাৎ করে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। কম্পিউটারের স্ক্রীনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

'কি নাম বললেন যেন!'

'আহীর কুমার বাসু।'

'আমি দেখছি, আপনিও দেখুন। পুরো নাম তো থাকে না, কেবল এ. কে. বাসু দেখবেন।'

উনি প্রোগ্রামিং শুরু করলেন। অজস্র নাম নিচ থেকে উপর দিকে উঠছে। এ. কে. পাল. এ. কে. সাহা, এ. কে. সিং দেখতে পাচ্ছি এ. কে. বাসু দেখতে পাচ্ছি না। দেখার সুবিধার জন্য উনি মাঝে মাঝে পজ্ করে দিচ্ছেন। বার তিন চারেক একই জিনিস বার বার ঘুরিয়ে দেখালেন। যদি মিস্ হয়ে যায় এই ভেবে। কিন্তু কোন ফল হল না। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না এ. কে. বাসু।

'এখানে তো পাওয়া গেল না। কি করবেন এখন?'

'জানি না, আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল।'

'দুটো পর্যন্ত ওয়েট করতে পারবেন?'

'নিশ্চই পারব।'

'এখানে একটু ওয়েট করুন, আমি দুটোর সময় আসছি। দেখি কি করা যায়।'

'ও. কে. থ্যাংকইউ।'

এখনো আশার আলো আছে। আহীরের সাথে প্রথম দিন দেখা করতে এসে যেখানে বসেছিলাম আজও সেখানে গিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। একটা পনের বাজে। এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। চেন খুলে ব্যাগ থেকে আহীরের চিঠিগুলো বের করলাম। ও গুলো আমার ব্যাগেই থাকে। একটা একটা খুলে পড়ছি। মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছি। অনিচ্ছা সত্বেও চোখ চলে যাচ্ছে বার বার। জানি সম্ভব নয়, তবু মনে হচ্ছে আহীর যদি ওখান দিয়ে আসে! গতদিনের মত আমার পাশের চেয়ারটাতে বসে যদি জিগ্যেস করে, 'কি ব্যাপার কুহেলি, তুমি এখানে!' আমি কি বলব! কিছু বলতে পারব না ; শুধু কাঁদব। তাকিয়ে আছি পাশের চেয়ারটার দিকে, ফাঁকা। তবুও তাকিয়ে আছি। আমি দেখতে পাচ্ছি আহীরকে। সেই হাফ সার্টটা পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমার হাসি পাচ্ছে না। কারণ আমি জানি ওটা আহীর নয়। আহীরের কল্পনা।

'আসুন, আসুন আমার সাথে।'

আমার সামনে দাঁড়িয়ে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন। ওনার সাথে গেলাম। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে গিয়েও বেঁকে গেলেন ডান দিকে। একটা কাফে। আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। ভাবলাম বলি, আপনি টিফিন সেরে নিন, আমি বাইরে ওয়েট করছি। কিন্তু আমার ভাবতে ভাবতেই উনি হনহন করে ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরে ডাকলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাম। একটা ফাঁকা টেবিলে উনি বসলেন। পাশের চেয়ারটাতে আমাকে বসতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটার এল, 'কি দেব সাহেব?'

'কি খাবে বল?'

'কিছু না, থ্যাংকইউ।'

'সে কি, কিছু অন্তত খাও!'

'না। বিশ্বাস করুন, আমি বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি।'

'ঠিক আছে, দুটো পেপ্সি নিয়ে এস।'

আদেশ পেয়ে ওয়েটার চলে গেল। আমি অপ্রস্তুতে পড়েছি। 'না না, আমি ড্রিংস নেব না। আমার জ্বর, গলাটাও ব্যথা। ঠান্ডা খেলে আরো বেড়ে যাবে।'

'কিছু হবে না, খাও তো।'

উনি ভাবলেন আমি খেতে লজ্জা পাচ্ছি তাই এটা আমার অজুহাত। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলেছি। ঐ অবস্থায় কোল্ড ড্রিংস শরীরের পক্ষে বিষ। তবে একেবারেই যে লজ্জা পাচ্ছি না তা নয়। ভাবছি অপরিচিত একজনের কাছ থেকে এভাবে খাওয়া ঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া খাওয়াতে হলে আমার খাওয়ানো উচিত।

উনি আমাকে হেল্প করছেন। ওনার খাওয়ানোর কোন মানেই হয় না। একটা পেপ্সি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। 'নাও। আমি কিন্তু তোমায় তুমি বলছি। তুমি আমার থেকে অনেক ছোট।'

'নিশ্চই বলবেন। সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'এবার বলত ব্যাপারটা কি? তোমার এত আগ্রহ দেখে আমি বুঝতেই পেরেছি নিশ্চই অন্য কোন ব্যাপার—'

'না,না, আপনি যা ভাবছেন...'

'আমি ঠিকই ভাবছি। শোন আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমাকে তুমি নিজের বন্ধু ভাবতে পার। আমি এমন কিছু করব না যাতে তোমার ক্ষতি হয়। বুঝতে পারছি তুমি খুব বিপদে পড়েছ। আমাকে বল, আমি তোমাকে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

আমার মনে হচ্ছে আমি আহীরকে পেয়ে গেছি। ভদ্রলোক আমাকে এতটা আশ্বস্ত করলেন যেন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই দেখতে পাব আহীর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি এতটা আশা করিনি। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মনটা।

'তোমার নাম কি?'

'কুহেলি, কুহেলি সান্যাল।'

'তুমি কি কলেজে পড়?'

'হ্যাঁ।'

'কি পড়?'

'গ্র্যাজুয়েশান কমপ্লিট করেছি। এখন কম্পিউটার পড়ছি।'

'তোমাকে আমি এর আগে দেখেছি।'

'তাই! কোথায় বলুন তো?'

'হাওড়া ময়দানে।'

'হতে পারে, ওখানেই তো আমাদের কম্পিউটার কলেজ।'

আমিও ভদ্রতার খাতিরে জানতে চাইলাম ওনার বাড়ি কোথায়। বাড়িতে কে কে আছেন—এইসব। উনি একটা ছোট প্যাড বের করে তাতে আহীরের নাম ঠিকানা লিখে নিলেন। বললেন কোন সেকশানে কাজ করে সেটা জানলে খুঁজতে সুবিধা হবে। আমিও ভাবলাম ওনার বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখি। এগিয়ে দিলাম আমার ডায়রিটা।

'আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিন।'

'কেন তুমি কি আমাকে পুলিশে দেবে?'

'আপনি আমাকে সাহায্য করছেন আর আমি আপনাকে পুলিশে দেব! আমি কি পাগল!'

ভদ্রলোক হাসছেন, 'বলা যায় না, তুমি হয়ত ভাবছ—'

'আমি কিছুই ভাবছি না। আপনি ঠিকানা নিলেন তাই মনে হল আপনার ঠিকানাটাও নিয়ে রাখা উচিত।'

ঠিকানা লিখে ডায়রিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—

'হ্যাঁ, এবার বলত—আগ্রায় কি ছেলেটার বাড়ি?'

প্রশ্ন শুনে আমি হাসছি। যে কথা আমি এখনো আহীরকে বলিনি এই ভদ্রলোক আন্দাজে ঢিল মেরে সেই কথাটা জেনে নিলেন। কি যে বলি বুঝতে পারছি না।

'হাসছ! আমাকে কিন্তু বিশ্বাস করতে পার। খাও বসে আছ কেন! ছেলেটির বাড়ি কি আগ্রায়?'

'না. আগ্রায় সার্ভিস করে।'

'আগ্রার কোথায়?'

'ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এ।'

'এয়ার ফোর্স! তার মানে ডিফেন্সের লোক! ও গড, এই ডিফেন্সের লোকগুলোকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

আমি অবাক। এ লোকটা বলে কি! যাঁরা দেশকে রক্ষা করার কাজে ব্রতী ইনি তাঁদের দেখতে পারেন না! আচ্ছা অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী তো লোকটার! একবার মনে হল বলি সেটা আপনার সমস্যা; তাতে আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু বলতে গিয়ে অ্যাসট্রেলিক্সার দাদুর কথা মনে পড়ে গেল। দাদু বলেছিলেন 'তুই মনের কথা একদম চেপে রাখতে পারিস না। অন্যায় কিছু দেখলেই দুম্ করে প্রতিবাদ করে বসিস্। এই জন্য তোর কার্য সিদ্ধি হয় না। তোর অত কিসের দরকার! যাবি, চোখ বন্ধ করে কাজ হাসিল করবি, চলে আসবি। লোকের মুখের উপর ফট্ ফট্ করে বললে কাজ হয় না।'

দাদুর কথাই মেনে নিলাম। কারণ এই মুহূর্তে একমাত্র এই মানুষটিই পারেন আমাকে সাহায্য করতে। তাই চুপচাপ হজম করলাম আহীরের বদনাম।

'তা, ডিফেন্সের লোকের সাথে তোমার আলাপ হল কিভাবে? তোমাদের আলাপ কি আগ্রাতেই?'

'না এখানে।'

'কত দিনের আলাপ?'

'তিন মাসের।' তখন হিসেব করে বলিনি, পরে দেখলাম তেইশে মার্চ থেকে তেইশে জুন পাক্কা তিন মাস। আজ চব্বিশে জুন।

'তিন মাসেই এই অবস্থা! এত বিশ্বাস!

আমার একটু একটু রাগ হচ্ছে। এভাবে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো অন্যের মুখ থেকে শুনতে আমি নারাজ। নিজের উপরও রাগ হচ্ছে খুব। ভদ্রলোক কি আমাকে সম্মোহন করেছেন! আমি এভাবে গড় গড় করে সত্যি কথাগুলো বলে যাচ্ছি কেন! আর ভাল্ লাগছে না এভাবে বসে বসে মৌখিক পরীক্ষা দিতে। উনি বোতলটা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। আমি খেতে পারছি না। একে গলায় ব্যথা

তার উপর আহীরকে খুঁজে না পাওয়ার টেনশান। মোজ করে কোল্ড ড্রিংস খাবা সময় এটা নয়। যদি কিছু করতে পারেন তো প্লীজ একটু হেল্প করুন। মিস্টা জিজ্ঞাসা চিহ্নের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম।

'তোমার বাড়ি থেকে বিয়ের কি খুব তাড়া লাগাচ্ছে?'

এবার সত্যিই আমি রেগে গেছি। প্রকাশ না করে আর পারছি না, 'দেখুন আপনি যা ভাবছেন ততটা সিরিয়াস কিছু নয়, ফোনে আমাদের কনটাক করার কথ ছিল। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টালি সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বুঝতে পারছি না কি হয়েছে। আর ওর ফোনের জন্য যে ঘরে বসে ওয়েট করব সে সময়ও নেই, কালই আগ্রায় চলে যাচ্ছে। তাই কোন্ ট্রেনে যাচ্ছে জানতে পারলে যোগাযোগ করা যেত কিন্তু লিস্টে যখন ওর নামই পেলাম না তখন আর কি হবে—'

'তুমি হতাশ হচ্ছ কেন! আমি তো দেখছি কি করা যায়। ওদের ডিফেন্স কোটায় আলাদা ভাবে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা থাকে। দেখি ওখান থেকে যদি রিজার্ভেশান করে! এস।'

বাইরে বেরিয়ে বললেন 'তুমি ন নাম্বার প্ল্যাটফর্মে' এস আমি ততক্ষণ গিয়ে স্কুটারটা পার্ক করি।'

বলেই ইঞ্জিনে ফট্ ফট্ আওয়াজ তুলে দু চাকা গড়িয়ে আমার সামনে দিয়ে এক নিমেষে হাওয়া। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই উনি আমার দৃষ্টি-সীমানার বাইরে চলে গেলেন। আমি খানিকটা এগিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখে একজনকে জিগ্যেস করলাম, 'দাদা, ন নাম্বার প্ল্যাটফর্মটা কোন দিকে পাব একটু বলবেন?'

'ক্যেয়া?'

ও বাবা! ইনি আবার আমার মাতৃভাষা বোঝেন না। ওনাকে দেখে সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল।

'ন নাম্বার প্ল্যাটফর্ম কিধার মিলেগা?'

'উধার।' রবি ঠাকুরের ছুটি গল্পে ফটিক তার মামাকে যেভাবে বাড়ি দেখিয়েছিল উনিও ঠিক তেমনি করে আমাকে ন নাম্বার প্ল্যাটফর্ম দেখিয়ে দিলেন। কিছুটা বুঝলাম কিছুটা বুঝলাম না। যেটুকু বুঝেছি তার উপর বেস করে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। আমি হাঁটছি তো হাঁটছি। শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখি সেটা কোন স্টেশানই নয়। শালা মেড়ো, কি একটা দেখিয়ে দিয়েছে। ঐ রাস্ত ধরেই ফিরছি আর ভাবছি যদি সেই জায়গায় ব্যাটাকে আবার দেখতে পাই তো বাঙলায় কয়েকটা গালাগালি দেব। পরে কাউকে জিগ্যেস করলে টের পাবে চাঁদু। এতবড় বেল্লিক আমাকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিল! চেনে না যখন বলতেই পারত মালুম নেহী। লেটা চুকে যেত। আমি কি কামড়ে দিতাম! উধার বলে খামোকা মিসগাইড করার কি ছিল! মনে মনে খুব তড়পাতে তড়পাতে আসছি। সত্যি সে হাওয়া হয়ে গেছে। সোজা পথে খানিকটা হাঁটলাম। সঞ্জয় বলেছিল সাবওয়ে ছাড়া হাওড়া স্টেশানে ঢোকার আরোও একটা বড় গেট আছে। যারা গাড়ি নিয়ে সি অফ

করতে যায় তাদের জন্য। ওটা লণ্ডবাটের দিকে যেতে পড়ে। আমি এসে দাঁড়ালাম সেই বড় গেটটার সামনে। কিন্তু গেট তো বন্ধ, প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছাড়া ভিতরে কি ঢুকতে দেয়! পায়ে পায়ে শ্লথগতিতে গেটের দিকে এগোচ্ছি। সেই সময় আমার পাশ দিয়ে একটা মারুতি এগিয়ে গেল। গেটে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা একদিকের বড় গ্রীলটা টেনে খুলে দিল। আমিও, সোচনা কোয়া জো ভী হোগা দেখা যায়েগা বলে মারুতির পিছন পিছন ঢুকে পড়লাম। খানিকটা এগোতেই দেখি মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমাকে দেখে এগিয়ে আসছেন। 'কি ব্যাপার, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'সরি স্যার, আমার জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হল।'

'আরে না না, সে জন্য বলছি না। একটু দাঁড়িয়েছি তো কি হয়েছে! তুমি ছিলে কোথায় এতক্ষণ?'

'আমি তো ন নাম্বার প্ল্যাটফর্ম খুঁজেই পাচ্ছিলাম না।'

'সে কি! তুমি চিনতে না?'

'না স্যার, এই ট্রেনের ব্যাপারে আমি একদম ওয়াকিবহল নই। ট্রেনে করে কোথাও যাওয়ার তেমন প্রয়োজনই পড়েনি। স্যার, আমি কিন্তু প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটিনি।'

'দরকার নেই; আমি তো আছি। এস আমার সাথে।'

ওনাকে অনুসরণ করলাম! উনি একটা গুমটি মত কাউন্টারে ঢুকলেন। আমাকেও ভিতরে ডাকলেন। ঢুকে দেখি কয়েকটা ছেলে বসে আছে। মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বললেন, 'কি যেন নামটা?'

'এ. কে. বাসু।'

'ইয়েস, এ. কে. বাসু।'

লাইন পেয়ে বললেন, 'হ্যালো! এটা কি...? কি, ক্যান্টিন!'

আবার ডায়াল করলেন। ফের লাইন চলে গেল ক্যান্টিনে। লাইনটার বোধহয় খিদে পেয়েছিল। উনি পিছন ফিরে একটা ছেলেকে জিগ্যেস করলেন, 'কিরে ভাই, এ যে খালি ক্যান্টিনে চলে যাচ্ছে; কি ব্যাপার?'

শুনে তারা হো হো করে হেসে উঠল। দেখি ওরা আমার দিকেই তাকিয়ে হাসছে। এই প্রথম আহীরের উপর রাগ হল আমার। কেন জানি না মনে হচ্ছে ও ইচ্ছে করে আমাকে ফোন করেনি। ছেলেগুলোকে যেন দম দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওরা হাসি থামাতেই পারছে না। যতক্ষণ না ব্যাটারি ফুরোয় ততক্ষন হেসে যাবে। চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছি; খুব বাজে লাগছে।

এক সময় লাইন পেলেন। জানতে চাইলেন, মিস্টার এ. কে. বাসুর নামে কালকের আগ্রাগামী কোন মেলে রিজার্ভেশান হয়েছে কি না। ওদিক থেকে উত্তর এল—'না'। উনি তবুও অনুরোধ করলেন ভালো করে চেক্ করার জন্য। কিন্তু ভালো করে চেক্ করার পরও না ছাড়া দ্বিতীয় কোন উত্তর এল না। উনি ফোন রেখে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে আমিও।

'শুনলে তো, ডিফেন্স কোঠাতেও ঐ নামে কোন রিজার্ভেশান হয়নি। তুমি ঠিক জান ও কালকের ট্রেনেই যাচ্ছে ?'

'সে রকমই তো বলেছিল।'

'এমনো তো হতে পারে যে রিজার্ভেশান ক্যানসেল করে অন্য কোন ডেটে করেছে !'

'হতে পারে।'

আমি আর পারছি না। পায়ের তলার শক্ত জমিটা যে চোরা বালি হয়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছি নিচের দিকে। আহীরের দেখা পাবার কণামাত্র আশা আমার মধ্যে আর বেঁচে নেই। ভাবছি আহীর কি তাহলে আগেই চলে গেছে ! ওকে যে আমার কত কথা বলার ছিল। কিছুই যে বলা হল না।

'কি করবে এখন ?'

'জানি না।'

আমাকে ও রকম হতাশাগ্রস্থের মত উত্তর দিতে দেখে উনি বোধহয় আমার অবস্থাটা অনুমান করতে পারছেন।

'তুমি এস আমার সঙ্গে।'

উনি হাঁটছেন, আমিও যাচ্ছি ওনার পিছন পিছন। কোথায় যাচ্ছি, কিসের জন্য যাচ্ছি, কিছুই জানি না। আমি কি রকম যেন বোকা হয়ে গেছি। উনি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন। একটা চেয়ার টেনে আমাকে বসতে বলে এগিয়ে গেলেন। আমি দাঁড়িয়েই আছি। একজনের সাথে কথা বলতে বলতে পিছন ফিরে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইশারা করে বসতে বললেন। বসলাম। খানিক পরে ফিরে এসে আমার উল্টো দিকের চেয়ারটাতে বসলেন।

'তুমি তো অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। কিছু খাও।'

'নো থ্যাংকস্।'

'কিছু তো খাও।'

'না স্যার, মাফ করবেন, আমি কিছু খাব না !'

'অল্প একটু খাও।'

'প্লীজ স্যার, বিলিভ মী ; আমার খিদে পায় নি।'

'তোমার বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

অনেক কষ্টে মুখে হাসি আনলাম, 'কেন বলুন তো ?'

'তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি বোধ হয় এখনো আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছ না।'

'না না, আমি ভয় পাচ্ছি না। অহেতুক ভয় পাব কেন ! আর অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আমার কি ক্ষতি করবেন বলুন! আর করবেনই বা কেন ! আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি এভাবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। আমি আপনাকে কয়েকটা ট্রেনের নাম জানতে চেয়েছিলাম, আপনি সে কটা বলেই আপনার ডিউটি শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি, এতক্ষণ আমার সাথে

থেকে নানা ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। আমি আহীরকে খুঁজে পাইনি সেটা আমার দুর্ভাগ্য। এখানে আপনার তো কিছু করার নেই…!'

'শোন, আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। ওয়েটিং লিস্টে কিছু নাম থাকে, সেখানে পাওয়া যায় কিনা আমি দেখব। ঠিকানাটা দাও, নাম পেলে কাল সকালে তোমার বাড়িতে লোক পাঠাব।'

'সে কি। বাড়িতে লোক পাঠাবেন কি!' আমি এমন ভয় মিশ্রিত অবাক হলাম যেন আমাকে কেউ এক গ্লাস বিষ অফার করেছে।

'না না, লোক নয়; একটা মেয়েকে পাঠাব।'

'লোক হোক আর মেয়েই হোক। সকালে বাবা বাড়িতে থাকেন, উনি জিগ্যেস করলে কি বলব!'

'আমি মেয়েটাকে শিখিয়ে দেব ও তোমার বাড়ির লোককে কিছু বলবে না।'

'ও না বলুক, আমাকে জিগ্যেস করলে আমি কি বলব! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমার জন্য আপনি এতটা ভেবেছেন। কাল সকালে আমি নিজেই আসব, আপনি টাইমটা বলুন।'

'আটটার সময়। পারবে অত সকালে আসতে?'

'দরকারটা যে আমার স্যার, আসতে তো হবেই। তবে আমার ঠিকানা আপনাকে দেব এবং নির্ভয়ে।'

মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন হাসছেন। একজন হেল্পফুল মানুষের হাসি। এ হাসি একজন নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীর হাসি। এমন মানুষের সাথে এর আগে কোনদিন দেখা হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা জানি না। এ মানুষের সংখ্যা যে পৃথিবীতে বড় কম। সম্পূর্ণ একটা অজ্ঞাত জগতে আমি একা আহীরকে খুঁজতে এসেছিলাম। এমন একজন বন্ধুর দেখা পাব ভাবিনি। কেউ এভাবে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে ভাবিনি। এ যে আমার কল্পনারও অতীত। একাই খুঁজে নেব এই ভেবে এসেছিলাম। পেয়ে গেলাম একজন সত্যিকারের বন্ধু। আমার ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, 'কি করবে এখন, বাড়ি যাবে তো?'

'না, একবার এসপ্ল্যানেড যাব ভাবছি।'

'এসপ্ল্যানেড! কেন, হাওয়া খেতে?'

'আমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমি হাওয়া খাওয়ার মুডে আছি!'

উনি হেসে ফেললেন, 'তাহলে কেন যাবে?'

'ওখানে একবার খুঁজে দেখি আহীরকে পাই কিনা।'

'ও, তোমরা বুঝি ওখানেই মিট কর! ওর কি আজ ওখানে আসার কথা আছে?'

'না, কথা নেই। তবে আসলেও আসতে পারে।'

'এ অনিশ্চয়তার মধ্যেও যাবে? আর একটা হেলমেট থাকলে আমিই তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম।'

'না স্যার, আমি একাই যেতে পারব।'

'আমি জানি তুমি পারবে। কিন্তু—' কি যেন ভাবছেন উনি। তারপর বললেন, 'তুমি একটু ওয়েট কর আমি একটা হেলমেট জোগাড় করে আনি।'

'না স্যার, তার কোন দরকার নেই। আপনি আবার কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন। আমি একাই চলে যাচ্ছি।'

'কষ্টের কি আছে এতে! আচ্ছা ঠিক আছে এস আমার সাথে, এস।'

আবার ওনাকে অনুসরণ করলাম। গেটের মুখেই এক চেকারের খপ্পরে পড়লাম। 'টিকিট প্লীজ।' সর্বনাশ! প্রেস্টিজ ফুটো করে দিল বলে—আমি ত্রাণ কর্তাকে খুঁজছি। কোথায় গেলরে ভিড়ের মধ্যে! তিনি হেসে বললেন, 'এই, ও আমার সাথে এসেছে।' চেকার হেসে রাস্তা করে দিল। উনি বেরিয়ে সোজা লঞ্চঘাটের দিকে চললেন। বুঝলাম উনি আমার সাথে যাবেন। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে ওখানে এভাবে হ্যারাজ করতে। টিকিট কাউন্টারের কাছে এসে বললাম, 'আপনি যান আমি টিকিট কেটে আসছি।'

'টিকিট কাটতে হবে না, আমার কাছে কুপন আছে।'

'না স্যার, আপনি কুপন রেখে দিন। আমি টিকিট কাটছি।'

'আরে এস তো কাটতে হবে না। এত হেজিটেট করছ কেন! এস।'

অগত্যা যেতেই হল। লঞ্চঘাটে বসে আছি। প্রচণ্ড রোদ, ব্যাগ থেকে রুমালটা বের করে মুখমুছি।

উনি হঠাৎ বললেন, 'কি হল, কাঁদছ কেন?'

'কাঁদছি! কাঁদব কেন?' না হেসে পারলাম না।

'সত্যি, তোমরা যে কি কর না! ওর বাড়ির ঠিকানা আমাকে দাও। আমি গিয়ে খবর দি, তোমার জন্য একটা মেয়ে এভাবে হয়রান হচ্ছে, আর তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসে আছ!'

ভদ্রলোকের ব্যবহার আমাকে ক্রমশ অবাক করছে।

'কোথায় বাড়ি?'

'ডায়মণ্ডহারবারে।'

'কতক্ষণ আর লাগবে, আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আমাকে ঠিকানাটা দাও।'

'না, বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তাছাড়া ওর বাড়ির ঠিকানাও নেই আমার কাছে।'

কথাটা সত্যি, আহীরের বাড়ির ঠিকানা আমি জানি না।

উনি তো অবাক, 'সে কি! বাড়ির ঠিকানা জান না? ওর কোন ছবি আছে তোমার কাছে? নাকি তাও নেই!'

সত্যিই নেই। সেটাই জানালাম ঘাড় নেড়ে।

'তুমি একটা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মেয়ে, এরকম ভুল কি করে করলে বলত!

না আছে ঠিকানা, না আছে ছবি। কোথায় খুঁজবে এখন তাকে! তোমার ছবি আছে ওর কাছে?'

'আছে।'

'হ্যাঁ, নিজেরটার বেলা দিয়ে বসে আছ। তুমি চেয়ে নাওনি কেন ওর ছবি, ঠিকানা?'

আমি হাসছি। মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের মুখে এই সব কথা শুনে আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। সত্যি বলতে মজাও লাগছে বেশ, উনি বাপির চাইতে খুব বেশী হলে বছর চার পাঁচেকের ছোট হবেন। কি তাও বোধহয় নয়। ঐ বয়সের একজন মানুষের কাছ থেকে এরকম দুর্ভাবনা পূর্ণ মন্তব্যই আশা করা যায়। কিন্তু উনি এই ক্ষণিকের পরিচিতার জন্য এত দুর্ভাবনা করছেন কেন! কি অদ্ভুত আন্তরিকতা! উনি শুধু আমার জন্য অতদূরে যেতে চাইছেন আহীরের খোঁজে। আবার এটাও ভাবতে অবাক লাগছে, যে কথা আমি এতক্ষণে একবারও পজেটিভলি কনফেস করিনি সেটা উনি কেবল অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমাকে আহীরের প্রেমিকা বানিয়ে দিয়েছেন। আমি আহীরকে ভালোবাসি এ অমোঘ সত্যটা এই অপরিচিত মানুষটা কেমন ভাবে জানতে পেরে গেল! সেভাবে দেখতে গেলে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নই এ পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি আমার ভালোবাসার কথা ধরতে পেরেছেন। তাহলে কি আমার ব্যবহারে আমার ভালোবাসা প্রকট! লজ্জের পাত্তা নেই। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'স্যার, আমি বাসেই যাই। তাতে করে আমার সুবিধা হবে। আর আপনাকেও কষ্ট করে যেতে হবে না।'

'না, তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারি না। চল, তুমি বাসে যাবে আমি গাড়ি নিয়ে বাসের পিছনে যাব।'

নাঃ! উনি আমার ব্যাপারটা সত্যিই খুব সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছেন, কি ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে না। সুইসাইড কেস না বাড়ি থেকে পালাবার মতলব! মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত আমার অত সচ্ছ দৃষ্টি নেই যে আমি ওনার মুখ দেখে সেটা অনুমান করতে পারব! উনি আমাকে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে বললেন। যতক্ষণ না স্টেশান থেকে স্কুটার নিয়ে উনি আসছেন ততক্ষণ যেন বাসে না উঠি। ওনার নির্দেশ মত গিয়ে দাঁড়ালাম স্ট্যান্ডে। দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। পাঁচ দশ পনের করে পঁয়তাল্লিশটি মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এত দেরি করছেন কেন বুঝতে পারছি না উনি কি আবার ওয়েটিং লিস্ট দেখতে বসলেন না কি! টিপ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, ছাতাটা খুলে দাঁড়ালাম। গাড়ি সমেত মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি; আর ধর্মতলায় গিয়ে লাভ নেই। উনি এলে বলব, আপনি বাড়ি যান আমিও বাড়ি যাই। বৃষ্টির গতি বাড়ছে। নিজের ছাতার তলায় একজন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে গিয়ে প্রায় কাক ভেজা হয়ে গেছি। হুড়মুড় করে বৃষ্টি এল। এখানে আর দাঁড়ান যায় না। গিয়ে দাঁড়ালাম সেডের তলায়। প্রথম থেকে এখানে দাঁড়ালে এত ভিজতে হত না, কিন্তু উনি যদি আমাকে

খুঁজে না পান তাই সামনের দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বৃষ্টি চলল প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে। একটানা মুষল ধারে বৃষ্টি। মুহূর্তে শুকনো খট্‌খটে রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেল। বৃষ্টি একটু থেমেছে। আমি চলে আসতেও পারছি না। উনি যদি আবার এসে খোঁজেন আমাকে! আবার যাব রিজার্ভেশান কাউণ্টারে! কথাটা ভাবতে ঐ খানেই বসে পড়তে ইচ্ছে হল। এতটা জল জমে গেছে শাড়ী পরে যাই কি করে! ঘড়িটা বাঁধার জন্য ব্যাগ থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে আহীরের চিঠিটা কাদায় পড়ে গেল। চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে শাড়ীতে মুছে ফেললাম। ছাতাটা ভিজে গেছে ব্যাগে ঢোকাবারও রাস্তা নেই, তাহলে খাতা ভিজে যাবে। অন্য হাতে ফাইল। আমি কি করব বুঝতে পারছি না। হাত কাটা জগন্নাথের মত অসহায় লাগছে। আর একটা হাত হলে ভালো হত। কোন রকমে শাড়ীটা একটু গুঁজে সেড থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি কি ঠিক দেখছি! বাপির মত কেউ একজন এদিকে আসছেন না! ও গড! এ তো বাপির মত নয় স্বয়ং বাপি। আমার মনে পড়ে গেল, মাকে বলে এসেছিলাম বাপি বাড়ি ফেরার আগে আমি চলে আসব। কি হবে এখন! আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম করছে। বাপি যে এদিকেই আসছেন। আমাকে দেখতে পাননি এখনো। আমি বরং পালিয়ে যাই; ঐ মোটা থামটার পিছনে লুকিয়ে পড়ি...। ছিঃ! এসব কি ভাবছি! কেন পালাতে যাব! আর এসব লুকোচুরিরই বা কি দরকার! অন্যায় করলে শাস্তি পেতে রাজি আছি কিন্তু এভাবে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারব না। যা হয় হবে দাঁড়িয়ে থাকব। বাব্বা, কি সাহস! ধেয়ে আসা বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম বীর পুরুষের মত—সরি বীরাঙ্গনার মত। মনে মনে ছক্ কষছি কি বলব। ভিতর ভিতর যতই তড়পাই বাপির সামনে আহীরের কথা বলার সাহস নেই। অবশেষে অন্তিমলগ্ন আসন্ন। যেন রকেট লঞ্চিং হচ্ছে—ফাইভ, ফোর, থ্রী, টু, ওয়ান, জিরো—বাপি আমার দিকে তাকালেন। চোখে চোখ পড়তেই আমার প্রাণ পাখিটা যেন নাশারন্ধ্র দিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। মনে হল আমার শরীরে বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। নাকে তুলো গুঁজে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

'তুই এখানে!' প্রথম ধাক্কা।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখছেন। হাঁটুর নিচ থেকে শাড়ী ভিজে। চাপলে এক বালতি জল বের হবে। আপাদমস্তক ছাতরা পাখির মত অর্ধস্নাত।

'কোথায় গিয়েছিলিস?'

'শিয়ালদায়।'

'শিয়ালদায় গেছিলিস তো এখানে কি করছিস?'

'ডায়রেক্ট বাস পাইনি, তাই হাওড়া পর্যন্ত এসেছি।'

'এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'বাড়ি যাব।'

'বাড়ি যাবি! তুই তো দাঁড়িয়েছিস উল্টোদিকে। এখানে থেকে কি বাড়ি যাবার বাস পাবি?'

'বৃষ্টি পড়ছিল তাই শেডের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

কেবল মাত্র শেষের সত্যি কথাটা মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম। এতক্ষণ মাথা নিচু করে গড় গড় করে মিথ্যে গুলো বলে গেলাম। বাপির মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলার ক্ষমতা আমার নেই। বাপির চোখ দুটো যেন লাই ডিটেক্টার। ওদিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাব, একেবারে নিশ্চিত।

"মনে পড়ছে মাস কয়েক আগেকার একটা ঘটনা। সেদিন আমাদের স্যারের একটা টিভি সিরিয়ালের গান রেকর্ডিং ছিল এইচ এম ভি স্টুডিওতে। আমি হানড্রেড ইলেভেন পার্সেন্ট সিওর ছিলাম যে স্টুডিওতে যাওয়ার জন্য বাপির অনুমতি পাব না, কিন্তু যাওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন। তাই মাকে বলে গেলাম, 'স্টুডিওতে যাচ্ছি; বাপি জিগ্যেস করলে বোলো পড়াতে গেছে। পড়িয়ে যে সময় বাড়ি ফিরি সেই সময়ের মধ্যেই চলে আসব।'

মাকেও অবশ্য একটা ছোট্ট মিথ্যে বলতে হল। মা যদি জানতেন যে আমি একা যাচ্ছি তাহলে উনি সারাদিন চিন্তা করতেন আর ছটফট করতেন। কারণ ওদিকে আগে কখনো যাইনি। অচেনা রাস্তা তার উপর আবার এত দূরে, তাই বললাম বন্ধুদের সাথে যাচ্ছি। অথচ একাই খুঁজে গেছি একাই এসেছি। কিন্তু ফেরার পথে সে এক মহা বিভ্রাট। মতিঝিলের একটু আগে আমাদের বাসটা করল অ্যাক্সিডেন্ট। একটা সাইকেল আরোহীর পিছনে মেরেছে এক ধাক্কা। লোকটা একদিকে ছিটকে পড়ল আর অন্যদিকে তার সাইকেল। ভদ্রলোক প্রাণে বেঁচে গেলেও বেশ চোট লেগেছে। আর সাইকেলটার দিকে তাকান যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ আগেও যে ঐ বস্তুটার নাম সাইকেল ছিল তা বোঝার উপায় নেই। হ্যান্ডেল একদিকে চাকা আর একদিকে। সে চাকা আর গোল নেই দুমড়ে মুচড়ে একেবারে অষ্টবক্র হয়ে গেছে। ওজনদরে বিক্রি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যাক, সাইকেলটা মরলেও মালিকটা বেঁচে গেছে। আমি ভাবছি লোকটার অবস্থা যদি ঐ সাইকেলটার মত হত তাহলে এতক্ষণ বাসটা অগ্নিপরীক্ষা দিত। আর সীতার মত বাসটা তো নিষ্পাপ নয়, সদ্য একটা পাপ করল তাই পরীক্ষায় ফেল রেজাল্ট—পুড়ে ছাই। এদিকে হয়েছে কি, বাসটা পাবলিক ঘেরাও করতে সামনের কনডাকটর তার পয়সার ব্যাগটা আমার ওড়নার তলায় গুঁজে দিয়ে চলে গেল। প্রথমটায় খুব ঘাবড়ে গেছি আমি। ওড়না সরিয়ে নিতেই সে করুণ সুরে বলল, 'ওটা আপনার কাছে একটু লুকিয়ে রাখুন দিদি। ওরা পেয়ে গেলে মুশকিল হবে।'

কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে উঠছে। ড্রাইভারকে নামিয়ে ওরা যে রকম চড় চাপড় মারতে শুরু করেছে, তাতে করে ও আগামী কয়েকদিন স্টিয়ারিং ধরতে পারবে কি না সন্দেহ। বেশ কয়েকজন যাত্রীও নেমে গেল। আমি একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি। নামতেও পারছি না আর সেই কনডাকটরটাই বা গেল

কোথায়! জটলায় মধ্যে কোথার যে তালে গোলে অম্বলে হজম হয়ে গেছে খুঁজে প্যাচ্ছি না। জানালা দিয়ে মুরগীর মত গলাটা বের করে চেঁচাচ্ছি। আ্যায়—অ্যায়—দেখতে পেয়েছি, 'ও দাদা, আর কতক্ষণ বসে বসে আপনার যক্ষের ধন আগলাব! সামলান আপনার জিনিস আমি নেমে যাব।

'একটু দাঁড়ান না। গাড়ি এক্ষুনি ছাড়বে।'

'ছাড়ুক। আমি অন্য বাসে যাব। খানিক দূরে গিয়ে আবার কার পিছনে ঠোকিয়ে দেবে তার ঠিক নেই।' শেষের কথাগুলো আস্তে বললাম। পয়সার থলি হ্যাণ্ড ওভার করে টিকিটটা এগিয়ে দিলাম।

'পয়সা ফেরৎ দিন।'

'কিসের পয়সা?'

'কিসের পয়সা মানে। দু কদম এসেই তো হোঁচট খেলেন। এইটুকু আসার জন্য টিকিট কাটিনি।'

'বসুন না, গাড়ি তো যাবে।'

'থাক্, আমার তাড়া আছে আমি নেমে যাব।'

'তাহলে যান, পয়সা দেওয়া যাবে না।'

'এ—ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পাবলিককে দিয়ে দেব। মামদোবাজী না! টিকিটের দাম ফেরৎ দেবে না।'

আমি বলার সাথে সাথে আরও কয়েকজন টিকিট নিয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে। বেগতিক দেখে কনডাক্টর পয়সা ফেরৎ দেয় সবাইকে। নিচে নেমে দেখি আর একদল যাত্রী অন্য কনডাক্টারকে ঘিরে ধরে টিকিটের দাম ফেরৎ নিচ্ছে। খানিক এগিয়ে এসে অন্য বাস ধরে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। বেশ চলছিল। কিছুটা দূর এসে এমন জ্যামে আটকে গেল বাস আর নড়তেই চায় না। ন যযৌ ন তস্থৌ। কি বিপদ, এ যেন কুমিরের মুখ থেকে রেহাই পেয়ে বাঘের সামনে পড়েছি। এদিকে ঘড়ির কাঁটা পুলিশে তাড়া খাওয়া চোরের মত ছুটছে; তার পথে তো আর জ্যাম নেই। বাড়ি ফেরার টাইম ক্যালকুলেশান করে ঠিক সময়েই স্টুডিও থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু হার্ডল্ রেসের মত এত ব্যারিকেট টপকাতে হবে কে জানত! বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা চিন্তা করছেন, বাপি রেগে যাচ্ছেন। আমি যেন মহাভারতের সঞ্জয়ের মত দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখতে পাচ্ছি। ভাবতে ভাবতে ঢুকছি, মাকে চুপি চুপি জিগ্যেস করব ঘরের আবহাওয়া কেমন সেই মত বুলেটিন চালাব। ও হরি! দরজা খুললেন বাপি। পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করে আমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলিস?

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত শুনেই ঘাবড়ে গেছি। মাথা নামিয়ে নিতেই ধমকে উঠলেন, 'এত দেরি হল কেন? কোথায় গিয়েছিলিস?'

বাপি এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন যেন উনি জানেন আমি কোথায় গিয়েছিলাম। অনেকটা সেই স্মাগলারদের থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগের আগে পুলিশ যেমন গুল মেরে কথা

আদায় করে—তোমার সাথীরা সব সত্যি কথা বলে দিয়েছে। তুমি কি ভাবছ আমরা কিছু জানি না! স্বীকার কর এগুলো সত্যি! তা না হলে তোমার সাথীরা ছাড়া পাবে, তোমার শাস্তি হয়ে যাবে।

বাপির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বশীকরণ মন্ত্রপুতের মত বলে ফেললাম, 'এইচ এম ভি স্টুডিওতে গেছিলাম।'

'কোথায় গেছিলিস! এইচ এম ভি স্টুডিও! তবে তোর মা যে বলল তুই পড়াতে গেছিস!'

হে ভগবান, এ আমি কি করলাম! বাপির ধমক খেয়ে মার কথা বেমালুম ভুলে গেছি। মাকে বাপির কাছে মিথ্যেবাদী করে দিলাম! মা আমার জন্য অপরাধী হয়ে গেলেন। কি বেইমান রে আমি! ইতর, ছোটলোক, ছুঁচো। মার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে। মা হয়ত এক্ষুণি বলবেন, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! আরও বলবেন, তুই আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি চালালি। মা কিছু বলার আগেই আমি বললাম, 'মার কোন দোষ নেই। আমিই মাকে বলতে বলে গেছিলাম তুমি অহেতুক চিন্তা করবে তাই।'

'এইচ এম ভি স্টুডিও কোথায়, টালাপার্ক দমদম ঐদিকে তো?'

'হ্যাঁ।'

'তোর সাহস তো কম নয়, তুই আমাকে না বলে অতদূরে গেছিস!'

আমি আর বাপির সামনে নেই। বুঝতে পারছি উনি ভীষণ মনক্ষুন্ন হয়েছেন। আমার এ ব্যবহার মোটেই আশা করেননি। আমার বহু আনন্দ, খুশীর বিনিময়ে এতদিন তিল-তিল করে যে বিশ্বাস গড়ে তুলেছিলাম আজ তার ভিতটা যেন নড়ে উঠল। বাপি হয়ত ভাবছেন সমি এভাবে চুরি করে নিশ্চই আরো অনেক জায়গায় গেছে। ইস্ কি ভুল করলাম। সত্যি কথা বলার কি নিদারুণ শাস্তি পেলাম আমি।'

'তুই আজ শিয়ালদায় যাবি আমাকে বলিস নি কেন?'

বাড়ি ঢুকে বাপির প্রথম প্রশ্ন। আমি ভাবছিলাম মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের কথা। উনি হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন সেটাই ভাবছিলাম। সে ভাবনায় ছেদ পড়ল বাপির প্রশ্নে।

'আগে আমার যাওয়ার ঠিক ছিল না। তুমি চলে যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'হঠাৎ কি এমন দরকার পড়ে গেল যে এই অসুস্থ অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যেতে হল।'

'যাওয়ার সময় তো বৃষ্টি হয়নি। রোদ ছিল।'

উনি আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকিয়ে চলে গেলেন। আমি কি তর্ক করছি! তা কেন! বাপি যা প্রশ্ন করছেন আমি তার উত্তর দিচ্ছি মাত্র। বড়দের এই ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। প্রশ্নের জবাব না দিলে বলবেন, এমন অভদ্র, চুপ করে থেকে বড়দের উপেক্ষা করছে। আর জবাব দিলে বলবেন, এমন

অসভ্য, বড়দের মুখে মুখে তর্ক করছে। এ যেন শাঁখের করাত। যেতেও কাটে আসতেও কাটে। সারাটাক্ষণ কেটে গেল গরমে গরমে। কারুর সাথে কারুর কথা নেই। তিন জন তিন জগতের প্রাণী। একে অপরের ভাষা বোঝে না। তাই সবাই মৌনব্রত পালন করছে। কিন্তু কাল সকালে বাপি বের হবার আগেই আমাকে বের হতে হবে। আর না বলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমিই আগে শুরু করলাম, 'বাপি, কাল সকালে এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে শিয়ালদায় যাব।'

'সকাল কটায় ?'

'সাড়ে সাতটা।'

'কখন ফিরবি ?'

'দুপুরের আগেই চলে আসব।'

বাপি আর কিছু বললেন না। উনি যে আমরা এই যাওয়াটা খুব সহজভাবে মেনে নিলেন, তা নয়। এটা খানিকটা উদাসীনতা। অবাধ্য মেয়ের প্রতি উদাসীনতা। অন্য কোন কাজ হলে যেতাম না। যত দরকারি কাজই হোক, না গিয়ে বাপির এ উদাসীনতার মূল্য দিতাম। কিন্তু আমি নিরুপায়। কাল আহীর চলে যাবে। আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। দেখা হলে কি বলব! ও যদি আমাকে দেখতে না পায়, আমি ওর সামনেই যাব না। দূর থেকে দেখে চলে আসব। কাছে গিয়ে একবারও জানতে চাইব না, কেন আমার সাথে এমন করল! না, কিছুতেই সামনে যাব না। অভিমানে মনটা ভরে উঠছে। আর যদি সামনা-সামনি দেখা হয়ে যায় তাহলে! জানি না; আমি নিজে থেকে কিছু বলব না। ও যদি কিছু বলে তো দু চার কথায় উত্তর দিয়ে চলে আসব। হ্যাঁ, ট্রেন ছাড়ার আগেই চলে আসব। সঞ্জয় বলেছিল সকাল সাড়ে নটায় তুফান মেল ছাড়ে। যেটা ডায়রেক্ট আগ্রা যাচ্ছে। যত সম্ভব আহীর তুফান মেলেই যাবে। কাল সবার আগে গিয়ে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের সাথে দেখা করতে হবে। দেখি উনি কি বলেন। বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই আরামে শরীর অবশ হয়ে এল। একটু একটু খারাপ ছিল তার উপর কোল্ড ড্রিংস, রোদে ঘোরা, বৃষ্টিতে ভেজা সবকিছু মিলিয়ে শরীরের মধ্যে একটা ফালতু ঝুট ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। আমি পাত্তা দিচ্ছি না। যত উঁ আঁ করবে তত চেপে ধরব। ও ব্যাটাকে আমি ভালো করে চিনি। অ্যাভয়েট করে চল, আপসে ঠিক হয়ে যাবে। কথাতেই তো আছে—'শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।' কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করলাম। শরীরে যা হয় হোক কাল সকাল সাড়ে সাতটার আগে বাপি বা মা যেন টের না পান, তাহলে আমার যাওয়া হয়ে গেল। একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে তারপর যা হয় পরে দেখা যাবে। মামদো-বাজী পেয়েছে, শরীর খারাপ হবার আর সময় পায়নি!

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পরনে সেই প্রথম দিনকার সাদা চুড়িদার আর হলুদ ব্যাগ। স্টেশনে হাজার লোকের ভিড়ের মাঝে আহীর আমাকে চিনতে না পারুক আমার জামাটা দূর থেকে ঠিক চিনতে

পারবে। গত রাতের অভিমান আর ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট নেই। থাকলে ওর কাছে ধরা দেবার এ নতুন পন্থা অবলম্বন করতাম না। বাস থেকে নেমে সোজা গেলাম মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের কাছে। কাল ওনার সঙ্গে দেখা না করে বাপির সাথে চলে যেতে বাধ্য হয়েছি তাই মনটা অপরাধী অপরাধী ভাব। আজ আর পিছনে দাঁড়ালাম না। কাউন্টারের সামনে যেতেই কাঁচের দেওয়ালের ওপার থেকে ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়ে সামনের ভদ্রলোককে সরে একটু জায়গা করে দিতে বললেন। আমি সেই রিক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সরি স্যার, কাল আপনার সাথে দেখা না করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছি।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন স্টেশনে যাও। নটা পনের তে কালকা মেল আর সাড়ে নটায় তুফান মেল ছাড়বে। ওদুটো দেখ। আট-নয় নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়বে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটার দরকার নেই, কেউ ধরলে আমার নাম বোলো। সঙ্গে কাউকে দেব ?'

'না স্যার, থ্যাংকস্। আমি খুঁজে নিতে পারব।'

টপাটপ্ সিঁড়ি টোপকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এলাম। সামনেই কাঁচের ঘেরা-টোপের মধ্যে বসে থাকা এক ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলাম 'দাদা, প্ল্যাটফর্ম টিকিটটা কোথায় পাব ?'

তিনিও আঙুল দেখিয়ে ফটিক মার্কা জবাব দিলেন। ওনার আঙুলের ডগা লক্ষ্য করে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম। দশ টাকার একটা নোট ঘুলঘুলির ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম, 'দাদা একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট দেবেন।'

দাদা বললেন, 'খুচরো হবে না।'

'একটু দেখুন না হয়ে যাবে। আমার কাছে আর নেই।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে বললেন, 'আপনি নিন, আমি দাম দিচ্ছি।'

'ও, থ্যাংকইউ।' দশ টাকাটা ওনার দিকে এগিয়ে দিলাম।

'আপনি রাখুন না, আমিই দিচ্ছি।'

'নু না, তা কি করে হয় ! তাহলে থাক।'

'আচ্ছা দিন দেখি'। উনি দশ নিয়ে খুঁজে পেতে আট ফেরৎ দিলেন। আমি টিকিটটা হাতে নিয়ে ওনাকে আর একবার সহাস্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এত সহৃদয় ব্যক্তিদের সাহায্য এর আগে কোনদিন পাইনি। এই দুদিনে অজস্র থ্যাংকইউ খরচা হয়ে গেল। তা যাক, আহীরকে খুঁজে পেলেই হল। উর্দ্ধশ্বাসে হাঁটলাম স্টেশানের দিকে। টিকিটে টাইম লেখা আছে আটটা কুড়ি। আটটা কুড়ি থেকে নটা কুড়ি। সঞ্জয় বলেছিল প্ল্যাটফর্ম টিকিট এক ঘণ্টা ভ্যালিড। তারপরই ফাইন। আমাকে সাড়ে নটা পর্যন্ত থাকতে হবে। টিকিটটা হাতে নিয়েই ঢুকলাম। সোজা ন নাম্বার প্ল্যাটফর্ম। সকালে অফিস যাত্রীদের ভিড়ে

স্টেশান একেবারে থিক্ থিক্ করছে। চারিদিক থেকে যেন মানুষের এলোপাথাড়ি ঢেউ চলেছে। আমার ভয় করছে। এই জনসমুদ্রে কোথায় খুঁজব আহীরকে! হে ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর। রিজার্ভেশান চার্ট টাঙানোর বোর্ডগুলো ফাঁকা। খানিক পর লম্বা লম্বা লিস্টগুলো বোর্ডে লোটকে দিয়ে গেল। আমিও একধার থেকে শুরু করলাম। সাদা কাগজের উপর ঝাপসা অক্ষরে লেখা নাম। আমার চোখ দুটো উপর থেকে নিচের দিকে নামছে বার বার। তন্ন তন্ন করে খুঁজছি এ. কে. বাসু। কিছুক্ষণ পর একটা ছেলে এসে বলে, 'দিদি আমাকে নামটা বলুন, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে—আমিই খুঁজে নিচ্ছি।'

সবাই আসছে নাম খুঁজে পাচ্ছে চলে যাচ্ছে, আমার খোঁজার আর অন্ত নেই। খুঁজে চলেছি তো চলেছি। সব চার্ট দুবার করে দেখেছি তবুও কোথাও এ. কে. বাসুকে খুঁজে পেলাম না। ঘড়ি দেখলাম নটা পাঁচ। আর দশ মিনিট পর কালকা মেল ছাড়বে। আমি গাড়ির গায়ে চিটানো লিস্টগুলো পড়তে পড়তে এগোচ্ছি। শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলাম। গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করেছে। এক সময় বেরিয়ে গেল আমার সামনে দিয়ে। আমি স্টেশানের দিকে ফিরতে লাগলাম। এখনো একটা ভরসা আছে। তুফান মেল। যে ছেলেটা আমাকে নাম খোঁজার সময় সাহায্য করতে চেয়েছিল তাকে দেখতে পেলাম।

'দাদা, তুফান মেল কত নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?'

'ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে।'

গেলাম সেখানে। আবার নতুন করে খুঁজতে শুরু করলাম। ট্রেনের গায়ে লাগানো চার্টগুলো পড়তে পড়তে চলেছি। হঠাৎ মনে পড়ল মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন তো তুফান মেলের কয়েকটা কোচ নাম্বার বলে দিয়েছিলেন। মনে পড়ার সাথে সাথেই নাম্বার মিলিয়ে ট্রেনের কামরায় উঠলাম। এক মানুষ সরু পথ। একজন গেলে আর এক জনের পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই। কোনরকমে ঠেলে ঠুলে এগোতে এগোতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি। এক কামরায় খোঁজা শেষ হলে পাশের কামরায় উঠি। এমনি করতে করতে হঠাৎ মনে হল আগের কামরায় খুঁজে আসার পর যদি ও ওঠে। আবার উঠে এলাম আগেরটায়। আমার মাথা আর কাজ করছে না। একদল চ্যাংড়া ছেলে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ চাপিয়ে বসে আছে। সরু প্যাসেজ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে মন্তব্য করল, 'কোথায় যাচ্ছ? আমাদের কাছে এস! এখানে অনেক জায়গা আছে।' সঙ্গে বিশ্রী হাসি। অন্য সময় হলে মটকা গরম হয়ে যেত, কিন্তু তখন ফিরে তাকাবারও সময় নেই। এ অপমান মনে বিঁধলেও যন্ত্রণার অনুভূতি টের পেলাম না। পাব কি করে! সেখানে যে আরো বড় যন্ত্রণা জায়গাটাকে অসাড় করে রেখেছে। রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাওয়া জায়গায় আঘাত করলে লাগে না: এটাই তো নিয়ম। ট্রেনটা নড়ে

উঠল। কি করব আমি, আহীরকে যে খুঁজে পেলাম না। পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে, আমার লেখা এখনো শেষ হয়নি। ম্যাডাম খাতা নিতে নিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কি অসম্ভব টেনশান। ধাক্কা খেয়ে টনক নড়ল; আমি ট্রেনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। চাকা গড়াচ্ছে, নেমে এলাম ট্রেন থেকে। লক্ষ্য করলাম জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। তাঁর হাত ধরে ট্রেনের ভিতর বসে আছে একটা ছেলে, তারও চোখ ছল্ ছল্ করছে। বিদায় লগ্নে রোদনের পালা। ওদের ছেড়ে যেতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল। যেন ঘষা কাঁচের উল্টোদিকের দৃশ্য দেখছি, ট্রেন চলতে শুরু করেছে। আমি কাঁদছি। নিজেকে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারছি না। ছিঃ, এভাবে পাবলিক প্লেসে দাঁড়িয়ে কাঁদার কোন মানে হয়। আমি লুকোতে চাইছি চোখের জল। তাছাড়া এর জন্যে আহীরকে খুঁজতে পারছি না। ট্রেনের ভিতরকার যাত্রীর মুখগুলো ঝাপসা। খুব বিরক্ত লাগছে নিজের উপর। আপ্রাণ চেষ্টা করছি, চোখের সামনে কুয়াশাচ্ছন্ন পর্দাটা সরিয়ে ফেলতে, পারছি না। বার বার নোনা জলের ঝাপটায় অসচ্ছ হয়ে যাচ্ছে সামনের দৃশ্যপট। নিজেকে শক্ত করছি। কান্না থামিয়ে দেখার চেষ্টা করছি ট্রেনের ভিতরকার যাত্রীদের; একঝলক যদি দেখতে পাই আহীরকে। পেলাম না। আমার সব আশা আকাঙ্খাকে চাকার তলায় পিষে ইঞ্জিনের বুকফাটা চিৎকার তুলে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা। আমি দাঁড়িয়ে আছি, একা। ভাবছি, আর কোনদিন দেখতে পাব না আহীরকে। আমি যেভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতাম আহীরকে ছাড়া সেভাবে বাঁচতে পারব না। সত্যিই কি বাঁচা যায়?

'যাকে খুঁজছিলেন পেলেন না?'

প্রশ্ন শুনে তাকালাম। সেই ছেলেটা। ঘাড় নেড়ে জানালাম, 'না'।

পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম স্টেশান থেকে। কি করি, বাড়ি যাব! ভালো লাগছে না যেতে। কোথায় যাব। বাড়ি যাওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। কিন্তু মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত। তা না হলে বড়ই অভদ্রতা হবে। অলস পায়ে সেদিকেই হেঁটে চললাম। কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম, 'স্যার—'

'ভিতরে এস।'

ভেবেছিলাম আমার ব্যর্থতার খবরটা জানিয়েই চলে আসব। কিন্তু তার আগেই উনি ভিতরে ডাকলেন। আবার সেই গার্ডের মুখোমুখি হলাম, 'মুঝে অন্দর যানা হ্যায়।'

'যাইয়ো।'

অনুমতি পেয়ে ভিতরে গেলাম। উনি নিজের আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, 'কি ব্যাপার, খুঁজে পেয়েছ?'

'না।'

'ও নো। কি করবে এখন ?'

'আজ আর কোন ট্রেন নেই আগ্রায় যাওয়ার ?'

'আছে। সাড়ে তিনটের সময় একটা আছে।'

'আমি তাহলে একটু ওয়েট করি। ঐ ট্রেনটা দেখে যাব।'

'ওয়েট করবে ! সাড়ে তিনটে পর্যন্ত !' ঘড়ির ওপর থেকে জামার হাতা সরিয়ে বললেন, 'এখন তো সবে পৌনে দশটা এতটা সময় কোথায় ওয়েট করবে ?'

'কেন, বাইরে চেয়ার আছে আমি ওখানেই ওয়েট করছি।'

'পারবে এতক্ষণ বসে থাকতে ?'

কোন উত্তর দিলাম না, শুধু হাসলাম। যে হাসির অর্থ—পারব বৈকি।

'কিন্তু তোমার খাওয়া-দাওয়া ?'

'ও আপনি ভাববেন না। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি।'

'ঠিক আছে বোস ; আমি তিনটের আগেই খবরটা তোমাকে জানাবার চেষ্টা করছি। ঐ ট্রেনে যারা ট্রাভ্‌ল করছে তাদের রিজার্ভেশান চার্ট এখনো বের হয়নি। ওটা বের হলে দেখে হয়ত বলা যাবে।'

'ঠিক আছে স্যার, আমি ওখানেই ওয়েট করছি।

ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসলাম সেই চেয়ারে। নতুন করে কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা আমার নেই, আর পুরনো গুলো নিয়ে যে নাড়াচাড়া করব, সে তো সব মিথ্যে হয়ে গেছে। হারিয়ে ফেলেছি সে সব। বসে আছি। আহীরকে দেখতে পাওয়ার সামান্যতম আশাটুকু বেঁচে নেই। তবুও বসে আছি। একবার শেষ চেষ্টা—

মৃত্যুর দ্বারে পড়েছে আজ
জীবনের যবনিকা,
তবু শোকের সমারোহের মাঝে
জ্বলে প্রাণের শিখা।

'দিদি আপনার চা।'

'একটা রোগা মত লোক আমার দিকে এক ভাঁড় চা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পান খাওয়া দাঁতের একগাল হাসি লেগে আছে সারা মুখে।

'আমার চা ! আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমি তো চা চাই নি !'

মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের নাম করে বলল, 'উনিই আপনাকে চা দিতে বললেন।'

'আমি তো খাই না। আপনি গিয়ে ওনাকে বলুন, আমার চা লাগবে না।'

'উনি আমাকে বার বার বলে দিয়েছেন আপনি যাতে নেন্। ধরুন।'

চাটা নিয়ে ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে এগারটা বাজে। ভদ্রলোকের কাছে আমি ঋণী হয়ে যাচ্ছি। কি দরকার ছিল চা পাঠাবার ! ঘণ্টাখানেক পর সেই লোকটা আবার

এল আর এক কাপ চা নিয়ে। এবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। আমার মোটেই ভালো লাগছে না এভাবে বসে বসে অন্যের পয়সা ধ্বংশাতে। সামনের লম্বা লাইনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কাঁধে পিঠে হাতে করে গোটা চারেক পোটলা পুটলি, এক্কেই নড়তে পারছে না তার উপর আবার একটা হাত এনগেজড্ সিগারেটের জন্য। ছেলেটাকে চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে ভাস্কর। আমার কলেজের বন্ধু। চিনতে পারছি অথচ পারছি না। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল গিয়ে সামনে দাঁড়াই ও যদি ভাস্কর হয় আমাকে ঠিক চিনতে পারবে। কিন্তু যদি না হয় তাহলে খুব বোকা বোকা লাগবে। আমি চেয়ারে বসেই ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম ওর ঘাড় ঘোরানোর অপেক্ষায়। এক সময় সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার জন্য ও মুখটা ডান দিকে ঘোরাল। ইয়েস, ভাস্কর, ও আমাকে দেখতে পেয়ে হাসছে। প্রায় দু বছর পর আমাদের দেখা। উঠে গিয়ে ওকে ভার মুক্ত করলাম, 'আমাকে দে এগুলো।'

নিজের জায়গায় ফিরে এসে পাশের চেয়ারে ওর লটবহর গুলো রাখলাম। কাউণ্টারে কাজ সেরে ভাস্কর এসে বসল।

'কেমন আছিস বল।' ভাস্কর শুরু করল।

'এই চলে যাচ্ছে। তুই এখানে?'

'একটা রিজার্ভেশান ক্যানসেল করতে এসেছি।'

'ও। তারপর, তোর কি খবর? কি করছিস আজকাল?'

'কিছু না, বাড়িতে বসে আছি।'

'সে কি! আশু যে বলল তুই কিসের একটা ট্রেনিং নিতে বাইরে গেছিস।'

'হ্যাঁ, সে তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কবে দেখা হয়েছিল আশুর সাথে?'

'এই তো, বেশী দিন নয় মাস দুই আড়াই হবে। ভাইকে নিয়ে ডাক্তারখানা থেকে ফিরছি, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল মূর্তিমান। হ্যালো ডার্লিং কেমন আছ? তুই তো জানিস ওর কেমন কথার ছিরি। ভাই এর সামনে পুরো প্রেস্টিজে ফেলে দিয়েছে। বলে, চল ডার্লিং তুমি আর আমি ব্যাণ্ডিট কুইন দেখে আসি।'

'জানি, ও এখনো সেই ছ্যাবলাই রয়ে গেছে। আর কারুর সাথে দেখা হয় না?'

'হয়, সেই দিনই তো, আশুর সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছি হঠাৎ দেখি কোথা থেকে অলক এসে হাজির। কিরে গুরু বোন কেমন আছিস?'

'ও হ্যাঁ, অলক তোকে গুরু বোন বলে ডাকত না! তুই এখনো মাউথ অর্গান বাজাস?'

'না রে।'

'কেন, অনেকগুলো গান তুলেছিলিস তো। ছেড়ে দিলি কেন?'

আর একটা সিগারেট ধরাল ভাস্কর।

'এমনি। অ্যান্থ্রোপোলজি এক্সকারশানে গিয়ে সুব্রত আমাদের নিয়ে একটা ছবি তুলেছিল। আশু, অলক, অজয়, সুব্রত আর আমি। বলল, এভাবে এক সাথে আমাদের হয়ত আর কোনদিনই দেখা হবে না। তাই স্মৃতি হিসাবে আমার ছাত্রছাত্রীদের সাথে একটা ছবি থাক।'

'সত্যি, কলেজের দিনগুলো মনে পড়লে এখনো মজা লাগে।'

'তোর মজা লাগে! আমার কষ্ট হয়, মনে হয় আবার প্রথম থেকে যদি শুরু করা যেত!'

'অলক কি করছে, চাকরি বাকরি পেয়েছে?'

'দূরে ভাই, চাকরি কোথায় পাবে! ওষুধের কি একটা বিজনেস্ করবে বলছিল। রোডের উপর একটা ভালো ঘর খুঁজছে।'

'আর আশু কি বলল?'

'ওর কথা আর বলিস না, সারাক্ষণ রাজনীতি নিয়ে বকে গেল। যদিও রাজনীতির প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম, কিন্তু ও একবার বলতে শুরু করলে আর থামতে চায় না। শেষে অলক রেগেমেগে বলে তোরা থাক রাজনীতি নিয়ে আমি চললুম।'

'অলক এখনো যায় সুব্রতর কাছে?'

'রেগুলারলি যায় না মনে হয়। তাছাড়া সুব্রতই এখন সময় দিতে পারে না। কারখানা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।'

'ছেলেটা বাজাত কিন্তু খুব সুন্দর।'

'হ্যাঁ, ক্লাসে মাউথ অর্গান বাজান নিয়ে কত বকুনি খেয়েছে! একদিন তো এস. ডি. রুমে ঢুকে পড়েছেন ও তাও চোখ বন্ধ করে বাজিয়ে চলেছে। স্যার বলছেন কিরে এবার থামা।'

'এস ডি বলে রেহাই পেয়ে গেছে। এ. জি হলে মাউথ অর্গান কেড়ে নিয়ে পুকুরে ফেলে দিত।'

'আমি যখন ওদের বাড়িতে শিখতে যেতাম, প্রথমে গান তুলে নিয়ে বাকি সময়টা বসে বসে ওর গান শুনতাম। কি অদ্ভুত বাজাত ও।'

'তুই কি করছিস বললি না তো?'

'কম্পিউটার পড়ছি। ইচ্ছে আছে বাংলায় এম. এ. টা পড়ার, দেখি কি হয়।'

'এখানে বসে আছিস, কোথাও যাবি না কি?'

'না, আমি কোথাও যাব না। আমার এক বন্ধু আগ্রায় যাবে, তার জন্যই ওয়েট করছি।'

'ট্রেন কটায়?'

'সাড়ে তিনটে।'

'সে তো ঢের দেরি, এত আগে এসেছিস কেন ?'

'আগে না এলে তোর সাথে যে দেখা হত না ।'

ভাস্কর হাসছে। আমার দৃষ্টি চলে গেছে কাঁচের দেওয়ালের ওপারে। মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমাদের দেখছেন। উনি ভাস্করকে আহ্বীর ভাবছেন না তো! কথাটা মাথায় স্ট্রাইক করার সাথে সাথে উনি ইশারায় আমাকে ডাকলেন। কাউণ্টারের সামনে যেতে বললেন, 'ভিতরে এস ।'

আমি ফিরে আসছি একটা কথা কানে এল, 'কি ব্যাপার, কাল থেকে এখানে ঘোরাঘুরি করছেন দেখছি !'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। একটা ছেলে। 'এনি প্রবলেম ?'

'না, কাল থেকে দেখছি তো—'

'দেখছেন কেন, আপনাকে দেখতে বলেছি ?'

'অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন—'

'কি আশ্চর্য ! সেটা আমার সমস্যা। তাতে আপনার মাথা ব্যথা হচ্ছে কেন ?' দু চার জন বচসা শুনে এগিয়ে এসেছে।

ছেলেটা মাথা নামিয়ে নিল। ও ভেবেছিল টোণ্ট করে বেরিয়ে যাবে। পাল্টা জবাব আশা করেনি। একটু ঠোক্কর খেতেই শামুকের মত সব বীরত্ব খোলসের ভিতর ঢুকিয়ে অসাড় জড়পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি ভাস্করের কাছে ফিরে এলাম।

'ভাস্কর, চলি রে। আমি একটু ভিতরে যাব দরকার আছে। একা বসে বোর হচ্ছিলাম তোর সাথে দেখা হয়ে ভালোলাগল। একদিন বাড়িতে আসিস না। আশা করি রাস্তাটা ভুলে যাসনি ।'

'না, তা ভুলিনি। তবে ভুললেও ক্ষতি নেই, তোর ঠিকানা আছে ।'

'তাহলে তো নো প্রবলেম, একা না পারিস আশুকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাস। চলি রে, আবার দেখা হবে ।'

আমি পরিচিত পথ ধরে ভিতরে ঢুকলাম। দরজা ঠেলে দেখি মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের সঙ্গে আরো দুই ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। রোগা করে ভদ্রলোক আমার নাম, বাড়ি কোথায়, কি পড়ছি, বাবা কি করেন সব জানতে চাইলেন। একটু দ্বিধার সাথে হলেও উত্তর দিলাম সরাসরি। আমার কথা শুনে উনি যা বললেন তাতে আমার একটু ভাবনা হল। উনি আমাদের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরেই থাকেন। আমাদের ওখানকার বড় ক্লাবটাও চেনেন। তারপর একজন দায়িত্ববান গার্জেনের মত বললেন, 'আমি তোমার ব্যাপারটা শুনেছি, দেখ তোমার বয়স অল্প তাই একটা সৎ উপদেশ দি ; তোমাদের মধ্যে যদি কোন নেগোসিয়েশানের ব্যাপার থাকে তাহলে এভাবে যোগাযোগ করে উঠতে পারবে না। আমি লক্ষ্য করেছি তুমি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছ। এভাবে খুঁজে

পাওয়া যায় না। তার চেয়ে বরং তুমি ওর বাড়ি চলে যাও!'

আমাকে কিছু বলতে না দিয়েই মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন বললেন, 'সে কথা আমি ওকে বলেছিলাম। এখান থেকে ডায়মণ্ডহারবার কতক্ষণ লাগত! আমার গাড়ি ছিল ওকে নিয়েই যাওয়া যেত। কিন্তু ও তো প্রপার ঠিকানাটাই জানে না।'

'সেকি! যার সাথে তোমার এ রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার ঠিকানাটাই তুমি রাখনি! আজকালকার লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতি মেয়ে তোমরা, এ রকম ভুল। তো তোমাদের হওয়া উচিত না।' তৃতীয় ভদ্রলোক টিফিন খাচ্ছিলেন ওখানে বসে। মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের কথা শুনে খাওয়া বন্ধ করে অবাক হয়ে কথাগুলো আমাকে বললেন।

এবার আমি বলতে শুরু করলাম, 'দেখুন আপনারা হয়ত ভাবছেন আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে ও ইচ্ছে করে চলে গেছে। সে সব কোন ব্যাপারই নয়। আগ্রায় ফেরার আগে আমাদের দেখা কবার কথা ছিল। যে কোন কারনেই হোক ও সেটা করে উঠতে পারেনি। আমি সিওর ও নিশ্চই অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা অন্য কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। আমি ওকে চিনি। ইচ্ছাকৃত ভাবে এ রকম কখনোই করবে না।'

সেই রোগা ভদ্রলোক বললেন, 'বেশ তাই না হয় হল, কিন্তু তুমি এভাবে কতক্ষণ খুঁজবে ওকে! তোমার কথামত যদি ধরি কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েছে তাহলে তো রিজার্ভেশান ক্যানসেল করে অন্য কোনদিন যেতে পারে।'

'তা পারে। আসলে আমাকে ফোন করে জানাবার কথা ছিল আব গত কদিন ধরে ফোনটা ডেড।' (এটা মিথ্যে নয়। ফোন ডিস্‌কানেক্ট করে কাকুরা দীঘায় গেছিলেন। এটা ডেড নয় তো কি!) তাই ভাবলাম ও হয়ত জানাতে চেয়েছিল ফোন ডেড থাকায় তা সম্ভব হয়নি, এখানে এলে দেখা হতে পারে।'

'কি করবে তাহলে এখন?'

'সাড়ে তিনটের ট্রেনটা দেখি, না পেলে কাল আগ্রায় ফোন করব।'

ভদ্রলোক হাসলেন। কি ভাবছেন কে জানে! মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন বললেন, 'তুমি একটু বোস। সাড়ে তিনটের গাড়ির চার্টটা বের হচ্ছে। তোমাকে এখানে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি না পাও তাহলে আর অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

'আমি বাইরে গিয়ে বসি?'

'না না বাইরে যাবার দরকার নেই এখানেই বোস। এখানে এস, এখানে হাওয়া আছে।' এরার কুলারের তলায় দাঁড়াতে বলে উনি ভিতরে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। আমি ভাবছি ঐ রোগামত ভদ্রলোক আমাদের পাড়ার যাকে চেনেন বললেন তাকে যদি আমার কথা বলেন তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আহীরের কথা বাপি আমার কিংবা মার কাছ থেকে শুনলে হয়ত কোন ব্যাপার না কিন্তু কোন

থার্ড পার্সনের মুখ থেকে এ খবর পেলে ভীষণ অপমানিত হবেন। আমার বকুনি হজম করার ক্ষমতা আছে আমি না হয় এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিলাম। কিন্তু বাপির অপমান হলে সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন বোস। যাও, ঐ চেয়ারটাতে গিয়ে বোস।'

এতক্ষণ নিজে যে চেয়ারে বসে টিফিন করছিলেন সেদিকে দেখিয়ে তৃতীয় ভদ্রলোক আমাকে বসতে বললেন, আমি গিয়ে বসলাম সেটাতে। আমার পাশ দিয়ে অফিসের লোক জন ঢুকছে বের হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বেশ সকৌতূহলে আমার দিকে একবার করে তাকিয়ে যাচ্ছেন। মিনিট দশ পনের পর মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন এলেন, হাতে এক পাঁজা কাগজ। ওনাকে আসতে দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'দেখ এর মধ্যে খুঁজে পাও কি না।'

উনি একটা একটা করে পাতা উল্টাচ্ছেন আর আমি তর্জনী ঠেকিয়ে নামগুলো চেক্ করে যাচ্ছি। এক ভদ্রলোক যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নকে জিগ্যেস করলেন, 'কি ব্যাপার দাদা?'

'উনি একজনকে খুঁজছেন।'

'কাকে?'

প্রশ্ন শুনে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন বললেন, 'একজন ডিফেন্স অফিসারকে।'

'বাবা! ডিফেন্স কেস!' চোখ দুটো বড়া করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেলেন।

আমার পরে উনিও চেক করলেন। কিন্তু থাকলে তবে তো পাব। প্রত্যেক বারের মত আবার সেই নিরাশা।

'আর কিছু করার নেই না?'

উনি হেসে বললেন, 'আর কি করবে বল? এই চার্টগুলোই খানিক পরে স্টেশানে দেওয়া হবে। এতে যখন নাম নেই, তার মানে নিশ্চিত ও এই ট্রেনে যাচ্ছে না।'

আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করছি। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আশাতিরিক্ত সাহায্য করেছেন আমাকে। আপনার কথা মনে থাকবে স্যার। চলি।'

দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই উনি বললেন, 'দাঁড়াও। দাঁড়াও একটু আমি আসছি।'

চার্টগুলো নিয়ে ভিতরে গেলেন, পর মুহূর্তেই নিজের ফোলিও ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন, 'চল।'

বাইরে বের হতেই সেই তৃতীয় ভদ্রলোকের মুখোমুখি হলাম। সৌজন্য বোধের

খাতিরে হেসে বললাম, 'চলি ।'

'খুঁজে পেয়েছ ?'

'না ।'

মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন ওনাকে বললেন, 'ওদের অফিসে একবার খোঁজ নিয়ে দেখি, ঐ নামে কাল পরশু কোন রিজার্ভেশান আছে কি না ।'

ওখান থেকে নেমে গত দিনের মত উনি স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি হেঁটে ঢুকলাম স্টেশানে। গাড়ি পার্ক করে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। কাছে যেতে বললেন, 'শোন, তোমাকে ওদের রেলওয়ে অফিসে নিয়ে যাব। ওখানে এমনিতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তোমাকে জিগ্যেস করলে বলবে তোমার রিলেটিভ হয় ।'

ওনার কথা বলার ভঙ্গীমায় রহস্যের গন্ধ পেলাম ।

'এতে আহীরের সার্ভিসে কোন ব্যাড এফেক্ট হবে না তো ?'

'না না, কি ব্যাড এফেক্ট হবে ।'

'ছেড়ে দিন স্যার, দরকার নেই। এরা ওখানে কিছু উল্টো পাল্টা ইনফর্ম করে দিলে খুব বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। আমি আগ্রায় ফোন করলেই ওর খবর পেয়ে যাব, আহীর না থাকলেও ওর এক বন্ধু আমাকে জানে তার কাছ থেকে খবর পেতে অসুবিধা হবে না ।'

'আরে বাবা কিছু হবে না, এস ।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলছি, এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না স্যার। আহীরের ক্ষতি হয়ে যাবে এতে ।'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমি বলব ।'

সিড়ি দিয়ে ওনার সাথে উঠছি। সেকেণ্ড ফ্লোরে অফিস। ভিতরে ঢুকে দেখি সব ইউনিফর্ম পরা স্টাফ। সার্টের কাঁধে স্টার-ফার লাগান। টেবিলের উল্টোদিকে বসে থাকা অফিসার আমাদের দিকে তাকালেন, মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমার সমস্যাটা হিন্দীতে ওনাকে বললেন। বাইরে রিলেটিভ বলে এলেও এখানে আহীরের পরিচয় দিলেন আমার বন্ধু হিসাবে। অফিসার আমার দিকে তাকালেন, "সিট্‌ডাউন প্লীজ ।'

'থ্যাঙ্কইউ ।' টেবিলের এ পারের চেয়ারে বসলাম ।

'আপনে দেখা উন্‌কা রিজার্ভেশান টিকিট ?'

'জী নেহী স্যার ।'

স্কুলের রোল কলের খাতার মত কার্ড মলাটের বাঁধান বড় একটা খাতা বের করে কয়েকটা পাতা উল্টে দেখলেন ।

'ইঁহা তো নেহী হ্যায়। আপ দেখ লিজীয়ে ।' খাতাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। দেখলাম সত্যি সত্যিই নেই ।

'কাল ইয়া পরশু কি ট্রেন মে ইস্ নাম কা কোই রিজার্ভেশান ?'

'আপ উঁহা যাইয়ে। উও বাতা সাকতে হ্যায়।'

উনি হাত দেখিয়ে অন্য একজনকে দেখালেন। আমরা সেখানেই গেলাম। বাঁশের মত বিশাল উঁচু উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন কয়েকজন। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন বললেন ব্যাপারটা। তিনিও অনুরূপ একটা খাতা বের করলেন। দেখে শুনে বললেন, 'জী নেহী, এ. কে. বাসু নাম কা কোই রিজার্ভেশান নেহী হ্যায়। মগর এ. পি. বল নামকা এক রিজার্ভেশান হ্যায়, কাল সাম কি গাড়ি মে আগ্রা যা রহে হ্যায়।'

সেই শুনে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন বললেন, 'তোমাকে ওর আসল নামটা বলেছে তো ?'

'ওমা! আসল নাম বলবে না কেন। ঐ নামেই আগ্রাতে চিঠি যায়। চিঠির উত্তর আসে।'

'ওর অন্য কোন নাম আছে ?'

'থাকতে পারে ; কোন ডাক নাম। সে নাম এখানে ইউজ করবে কেন! আপনে ক্যোয়া নাম বাতায়া ? এ. পি.—'

'বল।' বাঁশের মাথায় বসে থাকা লোকটা বলল।

'কন্ সি গাড়ি মে যা রহে হ্যায় ?'

'কাল সাম্ সাত পন্দ্রা কো কালকা মেল মে। কোচ নাম্বার থ্রী।'

'থ্যাঙ্কইউ।'

আমাদের ফিরে আসতে দেখে সেই অফিসার ভদ্রলোক আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'মিলা ?'

'নেহী স্যার।'

'কন্ লাগতা হ্যায় আপকা ?'

'চাচেরা ভাই।' আমি কিছু বলার আগেই মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন উত্তর দিলেন।

'মদত কে লিয়ে সুক্রিয়া ; নমস্তে।' দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করার আগেই অফিসার কে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আমার হাসি পাচ্ছে। আমাকে এত সাবধান করে দিয়ে নিজেই গুলিয়ে ফেললেন। অফিসে ঢোকার আগে বললেন রিলেটিভ, ঢুকে বললেন দোস্ত, আর বেরিয়ে আসার সময় বললেন চাচেরা ভাই। অফিসার ভদ্রলোক নির্ঘাত আমাকে ক্রুড ভাবছেন।

'কি করবে, কাল সাতটা পনেরোয় আসবে ?'

'কি করব এসে নাম তো উল্টো।'

'কোন মিস্টেক হতে পারে। এ. কে. বাসুর জায়গায় এ. পি. বল হয়ে গেছে হয়ত।'

'তা কি করে হয়! একটু আধটু মিস্টেক না হয় হতে পারে। সাপোজ

এ. কে. এর জায়গায় এ. পি. হয়ে গেছে কিন্তু টাইটেলটা দেখুন, বাসু আর বল— স্পেলিং এ অনেক ডিফারেন্স। এতটা মিসটেক হয় কি করে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। ভুল কিছু বল নি। তাহলে ; এখন বাড়ি যাবে তো ?'

'ভাবছি।'

'কি ভাবছ ?'

'ভাবছি সাড়ে তিনটে তো বেজেই গেল এই গাড়িটা একবার দেখে যাই।'

'কোন লাভ নেই। তুমি তো চার্টগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। আর ঐ চার্টের বাইরে কেউ এতে ট্রাভ্‌ল করতে পারবে না।' আমি চুপ করে আছি দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি দাঁড়ালে আমাকেও দাঁড়াতে হবে।'

'না স্যার, আপনি বাড়ি যান। এমনিতেই আমি আপনার অনেক টাইম ওয়েস্ট করেছি। আমি একাই—'

'তা হয় না। আর তো মাত্র কয়েক মিনিট। আমি দাঁড়াচ্ছি।'

'চলুন। বাড়িই ফিরে যাই।'

উনি গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। 'বোস। এতটা হাঁটবে কেন, আমিই বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমাকে পৌঁছে দিয়ে মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন বললেন, 'কোন দরকার পড়লে এস আমার কাছে। আগ্রায় আমার এক আত্মীয় থাকেন ; আমি ওখান থেকে তোমার খবর এনে দিতে পারব।'

কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নিচু হয়ে এল।

'তার দরকার হবে না। তবে আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব। আর আহীরের সাথে দেখা হলে সবার আগে ওকে আপনার কথা বলব। চলি।'

'এস'। উনি স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি সেডের তলায় এসে দাঁড়ালাম। বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। আমার জীবনটাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। পাওয়া না পাওয়ার ঠিক মাঝখানে, একটা নিউট্রাল পয়েন্টে। আজ ভীষণ মনে পড়ছে সেই দিনটা, যেদিন হঠাৎ মনে হয়েছিল পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লেখার কথা। সেদিন কি একবারও ভেবেছিলাম আজকের এই পরিণতির কথা! কখ্‌খোনো না। সত্যি সত্যিই যে উত্তর আসবে সেটাই তো ভাবিনি। সেদিনের ঠাট্টা আজকের সিরিয়াস একটা রূপ ধারন করেছে। মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নকে তো বললাম আহীরকে আপনার কথা বলব। কিন্তু আহীরের সাথে যদি আর কোনদিন দেখা না হয়। মনে মনে যতই কল্পনা করি না কেন সত্যি তো এটাই যে আগ্রায় গিয়ে আহীরের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। একা তো দূরের কথা হয়ত রমাদির সাথেও বাপি যেতে দেবেন না। আর অনাহূতের মত আমি যাবই বা কেন। কোন অধিকারে যাব। যে আমার সাথে বন্ধুত্বটুকু রাখতে চায় না তার খোঁজে আমি যাবই বা কেন। কিন্তু এটা কি ঠিক, সত্যিই কি আহীর আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। কেন ? ও হয়ত ভেবেছিল আমি আরো সুন্দর হব,

ওর সে ভাবনার সাথে আমাকে মেলাতে পারে নি। ও হয়ত আমার মধ্যে খুঁজে পায় নি ওর সেই কল্পনার ইনার বিউটি। তাই কি এমনি করে পর করে দিল। পর! আপন হলাম কবে যে পর হব! আহীরের চিঠির কথাগুলো মনে পড়ছে। 'জানি তুমি আমার উপর অনেক অনেক অভিমান করে বসে আছ।' এখন এই কথাগুলোই আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। এ কথার মধ্যে যে আপনতার সুগন্ধ পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ভালোবাসার স্পর্শ। তবুও আমি পর—

যতটা সুন্দর ভেবেছিলে তুমি
জানি আমি নই ততটা সুন্দর
যতটা আপন করেছিলে তুমি
আমি কি ততটাই পর?

কে দেবে এ প্রশ্নের উত্তর! আহীর কি শুনতে পাচ্ছে আমার কথা! এটা যে বাস্তব। এখানে শব্দের পার্থিব দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য বায়ু তরঙ্গের মাধ্যম লাগে। স্বপ্নের জগতের মত ভালোবাসার গান এখানে কল্পনায় ভাসে না। প্রেম এখানে এত সহজ লভ্য নয়। হায়রে—সে যে বড় জ্বালাময়। কি নিষ্ঠুর হয়ে ভাবছি, প্রারম্ভেই ঘটল আমার প্রেমের পরিসমাপ্তি। ফুল হয়ে ফোটার আগেই খসে পড়ল মুকুল। আজিকার এ বোধন বেলায় বাজিছে বিসর্জনের শঙ্খ।

বাড়িতে পা রাখতেই মা বললেন, 'এত দেরি করলি কেন? তোর ফোন এসেছিল?'

'কখন?' আমি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আহীর ছাড়া অন্য অনেকেই আমাকে ফোন করতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আর কারুর কথা ভাবতে পারছি না। এই একটা নাগাদ হবে। গৌরী ডাকতে এসেছিল। আমি বলেছি তুই শিয়ালদায় গেছিস।'

আর কোন কথা নয়। কাঁধের ব্যাগটা মার হাতে ধরিয়ে দিয়েই ছুটলাম। দরজা খুলেই দেখি অফিসে কাকু বসে আছেন। আমাকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকালেন, 'কি রে!'

'আমার ফোন এসেছিল কাকু?'

'হ্যাঁ, এস্‌ছিল তো।'

'কখন?'

'একটা দেড়টার সময় হবে।'

'কে ফোন করেছিল বলল?'

'বলল তো আহীর। আর্ট কলেজের আহীর।'

'কিছু বলতে বলেনি?'

'না, তুই শিয়ালদায় গেছিস শুনে জিগ্যেস করল কখন তোকে পাওয়া যাবে। আমি বললাম সন্ধ্যের পর।'

'সন্ধ্যের পর ফোন করবে বলেছে ?'

'না, সে রকম কিছু বলেনি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

কিছু বুঝতে পারছি না। আহীর কোথা থেকে ফোন করতে পারে! একটা দেড়টা মানে, আমি তখন হাওড়ার রিজার্ভেশান কাউণ্টারে। ও কি হাওড়া স্টেশান থেকে ফোন করেছিল! হয়ত সাড়ে তিনটের মেলে আগ্রা গেছে, তার আগে আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিল। ইস্, ঐ গাড়িটা দেখলে নিশ্চই পেতাম। কেন অপেক্ষা করলাম না! তবে এর থেকে এটা পরিস্কার আমার ফোন নাম্বার ও হারায়নি। তাহলে এতদিন ফোন করেনি কেন! আর এতদিন যদি আমার কথা মনে নাই পড়ে তাহলে আজই বা ফোন করতে গেল কেন! ও কি শুধু ফোনে খবর দিতে চেয়েছিল! আমার দাদা তোমাকে অপছন্দ করেছে। গুড নিউজ, ভেরি গুড। যদি এ সংবাদ হয় তাহলে আমি পুলকিত। কিন্তু তা যদি না হয়! সিচুয়েশান নতুন মোড় নিয়েছে। সব কিছু আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সন্ধ্যের পর কাকুর বাড়ি গেলাম। যদি আহীর আর একবার ডাকে। 'যদি'—এই ছোট্ট শব্দটার উপর নির্ভর করে গত তিন দিন ধরে পাগলের মত চারিদিকে খুঁজে বেড়িয়েছি আহীরকে। কিন্তু এ শব্দটা আমার সে নির্ভরতার মূল্য দিতে পারেনি। বার বার নিরাশ করেছে আমাকে। পদে পদে আঘাত করেছে, হেরে যেতে বাধ্য করেছে। তবুও এখনো বসে আছি সেই 'যদি'কে বিশ্বাস করে। কি অদ্ভুত আমার বিশ্বাস করার ক্ষমতা! আমি নিজেই অবাক হচ্ছি। এবারেও 'যদি' আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। দেঢ়টি ঘণ্টা বসে রইলাম ফোনের পাশে, ওপার থেকে কেউ আর কুহেলি কে ডাকল না। চলে এলাম। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, কোই বাত নেহি, যাওয়ার আগে কমসে কম একবার আমার কথা মনে তো করেছে। এইটুকুই যথেষ্ট আমার জন্যে। বাড়ি ঢুকতেই মা জানতে চাইলেন ফোন পেয়েছি কি না। মা জানেন আমি এখানে ওখানে লেখা পাঠাই, সেখান থেকেই কেউ ফোন করেছিল হয়ত। তাই আর বেশী কৌতুহল দেখালেন না। আর এ ব্যাপারে বাপিরও তেমন কৌতুহল নেই। তাই কখন কার ফোন এল না এল, নো ইণ্টারেস্ট। তাতে অবশ্য আমারই লাভ হয়েছে। তা না হলে এতক্ষণ প্রশ্নের কাল বৈশাখী বয়ে যেত। রাত্রে শুয়ে ভাবছি, আজ বেশ আহীরকে স্বপ্নে দেখি, কলার ধরে জানতে চাইব এতদিন ফোন করেনি কেন। দেখব কি উত্তর দেয়। পাই একবার নাগালে, সহজে ছাড়ব ভেবেছ! কিন্তু পেলে তবে তো! আমার একটা মস্তবড় গুন ছিল ঘুমাবার সময় যা চিন্তা করে শোব রাত্রে ঠিক সেটা স্বপ্নে দেখব, বা সারাদিনে ঘটে যাওয়া বিশেষ কোন ঘটনা, রাত্রে অবচেতন মনের পর্দায় তা ধরা দেবেই। অথচ ইদানিং দেখছি আমার সে গুনটা লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। আহীরকে নিয়ে এত ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি

সারাদিন এত জল্পনা কল্পনা অথচ একটা দিনের জন্য ব্যাটাকে ধরতে পারলাম না ; কেবলই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা ধড়িবাজ ছেলে মাইরি ! বাস্তবে তো টিকি দেখা যাছে না, স্বপ্নেও বাবুর দেখা পাওয়া ভার। একেবারে বেপাত্তা। ধূমকেতুর মত সেই যে একবার লেজটা দেখিয়ে চলে গেল, আর এল না।

আমার আশার মুখে ছাই দিয়ে সে রাতটাও কাটল আহীর স্বপ্নহীন ভাবে। সকালে উঠে ভাবছি, কতদিন পড়াতে যাওয়া হয়নি। আজ যেতেই হবে। নিজেকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। স্যার কি ভাবছেন কে জানে ! হয়ত ভাবছেন কুহেলিটা ভীষণ ইরেস্‌পনসিবল্‌। এতবড় একটা সুযোগ দিলাম কাজে লাগাতে পারল না ! সত্যিই তাই, এতদিন তীর্থের কাকের মত বসেছিলাম এমন একটা সুযোগের জন্য। অথচ আজ যেন কোন গুরুত্বই পাচ্ছি না। আহীরের সাথে দেখা হবার পর একটা দিনের জন্য কোথাও যাইনি ; পাছে আহীরের ফোন আসে। একটি বারের জন্য মনে হয়নি এতে আমার কত ক্ষতি হয়ে গেল। স্নান সেরে পাখাটা ফুল স্পীডে চালিয়ে চুল শুকাচ্ছি।

কাকিমা এলেন, 'সমি, তোমার ফোন এসেছে।'

কার ফোন কখন এসেছে কি বলেছে কিছু জিগ্যেস না করেই ছুটলাম। কাকিমা পিছনে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বললেন, 'অফিসে আছে।' আমি সোজা গিয়ে ঢুকলাম অফিসে। কেউ নেই। যাক্‌ নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। কিন্তু রিসিভার তো তোলা নেই। বেরিয়ে এলাম, কাকীমা তখনো আসছেন। কাছে আসতে জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় ফোন ?'

'দশ মিনিট পর রিং করবে বলেছে।'

'কে করছে কিছু নাম বলেছে ?'

'কাল যে করেছিল।'

'আহীর ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তা হলে অফিসেই বসি ?'

'যাওয়ার আগে দেখা করে যেও।'

কাকিমা দো তলায় চলে গেলেন। আমি বসলাম অফিস। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছি। বেশ বুঝতে পারছি আমার হার্ট বিট বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমি কথা বলতে পারব না। আমার গলা কাঁপছে। শীত করছে। ফোনের দিকে তাকিয়ে আছি। বাজছেই না ; এখনো কি দশ মিনিট হয়নি। চারিদিকে চোখ বোলালাম, কোথাও একটা ঘড়ি নেই। একসময় ঘরের নিরবতা ভঙ্গ করে ফোনটা চিৎকার করে উঠল।

ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললাম, 'হ্যালো !'

'হ্যালো, বিকাশ বাবু আছেন ?'

'আছেন। হোল্ড করুন ডেকে দিচ্ছি।'

দরজা খুলে বাইরে এলাম, 'কাকু তোমার ফোন।'

কাকু কথা বলছেন। আমি মনে মনে বলছি, কাকু তাড়াতাড়ি ফোনটা রাখ। নয়তো এনগেজ পেয়ে আহীর আবার না চলে যায়। কথা বলা শেষ করে কাকু আলমারি থেকে কি সব কাগজ পত্র বের করছেন। আবার রিং হচ্ছে। আমিই তুললাম, 'হ্যালো!'

'হ্যালো—' আহীরের গলা। চিনতে আমার একটুও অসুবিধা হয়নি। কাকু আছেন কি কথা বলি!

'হ্যালো—কে কথা বলছেন?'

'ম্যায় কুহেলি বোল রেহি হুঁ।'

কাকু আমার দিকে একবার তাকিয়ে কাগজকটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আহীর আমার ভাষা বুঝতে পারেনি, 'কে! হ্যালো—'

'কোথায় ছিলে এতদিন? ফোন করনি কেন?'

'হাই! কুহেলি।' ওর কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস। আমাকে চিনেছে।

'কোথায় ছিলে তুমি এতদিন? ফোন করনি কেন আমায়?'

ও হাসছে। 'এই—কি ব্যাপার! গলায় অভিমানের সুর শুনতে পাচ্ছি।'

'তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?'

'কেন, দেশ থেকে।'

'কাল তো তোমার আগ্রায় যাবার কথা ছিল।'

'যাইনি। আজ কি করছ?'

'কিছু না।'

'চলে এস তাহলে।'

আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

'কি হল, চুপ করে আছ কেন?'

'তুমি এতদিন আমায় ফোন করনি কেন আহীর?'

'শোন—শোন, বলছি। তুমি এস তো আগে। দেখা হলে সব বলব। কি ব্যাপার, তুমি কাঁদছ না হাসছ?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'দুটোর কোনটাই নয়। না পারছি কাঁদতে না পারছি হাসতে।'

'তাহলে তো সিরিয়াস্ কেস। চলে এস।'

'কোথায়?'

'সেম প্লেস।'

'টাইম?'

'টাইম—টা-ইম। দেড়টা। পারবে ?'

'আমি আসছি।'

'ও. কে. বাই। সি ইউ।'

অফিস থেকে বেরিয়ে চলে আসতে গিয়েও মনে পড়ল কাকিমা দেখা করে যেতে লেছেন। দ্রুত সিঁড়ি টপকে উপরে উঠলাম। 'কাকিমা কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ, ফোন পেয়েছ ?'

'পেয়েছি। এইমাত্র এল। কি বলছ বল।'

'তেমন কিছু না, এমনি ডেকেছিলাম। তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন ?'

'সিঁড়ি দিয়ে ছুটে এসেছি তো তাই।'

দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালাম। সাড়ে বারটা বাজে। মাই গড়! মাত্র ক ঘণ্টা। 'আসছি কাকিমা, পরে আসব।'

অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে এলাম, এক ছুটে বাড়ি। এইটুকু ময়ের মধ্যে খাওয়া তৈরী হওয়া বাস ধরা সব করতে হবে। আজ আবার স্ট্যাণ্ডের াছে বাস অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। এক অবাঙালি ভদ্রলোক। রাস্তায় না কি চাপ প রক্ত। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেছে। আমি দেখিনি ; যারা দেখেছে তারা লল। সুতরাং এ রাস্তায় বাস বন্ধ। সব গাড়ি বাইপাস দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে। াক খেতে খেতে যাবে দেরি হবে। অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। এদিকে আবার স কম। কতক্ষন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

'মা ভাত দাও। আমাকে এক্ষুনি বের হতে হবে।'

'কোথায় যাবি ?'

'ধর্মতলায়।'

'ধর্মতলায় কেন ?'

'ওরা একটা লেখা চাইল। তাড়াতাড়ি দাও।'

'বাপিকে বলা নেই। এসে আবার রাগ করবে।'

'আমার কিছু করার নেই মা। আমি জানলে তো বলব। তুমি বোলো ফোন সেছিল তাই গেছে।'

গোগ্রাসে গিলছি। এখনো চুল বাঁধা জামা পরা বাকি।

'কি রে! আস্তে খা, গলায় আটকে যাবে যে। আর একটু দি ?'

'খেপেছ! আর একদম না।'

কোন রকমে ভাতকটা উদরস্থ করে উঠে গেলাম। মা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করছেন, াঁ রে, কখন ফিরবি ?'

'চিন্তা কোর না জলদি জলদি ফেরার চেষ্টা করব।'

'আর তোর টিউশনি ?'

'গুলি মার টিউশনি। আগে আমার কাজ, তারপর—'

'হ্যাঁ, মাস গেলে টাকাটা নিতে লজ্জা করে না ?'

'না করে না। কারণ অ্যাবসেণ্ট হলে এক্সট্রা পড়িয়ে দি।'

তৈরী হতে হতেই মার কথার উত্তর দিচ্ছি।

'কিন্তু পরপর এতদিন হয়ে গেল তুই যাসনি।'

'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি কাজ সারা হয়ে গেলে একেবারে পড়িয়ে বাড়ি ফিরব। চিরুনিটা দাও।'

'দরকার নেই ; সোজা বাড়ি চলে আসবি। এতক্ষণ না খেয়ে টিউশনি যেতে হবে না।'

'কখন যে কি বল না মা, তার ঠিক নেই। দূর! চুলটা এখনো ভিজে।'

'ভিজে হবে না, এইটুকু সময়ে শুকোয়! শোন, সাবধানে যাবি। দেখে রাস্তা পার হবি। ছুটে গাড়িতে উঠবি না। ও হ্যাঁ, এ দিকের বাস তো বন্ধ কি করে যাবি ?'

'ওদিকে বন্ধ তো কি হয়েছে! আর এক দিক তো খোলা আছে। তুমি চিন্তা কোর না! বাপি এলে বুঝিয়ে বোলো যেন রাগ না করে। আসছি আমি।'

'আয়। সাবধানে যাস। তাড়াতাড়ি আসবি।'

ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দ্রুত পা চালিয়ে যাচ্ছি, গলির ভিতর থেকে বাসের শব্দ পেয়ে পোঁ পোঁ দৌড় মারলাম। বাহ্! ভাগ্যটা বেশ ভালো তো! এ রাস্তায় এত সহজে বাস পাওয়া যায় না ; নেহাতই বরাতে ছিল। গত জন্মের পুন্যি বলা যেতে পারে। উঠেই সিট্ পেলাম। বসে ভাবছি, আহীর যদি আগের দিনের মত লেট করে তো এক হাত নেব। এতক্ষণ বাস ধরার তাড়ায় এ চিন্তা মাথায় ছিল না। ফোনে বলা কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি। কি দারুণ শোনাচ্ছিল ওর কণ্ঠস্বর। অভিমান শব্দটা আহীরের বোধ হয় খুব প্রিয়। কথায় কথায় ব্যবহার করে। আমার আধা কান্না আধা হাসি অভিব্যক্তিটা ফোনের ওপার থেকেই ও বুঝতে পেরেছে। ছেলেব এলেম আছে। আমি মরিয়া হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন, ফোন করনি কেন আমায়। আরে! তুমি! আমি আহীরকে তুমি বললাম! হ্যাঁ ; তাই তো মনে হচ্ছে। টেনশানের ঠেলায় খেয়ালই ছিল না আমি ওর সাথে সরাসরি কথা বলছি। মনে মনে যখনই ওর সাথে কথা বলি তুমি সম্বোধন করি। কিন্তু গত দিন তো আপনি বলেছিলাম। ইস্, কি ভাবল! কি আবার ভাববে! ও তো বলেই ছিল তুমি বলতে। আমিই বরং বলেছিলাম—সত্যিই তো, কথাটা ভিতর থেকে এসেছে। অন্তরের অন্তরতম স্থল থেকে। আমি নিজেই বুঝতে পারিনি কখন ওকে তুমি বললাম। একেই কি বলে ভিতর থেকে আসা! সেদিন কিন্তু কথাটা না বুঝেই বলেছিলাম। বোঝাতে চেয়ে ছিলাম যেদিন মন চাইবে সেদিন বলব। কিন্তু আমার অজান্তেই এভাবে ব্যাপারটা ঘটে যাবে ভাবিনি। তুমি শব্দটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ইন্টিমেসি আছে। একসাথে

অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। তুমি—তুমি—তুমি। আহীর, তোমাকে আমি ভালোবাসি। ধ্যাৎ! আমি বলতে পারব না। কথাটা সত্যি; কিন্তু বলতে গেলে কি রকম বোকা বোকা লাগে, আমার হাসি পাচ্ছে। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলাম আমি একা একাই হাসছি; বোকা পাগলের মত। নিজেকে সুস্থ করে বাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনলাম। একটা বাচ্চা ছেলে আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় ধরে খামচা খামচি করছে। তাকে কোলে তুলে নিলাম। বাস যখন ধর্মতলায় পেঁছিল, তখন পোনে দুটো। পনের মিনিট লেট। বাস থেকে নেমে কাউণ্টারে গিয়ে দেখি আহীর দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বাইরে বেরিয়ে এল। 'দেরি হল?'

'কি করি বল, আমাদের ওখানে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। সব গাড়ি বাইপাস দিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আমি অন্য রাস্তা দিয়ে এসেছি।'

'কটা বাজে?' আজও হাতে ঘড়ি নেই।

'পোনে দুটো। তুমি কখন এসেছ?'

'বেশীক্ষণ না। মিনিট দশেক হবে। কোথায় যাবে?'

'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে।'

ও হাসছে। 'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।'

'তাহলে চল বাবুঘাটে যাই।'

'বাবুঘাটে! বাবুঘাটে কি আছে?'

'চলই না। ওখানে বসার জায়গা আছে। ইডেনে।'

'চল।' হাঁটতে শুরু করলাম বাবুঘাটের দিকে।

'তুমি কোথায় ছিলে বলত এতদিন? গত তিন দিন ধরে তোমাকে কোথায় কোথায় খুঁজেছি জান!'

'আমাকে খুঁজেছ! তুমি আমাকে কোথায় খুঁজবে?' অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে আহীর। পথ চলা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কাল তোমার আগ্রায় যাওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকে একটার পর একটা গাড়ি চেক্ করে গেছি। তুমি যখন কাল ফোন করেছিলে তখন আমি হাওড়া স্টেশানে।'

'তার মানে! তুমি শিয়ালদায় যাওনি?'

'না, ও কথা বাড়িতে বলে গেছিলাম। কি বলতাম বল, আমি হাওড়া স্টেশানে যাচ্ছি আহীরকে খুঁজতে!'

'ও গড! আমার জ্বর হয়েছিল। ওখানে রাত্রে স্নান করা অভ্যাস; এখানে এসেও করেছি, ব্যাস্ জ্বরটর হয়ে একাকার—'

'একটা ফোন তো করতে পারতে!'

'কি করে করব! তুমি জান না আমাদের বাড়ি কত ভিতরে! মেন্ রোডে

এলে তবেই তো ফোন পাব। আর আমার যা অবস্থা বাইরে বের হতেই পারছিলাম না।'

'আর আমি বাড়িতে বসে কত কিছু ভাবছি ; ফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলেছ। আগ্রায় চলে গেছ··· ।'

এক এক করে গত তিন দিনের সব ঘটনা মোটামুটি বললাম ওকে। সব কিছু শুনে ও দারুণ এক্সাইটেড। বলে, 'তুমি ভাবলে কি করে তোমাকে না বলে আমি চলে যাব ! যাওয়ার আগে তোমার সাথে একবার দেখাও করব না—এটা হয় !'

আমার আর কিছু চাই না। সব চাওয়া ভরে গেল কানায় কানায়। এই মুহূর্তে বিশ্বের সব চাইতে সুখী মানুষ আমি। এ কথা বলে ও প্রমাণ করে দিল কি ভীষণ আপন ও আমার ! আহীর আরো কত কথা বলছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না। ওর পাশে পাশে হাঁটছি। একটু ছুঁতে ইচ্ছে করছে ওকে। আমার হলুদ শাড়ীর আঁচলটা পত্ পত্ করে উড়ছে। ছুঁই ছুঁই করে ওকে ছুঁয়ে ফিরে আসছে বার বার। আমি হাসছি। মনে পড়ে গেছে, এই খানিক আগে কার্জন পার্কের সামনে চওড়া রাস্তাটা ক্রস করতে গিয়ে খুব জোরে ধাক্কা খেয়েছি দুজনে। ও সরি বলেছিল।

'হাসছ কেন ? আমি তো হাসির কথা বলিনি।'

তবুও হাসছি। ও কি বলছিল শুনিনি। আমি তো অন্য কথা ভেবে হাসছি। ইডেন গার্ডেনে ঢোকার মুখে কতকগুলো সরবতওয়ালা খোদ্দের পাবার আশায় চেঁচামেচি করতে লাগল, দাদা এদিকে আসুন দিদি এদিকে আসুন বলে। আমরা তাদের সযত্নে এড়িয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

ডানদিকে মোড় নিয়ে হাঁটছি। 'কোথায় বসবে ?'

'ঐ তো কংক্রীটের বেঞ্চ পাতা আছে আমাদের জন্য।'

আমরা গিয়ে বসলাম সেখানে। ঠিক মত বসেছি কি বসিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল একটা চা ওয়ালা। আহীব আমাকে জিগোস করল, চা খাবে ?'

'অসম্ভব, সবে মাত্র খেয়ে এসেছি। তুমি খাও।'

'না ভাই, চা লাগবে না।'

ছেলেটা যে খুব একটা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরল বলতে পারি না। আহীর আমার ডান পাশে বসে আছে।

'তুমি আজ ফোনে অত ফ্রীলি কথা বলছিলে কি করে ?'

'লাইনটা যে অফিসে ছিল।'

'তাই বল। আমি ভাবছি, বাহ্ মেয়েটা তো বেশ কথা বলছে। কি ব্যাপার, আশে পাশে কেউ নেই না কি ! তুমি কি ফোন কাঁদছিলে না হাসছিলে ?'

'দুটোর কোনটাই নয় ; বিশ্বাস কর, কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমি বিলীভ্ করতে পারছিলাম না যে তোমার সাথে কথা বলছি—'

'তুমি তো এখনো হাঁপাচ্ছ ; তোমার গলা কাঁপছে। আমি তোমার পাশে বসে আছি এটাও কি বিলীভ্ করতে পারছ না ?'

'সত্যিই পারছি না। আমি যেন নিজেকেই বিলীভ্ করতে পারছি না। তুমি তো জান না, কাল তুফান মেল ছেড়ে যাবার পর মনে হচ্ছিল আর কোনদিন তোমার সাথে দেখা হবে না। বাড়ি ফিরে শুনলাম তোমার ফোন এস্‌ছিল। একটা হিন্দী শের মনে পড়ে গেল—'জিসকো ঢুণ্ডা গলি গলি,উও ঘর কি পিছুয়াড়ে মে মিলি।' তোমার সাথে আবার দেখা হবে তার বিন্দুমাত্র আশা আমার মধ্যে বেঁচে ছিল না। ভাবলাম চলে যাওয়ার আগে সৌজন্য বোধের খাতিরে হয়ত একবার ফোন করেছিলে। কোই বাত নেহী, জানে সে প্যাহেলে কমসে কম একবার মুঝে য়াদ তো কিয়া, ইতনাহি কাফি হ্যায় মেরে লিয়ে।'

'আচ্ছা ! আর কি ভেবেছিলে ?'

'ভেবেছিলাম, গতদিন তোমার আসতে দেরি হয়েছিল, তোমাকে বলেছিলাম সে কথা। কোন রকম ফর্মালিটি করি নি। তাই হয়ত তুমি আমাকে আনফর্মাল ভেবেছ, রাগ করেছ আমার উপর।'

'দূর! একদম বাজে কথা। ফর্মালিটি করার কি আছে! আমার অন্যায় হলে যে কেউ বলতে পারে এতে রাগ করার কি আছে! এই তো কদিন আগে, আমার এক স্যারের সাথে দেখা করতে গেছি। একটু দেরি হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখছি উনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার জন্য। আমি দু হাতে কান ধরে সরি বলেছি। উনি হাসছেন, আরে কি করছ! ঠিক আছে ঠিক আছে।'

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা জনবহুল পথ। এক বয়স্ক ভদ্রলোক ধুতি পাঞ্জাবী পরে দাঁড়িয়ে আছেন আর আহীর তাঁর সামনে দু হাতে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বেশ মজা লাগছে। আহীরকে স্কুলে পড়া না পারা ফাঁকিবাজ বিচ্চু ছেলেটার মত লাগছে।

'তুমি এখন আমার সামনে কান ধরতে পারবে ?'

আমার প্রশ্ন শুনে ও না হেসে পারল না। 'পারতাম। তুমি যদি আমার চাইতে বড় হতে নিশ্চই পারতাম। আচ্ছা, আজ প্রথমে কে ফোন তুলেছিল ?'

'আমি।'

'হুঁ, ভেবেছিলাম বলি, হ্যালো বনলতা—তারপর ভাবলাম, না বাবা ওদিকে যদি তোমার কাকিমা থাকেন তাহলে আমার রোম্যান্টিক ডাক শুনে উনি হয়ত হারানো যৌবন ফিরে পাবেন।'

—এ মা! কি অসভ্য ছেলে দেখি! বড়দের সম্বন্ধে—

'তবে তোমার কাকিমা যখন বয়স অল্পই হবে—'

'দিদি নিন্ না।'

গলা থেকে একটা লম্বা বেল্ট ঝুলেছে। শেষ প্রান্তে একটা টিনের বাক্স।

সামনেই দাঁড়িয়ে একটা ছেলে। আবার অনুরোধ, 'নিন না।'

আহীর জিগ্যেস করল. 'কি আছে ভাই ?'

'সন্‌পাবড়ি।'

'আমার, ভাললাগে না। তুমি খাবে ?'

'না।'

পাল্টা অনুরোধ, 'কিনুন না দিদি ; কাল থেকে কিচ্ছু খাইনি। আজ সারাদিন একটুও বিক্কিরি হয় নি…।'

এভাবে এমন কিছু কিছু কথা বলতে লাগল যে কি বলব ! আমি ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে দিলাম।

'যাও. আর এদিকে আসবে না।'

'এই, কিনবে না ?'

'না।'

'এই ভাই, টাকাটা ফেরৎ দাও তো। আমি কিনছি।'

'আরে ছাড় না, যেতে দাও। এই তুমি যাও তো।'

'পয়সা বেশী হয়েছে না !'

'না দিলে ও আমাদের কথাই বলতে দিত না। বিরক্ত করত।'

'তাই বলে পাঁচ টাকা দিতে হল !'

'শুনলে না, বলল কাল থেকে কিচ্ছু খায় নি।'

'আমাদের দেশে এরকম মানুষের অভাব নেই, রাস্তায় বের হলে দু পা অন্তর ওদের সাথে দেখা হবে, কত দেবে তুমি - এরকম নরম মন হলে শেষ হয়ে যাবে।'

আহীরের কথা শুনে মনে পড়ে গেল আমার কলেজ জীবনের একটা ঘটনা। কলেজ থেকে অ্যান্থ্রোপোলজি এক্সকারশানে গিয়েছিলাম একটা গ্রামে। সে গ্রামে গরীব লোকের সংখ্যাই বেশী। একদিন টিফিন নিয়ে ডায়নিং হল থেকে সবেমাত্র বাইরে পা রেখেছি। গোটা পাঁচেক বাচ্চা ছুটে এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে, আমাকে দাও আমাকে দাও করে। সব্বাইকে একটা দুটো করে দিতে দিতে যখন ঘরে এলাম তখন থালা একদম ফাঁকা। আমরা দশ বার জন বন্ধু সব সময় এক সাথে খাবার খেতাম। সেদিন ওদের খাবারে ভাগ বসালাম। সব শুনে উৎপল বলল, 'এবার থেকে তুই আর টিফিন আনতে যাস না। কুপনটা আমাদের কাউকে দিস আমরাই এনে দেব। তুই আনতে গেলে আবার বিলিয়ে আসবি।'

'আজ বাড়িতে কি বলে এসেছ ?'

আহীরের প্রশ্নে ফিরে এলাম বর্তমানে।

'ম্যাগাজিনের জন্য গল্প দিতে যাচ্ছি।'

ও হাসছে। হয়ত ভাবছে মেয়েটা ডাহা মিথ্যাবাদী। ভাবুক, যার জন্য চুরি করা হয় সেই তো সবার আগে চোর বলে। এটাই তো নিয়ম। হিন্দী সিনেমাতেও

তাই হয়। গরীব বাপ ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করার জন্য যত রাজ্যের কুকীর্তি করে বেড়িয়েছে। আর সেই ছেলে বড় হয়ে, লায়েক হয়ে সর্বাগ্রে বাপের দিকে আঙুল তোলে, ইউ আর এ ক্রিমিন্যাল।

'তুমি যেখানে অ্যাকটিং শেখ সেখানেই কি লেখাগুলো দাও?'

'হ্যাঁ, আসলে ওখানে বিভিন্ন ধরনের লোকজন আসেন তো, অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। আর মেন্‌লি লেখার ব্যাপারটা মাথায় রেখেই ওখানে ভর্তি হয়েছি। অভিনয় শিখে বিশাল কিছু একটা করব সে চিন্তা করি না।'

'তোমাদের অ্যাকটিং এ কি কি শেখায়?'

'প্রথমে শেখায় টাং টুইস্টার। ডায়লগ শুদ্ধ ভাবে বলার জন্য।'

'টাং টুইস্টার বলতে পার?'

'পারি।'

'বলত দেখি, সুচ সুতো।'

'ধ্যাঃ! এটা আবার কোন টাং টুইস্টার না কি!'

'বলই না।'

'সুচ সুতো।'

'এক সাথে বল। আলাদা আলাদা বললে হবে না।'

'বলতে পারব না যাও তো। কি বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে।'

ও জেদ ধরেছে বল, আমি জেদ ধরেছি বলব না। শেষে আমার জেদটাই বজায় রইল।

'বেশ, আর কি শেখ বল।'

'প্যাশান প্লে, ইম্প্রভাইজেশান, বিভিন্ন ধরনের শট, ক্যামেরার সামনে প্র্যাকটিক্যালও হয়। লিপ সিংকোনাইজেশান শেখায়—'

'এটা তো সহজ ব্যাপার, গানের সাথে লিপ দেওয়া।'

'সহজ ব্যাপার!'

'সহজ না! গান সম্বন্ধে একটু ধারণা, থাকলেই হয়।'

'তুমি অভিনয় করেছ কোনদিন?'

'করেছি। গতবছর পুজোর সময় আগ্রায় নাটক করেছি। একটা রাজনৈতিক নেতার চরিত্র। এমন লম্বা চওড়া ভাষণ দিয়েছি সবাই হেসে পাগল।'

'আমার স্টেজে অভিনয় করার কথা ভাবলেই ভয় লাগে। ক্যামেরার সামনে ঠিক আছে। ভুল হলে রি টেক করা যায়। আর স্টেজে ভুলে গেলে দর্শক চেঁচিয়ে নামিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, ফাস্ট অ্যাপিয়ারেন্সে একটু নার্ভাস লাগেই। গলাটা একটু ভিজিয়ে মুডটা ঠিক করে নিলাম। আর বন্ধুদের বললাম, সার্চ লাইটগুলো আমার মুখের উপর ফেলবি যাতে সামনে বসে থাকা কালো কালো মাথাগুলো দেখতে না পাই।

দর্শকদের মুখ দেখতে পেলেই ডায়লগ ভুলে যাব। তারপর চুটিয়ে অভিনয় করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা কেউ ভাবতেই পারে নি আমি অত ভালো করব। আসলে রোজ রিহার্সালে গণ্ডগোল করতাম আর ঘরে এসে ডায়লগ মুখস্থ করতাম। এবারেও করব। তুমি একটা নাটক লিখে দাও না, আমরা অভিনয় করব।'

'য্যা্!'

'কেন, য্যা্ কেন? একটা হাসির নাটক লিখে পাঠিয়ে দিও।'

'সত্যি!'

'সত্যি নয় তো কি, আমি ইয়ার্কি করছি!'

'নারী বর্জিত নাটক?'

'হুঁ, সে রকম বুঝলে একটা মেয়ে রাখতে পার।'

'তোমার জন্য?'

'তাহলে তো আরো ভালো হয়। তবে হাসির নাটক হওয়া চাই।'

'রিসেণ্ট একটা লিখছি। সায়লেণ্ট অ্যাকটিং এর উপর টিভি-তে একটা কমেডি সিরিয়াল হবার কথা আছে। অফারটা আমি পেয়েছি।'

'তাই না কি! দারুন খবর।'

'দাঁড়াও, এখনো কনফার্ম নই। পছন্দ হলে তবেই নেবেন। এই অফারটা দিয়েছেন আমাদের মাইম স্যার।'

'মাইম! তুমি মাইমও জান?'

'জানি না, তবে শিখছি।'

'যারা শেখে তারাই তো জানে। গল্পটা একটু শোনাও না।'

'সে তো অনেক বড়।'

'একটুখানি শোনাও।'

'দুটো কুকুরের গল্প। একটা অ্যালসেসিয়ান আর একটা স্পেনিয়াল।'

'হ্যাঁ গো, কুকুরগুলো পারবে অভিনয় করতে?'

'ওদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতে হবে। ওরা তো আর মানুষ না, মদ খেয়ে গলা ভিজিয়ে মুড তৈরী করে অভিনয় করবে!'

'এই-এই-এই; আমাকে খুব শোনান হচ্ছে তাই না!'

চালাক ছেলে; অল্পতেই বুঝতে পেরেছে। আমি হাসছি।

'কি হয় ওটা খেলে, সাহস বেড়ে যায়?'

'যায় বৈকি। তুমি বুঝবে না।'

'কি করে বুঝব বল, আমি তো আর কোনদিন খাই নি?'

'একদিন খাওয়াব তোমায়। আগ্রায় চল, মদ আর শুয়োরের মাংস; নিজে রেঁধে খাওয়াব।'

'ইস্ !'

'ইস্ করছ ! আহা, ঘেন্নায় নাক স্বর্গে উঠে গেল। খাওনি তো কোনদিন। হেভি খেতে। কিসের মাংস খেয়েছ বল।'

'মুরগী আর ছাগল। তাও খেয়ে বুঝতে পারি না কিসের মাংস খাচ্ছি।'

'ব্যাস ! আমি অনেক কিছু খেয়েছি। গরু থেকে শুরু করে ডাকপাখি।'

'আজই কাগজে দিয়েছে আমাদের দেশে বিফ্ খাওয়ার অপকারিতা।'

'রাখ তোমার অপকারিতা। কেরালার ছেলেগুলোকে তো দেখোনি, সামনে দিয়ে কিছু একটা ছুটে গেলেই ধর ব্যাটাকে মার ব্যাটাকে। কেটে রান্না করে খেয়ে ফেলল।'

'ম্যা গো ! কি ঘেন্নার কথা।'

'ওদের ওসব নেই। মুভিং অবজেক্ট হলেই হল, সব খাওয়ার যোগ্য। ওরা রান্নাও করে খুব ভালো। তুমি রান্না করতে পার ?'

একটু ভেবে বললাম, 'পারি।'

'সত্যি ?'

'সত্যি বলছি পারি। তবে করি না। মা যখন মামার বাড়ি যায় আর অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন করি। একবার এমন ভাত রেঁধেছি বাপি দেখে খুব হাসছে।'

'কেন, হাসছেন কেন ?'

'ভাতের মধ্যে চালের চিহ্ন মাত্র নেই। এত ফুটিয়েছি সব ফ্যান হয়ে গেছে, ঘেঁটে দই। তুমিও হাসছ ?'

'না না, হাসছি না। আর কি পার বল।'

'ডাল।'

'কি ডাল ?'

'লাল ডাল।'

'লাল ডাল ! ডালের নাম জান না ?'

'জানি তো, মুগ ডাল মুসুর ডাল আরো কত কি। কিন্তু কোনটা কি ডাল চিনি না। যত মনে রাখার চেষ্টা করি খালি ভুলে যাই।'

এবার আমি হাসছি ওর মুখ দেখে।

ও বলছে, 'এতেই হবে। এতেই হবে আমার।'

দর বাড়ানোর জন্যে বললাম, 'আমি রুটি করতে পারি।'

'আচ্ছা, তাই না কি ! তা বাবাকে দেওয়ার সময় বলে দাও তো বাপি এটা রুটি ?'

'মোটেও না। আমি অত বাজে রুটি করি না যে দেখে চেনা যাবে না।'

আহীর খুব হাসছে। আমার একটু একটু রাগ হচ্ছে আবার হাসিও পাচ্ছে। আবার একটা চা ওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে।

'চা খাবে ?'

'না।'

'খাও না খাও না, রাগ করছ কেন ?'

'আমি চা খাই। তুমি জান না ?

'নাই বা খেলে আজ একটু খাও না।'

'না।'

'কি বলব ভাই, দিদিমনি খাবেন না।'

'খান না দিদি, আমার একটু বিক্রির হয় তাহলে।'

'কি আশ্চর্য ! তোমার বিক্রির জন্য আমি যা খাই না সেটা খেতে হবে !'

'সত্যিই তো, কেন শুধু শুধু চা খাইয়ে মেয়েটাকে কালো করতে চাইছ ?'

'নিন্ না দিদি।'

'দেখ, আমার কাছে একদম পয়সা নেই ও যদি গাড়ি ভাড়া না দেয় তাহলে আমাকে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে—'

'হ্যাঁ, আমি দেব গাড়ি ভাড়া। তুমি খাও। চাও আমি খাওয়াচ্ছি।'

'না, তুমি খাও। আমি খাব না।'

ছেলেটা তবুও ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে, 'দিদি নিন না। দিদি নিন না।' উফ্, কি বিপদে পড়েছি। আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছে। আচ্ছা ছিনে জোঁকের পাল্লায় পড়া গেছে তো। ও হরি ! আহীরের মুখের দিকে চোখ পড়তে দেখি ও ছেলেটাকে ইশারা করে আমাকে বিরক্ত করতে বলছে। চোখে চোখ পড়তে গম্ভীর হয়ে গেল।

'ইউ ! আমি কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছি এবার।'

'ওরে বাবা ! তুমি কেটেপড় ভাই, মা কা'ল রেগে গেছেন। আচ্ছা আর রাগব না। চা ওয়ালাও চলে গেছে, আশে পাশে কেউ নেই। এবার আমাকে একটা গান শোনাও। এখানে বাথরুম নেই, এমনি গাও।'

'কেন গাইতে বলছ, তুমি তো জান আমি পারি না।'

'যেমন পার গাও। শুনবো তো আমি ! কি ভাবছ ? এই—'

'উঁ ! আমি ঠিক করিনি না ?'

'কি গো ?'

'তোমাদের রেলওয়ে অফিসে তোমার খোঁজ করাটা ঠিক হয়নি না !' ও হাসছে মুখ টিপে। 'এতে তোমার ক্ষতি হতে পারত ?'

'পারত, একটা মেয়ে খোঁজ করছে বলে কথা। নারী ঘটিত ব্যাপার—'

'আমি কিন্তু তোমার ক্ষতি করতে চাইনি, বিশ্বাস কর।'

'পাগলি ! এটা অবিশ্বাস করার মত কথা !'

'আসলে সেই সময় তোমাকে খুঁজে পেতে এতটা মরিয়া ছিলাম যে—'

'আমি জানি ; কি হত ! কিচ্ছু হত না।'

'আমি কিন্তু সেই ভদ্রলোককে তোমার ঠিকানা দিয়েছি। ভেবেছি ঠিকানা পেলে হয়ত তোমাকে খুঁজতে সুবিধা হবে। অবশ্য উনি চাইতে দিয়েছি।'

'আমাকে খোঁজার জন্য অফিসের ঠিকানা লাগবে কেন। দিয়েছ বেশ করেছ। তবে এটা ঠিক, তোমার জায়গায় যদি কোন ছেলে—এই ধর আমিই যদি সাহায্য চাইতাম তাহলে কি উনি এভাবে সাহায্য করতেন ?'

'কেন করতেন না! নিশ্চই করতেন। তুমি জান না উনি ভীষণ হেল্পফুল মানুষ।'

'তবুও, তুমি মেয়ে বলে এক্সট্রা ফেসিলিটি পেয়েছ।'

'মোটেও নয়। এটা তোমার ভুল ধারনা। তবে, উনি যখন বলছিলেন চল তোমাকে স্কুটারে করে ধর্মতলায় পৌঁছে দি, তখন সত্যি বলতে কি আমার ভরসা হয়নি। এতে অবশ্য ওনার কোন দোষ নেই। উনি যথেষ্ট ভদ্রতা বজায় রেখে আমার সাথে কথা বলেছেন। এটা আমার সংকীর্ণ মনতার বহিঃপ্রকাশ। আমার অক্ষমতা।'

'তুমি কি ভেবেছিলে! তোমাকে স্কুটারে চাপিয়ে কোন একটা নির্জন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলবে। তারপর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে। তুমি চিৎকার করবে বাঁচাও! বাঁচাও! তখন সিনেমার ভিলেনের মত হা হা করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে তোমার দিকে এগিয়ে আসবে—'

'এই এই এই—আর এগিও না, খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

'ও, তুমি তখন এই ডায়লগটা বলবে ?'

'না, তখন বলব না। এখনই বলছি, তোমাকে। যা বলেছ বলেছ আর বোল না।'

'কেন নয়! তুমিই তো বল মনে মনে অনেক কিছু ভাবা যায়।'

'তাই বলে এই সব, তুমি আর ভাবার জিনিস পেলে না!'

'আরে শোনই না। তারপর, তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—এগিয়ে যাচ্ছে—এগিয়ে···।'

'আর এগিও না প্লীজ। ওখানেই দাঁড়াও।'

'থাম না, উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি। তোমার চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল একটা হী-ম্যান। সুপুরুষ চেহারা। তোমাকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এল। তারপর সে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে—'

'হ্যাঁ, নিজের গাড়িতে চাপিয়ে এবারে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা হোটেলে।'

'আবার হোটেল!' দাঁত বের করে হাসছে।

'আমার আর কাজ কি বল! তোমাকে খুঁজতে গিয়ে এর ওর গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াই; একবার এর ঘরে একবার ওর হোটেলে হাত বদল হতে থাকি, আর তুমি ঘরে বসে বসে নিশ্চিন্তে রাবড়ি খাও। আচ্ছা, এ কদিনে আমার কথা কি

তোমার একবারও মনে পড়েনি ?'

'কেন পড়বে না। কি ভাব তুমি আমায়! তোমার কথা মনে হত, কিন্তু আমার যা কণ্ডিশান না পারি উঠতে না পারি বসতে। তবে তুমি ঠিক করনি একটা অচেনা জায়গায় ওভাবে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছ। তুমি যখন কিছু জান না একা একা যাওয়া ঠিক হয়নি। কিছু একটা হয়ে গেলে…।'

আহীর সিরিয়াসলি কথাগুলো বলছে। আমার কোন ক্ষতি হলে ও কষ্ট পেত। সে তো অনেকেই পেত। খবরের কাগজে এরকম ঘটনা পড়ে অনেক অচেনা মানুষই আহা বলে। সেটাও তো কষ্টের বহিঃপ্রকাশ। না না, আহীর আরো কষ্ট পাবে, ও আমার বন্ধু। সত্যিই ও আমার বন্ধু।

'বাদ দাও ও কথা। তুমি পরিষ্কার করে বলত, তোমাকে ঠিক কি কাজ করতে হয় ?'

'পরিষ্কার করে মানে ?'

'মানে, শুধু চাকরি করি বলে ছেড়ে দিও না। তুমি চাকরি কর সে আমিও জানি। কি কর সেটাই জানতে চাইছি। এয়ার ফোর্সে তো অনেক রিস্কি কাজ করতে হয়—'

'না, সে সব কিছু নয়। আমার কাজ অফিস ঘরে। এ. সি. রুমে বসে এয়ার ক্রাফটের গতি বিধি লক্ষ্য করা।' আমি স্বার্থপরের মত নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, আহীরের লাইফ রিস্ক নেই।

'কি ভাবে লক্ষ্য কর ?'

'রুমের মধ্যে স্ক্রীন আছে। সেখানে—আচ্ছা তুমি টিভি-তে কোনদিন রকেট লঞ্চিং দেখেছ ?'

'দেখেছি।'

'অনেকটা ঐ ধরনের ব্যাপার। ধর কোন বিদেশী এয়ার ক্রাপ্ট ভুল করে আমাদের আকাশে চলে এসেছে তখন সেটা স্ক্রীনে ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্নিং দেওয়া হয় নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য। না ফিরলে, আমাদের লোক সব সময় তৈরী আছে তারাই উড়ে যায় বিদেশী এয়ার ক্রাফটকে সাবধান করতে।'

'তুমি যাও না তো ?—হাসছ ?'

'না। আমার কাজ অফিসে।'

'ওখানে কম্পিউটার আছে ?'

'তা আছে।'

'তোমার চিঠি পেয়ে প্রথমে বুঝতে পারিনি র‍্যাডার ডিপার্টমেন্টটা কি। ডিক্সনারী খুলে মানেটা দেখলাম।'

'কি দেখলে ?'

'লেখা আছে রেডিও ম্যাগনেটিভ ওয়েভস্ দ্বারা এয়ার ক্রাফ্টের ডিরেকশান—মানে দিক নির্ণয় করা।'

'ঠিক তাই। এই তো, তুমি সব জান দেখছি।'

'কিন্তু বুঝতে পারিনি তোমার কাজটা কি। কি করে বুঝতে পার কোনটা বিদেশী আর কোনটা আমাদের প্লেন।'

'সেটা টপ্ সিক্রেট। বলা যাবে না।'

'ও সরি। জান তো, টিভি-তে যখন আগ্রার কিছু দেখাত, হয়ত জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে দূরদর্শনের ক্যামেরা ঘুরছে। আমি কত অচেনা ছেলেকে দেখে ভেবেছি। আচ্ছা এটাতো আহীর হতে পারে—'

'ওফ্, সত্যি তুমি না!'

'না না, শোন। তোমাকে নিয়ে কি ভেবেছি সেটা তুমি—' থমকে গেলাম। কথা বন্ধ করে কি ভাবছি। প্রশ্ন করলুম আহীরকে, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে নিয়ে কি ভেবেছি; আমার সেই ভাবনাগুলো যদি তোমাকে না বলি তাহলে কি হবে?'

'কি হবে! কিছুই হবে না।'

কি নির্লিপ্তভাবে কথাটা বলল আহীর। ঐ ছোট্ট কথাটা আমাকে শলের মত বিঁধল। কি নিষ্ঠুর শোনাল! আমার কষ্ট হচ্ছে। উপেক্ষিত মনে হচ্ছে নিজেকে। কেন বলল এমন কথা! নিজেকে বোঝাচ্ছি সত্যিই তো, কি আবার হবে! কিছুই হয় না। আমার অনুভূতির কথা ও শুনবে কেন! একটা গান মনে পড়ছে। লাইনটা সম্ভবত এই রকম—'যদি আগুনেই পুড়ে মরে প্রজাপতি, তাতে প্রদীপের কি বা বল ক্ষতি···।' এ আর নতুন কথা কি! অনেক দিন আগে কোন এক অভিজ্ঞ কবি এ লাইন লিখে গেছেন। আজ আহীর তার পুনর্ব্যবহার করল। এতে ওর দোষ নেই। আমিই আমার পাওনার অতিরিক্ত আশা করে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম টেলিপ্যাথির মত আহীর আমার মনের কথা বুঝে নেবে। কল্পনার জগতে ঘুরে ঘুরে চিন্তা ভাবনাগুলো এত ভোঁতা হয়ে গেছে আগে বুঝিনি।'

'এই, কি চিন্তা করছ! আমি আহীর কি না!'

আমি হাসছি। কষ্টকে আড়ালে লুকিয়ে রাখার সব চাইতে ভালো উপাদান এই হাসি, কিছুতেই নিজেকে ওর সামনে প্রকাশ করব না।

'আজ কিন্তু প্রমাণ এনেছি, আমি আহীর।'

'আমিও প্রমাণ এনেছি, আমার বাবার নাম মহেন সান্যাল। এই দেখ আমার কম্পিউটারের আই কার্ড। ও সরি, এতে তো নেই। যাস্ট এ মিনিট। আমার অ্যাকটিং-এর আই কার্ড-এ আছে। এই দেখ—ফাদার্স নেম, মিস্টার মহেন সান্যাল। কি বিশ্বাস হল!'

'হুঁ তাইতো দেখছি।'

আই কার্ডে আমার ছবি আছে। ও একবার ছবি দেখছে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে

আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। বার বার অমনি করছে।

'কি দেখছ! ও অনেক দিনকার ছবি। কোন মিল পাবে না।'

'তোমার ঠোঁটের তিলটা দেখছি। বিউটি স্পট; অনেকে কালি দিয়ে নকল করে।'

আহীর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। মনটা কুঁকড়ে আছে এখনো। দমকা হাওয়ায় আমার চুলগুলো উড়ছে। ঝাপটে পড়েছে মুখের উপর।

'—চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা… ।'

ও জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন বলছে।

'তোমার কবিতাটা ভীষণ ভালো লেগেছে। 'আমি নারী—' কি যেন লাইনটা —কি যেন—'

'সন্তানকে জন্ম দেবার যন্ত্রণা ভোগ করব আমি। অথচ সে সন্তান আমার পরিচয় নিয়ে বড় হতে পারবে না। কেন? আমি নারী বলে?'

'ইয়েস, তুমি কি করে বুঝলে আমি এই লাইনটার কথা বলছি?'

'অনেকেই বলে এ লাইনটা সবচেয়ে ভালো। কিন্তু আমার ভালো লাগে অন্য একটা লাইন—আদমের পৌরুষের অহংকারে তোমরা মত্ত। অথচ সেই পৌরুষের রূপকার, ঈভের নারীত্বকে কখনো মর্যাদা দাওনি তোমরা'।

'ভেব না, তোমাদেরও রাজত্ব আসবে একদিন।'

'এ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তা সম্ভব নয়।'

'মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কোথায় আছে?'

'ঠিক জানি না। তবে কিছু আদিবাসী সমাজ আছে মাতৃতান্ত্রিক। অ্যান্থ্রোপোলজিতে পড়েছি।'

'ওরা আমাদের থেকে এ ব্যাপারে তাহলে উন্নত বল! তুমি কি জান, ওদের সমাজে কোন রেপ্ কেস্ হয় না।'

'তোমাকে বলেছে হয় না। ওদের ক্ল্যাস্ হয় না তাই জানতে পার না। আমাদের সমাজে যে রকম কাগজে লেখা দেখি হয়—ওদের খবর কে রাখে! তাছাড়া ওদের মেয়েরাও এত প্রতিবাদী নয়।'

'প্রতিবাদ করে আর কি করবে! ওদের সমাজে তো ফ্রী মিক্সিং। কোন অনুষ্ঠান হলে মেয়ে পুরুষ একসাথে বসে মদ খায়—'

'মদ বলে না, হাড়িয়া খায়। পচা পান্তা থেকে তৈরী। খেলে ভীষণ নেশা হয়। অবশ্য মহুয়াও খায়।'

'ঐ হল, হাড়িয়া হোক আর মহুয়াই হোক—খেল তো। তারপর যে যার পারে হাত ধরে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। এ ওর বউ-এর হাত ধরে ও আর একজনের বউ-এর হাত ধরে।'

'বাবা! আদিবাসীদের সম্বন্ধে তুমি বেশ অভিজ্ঞ দেখছি। ওরা কিন্তু ভীষণ সৎ হয় জান তো! নিজেদের নিয়ম সম্বন্ধে ভীষণ দায়িত্বশীল। এদের উপর বহিঃসমাজের হস্তক্ষেপ ওরা কিছুতেই বর্দাস্ত করে না।'

আফসোসের সুরে ও বলছে, 'দূর, আদিবাসী হলেই ভালো হত।'

'কেন?'

'তাহলে এতদিন অপেক্ষা করতে হত না।'

কি অসভ্যতা! পাকা ছেলে। মুখে বললাম, 'তুমি আদিবাসী হলে তোমার সাথে আমার দেখাই হত না।'

'কেন হত না! তুমিও আদিবাসীদের মেয়ে হতে।'

'তুমি তো আমার লেখা দেখে ডেকেছ। আদিবাসী হলে আমি লেখাপড়া জানতাম না, তোমাকে চিঠিও লিখতে পারতাম না—'

'চিঠি লেখার কি দরকার! আমরা একই গ্রামে—না, তুমি আমার পাশের বাড়িতে থাকতে। আমরা একসাথে বসে হাঁড়িয়া খেতাম তারপর হাত ধরে—'

ভদ্রলোকের মত জিভে লাগাম দিল। ও যে বর্তমানে আদিবাসী নয় তার প্রমাণ দিল।

'কটা বাজে গো?'

ঘড়ি দেখে টাইম বললাম।

'তুমি ছাতা এনেছ?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'কি মেঘ করেছে দেখ।'

সত্যি, পিছন দিকের আকাশটা কালো। ঘন স্লেট রঙে আচ্ছন্ন।

ও বলছে, 'চল এবার ওঠা যাক। এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে। এখানে দাঁড়াবারও জায়গা নেই। ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে।'

আমরা উঠে হাঁটতে শুরু করেছি। আমার হঠাৎ মনে পড়ল ওর প্রোমোশানের কথা।

'আহীর, তোমার প্রোমোশানের কি খবর? পরীক্ষা দিয়েছিলে যে!'

'ও নিয়ে ভাবি না। হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে মানে, তখন তোমার দায়িত্ব বেড়ে যাবে বল!'

'হুঁ, দায়িত্ব বাড়বে কিন্তু কাজ কমবে।'

'কি রকম?'

'এখন আমার সিনিয়র বলেন, বাসু ডু দিস। তখন আমি বলব, অমুক ডু দিস।'

বাপ রে, কি স্টাইল! যেন এখনই সিনিয়র হয়ে গেছে।

ও একটু গম্ভীর হয়ে পথ চলছে। কি ভাবছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি ওর

মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি। আমার দিকে না তাকিয়েই ও বলছে, 'সমি, তোমাকে একটা কথা বলব।'

'বল।'

'এ কথা বলতে ভালোলাগছে না তবুও বলতে হবে।'

আমি বেশ বুঝতে পারছি ও কি বলতে চাইছে। গতদিন বলেছিল পাত্রী হিসাবে যে সব মেয়েদের ছবি ফেরৎ পাঠান হয় তাদের জন্য খুব খারাপ লাগে। ভীষণ ভদ্রতার সঙ্গে তাদের সরি বলা হয়। তখন ওদের কত খারাপ লাগে বলত। ও এক্ষুনি বলবে আমার দাদা তোমায় পছন্দ করে নি। ওফ্! কথাটা মনে হতেই একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। মনে মনে বললাম, থ্যাঙ্কগড! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

আর মুখে বললাম, 'বল না কি বলবে?'

'মনটা শক্ত আছে তো? না থাকলে শক্ত কর।'

'কেন, খুব জোরে আঘাত দেবে বুঝি?'

এবার তাকাল আমার দিকে। আমি হাসছি। 'বল কি বলবে। আমি যথেষ্ট স্ট্রং।'

'ছোটদাকে তোমার কথা বলেছিলাম। সব কিছু শুনে, তোমার চিঠি পড়ে কি বলল জান!'

'কি?'

'বাব্বা! মেয়েটার তো বেশ সাহস আছে। কিন্তু চাকরি করতে চায় এ রকম মেয়েকে ও বিয়ে করবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি একমাত্র সন্তান। বাবা মাকে দেখার দায়িত্বটা তোমার অনেক বেশী। আর ছোটদার ট্রান্সফারেব্‌ল জব; কখনো এখানে কখনো ওখানে। সেক্ষেত্রে বাবা মাকে দেখাশুনা করা অসুবিধা। সে দায়িত্ব ও পালন করতে পারবে না…।'

আমার খুব হাসি পাচ্ছে। আহীর মহা ফাঁপরে পড়েছে। ওর মিথ্যে বলা অভ্যাস নেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওর দাদা আমাকে অপছন্দ করেছে সে কথা ডায়রেক্ট বলতে পারছে না পাছে আমি কষ্ট পাই। তাই ইনডায়রেক্টলি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এইসব বকছে। প্রথমতঃ আমি একবারও বলি নি আমি চাকরি করব। দ্বিতীয়তঃ বিয়ের পর সব মেয়েরাই শ্বশুর বাড়ি যায়। বাবা মার কাছ থেকে দূরে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি আর এ শাস্তিটা পাব না তাই কখনো হয়।

'তুমি কলকাতার কোন ছেলেকে বিয়ে কর।'

'কেন?'

'বাবা মার কাছে থাকতে পারবে।'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'তাতে কি।' আমি কথা বলতে পারি না। দেখ, এতে আমাদের বন্ধুত্বে নিশ্চই চিড় ধরবে না। এমন হওয়া উচিত নয়। আমাদের সম্পর্কটা থাকবে তো?'

আমাকে অবাক করল আহীর। এতদিন ভাবতাম এ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে আমি একাই উদগ্রীব। আহীরও তাহলে চায়।

'তোমাকে একটা কথা বলি। আমি সত্যি বলব, তুমি বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা তোমার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। এ কথা ফোনেই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এত দেরিতে---যাগ্গে, আমার প্রথম চিঠির উত্তরটা যদি তুমি না দিতে, সাপোজ তোমার বাবা কিংবা দাদা দিতেন তাহলে হয়ত অভদ্রের মত সে চিঠির উত্তরই আমি দিতাম না। কারণ উত্তর পাওয়াটাই ছিল আমার শেষ লক্ষ্য। কিন্তু তোমার চিঠি যখন পেলাম, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার চার লাইন চিঠির উত্তরে তুমি লিখলে চল্লিশ লাইন। আশাতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছি ভেবে কেমন যেন সাহস বেড়ে গেল। বিশেষ করে তুমি নিজের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখতে বলেছিলে। তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হল। তোমাকে চিঠি দেবার পর ভেবেছি, কেমন করে এ বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করা যায়। আমরা নিজেদের যতই আধুনিক ভাবি না কেন বিয়ের পর নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। আমরা চাইলেও আমাদের সাথীরা চাইবে কেন! আর সংসারের শান্তি বিঘ্নিত করে কেই বা চাইবে বল বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে। এতটা আপসহীন উদার মানসিকতা আমাদের এখনো হয়নি। অগত্যা, বন্ধুত্বের বিনিময়ে সংসারের শান্তি কিনতে হয়। এটা আমি চাইনি। এ বন্ধুত্বের ইতি আমি চাইনা। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বের করলাম একটা রাস্তা। ভাবলাম তোমার দাদাকে যদি বিয়ে করি তাহলে ক্লিয়ার। তোমার সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরী হবে, বেঁচে যাবে আমাদের অদ্ভুত বন্ধুত্ব। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। বোকার মত, ইটকারীর মত দুম করে ছবি পাঠিয়ে দিলাম তোমাদের বাড়িতে; সঙ্গে একটা স্টুপিড মার্কা চিঠি। পরে ধীরে ধীরে আসল সত্যটা উপলব্ধি করলাম—তোমারই সংসারে অন্য কারুর স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মন প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম তোমার দাদা আমাকে অপছন্দ করুন। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, আমি খুশী।'

আহীর চুপচাপ শুনছে আমার কথা। আমি জানি ও কিছুটা বুঝলেও পুরোটা বোঝেনি। আর যেটুকু বোঝেনি সেটা বোঝার জন্য যদি কোন প্রশ্ন করে আমায় আমি অপ্রস্তুতে পড়ব। কারণ আহীরকে মিথ্যে বলতে পারব না। আর ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যি বলার মত মন এখনো তৈরী করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আহীর আমাকে রেহাই দিল কোন প্রশ্ন না করে। শুধু বলল, ছোটদাকে তোমার কথা বলেছিলাম, কিন্তু সব তো বলা যায় না! তোমার সাথে দেখা করেছি, ঘুরেছি, আড্ডা মেরেছি এগুলো বলতে পারি নি।'

'বুদ্ধিমান ছেলে। না বলে ভালোই করেছ।'

'তুমি কোথা থেকে বাস ধরবে?'

'স্ট্যান্ড থেকে।'

'এতটা হেঁটে যাবে? চল বাসে উঠি।'

'বাসে! এই তো এসে গেছি। তুমি মোটে হাঁটতে চাওনা, ভীষণ কুঁড়ে আছ।'

'তা ঠিক। অস্বীকার করব না। তবে তুমি বড্ড জোরে হাঁট।'

'ঠিক আছে, তোমার জন্য আসতে হাঁটছি।'

'না, আমি তোমার জন্য জোরে হাঁটছি।'

'তা কেন, তুমি আমার জন্য জোরে হাঁটতে পার আর আমি তোমার জন্য আস্তে হাঁটতে পারি না।'

'নিশ্চই পার, তবে তোমার অগ্রগতিকে রুখে আমার কি লাভ বল।'

'ধ্যাৎ! সব সময় ইয়ার্কি।'

আমরা গোষ্ট পালের মূর্তি'র পাশ দিয়ে হাঁটছি। আহীর সুসংবাদটা দিয়ে আমাকে চিন্তা মুক্ত করেছে।

'কোথায় যাচ্ছি বলত আমরা?'

'ঠিক যাচ্ছি। তুমি এস না। আমি ঐদিকের সব রাস্তা চিনি।'

বলতে বলতে মাঠের মাঝখানে হাত দুই আড়াই চওড়া একটা সোঁতার কাছে এসে আটকে গেলাম।

'একি! কোথায় নিয়ে এলে গো? এ যে দেখছি পরীখা। লাফাতে পারবে?'

'তুমি আগে যাও, তারপর আমি যাব।'

'য্যাঃ! তুমি পারবে না, তার উপর আবার শাড়ী পরে আছ।'

'তাতে কি! আমি ঠিক লাফাব। হাসছ? ধ্যাৎ! হাসছ কেন? ভাললাগে না।

আহীর বেদম হেসে চলেছে। এক সময় হাসি থামিয়ে বলে, 'তারচেয়ে বরং এক কাজ করি, আমি সাঁকোর মত লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি তুমি আমার উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে যাও, মা কালির মত।'

'আহা! অনেক হয়েছে, কাউকে আর লাফাতে হবে না। চল ঘুরে যাই।'

'আহা করছ! এগুলোই তো আমাদের কাজ। বিপদের সময় দেশের লোকের পাশে দাঁড়ান। কোথাও বন্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা হ্যালিকাপ্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি তাদের সাহায্য করতে।'

'আপাতত তোমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, যখন হবে বলব। চল।'

মাঠে কতকগুলো ছেলে ফুটবল খেলছে। তাই দেখে আহীর নিজের কথা বলছে। ও একসম খুব ফুটবল খেলত। এখনো খেলতে ইচ্ছে হয়। আরো অনেক কথা বলছে। 'সমি, আমাকে চিঠি দেবে তো?'

'দেব। তবে এখন আর নয়। আমার বিয়ের পর দেব।'

'সে কি! তোমার বিয়ে আমায় নেমন্তন্ন করবে না?'

আমি হতভম্ব ওর উৎসাহ দেখে। 'নেমন্তন্ন করলে কি করবে, খেতে আসবে?'

'বারে, আসব না! শুধু খেতে আসব কেন, বিয়েতে আমি তোমার পিঁড়ি ধরব।'

রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বালা জ্বালা করছে। যার সাথে শুভদৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখছি সে কি না আমার পিঁড়ি ধরবে! আস্পর্ধা দেখ! মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছি না বলে আমাকে এভাবে অপমান করবে! ও কি একটুও বোঝেনি! না বুঝেও বুঝতে চাইছে না!

'তুমি মাঝে মাঝে এরকম চুপ হয়ে যাও কেন বলত? কি ভাব?'

'কিছু না।'

'তোমার ছবি এনেছি।'

'দাও।'

'তুমি নিয়ে কি করবে! এগুলো আমার কাছেই থাক। তবে এমনি নেব না তোমার জন্যেও এনেছি।'

এই বলে নিজের ছবি আমাকে দিল। আমি ব্যাগ খুলে ছবিগুলো রাখতে গিয়ে চোখ পরে গেল ফুলকরা খামটাতে। এতক্ষণ এটার কথা মনেই ছিল না। কিছু না ভেবেই খামটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। হাতে নিয়ে জিগ্যেস করল, 'কি গো এটা! চিঠি?'

'না।'

'তাহলে?'

'একটা ম্যাসেজ। উঁহু। পরে দেখ।'

'ও. কে.' পকেটে রেখে দিল। 'তোমার বাস কই?'

'ঐ তো।'

'বাহ্! তোমাকে দেখে এগিয়ে আসছে দেখ। মেয়েদের এই এক সুবিধা। আমি এসে দাঁড়ালে কি আর বাসটা আসত! আমাকেই কষ্ট করে গিয়ে উঠতে হত! নাও, উঠে পড়।'

'আহীর—'

'কি।'

'খামটা দেবে?'

'কি খাম গো?'

'এইমাত্র যেটা তোমার দিলাম।'

'কেন?'

'ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।'

'ইম্‌পসিবল! এটা এখন আমার পকেটে সুতরাং আমার জিনিস। তোমার কেন?'

'দাও না প্লীজ।'

'মেরে দেব কিন্তু বলে দিচ্ছি, তুমি আমাকে চেন না।'

আমার আফসোস হচ্ছে। ওটা দেওয়া কি ঠিক হল। আমি কিন্তু দেব বলেই লিখেছিলাম। না দিলেই বোধহয় ভালো হত।

'ভেবো না ভেবো না। দিয়েছ তো আমাকে, এত ভাবার কি আছে! এখন বল, আমি শনিবার চলে যাচ্ছি, আমাকে সি অফ্ করতে আসবে তো?'

'তোমার ট্রেন কটায়?'

'ইলেভেন পি. এম।'

'কখন আসব বল।'

'আসতে পারবে?'

'তুমি সময়টা বল না!'

'সময়—সময়টা ফোনে জানিয়ে দিলে হবে না?'

'কেন, এখন জানাতে অসুবিধাটা কোথায়!'

'আসলে আমার সাথে আমার এক বন্ধু আসবে তো—'

'কবে ফোন করবে?'

'কাল আর পরশু তো সময়। তুমি দুদিনই কাকিমার বাড়ি যেও। টাইমটা বলে দিচ্ছি, বারটা থেকে সাড়ে বারটার মধ্যে।'

'দুদিনই যেতে হবে কেন?'

'কাল যদি বাইচান্স ফোন করতে না পারি পরশু সিওর করব। আরে, যাবে কাকিমার বাড়ি। কাকিমা কি করছ—রান্না করছ, বলে চলে যাবে। পারবে না?'

'হুঁ, পারতে তো হবেই।'

'যাও বাসে ওঠ।'

'তুমি যাও না, আমি পরে যাচ্ছি।'

'তাই কখনো হয়। তুমি একা দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি তোমাকে ফেলে চলে যাব!'

'কেন হয় না, আমি কি বাচ্চা মেয়ে?'

'নাহ্, তুমি অনেক বড়। পরে যাবে কেন, কেউ আসবে বুঝি। কে গো? তোমার বয়ফ্রেন্ড! আমি দেখব। দেখাবে আমায়?'

ও আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছে। আমি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি। কি জানি, ওটা দেওয়া বুঝি ঠিক হল না।

'আসি সমি, শনিবার দেখা হবে। সাবধানে যেও'।

আমি চলন্ত বাসে বসে আছি। ভাবছি, আহীর যখন খাম খুলে কবিতাটা পড়বে, তখন—

'অঙ্গীকার'

আজ তোমাকে দেখলাম।
একরাশ অচেনা লোকের ভিড় ঠেলে
তুমি এসে দাঁড়ালে আমার সামনে।

তখন আমি গালে হাত দিয়ে
বসেছিলাম তোমারই প্রতীক্ষায়।
নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে তুমি এলে।
অশান্ত মনটা কেবলই চঞ্চল হয়ে উঠছিল ;
প্রতীক্ষারত চোখ দুটো ফিরে ফিরে
চাইছিল তোমার পথের নিশানায়।
সকল পথিকের পানে তাকিয়ে বার বার
খুঁজে ফিরছিল তার অচেনা সাথীটিকে।
আর প্রতিবারই দুচোখে ভেসে উঠছিল
খুঁজে না পাওয়ায় ব্যর্থ প্রতিফলন।
ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।
না, কাঁদিনি আমি—
আমার চোখের জল তোমার
মুখটাকে যদি ঝাপসা করে দেয়!
তোমাকে প্রথম দেখার সে অনাবিল
অনুভূতি থেকে যে বঞ্চিত হব আমি।
তাই তো, দু হাতে কান্নার গলা টিপে তোমাকে দেখার
অদম্য ইচ্ছাকে সযত্নে আগলে রাখলাম।
তুমি আসবে,
আমার মন বলছে তুমি আসবে।
এলে তুমি।
আমাকে সুধোলে হেসে—
"তুমিই কি বনলতা ?"
আমার কর্ণ কুহরে এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে
তোমার কণ্ঠস্বরের সে অনুরনন।
চকিতে চেয়েছিনু তোমার পানে।
বুঝলাম, প্রতীক্ষার হল অবসান ;
আমার 'কল্পনার তুমি' বাস্তব হয়ে
দাঁড়িয়ে আছ আমারই সামনে।
আজি অচেনারে দেখলেম চিরপরিচিতের অহংকারে।
আমি প্রীত বন্ধু, অভিভূত।
তোমার পাশে বসে সোনালী বিকেলটা
কেটে গেল স্বপ্নের মত।
এবার এল ফিরে যাওয়ার পালা।
দুজনার পথ যে দুদিকে মোড় নিয়েছে।

পথের সে বাঁক পিছনে ফেলে
এগিয়ে গেলাম আমার পথে।
অনিচ্ছার শিকল পরা পা দুটো থমকে গেল হঠাৎ।
তোমাকে আর একবার দেখার লোভে
পিছন ফিরে তাকালাম।
তুমি দাঁড়িয়ে দেখছিলে আমার চলে যাওয়া।
চোখে চোখ রেখে হাত নাড়লে বিদায়ের ভঙ্গিতে।
বুকের মাঝে দলা পাকানো কান্নাটা
ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল।
মনে হল ছুটে চলে যাই তোমার কাছে।
পারিনি। জানি না কেন—
হয়ত সে অধিকার আমার নেই।
তাই, অধিকারের সীমারেখা লঙ্ঘন না করেই ফিরে এলাম।
বুঝলাম ; অবুঝ মনটা কাঁদছে না পারার অক্ষমতায়।
চোখের কোনে হাত দিয়ে দেখলাম
এক ফোঁটা জল নেই।
অথচ ভিতরটা ভিজে উঠছে ক্রমাগত।
অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মত বুকের নিচে
তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে অশ্রুনদী।
সে নদীর জলে প্রতিবিম্ব পড়েছে তোমার।
অপলক দৃষ্টিতে দেখছি সে প্রতিবিম্ব
পলক ফেলতে ভয় হয় ;
যদি হারিয়ে ফেলি তোমায় ?
জানি অধিকার নেই, তবুও চাইছি অঙ্গীকার—
তুমি নাই বা হলে আমার
তোমার এ প্রতিবিম্ব আমাকে দাও।
ভালো বেসে না হোক, দয়া করে দাও।
আমি তোমার তরে কাঁদিব চিরকাল।
কখনো শুকিয়ে যেতে দেব না এ অশ্রুনদী।
ও গো বন্ধু, তুমি এসে দাঁড়াও সে নদীর তীরে
স্পর্শ নয়, কাছে পাওয়া নয়,
শুধু প্রাণ ভরে দেখব তোমারে।

এ আমার যন্ত্রণার ফসল। আহীর দেখা না করে চলে গেছে ভেবে এটা লিখেছিলাম। আমার সব হারানোর বিনিময়ে একটু পাওয়াই এ কবিতার উপজীব্য। একটা সমগ্র জীবন আশ্রয় নিতে চাইছে একটা দিনের ছায়ায়। নিজেরই অজান্তে

কেমন করে জানি না আমার সমস্ত ভালোবাসাটুকু ডেডিকেট করেছি আহীরকে। কি আছে আর আমার! অবশিষ্ট বলে আর কিছু নেই। সবটুকু দিয়ে আজ আমি নিস্বঃ। আহীরের দাদা আমাকে অপছন্দ করেছে শুনে মনে খুশী ধরছিল না। কিন্তু দাদা যাকে অপছন্দ করেছে ভাই তাকে পছন্দ করবে এ ভ্রান্ত ধারণা আমার মনে স্থান পেল কি করে! নিজের বোকামিতে নিজেই লজ্জিত। আমি উদ্দেশ্যহীন একটা পথের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি। কোন লক্ষ্য নেই, কোন ঠিকানা নেই, শুধু গোলক ধাঁধার মত এক দুর্বোধ্য চোরা গলিতে ঘুরপাক খাচ্ছি। আমার সব হিসাব নিকাষ গোলমাল হয়ে গেছে। চাওয়া পাওয়ার যোগ বিয়োগের অংকগুলো সব ভুল, সব ভুল হয়ে গেছে। আহীর একটুও বুঝতে পারেনি আমার মনটা। আমি ওকে কেন এভাবে খুঁজেছি ও বুঝতে পারনি ; বুঝলে এত নির্লিপ্ত থাকতে পারত না। এক সময় বিয়ে করব না বলে জেদ করতাম। বাপি মাকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব মনে হত। তারপর, কে জানে কবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘর বাঁধার একটা সুপ্ত বাসনা অংকুরিত হল এ মনের গহনে। কিন্তু পুরুষের প্রতি ভীতি সে অংকুরকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। কাগজে প্রায়ই পড়তাম, অমুকের স্বামীর অন্য এক মহিলার সাথে অ্যাফেয়ার আছে। বিবাহের পূর্বের প্রেমিকা বিবাহের পরও রয়ে গেছে সবটুকু অধিকার দখল করে। কি হতভাগ্য সেই মেয়েটি! দু চোখ ভরা না জানি কত সোনালী স্বপ্ন নিয়ে সে এসেছিল শশুর ঘরে। কি পরম বিশ্বাসে স্বামী নামক ভদ্রলোকটির হাত ধরেছিল সে। যে না কি প্রতি রাতে মদ্যপ অবস্থায় নিশাচর প্রাণীর মত বাড়ি ফেরে। আমি নিজের ভাগ্যকে কোন সাহসে আলাদা করব তার থেকে! ঐ মেয়েটির জীবন দিয়ে যে আমার জীবনী লেখা হবে না এমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে! কেউ না। তাই মনে হয়েছে পেয়ে হারানোর চাইতে না পাওয়া অনেক শ্রেয়। কালকের বঞ্চনার কথা ভেবে আজকের আনন্দকে স্বীকৃতি দেবার সাহস হয়নি কখনো। তাই ঘর বাঁধার স্বপ্নকে সমাধিস্থ করে রেখেছিলাম এতকাল। এ নিয়ে কোন ক্ষোভ ছিলনা আমার মনে। কখনো আলাদা করে ভাবতে বসিনি যে বিয়ে না করলে আমি অসম্পূর্ণ। এভাবেই বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। হঠাৎই একদিন যাদুকরের যাদুদণ্ডের মত উড়ে এল আহীরের চিঠি। যার ছোঁয়ায় সরে গেল কবরের মুখের মাটি। কফিনের ঢাকনা খুলে সূর্যের দিকে মুখ তুলে চাইল আমার ঘুমিয়ে থাকা স্বপ্নের অংকুর। আমাকে নতুন করে ভাবতে শেখাল, সাহস জোগাল স্বপ্নকে বাস্তবের রঙে রাঙাতে। কানে কানে বলল—

আজি প্রতীক্ষার হল সমাপন
কেন মিছে আর করগো রোদন
তব স্বপ্ন সাথীকে স্মরিয়া,
অমানিশি দেখ হয়েছে প্রভাত
তব দ্বারে এসে করি করাঘাত
আমারে নাও গো বঁধু বরিয়া।

আমি যে তোমাকে বরণ করেই নিতে চেয়েছিলাম আহীর। তোমাকে ভালোবেসে পূর্ণতা পেতে চেয়েছিলাম। ভালেবাসলাম বটে কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করল না সে ভালোবাসা। এ আমার অক্ষমতা। মনের কোনে প্রেমকে লুকিয়ে রেখে শুধু অভিনয় করে গেছি তোমার সাথে। কি নিখুঁত অভিনয়! তুমি বুঝতে পারলে না সমির অব্যক্ত কথাগুলো। শুনতে পেলে না তারা তোমায় কি বলতে চায়। জানতে পারলে না আমি তোমায় কি চোখে দেখি। আমার অভিনয় তোমাকে জানতে দিল না অভিনয়! অভিনয় মানে তো ছলনা! তাহলে কি আমি আহীরের সাথে ছলনা করলাম! ছলনা যে পাপ। আমার ভালোবাসায় পাপের ছোঁয়া লাগল! না; তা হয় না। আমি আহীরকে বলব। আমার সব কথা বলব। ছলনার জঞ্জাল সরিয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করার ওকে। তাতে যদি ও আমাদের সম্পর্কে ইতি টেনে দেয় তো—, ভাবতে পারছি না। তবুও সে কষ্ট আমার; আমি মেনে নেব তা। কিন্তু আহীরকে ঠকাতে পারব না। অকপটে সব সত্য স্বীকার করে পিছন ফিরে দাঁড়াব। আজই চিঠি লিখব। শনিবার ওর হাতেই দিয়ে দেব।

প্রিয় আহীর,

জানি না এ চিঠির কোন প্রয়োজন ছিল কি না। হয়ত ছিল, হয়ত বা নেই তবুও লিখছি। আড়াই ঘণ্টা হয়ে গেল আমি তোমাকে এসপ্ল্যানেডে ছেড়ে এসেছি তুমি বাসে আমার কবিতাটা পড়েছ কি না জানি না। (আমি হলে পড়তাম)। যদি পড়ে থাক তাহলে এতক্ষণে নিশ্চই বুঝতে পেরে গেছ যে আমি তোমার বন্ধু হবার যোগ্যতা হারিয়েছি! এ পরিণতি আমার জানা ছিল আহীর। তবুও ক্ষণিকের দুর্বলতায় মনে হয়েছিল ওটা তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নি। কিন্তু পরে মনে হল তুমি না দিয়ে ভালোই করেছ। কারণ ওটা কেবল তোমার জন্যই লিখেছি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির জন্য নয়। তাই রেজাল্ট যাই হোক না কেন ওটা আমি তোমায় দিতে বাধ্য হয়ত তোমার কাছে ওটা নিছক কবিতা মনে হতে পারে, কিন্তু আমি নিছক কবিতা লিখিনি। সমস্ত অনুভূতিটুকু নিকড়ে ঐ কবিতার জন্ম দিয়েছি আমি। আসলে কি জান, আমার ভীষণ অহংকার ছিল। তুমিই প্রথম আঘাত করলে সে অহংকারে আমাদের সমাজ নারী পুরুষের বন্ধুত্বকে কোনদিনই সহজভাবে মেনে নেয়নি। সর্বদা পাপের কলম দিয়ে হিসেব করে এসেছে সে পবিত্র সম্পর্ককে। আর আমার যেহাদ ছিল এখানেই। আমি নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ছিলাম; কোনদিন প্রেম করব না। যে পুরুষের সাথে আলাপ হবে, সে কেবল আমার বন্ধুই থাকবে, প্রেমিক হবে না কখনো। এতদিন কানায় কানায় পালন করে এসেছি সে প্রতিজ্ঞা। আমার বন্ধুদের মধ্যে দু একজন নিতান্তই ভদ্রতার সঙ্গে জানিয়ে ছিল যে তারা আমায় ভালোবাসে। আমি তাদের হাত জোড় করে বলেছিলাম, আয় অ্যাম সরি ফ্রেন্ড। আর একান্তভাবে অনুরোধ করেছিলাম আমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে। কিন্তু তারা কেউই আমার অনুরোধ রাখেনি। তারাও পাল্টা সরি জানিয়ে হারিয়ে গেল আমার

জীবন থেকে। আমি চেষ্টা করেছিলাম ওদের ধরে রাখতে, কিন্তু তারা আমার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে বার বার। ভীষণ কষ্ট পেয়েছি ওদের কষ্ট দিয়ে, তবুও চোয়াল শক্ত করে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। তবে ওদের মত কষ্ট হয়ত পাইনি। আর তাই বুঝি এতদিন পর সে আঘাত পাল্টা আঘাত হয়ে ফিরে এল আমার কাছে। এটা আমার পাওনা ছিল, আর আমার পাওনাকে আমি অস্বীকার করি কি করে বল! তুমি আমাকে আঘাত না দিলেও আমি আঘাত পাব আহীর। আর এ আঘাতটাই আমার জীবনের একটা মস্তবড় প্রাপ্তি, যা আমি সযত্নে লুকিয়ে রাখব মনের গোপন কোনে; যে স্থান রিক্ত পড়েছিল এতদিন। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখলাম সেদিনই সব কিছু বলতে চেয়েছিলাম। পারিনি; হয়ত মেয়ে বলেই পারিনি।

আচ্ছা আহীর, তোমার Control room-এর screen এ অনেক অবাঞ্ছিত air craft তো ঢুকে পড়ে পথ ভুলে। মনে করনা আমি তেমনই একটা অবাঞ্ছিত এয়ার ক্রাফ্‌ট, যে নাকি অযাচিত ভাবে এসে পড়েছিল তোমার Life screen এ। না, আমাকে ভুলে যেও এ কথা বলব না। মানুষ একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেও তো মনে থেকে যায়। না চাইলেও থেকে যায়। আর আমি তো তোমার জীবনের বাস্তব; কয়েক মুহূর্তের জন্য ঘটে যাওয়া এক চরম বাস্তব! তুমি না ডাকতেই আমি এসে পড়েছিলাম তোমার জীবনে। এতদিন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তোমার দিকে। (তোমার অনুমতি ছাড়াই)। এতটা কাছে যাব ভাবিনি। বিশ্বাস কর, বুঝলাম সেদিন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যেদিন তোমার চিঠি পেলাম।

আমি আমার চিঠির মত নই, সেজন্য দুঃখিত। আমি তোমার কল্পনার ইনার বিউটি হতে পারিনি, সেজন্য দুঃখিত। আমার চিন্তা ভাবনা যতটা প্রগতিশীল আমি নিজে ততটা নই, সেজন্য দুঃখিত। তুমি আমাকে যতটা সুন্দর ভেবেছিলে আমি ততটা সুন্দর নই, সেজন্য দুঃখিত। আমার মধ্যে এত খামতি থাকা সত্বেও আমি তোমার হতে চেয়েছিলাম, আমার এ ধৃষ্টতার জন্য দুঃখিত। মনের কথা মনে চেপে রেখে তোমার সাথে অ্যাকটিং করে যেতে পারলাম না আহীর। তাই তো একটা কোরা কাগজের মত নিজেকে মেলে ধরলাম তোমার সামনে, তোমাকে হারিয়ে ফেলব জেনেও। কাল তুফান মেল ছেড়ে যাবার পর একা একা যখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল তোমাকে আর কোনদিন দেখতে পাব না; কোনদিন না। নিজেকে বার বার জিগ্যেস করছিলাম, আমি যেভাবে বেঁচে থাকার জন্য স্বপ্ন দেখতাম তোমাকে ছাড়া সেভাবে বাঁচতে পারব তো? সত্যিই কি বাঁচা যায়?—

সমি

'হ্যালো—'

'হ্যালো, সমি?'

'ইয়া।'

'কোথা থেকে কথা বলছ?'

'অফিস।'

'তুমি কি আজকাল কাকার অফিস সামলাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আর কি করছ লোহা বিক্রি ?'

'হুঁ, তোমার দরকার হলে বোলো কন্‌সেশান করে দেব।'

'কেউ নেই বুঝি ওখানে।'

'না।'

'তুমি কাল এসেছিলে ?'

'হ্যাঁ!'

'সরি সমি, কাল বাড়ি থেকে বের হতেই পারিনি, কাজ ছিল। কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না কেন! তখন থেকে হুঁ, হ্যাঁ, না, করে যাচ্ছ!'

'তুমি বল, আমি শুনছি।'

'না, তুমি বল।'

'কাল কখন যাব ?'

'ও হ্যাঁ, কখন আসবে বলত! সাড়ে সাতটায় এস।'

সাড়ে সাতটা মানে কতক্ষণ আর থাকতে পারব! ও আর একটু আগে আসতে পারবে না! আবার কবে দেখা হবে, আরো কিছুটা সময় থাকতাম ওর সাথে।

'কি ভাবছ ? আসতে পারবে না ?'

'সাড়ে সাতটা! আমার জন্য একটু আগে আসতে পারছ না ?'

'তোমার জন্যই তো আসছি। ভেবে দেখ আমার গাড়ি এগারটায়, আমি আসছি সাড়ে সাতটায়। বুঝতে পারছি, অত রাত্রে বাইরে বের হওয়া তোমার পক্ষে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে না ?'

'না। অসুবিধা হবে না। আমি আসছি।'

'কোথায় দাঁড়াবে ?'

'হাওড়া বাস স্ট্যাণ্ডে শরৎচন্দ্রের একটা স্ট্যাচু আছে। ওখানে দাঁড়াব।'

'শরৎচন্দ্রের স্ট্যাচু! কোথায় জানি না তো ?'

'হাওড়ায় নেমে কাউকে জিগ্যেস করে নেবে। অত বড় একটা স্ট্যাচু খুঁজে নিতে পারবে না ?'

আহীর হাসছে। 'না বাবা, শরৎচন্দ্রকে খুঁজতে পারব না। আমি তোমাকে খুঁজে নেব।'

'তাহলে তুমিই বল।'

'তুমি তো আমাদের অফিসটা চেন—যেখানে আমাকে খুঁজতে গেছিলে—ওখানে একটা কাফে আছে! জান তো ?'

'আমি ভুলে গেছি। সেই ভদ্রলোক কোথা দিয়ে নিয়ে গেছিলেন মনে নেই।'

'তাহলে স্টেশানে ঢুকেই দেখবে অনেক কিছু জিনিস বিক্রি হচ্ছে। রুমাল তোয়াল আরো কত কি সব—'

'রুমাল তো কত জায়গায় বিক্রি হচ্ছে। এটা আবার দাঁড়াবার জায়গা হল! তার চেয়ে শোন, আমি ন-নাম্বার প্ল্যাটফমে দাঁড়াব।'

'ও—কে-তাই হবে।'

'আহীর—'

'বল।—কি বলবে বল না।'

'তুমি আমার উপর রাগ করনি তো?'

'তোমার উপর রাগ করব! কেন?'

'কবিতা কেমন লাগল?'

'কি বলি বলত! খুব ভালো। ভীষণ ইমোশনাল। কবিতার শেষ দিকটা পড়তে পড়তে—কি বলি—ওটা হাত থেকে পড়ে গেছিল বুকের উপর।'

'ভালো করে ধরনি তাই পড়ে গেছিল।'

'না, তা নয়। আসলে একঘেয়ে চাকরি করতে করতে আমার জীবন থেকে আবেগ হারিয়ে গেছিল। তোমার এ কবিতা—'

'সরি আহীর।'

'সরি বলছ কেন! এটা তোমার ক্রেডিট।'

আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। কিছু বলতে পারছি না। ফোনের দু পারে আমরা দুজনে নিরব। একসময় আহীর বলল, 'সমি—কিছু বল। চুপ করে থেকো না। তোমার কী কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, না কি খুঁজে পাচ্ছ না কি বলবে?'

'কষ্ট হচ্ছে।'

'তাহলে ফোন রাখি?'

'না! না রেখো না।'

'কিছু বলছ না তো তুমি, ধরে থেকে কি করব! কাল এস কথা হবে। রাখি? কি গো হ্যাঁ বল।'

'বললে তো এক্ষুনি ছেড়ে দেবে।'

আহীর হাসছে। আমার একটুও হাসি পাচ্ছে না। ও বলছে, 'ছাড়তে তো আমাদের হবেই সমি!'

'না!'

'কি না?'

'জানি না।'

'তোমার কি হয়েছে বলত?'

'কিচ্ছু না।'

'ঠিক আছে, কাল এস; দেখছি কি হয়েছে। ছাড়ি?'

'আহীর—'

'বল।'

'তুমি আমাকে খুঁজে নেবে তো ?'

'নিশ্চই ! তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি ঠিক খুঁজে নেব। বাই !'

কাকিমার সাথে দেখা না করেই বাড়ি ফিরছি। আমি যেন আমাতে নেই। মনের মাঝে দারুণ অস্থিরতা। আহীরের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক, তারমানে আমার উপর ও রাগ করেনি। আমার ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করেনি। কিন্তু আমি কি করি ! ওকে ছাড়া বাঁচা যে দুর্বিসহ মনে হচ্ছে। কি করি এখন, কে বলে দেবে আমায় ! এই ক দিনেই বাপি মার সঙ্গে আমার একটা কমিউনিকেশান গ্যাপ তৈরী হয়েছে। আমি যেন ওনাদের কথা বুঝতে চাইছি না বা পারছি না। ওনারা জানেন আমি আমার লেখা নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত। প্রায় রোজই ছোটাছুটি করছি বিভিন্ন সম্পাদকের কাছে, লেখাগুলোর একটা সংগতি করার জন্য। বাপিকে বললাম, 'কাল সাড়ে সাতটার সময় এক সম্পাদক ভদ্রলোক আসবেন ওনার সঙ্গে কথা বলতে যাব।'

বাপি অবাক হয়ে বললেন, 'সাড়ে সাতটায় ভদ্রলোক এলে তোর ফিরতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে ! রাত নটা বেজে যাবে !'

আমি নির্বিকার। আজ আমার কণ্ঠস্বরে অনুমতি চাওয়ার সুর নেই। আমি যেন নিশ্চিত আমার যাওয়া সম্বন্ধে। উনি আমার আবভাব দেখে বুঝলেন গুরুত্বটা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন। বার বার বলে দিলেন তাড়াতাড়ি ফিরিস।

বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ি থেকে বের হবার আগে ভাগ্যিস বৃষ্টি আসেনি, তাহলে যাওয়া ভণ্ডুল হয়ে যেত। এখন বৃষ্টি পড়ুক আর বাজ পড়ুক আমার কিছু এসে যায় না। লাইন দিয়ে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আহীর আসতে বলেছিল সাড়ে সাতটায় আমি এসে পৌঁচেছি সাতটায়। কি করব, ঐ সময় বাড়ি থেকে না বের হলে ধরা পড়ে যেতাম। এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকছেন। প্রথমে বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম আমারই আশে পাশে বা পিছনের কাউকে ডাকছেন বোধ হয়। পরে বুঝলাম, না আমিই টার্গেট উক্ত ভদ্রলোকটির। নাহ্, ওকে আর ভদ্রলোক বলা যায় না। যে অচেনা মেয়েদের দিকে কুৎসিত দৃষ্টি নিয়ে ইশারা করে ডাকে সে আর যাই হোক ভদ্রলোক কখনোই নয়। আবার ডাকছে। আহা ! আমি যাব কেন। আমার ভারি বয়ে গেছে। দরকারটা যখন তোমার তুমিই এস। বেশী পাঁয়তাড়া করলে এক চড়ে বাড়ির রাস্তা ভুলেয়ি দেব। আমায় চেন না, অবলা ভাবলে পস্তাতে হবে; ইডিএট। যত দৃষ্টি সরিয়ে নি ততই ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। মহাবিপদ হল তো এই বিচ্ছিরি লোকটাকে নিয়ে ! ঘড়ি দেখছি আটটা বাজে। এক ঘণ্টা হয়ে গেল হাওড়া স্টেশানে দাঁড়িয়ে আছি। কতক্ষণ আর থাকব, এক্ষুনি তো চলে যেতে হবে। আহীর আজও লেট। এক নাম্বারের লেট মাস্টার, আরো কয়েক মিনিট গেল এভাবে। সমুদ্রের এলোপাথাড়ি ঢেউ এর মত চারিদিক থেকে কালো কালো মাথা ওয়ালা ঢেউগুলো যাতায়াত করছে। সেই ঢেউ এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে আহীর। গায়ে অ্যালগি কলারের হাফ-সার্ট। বাঁ কাঁধে লাল রঙের বড় স্পোর্টস্ ব্যাগ। ব্যাগের ভারে একদিকে হেলে

গেছে। দূর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়েছে। মুখে অকৃপণ হাসি. ডান হাতে ধরে আছে নিজের কানটা। আজও তো আমি ওর থেকে ছোট তাহলে এই পাবলিক প্লেসে আমার সামনে কান ধরল কি করে! ওকে ওভাবে কান ধরে আসতে দেখে আমি হাসছি। চালাক ছেলে ; রেজের মধ্যে আসার আগেই শাস্তি মকুব করে নিল!

হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'সরি সমি, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। কটা বাজে গো?'

'আটটা।'

'তুমি কখন এসেছ?'

'সাতটা।'

'ইস্! আমি জানতাম তুমি আগে আসবে। কখন বেরিয়েছি জান বাড়ি থেকে! বাসটা মাঝ রাস্তায় এমন করল—'

'তোমার বন্ধু কোথায়?'

'ও পরে আসবে।'

'তুমি চলে এলে?'

'বারে, আসব না! তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে যে!'

'তুমি আমার জন্য আগে চলে এলে?'

'হ্যাঁ—অ্যা!'

'এটা বোধ হয় ঠিক হল না। কি ভাবল তোমার বন্ধু!'

'ভাবেনি কিছু। তবে জিগ্যেস করছিল—বললাম এক রাইটারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। লেখিকা।'

'য্যাঃ!'

'হ্যাঁ গো—মা জিগ্যেস করছিল, তুই তো কোন বারে এত আগে যাস না—আজ কোথাও যাবি না কি?'

'তুমি কি বললে?'

'বললাম এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাব।'

'বন্ধু নয় ; বান্ধবী বলে দেখতে পারতে তোমার মা কি বলেন।'

ও হাসছে। 'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে! চল কোথাও গিয়ে বসি।'

'কোথায় যাবে?'

'আমাদের সেই অফিসের কাফে যাই চল।'

আমরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছি। সিঁড়ির কাছে এসে চিনতে পারলাম। ও জানতে চাইল, 'প্যাটফর্ম' টিকিট কেটেছ?'

'নিশ্চই। দস্তুর মত লাইন দিয়ে কেটেছি।'

'কাটলে কেন! তোমার তো সেই ভদ্রলোক আছেন।'

'আহা! আমার ভদ্রলোক আবার কি! হাসছ কেন? আরে—হাসছ কেন? ধ্যাৎ। ভাল লাগেনা, আমি রেগে যাচ্ছি কিন্তু।'

'আচ্ছা আচ্ছা আর হাসব না। বোস। কি খাবে বল।' দেওয়ালে টাঙানো খাবারের লম্বা লিস্টটা একধার থেকে পড়ে বলে, 'বল কি খাবে!'

'কেন খাব কেন! আমার খিদে পায়নি। সব সময় খাওয়ার কথা বল কেন বলত! ভাল্ লাগে না।'

'কি ভাল্ লাগে তোমার! মদ খাবে?'

'ওমা! এ কি কথা!'

'এখানে মদ পাওয়া যায় না?'

'জানি না, তুমি জিগ্যেস কর। ঐ তো একজন আসছে।'

লোকটা এসে দুটো জলের গ্লাস নামিয়ে রেখে আহীরের দিকে তাকাল। আহীর একবার ওকে দেখে আমার দিকে তাকাল। ওর মুখ দেখে আমি হেসে ফেলেছি। 'কি নেবে?'

খাওয়ার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেছি। তাই দেখে ও নিচু গলায় বলছে, 'আরে কিছু একটা নাও। এমনি বসে থাকা যায়!'

'কোল্ড ড্রিংস।'

'আবার ঠাণ্ড! কি?'

'পেপসি।'

'একটা পেপসি।' লোকটা চলে গেল।

'একটা বললে কেন?'

'আমি ঠাণ্ডা খাব না।'

'তাহলে অন্য কিছু বলতে পারতে!'

'পরে নিচ্ছি, তুমি খাও না।'

সামনে রাখা গ্লাস থেকে জল খেল।

'আচ্ছা, দিনে তোমার ক পেগ করে লাগে?'

'এতদিনে এই বুঝলে! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না! সত্যি আমি রেগুলার খাই না।'

আমি জানি আহীর সত্যি বলছে। ওকে এতটুকু অবিশ্বাস করতে আমার মন চায় না। তবু বার বার এভাবে বলে ওকে বোঝাতে চাই মদটা আমার কাছে কতটা ঘৃণ্য। পরোক্ষ ভাবে বলতে চাই যেটুকু খাও সেটুকুও খেও না।

'এক পেগ মানে কতটা পরিমাণ জান?'

'না।'

'সিক্সটি এম এল। তোমাকে সত্যিই একদিন খাওয়াব। সামনের বার এসে তোমাকে বারে নিয়ে যাব। অবশ্য তোমার খাওয়াও একটু দরকার।'

'কেন?'

'খেলে স্বাস্থ্য ভালো হয়। তুমি আর একটু মোটা হও। বড্ড রোগা।'

'না, কেন ?'

'কেন কি ! সেদিন বলছিলে না, তোমার বাবা খবরের কাগজ থেকে তোমার জন্য পাত্র—' ও ইচ্ছে করে আমাকে রাগাচ্ছে। চোখ নাচিয়ে কথা বলছে। জানে আমি বিয়ের কথা বললে রেগে যাই।

'ও, বিয়ের বাজারে নিজেকে এক্সপোজ করার জন্য !'

'হেট্, তুমি না ! এক্সপোজ করবে কেন ! ঠিক আছে আর বলব না।'

'রাগ করলে ? সরি।'

ও হাসছে, 'না।'

'তুমি আমার বিয়ের কথা বোল না।'

'বলব না। তুমি খাও।'

'তুমি একটু নাও।'

একটা গ্লাসে খানিকটা ঢেলে এক চুমুক নিয়ে ঠক্ করে গ্লাসটা টেবিলে রেখে বলে, 'এটা মদের মত করে খাব।' আরো দু চুমুক দিয়ে বলে, 'কাল তোমার কি হয়েছিল, ফোনে কথা বলছিলে না কেন ? এই—কি হয়েছিল ?'

আমি হাসছি। ওর ঠোঁটেও চাপা হাসি। চোখে দুষ্টুমি ভরা চাউনি। শয়তান আছে ; সব বুঝতে পারছে তবুও আমার কাছে শুনতে চায়।

'তুমি চিঠি দেবে তো ?'

'নিশ্চই।'

'আমি একটা দিয়েছি।'

'কোথায় ?'

'আগ্রায়।'

'তার মানে, আমার আগেই সে চিঠি আগ্রার দিকে রওনা হয়ে গেছে ? গিয়েই পেয়ে যাব ?'

'না। পরশু পোস্ট করেছি।'

লোকটা এসে কোল্ড ড্রিংস-এর খালি বোতলটা নিয়ে গেল।

'লুচি খাবে ?'

'না।'

'খাওনা খাওনা।' ব্যাগ থেকে টিফিন বক্সটা বের করে। 'খেয়ে দেখ না। তোমার মায়ের মত আমার মা হয়ত ভালো রান্না করতে পারে না।'

'কি করে বুঝলে পারে না। তুমি বুঝি আমার মায়ের রান্না খেয়ে দেখেছ ?'

'আমি খাইনি তুমি খেয়ে দেখ। আজকের ডিনারটা বরং তোমার সাথেই সেরে নি। কখন বাড়ি যাবে বলছ ?'

'ত্ত কিছু বলে আসিনি।'

'তাহলে থেকে যাও আমার সাথে এগারটা পর্যন্ত।'

'এগারটা পর্যন্ত কেন, আমি যদি তোমার সাথে যেতে চাই! তুমি নিয়ে যাবে আমাকে ?'

'কেন নিয়ে যাব না, ভয় দেখাচ্ছ! চল আমার সাথে।'

'আমার বাড়িতে যে কিছু বলা নেই; চিন্তা করবে না!'

'বলে দাও, এখান থেকে তোমার কাকুকে একটা ফোন করে দাও। বল, তোমার বাপিকে খবর দিয়ে দিতে তুমি আগ্রা যাচ্ছ।'

আমার কি ভীষণ ইচ্ছে করছে ওর সাথে চলে যেতে। আহীর যত সহজে কথাটা বলল তত সহজে যদি যেতে পারতাম! আমি জানি, বাপি-মা খুব চিন্তা করছেন। ভাবছেন, মেয়েটা এত রাত পর্যন্ত কোনদিন বাইরে থাকে না। কোথায় আছে কে জানে। অথচ আমার একবারও মনে হচ্ছে না বাড়ি ফিরে যাই। কি দারুণ স্বার্থপর হয়ে গেছি আমি। মনে পড়ছে, টিভিতে সিনেমা দেখার সময় কোন মেয়েকে শশুর ঘরে যেতে দেখে বাপি কেঁদে ফেলেন। চশমার ভিতর দিয়ে চিক্‌চিক্ করে ওঠে জল। বাপির চোখ ভিজে যায়। শুধু শশুর বাড়ি যাওয়া নয়, পিতা পুত্রীর যে কোন আবেগপ্রবন মুহূর্তই বাপির চোখে জল এনে দেয়। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, বাপিকে ছেড়ে কোনদিন কোথাও যাব না। আর আজ সেই বাপিকে ছেড়ে আমি চলে যেতে চাইছি। এতটা পরিবর্তন হয়েছে আমার! এ কি অসম্ভব মেটামরফোসিস্। আমি নিজেকে চিনতে পারছি না। আহীরের দিকে তাকিয়ে আছি। কে এই ছেলেটা! জীবনে কোনদিন ছেলেদের সাথে মিশিনি তা তো নয়। আমার অনেক বন্ধু। বান্ধবীর চাইতে বন্ধুর সংখ্যা যদি বেশী বলি তাহলেও মিথ্যে বলা হবে না। মনে পড়ছে আমার সেই সব বন্ধুদের কথা। যারা এক সময় আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার কথা ভেবেছিল। তারা লেখাপড়া জানে, সুশ্রী, যথেষ্ট পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। কই, তারা তো আমাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। তাদের মুখের উপর না বলতে আমার গলা তো একটুও কাঁপেনি! তবে ওর প্রতি এত ভালোবাসা আমার মনে জমা হচ্ছে কোথা থেকে! কেন ওর প্রতি এত বিশ্বাস! ও আমার কে! হা ঈশ্বর, আমি কি পাগল হয়ে গেছি! তুমি বলে দাও আমি কি করব এখন।

'এই—নেবে তো।'

'প্লীজ, মা দিন রাত খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন করে। তুমিও তাই করবে!'

'আচ্ছা মেয়ে তো, খাওয়ার কথা বললেই রেগে যায়। তোমার কি হয়েছে বলত! কিছু খেতে চাও না, সেই জন্য চেহারার এই হাল। তোমার প্রবলেমটা কোথায়? কি হয়েছে—অরুচি—কিছু খেতে ভাল্‌লাগে না—খালি টক্ খেতে ইচ্ছে হয়—আচার খাবে ?'

কি অসভ্য ছেলে! ডাক্তারাও বোধহয় এভাবে প্রশ্ন করে না। আমিও নির্লজ্জের মত হুঁ হুঁ করে উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।

'চিন্তা কোর না আমার ব্যাগে টক আছে। আগে এটা খাও তারপর দেব।'

আহীর কত কথা বলছে। কাফের বেয়ারাটাকে নিয়ে ইয়ার্কি করছে। সমানে বকে চলেছে। আগ্রার কথা বলছে। হঠাৎ বলে, 'কটা বাজে গো ?'

ঘড়ি দেখলাম. 'নটা পনের।'

'ইস্! অনেক রাত হয়ে গেছে। চল চল তোমার বাড়িতে চিন্তা করছে। তুমি পারবে তো একা যেতে, না আমি যাব তোমার সাথে ?'

'য্যাঃ! সত্যি যাবে ?' আমার হঠাৎ ভীষণ আনন্দ হল। আহীরকে যদি বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম!

'তুমি যেতে না পারলে যাব।'

'থাক, অত উপকার করতে হবে না।'

'স্টেশান থেকে বেরিয়ে সাবওয়ের সিঁড়ি দিয়ে নামছি। বাঁদিকের সিঁড়িটা দিয়ে গেলে একেবারে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে উঠব। কিন্তু আহীর দেখছি ভিড় ঠেলে সামনের সিড়িঁটার দিকে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম ওদিক দিয়েও বোধ হয় যাওয়া যায়। নিজেই সঠিক জানি না তাই চললাম ওর সাথে। ওমা! উপরে উঠে দেখি কোথায় বাস-স্ট্যান্ড! এখনো অনেকটা ঘুরতে হবে। খানিকটা এগিয়ে জিগ্যেস করছে, 'কোথায় গো ?'

এখন আর কোথায় গো বললে কি হবে। চল পাক খাও। চারিদিকে নোংরা জল কাদা পেরিয়ে চলেছি। বাপ্‌রে বলে ব্যাগটা কাঁধ চেঞ্জ করল।

'এইটুকু একটা ব্যাগ নিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ এইটুকু! দেখ না একবার কি রকম ভারি।'

'দুদিন ছাড়াই তো আস, কি নিয়েছ এত ?'

'অনেক কিছু। তোমার বাসস্ট্যান্ড কোথায় বলত! তুমি কি আজও পথ হারিয়েছ ?'

'পথ হারাব কেন, ঐ তো স্ট্যান্ড। তুমিই বা সোজা এলে কেন, বাঁদিক দিয়ে এলেই তো হত। এত ঘুরতে হত না।'

'বাহ্! এখানেও আমার দোষ ?'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে আমি হাসছি। খানিক আগে বৃষ্টি হয়েছে। জল কাদার বৈতরণী পার হতে হতে ও হঠাৎ কেত্তনের মত সুর ভেঁজে গান জুড়ল, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে—'।

স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। আমি কোন কথা বলছি না। ভীষণ ভিড়। আহীর আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মধ্যে একটু বাতাসের ব্যবধান। আমি যেন ওর অলীক স্পর্শ অনুভব করছি। ওর নিঃশ্বাসের তাপে বিগলিত হচ্ছি। আমার ওড়না ওকে ধরে আছে।

'সমি, তুমি সাজোনা কেন ?'

'ভালোলাগে না।'

'কেন ?'

'জানি না।'

'জানি না।' আমাকে ভেঙালো। 'এটা আবার কোন উত্তর হল! ভগবান তোমাদের সাজের কত সুযোগ দিয়েছেন। যেদিকে তাকাও শুধু তোমাদেরই প্রসাধন নজরে পড়ে। আর তুমি; একটু সাজতে পার না!'

'কার জন্য সাজব?'

'নিজের জন্য।'

'নিজেকে অতটা ভালো আমি বাসি না।'

'এবার থেকে বাসবে। ইয়ার্কি না! খালি পাকা পাকা কথা। সময় মত খাওয়া দাওয়া করবে…।'

ও আমাকে শাসন করছে, স্বঅধিকারে।

'আমাকে চিঠি দেবে তো?'

'কেন দেব না! তুমি তখন থেকে এ কথা জিগ্যেস করছ কেন বলত?'

'জানি না। মনে হল তুমি আর নাও দিতে পার।'

ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছে। নিঃশব্দ হাসিতে স্নিগ্ধ ভালোবাসার ছোঁয়া, 'পাগলি; দেব।'

'আবার কবে আসবে?'

'এই মুহূর্তে বলতে পারছি না গো। তুমি তো জান আমার আসার কোন ঠিক নেই। হুট্‌হাট্ চলে আসি। তবে যেদিনই আসি তোমার সাথে অবশ্যই দেখা করব। প্রমিশ।' ব্যাগটা আবার কাঁধ বদল করল।

'কষ্ট হচ্ছে ওটা নিয়ে দাঁড়াতে?'

'নাহ্! এটুকু ভার বইতে পারব।'

ডান দিকে তাকাতেই আমি স্থবির হয়ে গেছি, 'আহীর, আমার বাস—'।

আমি আর কিছু বলতে পারছি না। কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ও আমাকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে, বাস থেকে নেমে রিক্সা করে নিও। হেঁটে বাড়ি ফিরো না কিন্তু। কি গো, শুনতে পাচ্ছ? রিক্সা করবে তো?'

'দেখব।'

'না, দেখব আবার কি!'

'দরকার হলে করব।'

'দরকার হলে নয়, অবশ্যই করবে। এত রাত্রে হেঁটে বাড়ি যেও না। প্লীজ রিক্স নিও। প্রমিশ, প্রমিশ কর। কি হল!'

আমার গলা দিয়ে কথা সরছে না। সব কথা তালগোল পাকাচ্ছে কণ্ঠনালীতে এসে। কি বলি! আমার শব্দ হারিয়ে গেছে। বোকার মত তাকিয়ে আছি আহীরের দিকে।

'যাও। বাস ছেড়ে দিচ্ছে। সাবধানে যেও।'

আমি বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছি পিছন ফিরে। আহীর ইশারা করে আমাকে চিঠি লেখার কথা বলছে। আমি কোন রেসপনস্ করছি না। শুধু তাকিয়ে আছি। আহীরকে আঁকড়ে ধরতে চাইছি দু চোখ দিয়ে। জোর করে বেঁধে রাখতে চাইছি আমার কাছে। অবুঝ চাওয়ার যা পরিণতি হয় আমারও তাই হল। এক সময় দৃষ্টির বাইরে চলে গেল আহীর। আমি ভিড় বাসে দাঁড়িয়ে আছি। এক অপূরোনীয় শূন্যতা গ্রাস করেছে আমায়। আহীরের মুখটা মনে করতে পারছি না। ওর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি। কি আশ্চর্য, ও এভাবে আমার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কেন! আমি তো এতক্ষন ধরে দেখলাম ওকে। তাও মনে করতে পারছি না কেন! ওর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি। কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট অবয়ব নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। সেই ঘুমের মাঝে দেখা মূর্তিটার মত। আহীর কি তাহলে আমার ঘুমের রাজ্যে আত্মগোপন করল!

তাই হোক। সেখানে আমি স্বাধীন। কোন প্রতিবন্ধক, কোন নিষেধের গন্ডী নেই সেখানে। কোন লৌকিকতার পরোয়া করতে হয় না। আছে শুধু অবাধ স্বাধীনতা। সেখানে আহীরকে ভালোবাসতে আহীরের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় না। সেখানেই বরং আমি ঘর বাঁধি। কেউ ভাঙতে পারবে না আমার সে ঘর। তুমিও না। তুমি ফিরে যাও তোমার দুনিয়ায়। আমার স্বপ্নই ভালো—চাইনা বাস্তব।

কিন্তু বাস্তব যে আমার সামনে। বাপি দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছেন এদিকে। এখনো দেখতে পাননি আমাকে। বাস থেকে নেমে আমি হাঁটতে শুরু করেছি। রিক্সর কথা মনেই নেই। হাত তিনেক দূরত্বে আমাকে দেখেই থমকে গেলেন, 'ওফ্! ধন্য মেয়ে বলিহারি! এই বাড়ি ফেরার সময় হল! খুব সাহস হয়ে গেছে তোর। কোন্ মেয়েটা তোর মত রাত দশটার সময় বাড়ি ফিরছে বলত... !'

বাপির মুখের দিকে তাকিয়ে এ কথাগুলো শোনার সাহস আমার নেই। মাথা নিচু করে আছি, সারা রাস্তা আর কোন কথা বললেন না। আমিও নিরবে বাপির পিছন পিছন গেলাম। আমার ফিরতে দেরি দেখে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে মারও ক্ষোভের মুখোমুখি হলাম। আমি কিছু বলছি না। বলতে ইচ্ছে করছে না। আর বলবই বা কি! জানি তো আমি অপরাধী। এ বকুনি আমার ন্যায্য পাওনা। ফ্রেস হয়ে সোজা বিছানায় চলে গেলাম। তাই দেখে মা আরো রেগে গেলেন। 'শুয়ে পড়লি যে! খাবি না?'

'না, খেয়ে এসেছি।'

'কি খেয়েছিস?'

'যাই খাই! আর খিদে নেই। খাব না।'

আমার বিরক্ত মিশ্রিত উত্তর শুনে মা আর কিছু বললেন না। বাপিকে খাবার দিচ্ছেন। আমি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছি। আমায় শনি ভর করেছে। না, তার চেয়ে বরং বলি আহীর আমাকে হিপ্নোটাইজড্ করেছে। যার এফেক্ট শনির

ভয়ের চাইতেও মারাত্মক। এই মুহূর্তে আমি আউট অফ্ কন্ট্রোল অফ্ মাই পেরেন্টস্।

একটা সপ্তাহ কেটে গেল। আজ শনিবার। সন্ধ্যে থেকেই মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। ছবির মত এক এক করে ভেসে উঠছে গত সপ্তাহের সব ঘটনা। কেটে গেছে ছ ছটা দিন। সপ্তাহ ঘুরে মুখোমুখি হয়েছি আর একটা শনিবারের। এমনই একটা দিনে তুমি আমাকে রেখে চলে গিয়েছ। টিক্ টিক্ শব্দ করে ঘড়ির কাঁটাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই সময় জন বহুল প্ল্যাটফর্মে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। ঐ অসম্ভব ভিড়ের মধ্যেও আমি একা। আমার চারপাশে বিরাজ করছে এক অখণ্ড নিরবতা। এক দুর্ভেদ্য কাঁচের দেওয়াল, যে দেওয়াল ভেদ করে কোন পার্থিব শব্দই পৌঁছতে পারছিল না আমার কাছে। শুধু নিজের ভিতর থেকে গুমরে গুমরে উঠছিল হাতুড়ি পেটার শব্দ। যে শব্দের প্রতিধ্বনি কাঁচের ঘেরাটোপে ধাক্কা খেয়ে আঘাত হানছিল আমারই বুকে। দেখলাম, লাগেজের ভারে হেলে পড়া এক যুবক হাসি মুখে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। অপরাধীর ভঙ্গিমায় বাঁহাতে ধরে আছে নিজের কানটা। না হেসে পারলাম না। দেরি করে আসার শাস্তিটা মুকুব করে নিল অত্যন্ত কৌশলে। তুমি আমার জন্য এসেছ, তোমার সময়ের অনেক অনেক আগে, শুধু আমার জন্য। হ্যাঁ, এমনটিই তো বলেছিলে ফোনে। আমি কিন্তু তোমার জন্য আসিনি। এসেছি নিজের জন্য। কথাটা স্বার্থপরের মত হলেও সত্যি। এসেছি তোমাকে একবারটি দেখব বলে। জানি না এ দেখাই শেষ দেখা কি না। তাইতো শিল্পীর সাথে গলা মিলিয়ে গাইতে পারছি না—'আবার হবে তো দেখা। এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো…।' কারণ তোমার মনের ঠিকানার খোঁজ পাইনি আমি। এটা আমার অক্ষমতা বলতে পার। তাই তো তুমি রয়ে গেছ আমার নাগালের বাইরে। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে বুঝতে পারলাম আমি নিজেকে হারিয়ে এসেছি। এখন তো ক্লান্ত পদক্ষেপে নিজের শব নিজেই কাঁধে করে বয়ে বেড়াচ্ছি। আত্মার নিরবিচ্ছিন্ন আনাগোনা চলেছে দিল্লীর রাজপথে, আগ্রার অলিতে গলিতে, তাজমহলের শান্ত ছায়ায় অথবা সাজাহানের সমাধি পরে। রাত জাগা চোখ দুটোতে ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে রঙিন স্বপ্নের ভিড়গুলো। কেবলই মনে হচ্ছে জীবনের খেলা ভাঙার খেলা বুঝি শুরু হয়ে গেছে। আমার কল্পনা জগতের ফুল পাখিরা নিরব হয়ে আসছে ক্রমাগত। বিছানার সাথে মিশে থাকা শরীরটা উদাসীন চোখে তাকিয়ে আছে তোমার ছবিটার দিকে। এখন তো তোমার ছবি আর চিঠিগুলোই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আমি যেন কোমায় আচ্ছন্ন। রূপকথার রাক্ষসপুরীতে বন্দী রাজকুমারীর মতই অসহায়। মাথার কাছে রাখা আছে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি। সে কাঠির ছোঁয়ায় রাজকুমারীর ঘুম ভাঙাতে তুমি কি ফিরে আসবে আহীর। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি এস। ফিরে এস আবার।

'সমি—এই অসময়ে শুয়ে আছিস কেন?'

মা। আমি ঝট্পট্ আহীরের ছবিটা লুকিয়ে ফেললাম।

'এই জন্য তোর এত শরীর খারাপ করে। সব সময় অলসের মত শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছিস।'

এখন শুধু টিউশনি যাওয়া আর বেঁচে থাকার জন্য শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো করা ছাড়া আর কিছু করি না। হ্যাঁ, সন্ধ্যে থেকে টিভি খুলে বসে থাকি। এটা আমার মারাত্মক নেশা। আপাতত লেখা, অ্যাকটিং ক্লাসে যাওয়া, কম্পিউটার সব বন্ধ। অ্যাকটিং কোর্স কমপ্লিট; তবুও এক্সট্রা ক্লাস করতে যেতাম। এখন সেটাও বন্ধ। ভালোলাগে না কোথাও যেতে। এনার্জি পাই না।

ঠান্ডা হাতের স্পর্শে চোখ মেলে তাকালাম। বাপি। আমার মাথার কাছে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। জিগ্যেস করছেন—

'কি হয়েছে রে! শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'তাহলে শুয়ে আছিস কেন?'

'ভাল্‌লাগছে না।'

'কেন ভাল্‌লাগছে না সেটা বলবি তো!'

বাপির আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে খেলা করছে। আমার ঘুম আসছে। বাপির আদরে সব অস্থিরতা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বাচ্চা মেয়ের মত কুঁকড়ে পড়ে আছি। শুনেছি, বাবা মার কাছে সন্তান না কি কখনো বড় হয় না। অন্য সন্তানদের কথা জানি না, আমি জানি নিজের কথা। এখনো বাপি মার আদর খেলে এই বয়সেও মনে হয় আমি সেই ছোট্ট শিশুটা আছি। বাপি এক্ষুণি আমাকে কোলে করে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবেন। সেই ছোট্টবেলা থেকে আজ পর্যন্ত একটা ব্যাপার আমি ভীষণভাবে অনুভব করি, বাপি বা মা আদর করলে খুব বাঁচতে ইচ্ছে হয়। আমার মনে হয়, কোন ক্যানসারগ্রস্ত মানুষ যদি তার বাবা মার বুকে মুখ একটু আদর পায় তাহলে বোধ হয় সে ভুলে যেতে পারে তার যন্ত্রণার কথা। আমি নিশ্চিত, কোন আত্মহননকারী যদি এই অপত্য আদরে অবগাহন করার সুযোগ পায় তাহলে সে তার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য। কোন মৃত্যু পথযাত্রী সন্তান যদি শেষ মুহূর্তে এই নিরাপদ আশ্রয়ের স্নেহ ছায়ায় বেষ্টিত থাকে তাহলে তার মন থেকে মুছে যাবে মৃত্যু ভয়।

'বাপি, এই বাপি; বাপি—'

বাপি আমাকে ডাকছেন। মাঝে মাঝে আদর করে বাপি বলেই ডাকেন। আমি শুনতে পাচ্ছি। ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছি না। সাড়া দিলে তো আর ডাকবেন না। আমার খুব ভালোলাগছে এ ডাক শুনতে, পড়ে পড়ে আদর খেতে।

'উঠে পড়। একটু ছাতে যা তো দেখি। আর শুয়ে থাকিস না। ওঠ। কি যে করব তোকে নিয়ে! কিছু খেতে চাইবি না। শরীরটার কি অবস্থা করেছিস। ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন। ঐ ভদ্রলোক কি বললেন শুনলি তো! যা যা খেতে বলেছেন তুই তো তার কিছু খাস না। এ রকম করলে শরীর টেকে!'

আমার অ্যানিমিয়া হয়েছে। এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়। এ আমার অনেক

দিনকার সম্পত্তি। ব্যারোমিটারের পারদের মত মাঝে মাঝে ওঠা নামা করে এই আর কি। মনে পড়ছে, আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি হয়েছিল। যেখানে সেখানে যখন তখন ফেন্ট হয়ে যেতাম। খাওয়ার ইচ্ছে বা খিদে বলে কিছু ছিল না। সেই সময় একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। আমার লেখার অভ্যাস অনেক ছোটবেলা থেকে তাই তখন ভেবেছিলাম যদি কোনদিন অটোবায়োগ্রাফি লিখি তো এ ঘটনার কথা অবশ্যই উল্লেখ করব। তাই আজ এ কাহিনীকে উপেক্ষা করে যেতে পারছি না। সেদিন নিজেকে যে কথা দিয়েছিলাম আজ সেই কথা রাখতেই এ বিবৃতি দিতে বসেছি—

"এইচ. এস. পরীক্ষার আর মাত্র ক মাস বাকি। সামনে পরীক্ষা। প্রচণ্ড শরীর খারাপ। বাপি তাড়াহুড়ো করে নিয়ে গলেন এক ডাক্তারের কাছে। আমার সমস্যা আমি যদি ঠিক মত বলতে না পারি তাই মাও গেলেন আমায় সাথে। ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে মা এ টু জেড সব বললেন। সবকিছু শুনে উনি মাকে বললেন, 'আপনি একটু বাইরে গিয়ে বসুন, আমি দেখছি।'

তারপর উনি আমার চেকআপ করে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমিও ভাইভা টেস্টের মত পর পর উত্তর দিয়ে যাচ্ছি।

প্রথম প্রশ্ন, 'তুমি পড়াশুনা কর তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিসে পড়?'

'এবারে এইচ. এস. দেব।'

'তুমি কলেজে পড়? কোয়েড কলেজ?'

'ডে সেকশানটা কোয়েড। আমি মর্নিং-এ পড়ি, শুধু গার্লস্।'

'তোমার ছেলে বন্ধু আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে বৈকি। অনেক আছে।' আমি কলেজে ইউনিয়ান করতাম, তাই ছেলেদের সাথে ওঠা বসা করাটা অসম্ভব নয়।

'আমি অনেকের কথা বলছি না। স্পেশাল কোন ছেলে বন্ধু আছে?'

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম ওনার বক্তব্যটা। ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না তো, এমন কেউ নেই।'

'আমার কাছে লুকিয়ো না। জান তোমার কি হয়েছে?'

এরকম গুরুগম্ভীর কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেছি। হ্যাবলার মত ঘাড় নেড়ে বলছি জানি না।

'তুমি তিন মাসের প্রেগনেন্ট।'

কথাটা শুনেই আমি ফিক্ করে হেসে ফেললাম। পরক্ষনেই গম্ভীর হয়ে ভাবছি আমার হাসাটা বোধ হয় উচিত হয়নি। ডাক্তার মনে হয় রেগে গেলেন। কি করব হাসি পেয়ে গেল তো!

'তুমি হাসছ ! তোমার সাহস তো কম না !'

আমাকে ধমকাচ্ছে। কি আশ্চর্য, আমার কি দোষ !

'নামো ওখান থেকে।'

এক বুক উঁচু চওড়া বেঞ্চটাতে বসে এতক্ষণ পা দুলিয়ে দুলিয়ে ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম। ধমক খেয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে নিচে নামলাম।

'মাকে ডাক।' ডাক্তারবাবুর নির্দেশ পেয়ে কেবিনের দরজাটা একটু খুলে মুখটা বের করে মাকে ডাকলাম। মা ভিতরে আসতে ডাক্তার খস্ খস্ করে ছোট্ট কাগজে কি একটা লিখে মার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনি এখানে গিয়ে যোগাযোগ করুন সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার মেয়ের কোন ছেলে বন্ধু আছে ?'

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ আছে ?'

'ও তিন মাসের প্রেগনেন্ট।'

কি আশ্চর্য ! মাও হাসছেন। ঠিক হয়েছে, তখন আমি হেসে ফেলেছিলাম বলে আমাকে ধমকালেন। এবার কি করবেন, মাকে ধমকাবেন ! তাহলে আমি আপনাকে ধমকে দেব। ইয়ার্কি ! তামাসা করার জায়গা পাননি না ! মাকে হাসতে দেখে ডাক্তারবাবু থ হয়ে গেছেন। মা শান্ত ভাবে বললেন—

'না না, আপনার বোধ হয় কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'দেখুন চিন্তা করার কিছু নেই ! এই ঠিকানায় ওকে নিয়ে যান কোন জানাজানি হবার ভয় নেই।'

এতক্ষণে বুঝলাম মার হাতের ঐ কাগজটায় কোন অ্যাবরসন ক্লিনিক-এর ঠিকানা লেখা। মা কাগজটা ডাক্তারের টেবিলে রেখে দিয়ে বললেন, 'এর কোন দরকার নেই—'

মাকে বলতে না দিয়ে ডাক্তার আবার শুরু করলেন, 'ভয় পাবেন না।' মার মুখ দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না মা ভয় পেয়েছেন। 'সবে মাত্র শুরু। প্রাইমারি স্টেজে—'

'ডাক্তারবাবু আপনি ভুল করছেন। আপনি যা ভাবছেন তা মোটেও নয়।'

'দেখুন আমি ডাক্তার—'

'হতে পারেন আপনি ডাক্তার। কিন্তু আমি ওর মা। আমি জানি আমার মেয়ে কেমন। আর এও জানি ওর কি হয়েছে। বেশ কিছু দিন ধরে ও অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। এমনিতে ওর খাওয়া ভীষণ অল্প। তার উপর মর্নিং-এ কলেজ করে। সকাল পাঁচটায় খেয়ে যায় বেলা একটায় এসে খায়। এই দীর্ঘ সময়টা না খেয়ে কাটায়। কোনদিন ইচ্ছে হলে বন্ধুদের সাথে ক্যান্টিনে কি সব উল্টো-পাল্টা খায়। টিফিন করে দিয়ে দেখেছি নিয়ে যেতে চায় না। বড় হয়ে গেছি বলে ফেলে রেখে চলে যায়। গত দু বছর ধরে এই চলে আসছে। ওর শরীরে রক্ত নেই। আর রক্ত না থাকলে—জানেনই তো।'

মাকে এরকম ফুল কন্‌ফিডেন্সের সঙ্গে ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলতে দেখে ডাক্তার-বাবু একটু দমে গেছেন।

'না, আমি কনফার্মলি কিছু বলছি না। আমার ডাউট আছে। সেভাবে তো চেকআপ করতে পারলাম না। তবে ইউরিনটা একবার টেস্ট করিয়ে নেবেন।'

'নেব। এখন তো সাধারণ জ্বর সর্দিতেও ডাক্তার ইউরিন ব্লাড টেস্ট করতে বলেন। আয়।'

মা আমার হাত ধরে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন। ডাক্তার সেই কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যান কাজে লাগতে পারে।'

আমি ডাক্তারের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে হেসে বললাম, 'দরকার পড়লে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাব। এখন এটা এখানেই থাক।'

টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বেরিয়ে এলাম মার সাথে। আমাদের বের হতে দেখে বাপি এগিয়ে এলেন। মা তখনো হাসছেন। এর পর বাপি মার মধ্যে এ নিয়ে কি কথা হয়েছে আমি জানি না। পরে শুনেছিলাম বাপি না কি বলেছেন দরকার নেই অমন ডাক্তারের কাছে গিয়ে।

কিন্তু আমি ব্যাপারটা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারলাম না। একজন ডাক্তার এতবড় ভুল করবেন! মনের মধ্যে কথাটা পাক খাচ্ছে। ভাবছি ডাক্তারের কথা যদি সত্যি হয় তো হেভি হবে। মডার্ন সায়েন্স-এ একটা মিরাক্‌ল হবে। আমাকে নিয়ে কত রকম এক্সপেরিমেন্ট হবে। একক মাদারের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি অমর হয়ে যাব। খবরের কাগজে আমার ছবি ছাপা হবে। সবাই দেখবে, আমার বন্ধুরাও। অনেকে হয়ত নাক তুলবে। তা তুলুক। আমার মত ক্রেডিট কজনার! এবার আমি সত্যি সত্যি ভি. আই. পি. হয়ে যাব। সার্থক হবে আমার স্বপ্ন। সেভাবে ট্রাই করলে গিনেস বুকে নামটা তোলা কোন প্রবলেম হবে না। ভাবতেই মজা লাগছে। কাউকে বলতে ইচ্ছে করছে। কাকে বলি! ছেলের বাপ থাকলে তাকে না হয় বলা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা তো হবার নয়। আর যতই হোক মার সাথে এসব কথা বলা যায় না। কেমন যেন লজ্জা করে। ভাবছি, এই খুশির খবরটা কাকে বলা যায়। সোনামার কথা মনে পড়ছে। হ্যাঁ, সোনামাকে বলা যেতে পারে। বললামও। সব শুনে সোনামা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস মনি। এও কি সম্ভব! সায়েন্স নিয়ে পড়ছিস আর এই কমন সেন্সটুকু তোর নেই!'

'কেন হয় না? এক্‌সেপশনাল কিছু ঘটতেও তো পারে।'

'রাখ তোর এক্‌সেপশনাল। উন্মাদের মত কথা বলিস না তো।'

ধুর! সোনামার কথা শুনে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আর কিছু না হোক নিদেন পক্ষে একটা খেলার সাথী তো পাওয়া যেত! সে খুশীতে ছাই পড়ল।

'মনি, এ কথা আর কাকে বলেছিস?'

'কাউকে না।'

'আর কাউকে বলিস না।'

'কেন ?'

'যাকে বলবি সেই তোকে খারাপ মেয়ে ভাববে। কেউ বিশ্বাস করবে না তোর কথা।'

'তুমি তো কই খারাপ ভাবলে না!'

'আমি তো তোর মা না কি! মা কখনো মেয়েকে খারাপ ভাবতে পারে!' সোনা মা আমাকে আদর করছেন, 'তোর শরীর ভীষণ খারাপ মনি। একটু খাওয়া দাওয়া কর। একা একা রাস্তা ঘাটে আর যাতায়াত করিস না। বাপিকে বল অন্য কোন ভালো ডাক্তার দেখাতে। ঐ মুখপোড়া ডাক্তারের কাছে আর যাস না।'

আমি ঘরে ফিরে আবার সেই কথায় ফিরে এলাম, 'আচ্ছা সোনা মা, ডাক্তার তাহলে ও রকম কথা বলল কেন?'

'ভুল বলেছে। ডাক্তার বলে কি সে ভুল করতে পারে না! দেবতা না কি! তুই জানিস না মনি, আমাদের সমাজে কুমারী মা-দের কি চোখে দেখা হয়। কি যে কলঙ্ক সে যে হয়েছে সেই জানে। তোর জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হলে আত্মহত্যা করত। আর তুই দাঁত বের করে বলতে এসেছিস গিনেস বুকে নাম তুলবি। পাগলি কোথাকার!'

সোনা মা হাসছেন। আমিও হাসছি।

'আমি শুধু ভাবছি ঐ আহাম্মক ডাক্তারটার কথা; পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে একটা অবিবাহিত মেয়েকে এরকম কথা বলা মোটেই উচিত হয়নি। এর থেকে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারত।'

'আসলে আমার সিমটমসগুলো একজন প্রেগনেন্ট মহিলার সঙ্গে একেবারে মিলে গেছে—'

'যতই মিলে যাক, ওপর ওপর সিমটমস দেখে এতবড় সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেবে! হাতে অ্যাবরসন ক্লিনিকের ঠিকানা ধরিয়ে দেবে! তুই-ই বল না, এর আগেও তো একবার তোর এরকম হয়েছিল। এতটা বাড়াবাড়ি হয়নি ঠিকই, কিন্তু তখনো তো তোর বমি বমি পেত, খেতে পারতিস না, মাথা ঘুরত। শরীর দুর্বল থেকে এগুলো হয়। খাওয়ার এই ছিরি হলে আর কি হবে! ভোগো এবার।'

পরে সোনা মার কাছে শুনেছি। ভাই সবকিছু শুনে বলেছে, 'তোমরা ঐ গাড়োল ডাক্তারের নামটা একবার বল। বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে শালাকে পেঁদিয়ে তক্তা করে দিয়ে আসি। মামদোবাজি পেয়েছে! অতবড় কথাটা বলার সাহস ওর হল কি করে!' সোনা মা অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করেছিলেন।"

* * *

আমি আর তিলক টিভিতে সিনেমা দেখছি। হিন্দী ফিল্ম। তিলক আমার মামাতো ভাই; বেড়াতে এসেছে এখানে। কিছুতেই মন দিতে পারছি না সিনেমায়। আজ

তের তারিখ। ঠিক এক মাস আগে সব প্রতীক্ষার অবশান ঘটিয়ে আহীর এসেছিল আমার কাছে। সকাল থেকেই বিভোর হয়ে আছি সেই খেয়ালে। সিনেমায় নায়ক নায়িকার প্রাথমিক মিলন পর্ব শেষে বিরহ পর্ব চলছে। আমার মনটা আরো খারাপ করে দিচ্ছে। আজকাল এরকম হয়। সিনেমায় আনন্দ, খুশী, গান, শান্তি, মজা এই সব পর্বগুলো যখন চলে তখন কিছু মনে হয় না; কিন্তু দুজন ভালোবাসার মানুষ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেই মনের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় আহীরকে আমাব কাছ থেকে কেউ দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোকার মত কান্না পায়, নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না ওটা অভিনয়, সাজানো গোছানো ব্যাপার। মিথ্যে ঘটনার সাথে নিজেকে জড়িয়ে কষ্ট পাই। কষ্ট হচ্ছে তবু দেখছি। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আহীরের সাথে আজ কথা বলব। ইয়েস। আমার এই অস্থিরতা একমাত্র ওই শান্ত করতে পারবে। সন্ধ্যে বেলাই বেরিয়ে পড়লাম। বাড়িতে বললাম, 'আমি যেখানে লেখা পাঠিয়েছি সেখানে একটা ফোন করব।'

আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পনের হেঁটে এস. টি. ডি. বুথ। কাঁচের ঘরে ঢুকে নাম্বার মিলিয়ে ডায়াল করলাম। ওপারে রিং হচ্ছে। বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুরু দুরু করছে। ভয় নয়, আনন্দ মিশ্রিত একটা উত্তেজনা কাজ করছে আমার মধ্যে। অপেক্ষা করছি আহীরের কণ্ঠস্বরের জন্য। কয়েক সেকেন্ড পর রিং বন্ধ হল।

'হ্যালো'—পুরুষ কণ্ঠ।

'হ্যালো—ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স?'

'ইয়েস।'

ম্যায়, আহীর বাসু সে বাত করনা চাহ্‌তি হুঁ। বুলা দেঙ্গে প্লীজ?'

'কনু?'

'মিস্টার আহীর বাসু। র‍্যাডার ডিপার্টমেন্ট মে কাম করতে হ্যায়।'

'আপ কাঁহাসে বোল রহে হ্যায়?'

'ওয়েস্টবেঙ্গল সে।'

'কাঁহা সে?'

শালা কালা না কি রে! 'কলকাত্তা সে।'

'আপকা নাম?'

'কুহেলি।'

'ঠিক হ্যায়, আপ হোল্ড কিজীয়ে ম্যায় দেখতা হুঁ।'

'সুক্রিয়া।' কয়েক সেকেন্ড পর ফিরে এল।

'হ্যালো—আপ দশ মিনিট বাদ ফোন কিজীয়ে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এলাম। কাউন্টারের ছেলেটা খচ্‌ করে বিলটা ছিড়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। বিল দেখে আমার চক্ষু ছানাবড়া! সর্বনাশ, সিক্সটি ফোর!

'দাদা, এই ক মিনিটে এত বিল!'

'কোথায় ফোন করেছিলেন ?'

'আগ্রা।'

'তাহলে তো হবেই।'

'কিন্তু সাতটার পর তো চার্জ কম হয়।'

'হ্যাঁ, কটা বাজে এখন ?' নিজের হাত ঘড়ি দেখে, 'সবে সাতটা বাজছে।'

আমিও নিজের ঘড়ি দেখলাম। 'সরি—কিন্তু আমার তো কাজই হল না। দশ মিনিট পর আবার রিং করতে বলল। আর আমার কাছে বোধ হয় বেশী পয়সাও নেই।'

'ঠিক আছে আপনি ফোন করুন না।'

কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। যাক্ ফিরে যেতে হবে না। সিক্সটি ফোর রুপিজ ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গোটা ব্যাগ হাতড়ে দেখছি আর কত আছে। সব ঝেড়ে ঝুড়ে হাতে ঠেকল মাত্র তের টাকা। আমার হাসি পাচ্ছে। হোয়াট এ কোইন্সিডেন্স! বার কিংবা চোদ্দ টাকা হতে পারত। কিন্তু তের হল। এই তের সংখ্যাটা যেন তোমার পিছু ছাড়ছে না। তবে এই তের টাকার বিনিময়ে আহীরের সাথে কথা বলে পোশাবে না। এতো শুধু হ্যালো বলতেই খতম হয়ে যাবে। কি করা যায়। এখন বাড়ি গিয়ে টাকা নিয়ে আসা অসম্ভব ব্যাপার। বাপিকে কি বাহানা দেখাব! কাছে পিঠে কোন বন্ধুর বাড়িও নেই যে নিয়ে আসব। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি বেশ হেসে হেসে কথা বলছে সকলের সাথে। ভাবছি যেমন করেই হোক ম্যানেজ করতে হবে। দূর! যা হয় হবে দেখা যাবে। বেশী বেগোড়বাই করলে ঘড়িটা খুলে দিয়ে যাব। কাল টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। হাতে ধরে থাকা পয়সা ব্যাগে রেখে অপেক্ষা করছি। দশ মিনিট পর আবার ডায়াল করলাম। এনগেজ টোন আসছে। বার দুই ট্রাই করলাম, একই প্রবলেম। কাউন্টারের ছেলেটা বুঝতে পেরে ইশারা করে নাম্বার জানতে চাইল। বললাম। এবার রিং হচ্ছে। রিসিভার তুলল অন্য এক জন। তারপরই আহীরের গলা, 'হ্যালো।'

'হ্যালো আহীর ?'

'ইয়েস।'

'আমি কে বলত ?'

'আমি জানি তুমি কে।'

'আমি কুহেলি।'

'আই নিউ ইট। কেমন আছ বল।'

'যেমন রেখে গেছ।'

ও হাসছে, 'তোমার চিঠি পেয়েছি।'

'তাহলে তুমি চিঠি দাওনি কেন ?'

'বিশ্বাস কর, এ চিঠির কি উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। আমি অভিভূত।

আমার জন্য কেউ এমন চিঠি লিখতে পারে ভাবিনি। সত্যিই বুঝতে পারছি না কি লিখব।'

'তাহলে লিখো না। দিতে হবে না চিঠি।'

'ও কথা বোল না। দেব। আজ পার্টি আছে, হবে না। কালই লিখব। কিন্তু আমি নিরুপায় সমি।'

নিরুপায় !! আমি ওকে কি বলেছি যে ও নিরুপায় বলল! আমি কি অসম্ভব কিছু চেয়ে ফেলেছি! তা কেন হবে! আমি তো ওর কাছে নতুন করে কিছু চাইনি, একান্তই নিজের কথাগুলো কনফেস করেছি মাত্র।

'হ্যালো—হ্যালো—'

'শুনেছি।'

'কি ব্যাপার ?'

'কেমন আছ তুমি ?'

'ভালোই। ফিজিক্যালি ফিট্ মেণ্টালি ডিস্ব্যালেন্সট'।

'আমার জন্য ?'

'জানি না।'

আমি জানি। আমার চিঠিটাই ওকে মেণ্টালি ডিস্ব্যালেন্সট করছে। কিন্তু সে কথা আহীর স্পষ্ট করে বলতে পারছে না কেন!

'আই অ্যাম সরি আহীর।'

'তুমি এখন ফোন করলে কেন! কত বিল হবে জান ?'

'জানি, অলরেডি সিক্সটি ফোর দিয়ে দিয়েছি।'

'নটার পর করতে পারতে।'

'অত রাত্রে এতদূরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'শোন, তুমি ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করছ তো ? যত্ন নিচ্ছ নিজের প্রতি ?'

'এগুলো আমার নিজস্ব ব্যাপার। বাদ দাও এসব।'

'কেন বাদ দেব! তোমার নিজস্ব ব্যাপারে আমি কথা বলতে পারি না ?

আমি নিজেই জানি না আমি কি বলছি। ছোট্ট একটা শব্দ, নিরুপায়। এই শব্দটাই আমাকে কি ভীষণ আঘাত করেছে। কেন জানি না অপমানিত বোধ করছি। ছোট লাগছে নিজেকে। কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না আর।

'সমি কথা বল, বিল উঠছে কিন্তু প্রচণ্ড।'

'উঠুক, বিলটাতো আমি দেব।'

'তা দেবে। এই শোন, সে দিন বাড়ি যেতে তোমার কোন অসুবিধা হয়নি তো ?

'না।'

'আর বাপি কিছু বলেন নি ?'

'তেমন কিছু না। একটু বকলেন—'

'ইস্, আমার জন্য বকুনি খেলে তো!'

'ওটা আমার ব্যাপার, তুমি ভেব না। ছাড়ছি।'

'ও কে. শোন—নিজের দিকে খেয়াল রেখ প্লীজ। শুনছ?'

'হ্যাঁ।'

'বাই। গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেলাম। আমিও ফোন রেখে বেরিয়ে এলাম। আগের মত ছেলেটা বিল এগিয়ে দিল। একশ বাইশ টাকা। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'দেখুন আমার কাছে মাত্র তের টাকা আছে। ফোন করাটা খুব এসেনশিয়্যাল ছিল, তা না হলে চলে যেতাম।'

'ঠিক আছে ওটাই দিন, বাকিটা পরে দিয়ে যাবেন।'

'থ্যাংকইউ! আমি ঠিক দিয়ে যাব। আপনি আমার নাম ঠিকানাটা লিখে নিন।'

'না না, ঠিকানার দরকার নেই। আপনি নামটা বলুন, এখানে লিখে রাখি। আমি যদি না থাকি—অন্য কেউ থাকলে আপনি নামটা বলবেন অসুবিধা হবে না।'

'কুহেলি, কুহেলি সান্যাল। কাল সকালেই দিয়ে যাব। প্লীজ ট্রাস্ট মী।'

'আরে—ঠিক আছে! কোন ব্যাপার না। সকালেই আসতে হবে কেন, যখন এদিকে আসবেন তখন দিয়ে গেলে হবে।'

'থ্যাংকইউ। থ্যাংকইউ ভেরি মাচ।'

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে মনে হচ্ছে থমকে গেছে আমার জীবন। ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু নেই। এতদিনের সব স্বপ্ন, সব কল্পনা গুলোকে নিমেষে মুছে দিল আহীরের কণ্ঠে ঐ নিরুপায় শব্দটা। আহীরের নিরুপায়তার গর্ভে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে আমার অতীত আমার ভবিষ্যৎ। আর বর্তমান; যন্ত্রণার কাঁটায় জর্জরিত হয়ে আমাকে রক্তাক্ত করছে। এ রক্ত ঝরা বর্তমান নিয়ে আমি কি করব! আমি কাঁদছি। আলো আঁধারি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি বাড়ির দিকে। যেতে ইচ্ছে করছে না। পা টানছে অচেনা কোন পথের দিকে। মনে হচ্ছে পালিয়ে যাই কোথাও। যেখানে আমাকে কেউ চেনে না। একেবারে পরিচিত দুনিয়ার বাইরে। আমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। আহীর কেন বলল নিরুপায়? আমি কি ওকে বলেছি তুমি আমায় বিয়ে কর! কখনোই না। একবারও বলিনি সে কথা। আত্মঅহংকারকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে কোন পুরুষের কাছে সোঁপে দেওয়ার মত উদারতা আমার নেই। আমি কল্পনা প্রবন হতে পারি কিন্তু বাস্তব উপেক্ষাকে ফিল করতে পারার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি আমার আছে। ছিঃ! একি আত্ম অবমাননা! নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে লজ্জা করছে। অপমানে কুঁকড়ে যাচ্ছি। আমাকে এভাবে অপমান করার স্পর্দ্ধা আহীর পেল কোথা থেকে! আমার মুখের উপর নিরুপায় বলে কি অসম্ভব ধৃষ্টতার পরিচয় দিল আজ! নাহ্, এর জন্য আমিই দায়ী। আমিই প্রশ্রয় দিয়েছি ওকে। এ অপরাধের জন্য নিজেকে ফাঁসি দিতে ইচ্ছে করছে। মাথার মধ্যে বার বার একটাই শব্দের প্রতিধ্বনি বাজছে। নিরুপায়!

নিরুপায় ! এ শব্দ একদিন আমিও ব্যবহার করেছিলাম। তখন পড়াশুনা করতাম। কত অল্পবয়সী প্রেমিকরা চারপাশে ঘোরাফেরা করত। যাদের কাছে প্রেমের অর্থ ছিল অন্ধকার হলে হাতে হাত রেখে রোম্যান্টিক্ ফিল্ম দেখা আর ভিক্টোরিয়া, বি গার্ডেনে গাছের তলায় গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে বাদাম খেতে খেতে 'তুমি আমার আমি তোমার' মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে আবেগের হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো। এগুলোর মধ্যে আমি কোন গভীরতা খুঁজে পেতাম না। আমার সেই অল্প বয়সী অপরিনত বুদ্ধিতেও ধরা পড়ে যেত সেই সব রোম্যান্টিক্ প্রেমিকের ভালোবাসার কৃত্রিমতা। ওরা আমাকে বলেছিল—'তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাই। তোমাকে বিয়ে করতে চাই…।' আর এগুলোর কোনটাই আমি আহীরকে বলিনি। সুতরাং ওর নিরুপায় হবার কি কারণ থাকতে পারে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম, 'এতদিন আমি যেভাবে বাঁচার জন্য স্বপ্ন দেখতাম তোমাকে ছাড়া সেভাবে বাঁচতে পারব তো ?' পারব না। তাতে কি হয়েছে ! বাঁচব না। কত মানুষই তো বেঁচে আছে তাদের স্বপ্নকে কবর দিয়ে। আমিও বাঁচব তাদের মত করে। আর এখন যে জীবন আমি অতিবাহিত করছি সেটাই কি আমার কাঙ্খিত জীবন না কি। আমি তো শিল্পী হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেঁচে আছি সে শিল্পসত্তাকে কবর দিয়ে। তবুও তো বেঁচে আছি। সে ভাবেই বাঁচব, আমারই কলম দিয়েই তো একদিন বেরিয়েছিল—

ম্যায় তো হাস্ রহী হুঁ
মগর ইয়ে মেরি মুস্কান নেহী হ্যায়।
ম্যায় তো জী রহী হুঁ
মগর ইয়ে মেরি জীন্দেগী নেহী হ্যায়॥

সেভাবেই হাসব, সেভাবেই বাঁচব। নিজের মত করে বাঁচার অধিকার কটা মানুষ পায় ! আমিও না হয় সেই সব না পাওয়া মানুষের দলেই পড়লাম। তাই বলে এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল কি ! এ অপমান আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আজ মনে হচ্ছে আমারই ছোঁড়া নিরুপায় শব্দটা বুমেরাং হয়ে এতদিন পর আমার কাছেই ফিরে এসেছে। আমার শরীর মনে অত জোর নেই যে সেই বুমেরাং এর আঘাত আমি সহ্য করব।

বাড়ি ফিরেছি। শুয়ে আছি নিজের বিছানায়। বাইরের পোশাকটাও বদলাই নি। পাশের ঘরে বাপি মা তিলক রয়েছে। সবাই জানে আমি কাঁদছি। কারণ ? হ্যাঁ, কারণ একটা আছে বৈকি। কোন এক সম্পাদক আমার লেখাগুলো রিজেক্ট করেছেন। এই মাত্র ফোনে সেই দুঃসংবাদটা পেয়েছি ; তাই কাঁদছি। আমি জানি 'আলাপ'-এ আমার লেখা বেরিয়েছে, 'পিয়াসী' গল্পের ফার্স্ট ইন্সটলমেন্ট। যথেষ্ট প্রসংশা পেয়েছে লেখাটা। আলাপের সম্পাদক কথা দিয়েছেন ওঁর পত্রিকায় আমার জন্য একটু জায়গা থাকবেই। শুধু তাই নয়, আরো একটা পত্রিকায় লেখা পাঠাবার অফার পেয়েছি। এতদিন এইসব সুযোগ গুলোর জন্য তীর্থের কাকের মত অপেক্ষায় ছিলাম। আর আজ এ সুযোগ আমাকে একটুও রোমাঞ্চিত করছে না। আমার সব

রোমাঞ্চকে আহীর ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার মত এসে আমার জীবনটাকে ওলোট পালোট করে দিয়েছে। আমাকে নিজের সত্তা থেকে সমূলে উৎপাটিত করে মরুর বুকে নিক্ষেপ করেছে। আমি তৃষ্ণার্থ পথিকের মত ছট্‌ফট্‌ করছি। কাঁদছি—কেন আমাকে এভাবে কষ্ট দিলে আহীর? আমি তো তোমার সাথে দুটো কথা বলতেই গেছিলাম। আর তো কিছু চাইনি। তোমার অমূল্য প্রেমের কাছে আমার এই সামান্য চাওয়াটা এতই তুচ্ছ প্রমাণিত হল। বাপি বলেন, 'প্রত্যাশার সীমারেখা রেখে দাবী করলে আশাহত হতে হয় না।' আমার প্রত্যাশা সীমাহীন। নিজেকে ঘেন্না হচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা আমার উপযুক্ত শাস্তি। আমি বাপি-মাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। পড়তে চাইনি, অবাধ্য, ঘৃন্য মেয়ের মত আচরণ করেছি। এটা তার উপযুক্ত শাস্তি। ঠিক হয়েছে; জব্দ।

'দিদি'—তিলক এসে আমার হাতটা ধরেছে। 'আর কাঁদিস না দিদি। তোর শরীর খারাপ। এভাবে কাঁদতে থাকলে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বি। চুপকর। যা হবার হয়ে গেছে। অন্য জায়গায় চেষ্টা কর, তোর লেখা একদিন ঠিক প্রকাশ পাবে, তুই দেখে নিস্‌। আমার কথা মিলিয়ে নিস্‌ সেদিন।'

তিলক আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ঐটুকু একটা ছোট্ট ছেলে আমার বুকে জমে থাকা দুঃখের পাথরটা স্নেহের ক্ষমতা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সমব্যথি হতে চাইছে আমার। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলছে, 'কাঁদিস না চুপকর। তুই কাঁদাছস কেন? কেঁদে কি লাভটা হবে শুনি!'

সত্যিই তো. কাঁদছি কেন! আহীরকে ছাড়া কি বাঁচা যায় না! কে এই আহীর! আজ থেকে এক মাস আগে তাকে তো আমি চিনতামই না। এই দুদিনের দেখায় সে আমার জীবনে এমন অপরিহার্য হয়ে উঠল কি করে! তার মনে আমার জন্য কোন প্রেম নেই শুনে এরকম উম্মাদের মত আচারণ করছি কেন! কেন এত কান্না পাচ্ছে! কেন আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না! যার জীবনে আমার কোন জায়গা নেই তার জন্য আমি শুধু শুধু কেঁদে মরছি কেন! সত্যি আমার আর কাঁদতে ইচ্ছে করছে না। আম কাঁদতে চাই না। সবচেয়ে বড় কথা আমি আর কাঁদতে পারছিও না। দম বন্ধ কর একটা যন্ত্রণা মাথার মধ্যে ক্রমাগত হাতুড়ি পিটে চলেছে। একটু একটু করে সে যন্ত্রণা সংক্রামিত হচ্ছে সারা শরীরে। তবুও দু চোখ ছাপিয়ে অবাধ্য জল নিরুচ্চার রোদনের বাহিঃপ্রকাশ হয়ে বয়ে চলেছে অঝরে। কি অসম্ভব অসহায়তা! কাঁদতে কাঁদতে আম কাঁদার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে ফেলেছি; তবুও কাঁদছি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ক্ষমতার বিরুদ্ধে। প্রায় সারাটা রাতই এভাবে চলল। ভোরের দিকে কখন ক্লান্ত চোখের পাতা দুটো এক হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি।

পরদিন ঘুম থেকে উঠল এক অন্য সমি। অচেনা অজানা অপরিচিত এক সমি। শুরু হল আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। অতীতের সব হাসি কান্না পাওয়া না পাওয়ার হিসাব নিকাষ মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে মনের দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেখানে কারুর প্রবেশ নিষেধ। কোন অনুভূতিতেই সে রুদ্ধ দ্বার আর আগল মুক্ত হবে না।

একি নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা! আজ সকালে তিলক বাড়ি ফিরে গেছে। যাওয়ার আগে বলল, 'দিদি, আমার মন বলছে তোর এই কান্না এই কষ্টের কারণ লেখা নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে। আমি তোকে চিনি, যে অন্যকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে সে এই সামান্য কারণে এভাবে ভেঙে পড়তে পারে না। আমি হয়ত এ ব্যাপারে তোর কোন কাজে লাগতে পারব না। তবুও বলছি, যদি সম্ভব হয় তোর এ কষ্টের কারণ আমাকে অবশ্যই লিখে জানাস। আমি খুব চিন্তার মধ্যে থাকব। অপেক্ষা করব তোর চিঠির।'

আমার যন্ত্রণার গনগনে আগুনের মধ্যে তিলকের এই কথাগুলো কয়েক ফোঁটা শীতল জলের মত। এতে আমার যন্ত্রণা না কমুক, কেউ যে আমার যন্ত্রণার কথা বুঝেছে এটাই তো অনেক বড় সান্ত্বনা।

'সমি'—অন্ধকার ছাতে রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মা এসে দাঁড়ালেন পিছনে।

'সমি, গত দুদিন ধরে তুই এরকম চুপচাপ আছিস। ঠিক মত খাচ্ছিস না কথা বলছিস না। এরকম করলে কি হবে বল! লেখা ফেরৎ দিয়েছে তো কি হয়েছে' আরো ভালো লেখ নিশ্চই ওদের পছন্দ হবে।'

'মা, তোমাকে কয়েকটা কথা বলার আছে।'

আমার কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ। রাগ, দুঃখ অভিমান কষ্ট কিচ্ছু নেই। যেন একটা মেসিন কথা বলে উঠল। আমার যান্ত্রিক স্বরটা মাকে আরো উৎকণ্ঠিত করে তুলল, 'কি কথা? বল না, নিঃসংকোচে বল।'

'আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অনেক অভিযোগ। আমি জানি, তোমরা কেউই চাওনি আমি অভিনয় করি, আমার লেখাগুলো ছাপানোর জন্য এর ওর কাছে ছোটা-ছুটি করি, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরি, অসুস্থ শরীরে টিউশনি করতে যাই, মিঠুর বাড়ি গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারি, সারাক্ষণ টিভি দেখি আর সংসারের একটাও কাজ করি না। এসবই তোমাদের অমতে করতাম। এখন থেকে এসব ভুল আর হবে না। আমি ঘরে থাকব, সব কাজ করব। শুধু তোমরা কেউ আমার সাথে কথা বোল না: আমার কারুর সাথে কথা বলতে ভালোলাগছে না—'

'তুই কি পাগল হয়ে গেলি সমি!'

'কেন, তোমরা তো এটাই চেয়েছিলে। বাধ্য মেয়ের মত সব সময় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকি।'

'তোর টিউশনি?'

'আজই সব ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'কি বলে এলি?'

'বললাম শরীর খারাপ, কাল থেকে আসতে পারব না।'

'আর কদিন পরই তো ওদের পরীক্ষা, এরকম দায়িত্বহীনের মত মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এলি। ওদের অসুবিধার কথা একবারও ভাবলি না!'

'করবীকে বলেছি ও পড়াবে।'

'তুই কেন এমন করছিস? একটা সামান্য কারণে এভাবে সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিস কেন?'

'আর কথা বাড়িও না। আমার ভালোলাগছে না। তুমি নিচে যাও।'

'তুইও আয় আমার সাথে। একা একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকিস না।'

'তুমি যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

অবাধ্য সমিকে ছাতে একা রেখে মা চলে গেলেন। এতক্ষণ যে গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলছিলাম তা ধীরে ধীরে গলছে। বুঝতে পারছি, গলিত লাভা এক্ষুণি টপ্‌টপ্‌ করে গড়িয়ে পড়বে চোয়াল বেয়ে। আজ কি অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করলাম মার কাছে। নিজের হাতেই আমার রঙিন ডানা দুটো পুড়িয়ে দিলাম আজ। দু হাতে পায়ে পরেছি লোহার বেড়ি; পরাধীনতা। আমি বোধ হয় আর কখনো লিখতে পারব না। আমার মধ্যে অবশিষ্ট শিল্প সত্ত্বাটুকু বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমার বেঁচে থাকার আর কোন মানেই হয় না। উদ্দেশ্যহীন জীবন। তবুও বাঁচব—স্বেচ্ছামৃত্যু আমার কখনোই কাম্য নয়। আমি কৃচ্ছ্র সাধনে পারঙ্গম। নিজেকে তিল তিল করে কষ্ট দিতে পারি। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারি যন্ত্রণার কর্কশ আঁচড়; চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্তের সেই শিরশিরে অনুভূতি। তবুও আত্মহনন্‌ নয়। জীবন সুন্দর, আনন্দ সুন্দর, যন্ত্রণা সুন্দর, দুঃখ সুন্দর, মৃত্যু সুন্দর। প্রত্যেকের নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে। আমার জীবনে আনন্দ নেই। তাই তো সুন্দর দুঃখের সুন্দর যন্ত্রণা সইতে সইতে সুন্দর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব আমি। এটাও তো একটা জীবন। হোক না অন্য রকম। একদিন আমিই তো নিজের হাতে লিখেছিলাম আমার নিষ্ঠুর প্রেমিকের সেই ঐতিহাসিক প্রেম পত্র। মনে পড়ছে 'জরিমানা' কবিতাটা। অনেক দিন আগের লেখা। এক কাল্পনিক যন্ত্রণা থেকে সাজিয়ে ছিলাম কবিতাটা। লাইনগুলো পর পর ভেসে উঠছে চোখের সামনে—

'আমি তোমাকে ভালোবাসি—'
কথাটা যেদিন তুমি জানতে পারলে
সেদিনই চেয়ে বসলে
তোমাকে ভালোবাসার মূল্য।
আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে
তোমার প্রেমের প্রথম চিঠি।
'প্রিয়তমা মহাশ্বেতা,
আমি তোমাকে ভালোবাসি।'
মনে পড়ে, ইতির পরে
স্বযত্নে লিখেছিলাম তোমার নামটা।
না, আমার হাতের কলমটা
এতটুকু প্রতিবাদ করেনি।

ফুল করা খামে ভরে ওটা
আমাকেই পৌঁছে দিতে বলেছিলে
তোমার প্রেমিকার হাতে।
যাওয়ার আগে বলে গেলে,
আমাকেই এনে দিতে হবে
এ পত্রের জবাব।
মহাশ্বেতা তোমার ভালোবাসাকে গ্রহণ করেছে।
নিজেই এ খবর এনে দিয়েছিলাম তোমায়।
না, আবেগে আমার কণ্ঠ
রুদ্ধ হয়ে আসেনি।
বরং আনন্দে তোমারই গলা কাঁপছিল।
তুমিই পড়তে পারছিলে না
তোমার প্রেমিকার দেওয়া সে প্রেমপত্র।
আমাকে পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলে।
পড়লাম। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন
পড়ে শোনালাম তোমায়।
না, আমার চোখের জলে
ঝাপসা হয়ে যায়নি এ চিঠির বক্তব্য।
আমি কোনদিন কাঁদিনি।
এমন কি ভূমিষ্ঠ হবার পরও না।
আর পাঁচটা নব জাতকের মত
চিৎকার করে ঘোষণা করিনি
আমার জন্মের খবর।
আজ অনেক দিন পর
তুমি এসেছিলে আমার কাছে।
আজও আমার সামনে
তোমার হাত দুটো পাতা ছিল।
উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মত বললে—
'আচ্ছা,
তুমি তো আমাকে এত ভালোবাস—
পারবে?
পারবে আমার জন্য একটু কাঁদতে?
আমি তোমার চোখের জলে
আমার মহাশ্বেতার চোখ দুটো আঁকব।'

জীবনে কোনদিন যা করিনি
তোমার জন্য তাই করলাম।
তুমি দুহাত পেতে নিয়ে গেলে
আমার চোখের জল।
আবার এস তুমি,
তোমার জন্য চিরকাল খোলা থাকবে
আমার ঘরের দরজা।
কথা দিলাম—
কোনদিন নিরাশ করব না তোমায়।
খালি হাতে তুমি কখনো
ফিরে যাবে না আমার দুয়ার থেকে।
হ্যাঁ প্রেমিক,
নিজেকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে যাব
তোমাকে ভালোবাসার জরিমানা॥

এমন একখানা বাহিবৎ অসহনীয় কবিতা যার কলম দিয়ে বেরিয়েছে সে যে কতটা ক্লেশসহিষ্ণু হতে পারে তা অনুমান করা যায়। এক নিষ্ঠুর প্রেমিকের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করার···। আহীর কি নিষ্ঠুর! কখনোই না। ও আর যাই হোক নিষ্ঠুর কখনোই নয়। আমার এ পরিস্থিতির জন্য ওকে দায়ী করতে পারি না। ও হয়ত জানেই না আমি এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি ওর সাথে। আমি তো ওর সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলাম। আর আমার সে বন্ধুত্বকে গ্রহণ করেই ও এখানে এসেছিল। তবে আমার এ নিদারুণ পরিণতির জন্য আহীর দোষী হতে যাবে কেন! দোষ আমারই; তাই তো শাস্তিটা আমার একারই প্রাপ্য। আগুন যখন দুদিকে লাগে তখন একের সমবেদনায় অপরের জ্বালা মিটে যায়। কিন্তু এখানে যে আগুন লেগেছে একদিকে; তাই সে অগ্নি নিবাপনের প্রশ্নই ওঠে না। অসহায়ের মত কেবলই একা একা পুড়তে পুড়তে এক সময় শেষ হয়ে যাওয়া। কি দুঃখকর পরিসমাপ্তি ঘটবে আমার জীবনের! আর এ জীবন আমি নিজে বেছে নিয়েছি। এক সময় জোর গলায় বলতাম, আই অ্যাম জাস্ট এ ওয়াটারবাবল। আমাকে কেবল দূর থেকে দেখা যায় স্পর্শ করা যায় না। যেই আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবে আমি তার কাছ থেকে হারিয়ে যাব। তখন একবারও ভাবিনি আমি যদি সেচ্ছায় কাউকে স্পর্শ করি তাহলেও তো আমার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। হায়রে ভাগ্য, সেদিনের সে অহংকার আজ কর্পূরের মত বায়ুতে মিলিয়ে গেছে। এখন এই হারিয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, নিভে যাওয়া এইসব শব্দগুলোই

আমার সঙ্গী। সারাদিন ঘরের টুক টাক কাজ করি, দু বেলা দু মুঠো খাই আর মোহনায় মিশে যাওয়ার প্রতীক্ষা করি। ভাবি, বাকি জীবনটা এখানেই তো কাটাতে হবে। আমি নিজের জন্যে একটা ঘর খুঁজেছিলাম, সে ঘরই যখন আমার হল না তখন অন্য কোথাও যাই কেন। এখানেই থাকি, বাপি মার কাছে। এক সময় এটাই তো চাইতাম, বিয়ে করব না, আমি চলে গেলে বাপি মাকে দেখবে কে! তবে এরকম ভগ্ন হৃদয়ে নয়। সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই থাকতে চেয়েছিলাম। আহীর ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসে আমার স্বপ্নের তরীকে নোঙ্গর করে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, আহীর কি সত্যিই নিরুপায় শব্দটা ব্যবহার করেছে! না কি আমি ভুল শুনলাম! মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছি না তো! কি করে হয় এটা, আমি যে আহীরকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি। আর আমার এ ভালোবাসা চোদ্দ বছরের কোন কিশোরীর অপরিণত মনের আবেগ নয়। আমি যথেষ্ট ম্যাচিওর, প্রকৃত ভালোবাসা আর আবেগ প্রবণ প্রেমের তফাৎটা বুঝি। আহীর কেন বুঝল না? তবে ও চিঠি দেবে বলেছে; এটা আমি ঠিক শুনেছি। কিন্তু কোথায় চিঠি, এতদিন তো হয়ে গেল। আহীরের চিঠির প্রতীক্ষায় কত দুপুর কেটে গেল পথের পানে চেয়ে চেয়ে। একরাশ আশার আলো নিয়ে প্রতিদিন সকালের সূর্য্য উঠত, সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতাম আজ ঠিক তোমার চিঠি আসবে। কিন্তু সময়ের হাত ধরে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে গোধূলি নেমে আসে। নিরাশার নিকশ কালো অন্ধকারে আমাকে আচ্ছন্ন করে অস্ত যায় সূর্য্য। বুকের ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে। এল না, আজও এল না তোমার চিঠি। তুমি কি এমন কর আহীর! সারাদিনের ব্যস্ততার মধ্যে আমার জন্য দু লাইন লেখার মত একটু সময়ও তোমার হল না? তুমি কেন এত নীরব, কেন এত উদাসীন রইলে? তোমার এ নিরবতা আমায় যে তিল তিল করে মৃত্যুর উপত্যকায় এনে দাঁড় করিয়েছে। চারিদিকে মৃতের ভূমিশয্যার মাঝে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি অসহায়ের মত। আমার ঘর বাঁধার যে স্বপ্নগুলো মেঘের ডানায় ভর দিয়ে নক্ষত্রের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত তাদের চুমকি ওড়না উড়িয়ে, আজ তারা মুখ থুবড়ে পড়েছে বাস্তবের শক্ত মাটিতে। অতীতের চোরা গলির আনাচে কানাচে মনটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে স্মৃতির নুড়ি। কোঁচড় ভর্তি করে কুড়িয়ে চলেছে ভবিষ্যতের জন্য। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, তোমাকে প্রথম স্পর্শের অনুভূতি, তোমার পথ চেয়ে বসে থাকার সে থমকে যাওয়া সময়, তোমার ফোনের অপেক্ষায় অপলক দৃষ্টিতে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকা আরো কত কি। মনে হত সর্বক্ষণ রিং হচ্ছে। চকিতে তুলে নিয়ে আবেগে বোজা গলায় প্রশ্ন করতাম, হ্যালো আহীর! ওদিকে কোন প্রত্যুত্তর নেই। শুধুই একটা নিরবিচ্ছিন্ন শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে ফোনটা মরেনি। রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার বসে থাকা। আর পারছি না আহীর। সমস্ত অক্ষমতার তীক্ষ

কাঁটাকে ক্রমাগত দু পায়ে মাড়িয়ে আমাকে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। পিছন ফিরে তাকালে সে রক্তাক্ত পদচিহ্ন এখনো দেখতে পাই। সময়ের ঝাপটা তাদের কালচে করে দিলেও একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। অতীতের ঢেউ এসে বার বার ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বর্তমানের পটভূমি। সে ঢেউ এর নোনা জল কান্না হয়ে চলকে পড়ছে দু চোখ ছাপিয়ে। নিতান্তই অবাধ্যের মত যখন তখন এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে আমার দৃষ্টি। আমি দিন রাত পড়ে পড়ে কাঁদছি। কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছি না। আমি উপলশয়না হয়েছি। পাষাণের বুকে শুয়ে থাকতে থাকতে পাষাণ হয়ে যেতে চাইছে মন। পাষাণের গর্ভে তলিয়ে যেতে চাইছি অহল্যার মত। আমি শাপভ্রষ্টা নারী, চাই না শাপমুক্ত হতে। আমাকে পাথর করে দাও। আমি বাপিকে আঘাত দিয়েছি। মাকে কাঁদিয়েছি। যাবে কোথায় সে পাপ! নেই, মুক্তি নেই।

'তুই আবার কাঁদছিস?'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কারুর চোখের সামনে নিজের দুঃখে কাঁদাটা আমার ঠিক আসে না। সে বাবাই হোক আর মাই হোক। এতক্ষন তো ঘরে একাই ছিলাম।

'এভাবে আর কতদিন চলবে সমি? ক্যালেণ্ডারের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেছিস! এক মাস হতে চলেছে তুই এরকম আচরণ করছিস। যেচে কথা বলা তো দূরে, ডাকলে সাড়া দিস না। প্রশ্ন করলে হ্যাঁ না ছাড়া উত্তর দিস না। দিন রাত চিন্তা করে করে কি অবস্থা করেছিস শরীরের! কেন সমি, কেন নিজেকে এভাবে শাস্তি দিচ্ছিস?'

মা কাঁদছেন। আমার অসহ্য লাগছে। বিরক্ত লাগছে খুব। মনে হচ্ছে উঠে চলে যাই পাশের ঘরে।

'যে লেখার জন্য আজ তোর এই অবস্থা সেই লেখা তুই ছেড়ে দিলি? একটা দিনের জন্য তো দেখলাম না খাতা পেন নিয়ে বসেছিস। তুই কি ঠিক করেছিস আর লিখবি না?'

'তুমি চুপ কর। এসব শুনতে ভালোলাগছে না।'

'তুই কি আমাকে মা বলেও ডাকবি না? বাপি কত দুঃখ করছিল, তুই আর বাপিকেও ডাকিস না। তোর এ অবস্থা দেখে বাপি কত কষ্ট পাচ্ছে জানিস? আমরা তো কাঁদতে পারি সমি, বাপি তো সেটাও পাবে না। গুমরে গুমরে শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষটা।'

'আর কি চাও তোমরা? আমি তো এখন সারাক্ষণ তোমাদের চোখের সামনে রয়েছি। সময়মত খাচ্ছি, সংসারের কাজ করছি। আগের মত টিভি ও দেখি না। বাইরে আড্ডা মারতে যাই না—'

'না। এসব আমরা চাই নি। তুই বাইরে যা। এই এক মাসে একটা দিনের

জন্য ঘরের বাইরে পা দিস্ নি। তুই আবার আগের মত কথা বল। অনর্গল বক বক করে যেমন আমাকে পাগল করে দিতিস ঠিক তেমনি করে কথা বল আগের মত চিৎকার করে গান গা। বন্ধুদের সাথে যেমন হৈ চৈ করতিস তেমনি কর। আমার আগেব সমিকে ফিরিয়ে দে তুই। আমার আগের সমিকে…।'

মা আর কথা বলতে পারছেন না। একরাশ উদ্ধত কান্না এসে গলা টিপে ধরেছে। হা ঈশ্বর, এ কি অশান্তি! আমার অপরাধের শাস্তি তুমি আমাকে দাও তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করব না। কিন্তু বাপি মাকে রেহাই দাও। এতদিন আমি ওনাদের প্রতি অনেক অবিচার করেছি, জানি সে পাপের মুক্তি নেই। কেন তুমি শুধু শুধু ওঁদের কাঁদাচ্ছ? তোমাব আব কত অশ্রু দরকার? আমি যে দিন রাত কাঁদছি, তাতেও কি তোমার তৃষ্ণা মিটছে না? বেশ তো, যেটুকু সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি এখন থেকে সেটুকু সময়ও না হয় কাঁদব। শুধু আমার বাবা মাকে ছেড়ে দাও। ওঁদের কাঁদিও না। আমার যন্ত্রণার বোঝা আর বাড়িও না। একা একা এ ভার আমি বইতে পারছি না। আমাকে আর ভারাক্রান্ত কোর না, দোহাই তোমায়। এবার দয়া কর।

'সমি, বাপি তোকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল।'

'কেন? কি হয়েছে আমার?'

আয়নার সামনে একটু দাঁড়া, বুঝতে পারবি কি হয়েছে। শুকিয়ে খাওয়া কাকে বলে জানিস? তুই সেই শুকিয়ে যাচ্ছিস। এভাবে চলতে থাকলে আর বেশীদিন বাঁচবি না। এমন একটা কঠিন অসুখে পড়বি যেখান থেকে '!

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি তাহলে ঠিক রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। মার কোন কথা আমার কানে আর ঢুকছে না। আমি সফলতার স্বাদ পেয়েছি। সারাটা জীবন ধরে পদে পদে হেরেছি আমি। এবার পাব জয়ের পূর্ণ স্বাদ। সব্বাইকে হারিয়ে আমি জিতব। প্রতিশোধ নেবার এ সুযোগ আমি কাজে লাগাবোই। আহীরও বুঝুক নিরুপায়তা কাকে বলে। অদূর ভবিষ্যতের সম্ভব্য ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে কোলাজ পিকচার হয়ে গেছে। ঈশ্বর প্রদত্ত কল্পনাময় দিব্য দৃষ্টি আছে আমার। আমাব তপ্ত হৃদয়ে দক্ষিনায়নের শীতলতার প্রলেপ লাগছে। মুক্তির আনন্দে মনের মধ্যে কোন সে বিরহী স্বাধীনতার গান গাইছে। জুঁই ফুলের সুবাসে ভাসছে সারাটা ঘর।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হস্পিটালের বিছানায় একটা শীর্ণকায় হাড় জিরজিরে শরীর শোয়ান আছে। কাঠির মত সরু সরু হাত পা। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কোটরস্থ চোখ দুটো অর্ধ-উন্মিলিত। ঠোঁট দুটো শুকনো খড়ের মত ফ্যাকাসে। মুখের বর্ণ পাণ্ডুর। নাকে অক্সিজেন পাইপ। হাতে সুঁচ ফোটান। মাথার কাছে ঝুলেছে স্যালাইন ওয়াটার, রক্তের বোতল। সারা শরীরে মেডিক্যাল অর্নামেন্টস্। কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ঐ

অর্ধমৃত শরীরটা কার? ভালো করে দেখছি। কি আশ্চর্য! আমি যে নিজেকেই চিনতে পারছি না। বাহ্! আমি এত কাজের মেয়ে আগে জানতাম না তো! বাঁচার কোন পথই খোলা রাখিনি। প্রতিটা পথের শেষে একটা করে কালো মহিষ পাহারায় রেখেছি। অচৈতন্য আমি একটু একটু করে সিংক করছি। ডাক্তার বাবু অসহায়ের মত বাপিকে বলছেন—

'সরি, আই অ্যাম হেল্পলেস্। আপনার মেয়ে নিজেকে স্লো পয়জন করছে। ও বাঁচতে চাইছে না। কি করে চিকিৎসা করব? এত অবাধ্য জেদি মেয়েকে ট্যাক্‌ল করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ও কেন এমন করছে সেই কারণটা জানা আগে দরকার। ও মানসিক দিক দিয়ে বিদ্ধস্ত। ওর মনটাকে সুস্থ করুন আগে। আমার কোন চিকিৎসাই ওর কাজে লাগছে না। আপনি তো বলেছেন ও লিখত; সেই সব ডায়রি টায়রি ঘেঁটে দেখুন ওর মানসিক যন্ত্রণার কোন ক্লু খুঁজে পান কি না!' এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে ডাক্তার থামলেন। বাপিকে আরো অসহায় দেখাচ্ছে। একমাত্র সন্তান চোখের সামনে একটু একটু করে চোরা বালিতে ডুবে যাচ্ছে অথচ উনি কিচ্ছু করতে পারছেন না। আর যিনি করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন তিনিও জবাব দিয়ে দিলেন। নাহ্, একটা সুরাহা করতেই হবে। বাড়ি ফিরে শুরু করলেন চিরুনি তল্লাশি। প্রথমেই হাত দিলেন আমার পার্শোন্যাল ব্রিফকেস্‌টায়। খুলে দেখলেন, অজস্র বাসের টিকিট আর টুকরো টুকরো রঙিন কাগজে ভর্তি। ভি আই পি দের ছবি জমানো আমার হবি, বিভিন্ন ম্যাগাজিন আর নিউজ পেপার থেকে কালেক্ট করেছি। বেশীর ভাগ ফিল্মস্টারদেব ছবি। নেড়ে চেড়ে সিক্রেট কিছু খুঁজে পেলেন না। এবার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আমার পার্শোন্যাল লকারের চাবিটা নিয়ে সব কিছু টেনে বের করলেন আলমারি থেকে। এক গাদা ডায়রি। বেশ কিছু ফুলস্কেপ কাগজ। কয়েকটা গল্পের ম্যানেস্ক্রিপ্ট। একটা কবিতার অ্যালবাম। একটা ব্যাঙ্কের পাশবই আর দুটো বড় বড় বাক্স। তাতে ঠাসা চিঠি আর গ্রিটিংস্ কার্ড। চিঠি গুলো ঘেঁটে দেখতে লাগলেন কোন অপরিচিত নাম পাওয়া যায় কি না! অথবা সন্দেহজনক কোন কথাবার্তা। এই এনকোয়্যারির কাজে মাও অবশ্য বাপিকে সাহায্য করছেন। এত চিঠির মধ্যে থেকে আসল কালপ্রিটকে খুঁজে বের করা, মরুভূমিতে আলপিন খোঁজার সামিল। তবুও, একমাত্র আদরের সন্তানের জীবন বিপন্ন, তাকে সারিয়ে তোলার জন্য এই অসাধ্য কর্মটিও করলেন। কিন্তু সন্দেহ জনক কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। সবই মামাতো মাসতুতো ভাই বোনেদের চিঠি; বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবেরও আছে। কিন্তু তারা সবাই পরিচিত। সবচেয়ে বড় কথা গত সাত আট মাসের মধ্যে এসেছে এ রকম চিঠি একটাও নেই; যার ফলে সমির এই পরিবর্তন ঘটতে পারে। গ্রিটিংসে কার্ডগুলোও একটা একটা করে খুলে দেখলেন। নাহ্, কোন অপরিচিত নাম পাওয়া গেল না। কয়েকটা ছেলেদের নাম লেখা গ্রিটিংসও আছে কিন্তু তারা

সবাই বাড়িতে আসে। বিশ্বস্ত, বন্ধু হিসাবে চোখ বুজে নির্ভর করা যায় তাদের উপর। সমির এই ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য এরা কেউ দায়ী হতে পারে না, নেভার। ডায়রির পাত ওল্টাচ্ছেন বাপি। ১৯১৯ সালের একটা পকেট ডায়রি। উনিই দিয়েছিলেন। বাপি বলছেন—

'তখন সমির হাতের লেখা কেমন ছিল। এখন অনেক পরিণত, সুন্দর হয়েছে। নিজের ক্ষোভের কথা, কষ্টের কথা কেমন লিখে রেখেছে দেখ। এসব কথা মুখ ফুটে কখনো বলেনি তো আমাদের! ঐটুকু বয়স থেকেই এত চাপা অভিমান জমে আছে ওর বুকে! ও যে এত অভিমানী ওর উপরটা দেখে তো বোঝা যায় না! আমাদের বুকের মধ্যে মানুষ হয়েও সমি নিজেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখত!' বাপির কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। মা তো সেই কখন থেকে কাঁদছেন। বাপির চোখও ভিজতে শুরু করেছে। 'কিন্তু এসব তো অনেকদিন আগেকার লেখা। এতদিন পর এগুলো ইস্যু করে সমি নিশ্চই এসব কাণ্ড ঘটাবে না!'

তবুও পড়ে চলেছেন একটার পর একটা পাতা।

'সমি ছোট বেলায় ভীষণ স্পেলিং মিস্‌টেক করত। কত মেরেছি এই জন্য। দেখ এখানেও ভুল করেছে, দুঃখ বানান দু লিখেছে।'

'ছোট বেলায় কেন, সমি এখনো লিখতে বসে মাঝে মাঝে আমার কাছে বানান জানতে চায়। কতদিন ও কিছু লেখেনি···।'

আর কথা বলা অসম্ভব। ভীষণ কাঁদছেন মা। মেরুন রঙের একটা সরু ডায়রি। পাতা ওল্টাচ্ছেন। হিন্দী শের লেখা। মার হাতে মাম্হলি ডায়রি। কত তারিখে টিউশানির মাইনে পেয়েছি, কত পেয়েছি। কি ভাবে খরচা করেছি সেই সব হিসেব রয়েছে।

'আরে! ওটা কি? একদম কোনের দিকে হাত দাও।'

বাপির নির্দেশ অনুযায়ী মা আলমারি থেকে বের করলেন অবশিষ্ট জিনিস দুটো। একটা গুলতি আর একটা ব্যাগ।

'সমির ছেলেমানুষী কি এখনো যায় নি! ব্রিফকেস্‌ ভর্তি বাসের টিকিট। আলমারির লকারে পাখি মারা গুলতি! ওটা কি দাও।'

লাল চটের উপর সাদা সুতোর ফাঁস ফাঁস নক্সা করা ছোট্ট ব্যাগটা বাপি হাত বাড়িয়ে নিলেন।

'কি আছে এর মধ্যে?'—নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নিজেই ব্যাগের চেন খুলে ভিতরে হাত দিলেন, ভিতর থেকে যা বের হল তাতে সমির সব ছেলেমানুষী চাপা পড়ে গেল নিমেষে। সমি যে সত্যিই বড় হয়েছে এ ব্যাগ না দেখলে ওনারা বিশ্বাসই করতেন না।

তিনটে চিঠি। হলুদ খামের উপর সমির নাম লেখা। তেইশে মার্চ থেকে দশই জুনের মধ্যে চিঠিগুলো এসেছে। পত্র প্রেরকের নাম আহীর বাসু। দুজনের

চোখে অগাধ বিস্ময়। না, এ নাম আগে কখনো শোনেন নি ওঁরা। আহীর বাসু নামে সমির কোন বন্ধু আছে এ তথ্য বাবা মার কাছে অজানা। একটা একটা করে তিনটে চিঠি পড়লেন বাপি। রহস্যের কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

মা অবাক হয়ে বলছেন, 'খবরের কাগজে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দেখে ও শয়তানি করে এক জায়গায় চিঠি দিয়েছিল এটা আমি জানি। সে ভদ্রলোক না কি নাম করা ডিরেক্টার। সল্টলেকে বাড়ি। তিনি সমিকে দেখা করতে বলে চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠিও সমি আমাকে দেখিয়েছে। কিন্তু এ চিঠিগুলোর কথা ও আমাকে বলেনি। আহীর নামটাও পর্যন্ত ও কখনো করেনি আমার সামনে।'

'সমি দেখা করেছিল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ?'

'দূর ! ও ছ্যাবলামি করে চিঠি দিয়েছিল। যায় কখনো দেখা করতে ! জানি না ভদ্রলোক কি মনে করেছেন। উনি না কি সমির বন্ধুর বাড়ি এসে বার দুই ওর খোঁজও নিয়ে গেছেন।'

'কিন্তু এগুলো তো পাত্র নয় সবই পাত্রের ভাই এর চিঠি। আর এগুলো কি। হাওড়া স্টেশানের দুটো প্ল্যাটফর্ম টিকিট। একটা উনত্রিশ ছয় আর একটা পঁচিশ ছয়ের ডেট দেওয়া। এটা কি ! ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের রিকুইজিশান ফর রিজার্ভেশান। জার্নি ডেট, চব্বিশ ছয় ছিয়ানব্বই। সেকেণ্ড ক্লাস ! হাওড়া স্টেশান থেকে ঘাটশিলা। সমি কি আমাদের না জানিয়ে ঘাটশিলায় চলে যেত। কিন্তু এখানে তো নাম লেখা আছে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ও. পি. ভজনওয়ালা। ও নো ! সমি কি তাহলে এই ছেলেটির সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে নাম গোপন করে ঘাটশিলায় রিজার্ভেশান করতে চেয়েছিল ! আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে।'

মার মনে হয় সমির উপর এখনো একটু আস্থা আছে। তাই একটা দুর্বল প্রতিবাদ করলেন, 'কখনোই না। মানছি, সমি হয়ত মানসিক ভাবে এই ছেলেটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে হয়ত কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ সবই সম্ভব। কিন্তু সমি আমাদের না বলে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। ওটা অন্য কারুর রিজার্ভেশান ফর্ম হবে।'

'অন্য কারুর হবে তো ওর ব্যাগের মধ্যে কেন ?'

'সে আমি জানি না, তবে সমির মাথায় এত জঘন্য বুদ্ধি নেই।'

'সমির মাথায় না থাক, হয়ত সেই ছেলেটির মাথায় আছে। সেই হয়ত ওকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ! এই দেখ ইস্টার্ন রেলওয়ের একটা কাফের বিল। এগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওরা দেখা করত।'

'কিন্তু ছেলেটাতো আগ্রাতে চাকরি করে—'

'তাতে কি হয়েছে ? যখন আসত দেখা করত। আরো দেখ একটা আইস-ক্রীমের কাঠি, আর এটা কিসের প্যাকেট ?'

'দেখি, এতো আমলকির প্যাকেট। এটা আগে দেখেছি, সমি বলেছিল শিয়ালদার সলিলদা না কে বাসে ওকে কিনে দিয়েছিল।'

'মিথ্যে বলেছিল! এ নিশ্চই সেই ছেলেটা কিনে দিয়েছে, তাই এত যত্ন করে তুলে রেখেছে। কবে আইসক্রীম খাইয়েছে সেই কাঠিটাও ফেলেনি!'

'এই কাগজ দুটো কিসের?'

মা এগিয়ে দিলেন। চশমা ঠিক করে নিয়ে ভালো করে দেখে বাপি বললেন, 'এতো এস টি ডি ফোনের কম্পিউটারাইজড বিল। 0592 কোথাকার এস টি ডি নাম্বার? ডায়রিটা দাও তো।—এতো আগ্রার নাম্বার। তার মানে তোমার মেয়ে আগ্রাতে ফোন করেছিল। তের সাত ছিয়ানব্বই তারিখে। দুটো বিলই একই ডেটের। মানে একই দিনে দুবার ফোন করেছিল।'

'কত তারিখ বললে?' মা জানতে চাইলেন।

'তের সাত ছিয়ানব্বই।'

'তার মানে তো গত মাসেই। তোমার মনে আছে? সেদিন ফোন করে এসে সমি ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। শুধু সেদিন কেন, তারপর থেকেই তো ওর এই অবস্থা। আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন তের তারিখ ছিল, শনিবার। তিলক ছিল এখানে।'

'ও আচ্ছা! সেইজন্য বিকাশের বাড়ি না গিয়ে স্ট্যাণ্ডে গিয়েছিল ফোন করতে! বিকাশের তো এস টি ডি কানেকশান নেই।'

'অথচ বাড়িতে বলেছিল এত ঘন ঘন ওখান থেকে ফোন করা ঠিক না। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে করে আসি।'

'আমি তো ভাবতেই পারছি না। একটা ছেলের জন্য সমির মত মেয়ে এ রকম···ছিঃ! ও এভাবে আমার বিশ্বাস আমার আস্থাকে খুন করবে আমি, আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি। কত বড় বড় আদর্শের কথা বলত। এ সব সস্তা রোম্যান্টিসিজিমে ওর কখনো বিশ্বাস ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা যখন ভুল করার বয়স ছিল তখন এসব ঝামেলায় জড়ায়নি আর এখন · ছিঃ!'

'তখন থেকে ছি ছি করছ কেন! এরমধ্যে আমি তো কোন নোংরামো দেখছি না। এই বয়সের ছেলে মেয়েরা একে অপরকে ভালো বাসতেই পারে, এতে অপরাধটা কোথায়?'

'অপরাধ ভালোবাসাতে নেই। অপরাধ এভাবে সিন ক্রিয়েট করাতে। বাবা মার কথা না ভেবে নিজের জীবন এভাবে বিপন্ন করাতে—'

'কিন্তু ও কেন এরকম করছে! কি ঘটতে পারে ওদের মধ্যে, যার জন্যে সমি মরতে প্রস্তুত।'

'সেটাই তো জানতে হবে।'

'কি ভাবে? সমিকে নিশ্চই এসব কথা জিগ্যেস করা যাবে না! এখন ওর

যা অবস্থা—'

'না, ওকে জিগ্যেস করা উচিত হবে না। আচ্ছা, ওর কোন বন্ধু বান্ধব কে এসব কথা বলে নি? তার কাছ থেকে তো জানা যেত।'

'তা কি করে হবে! সে দিনের পর থেকে ও আর বাইরেই যায়নি। কোন বন্ধুর সাথে দেখাও করেনি। আর বাড়িতে যারা এসেছিল তাদের সাথে দু একটা কথা বলেছিল ঠিকই কিন্তু সে তো আমার সামনেই কথা হয়েছিল।'

'তাহলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'কি করবে?'

'ছেলেটার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করব। একমাত্র ওই বলতে পারবে আসল কারণ।'

'তুমি আগ্রায় যাবে?'

'না, সমিকে এই অবস্থায় ফেলে আমি আগ্রায় যেতে পারব না। ফোন নাম্বারটা কোথায় গেল—এই তো। ফোনটা করে আসি।'

এস. টি. ডি. বিলটা পকেটে নিয়ে বাপি বেরিয়ে গেলেন।

ফোন করে প্রথমেই আহীরকে পাবেন না। কাউকে ডেকে দিতে বলতে হবে। ওদিকে ফোন এসেছে শুনে আহীর ভাবছে ওর পরিচিত কেউ—

'হ্যালো, আহীর বাসু স্পিকিং।'

এদিকে গম্ভীর গলা, 'আমি মহেন সান্যাল, কুহেলির বাবা কথা বলছি।'

আহীর কি চমকে উঠবে! কানের কাছে রিসিভার ধরে থাকা হাতটা একটু কেঁপে উঠল বলে মনে হল।

'নমস্কার স্যার, কেমন আছেন?'

'ভালো না।'

'কেন? কি হয়েছে?'

'যে বাবার একমাত্র সন্তান মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে সে বাবা কি ভালো থাকতে পারে?'

'কি হয়েছে কুহেলির?'

'জানি না। আর সেটাই আপনার কাছে জানতে চাইছি। আপনি জানেন ওর কি হয়েছে?' আহীর নিরব। 'প্রশ্নটা হয়ত আপনার বড়ই অযৌক্তিক মনে হচ্ছে। সন্তানের এত কাছাকাছি থেকেও আমি জানি না ওর কি হয়েছে। এত দূরে থেকে একজন অপরিচিত মানুষের কাছে জানতে চাইছি নিজের মেয়ের কথা। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে!'

'স্যার, সমি এখন কোথায়?'

'হসপিটালে।'

'কেমন আছে?'

'একটুও ভালো না। আসলে ও বাঁচতে চাইছে না। এতটাই স্বার্থপর হয়ে উঠেছে যে বাবা মার কথা ভুলে গেছে। ডাক্তারের সাথে কোন রকম ভাবে কো-অপারেট করতে চাইছে না। ওর এই না চাওয়াগুলোর কাছে আমরা হেরে যাচ্ছি। জানি না কি করে বাঁচাব ওকে।'

'স্যার—স্যার আপনি চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বাড়ি যান। আমি এক্ষুণি আসছি। যত সম্ভব তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছি।'

'তুমি আসবে এখানে? সত্যিই আসবে?'

'নিশ্চই, সমি আমার বন্ধু। ওর এ ক্ষতি আমি চাইনি। ও একটা আস্ত পাগল, তাই নিজেকে মেরে আমাকে শাস্তি দিতে চাইছে। কিন্তু আমি এটা হতে দেব না। আমি আসছি।'

'তুমি কি ভাবে আসছ বল। আমি কি স্টেশানে ওয়েট করব?'

'না না, কোন প্রয়োজন নেই। আমি প্লেনে পৌঁচচ্ছি। আর ঠিকানা তো রয়েইছে আমার কাছে। বাড়ি খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না। ছাড়ছি। আপনি সাবধানে ফিরবেন।'

আহীরের কাছ থেকে এতটা সহানুভূতি বা সহমর্মিতা বাপি কি আশা করেছিলেন! জানি না। তবে, আহীর নাইবা আমায় ভালোবাসল, মানবতা বোধ থেকে এটুকু মনে হয় করাই যায়। যতই হোক ও তো আমার ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে পারে না! শুনেছি, অন্ধ ভালোবাসা মানুষের নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করার বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। তা হয়ত দেয় খানিকটা। আহীর তো নাও আসতে পারত। ফোনেই বলে দিতে পারত আসল সত্যটা। সত্যিই তো ওর কোন দোষ নেই। পতঙ্গ যদি নিজে এসে আগুনে ঝাঁপ দেয়, তাতে আগুনের কি অপরাধ থাকতে পারে! জীবনী শক্তি কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ছাই করাটাই তো তার ধর্ম। কিন্তু আহীর তা করেনি। করেনি! না আমি করতে দিই নি! কিসের লোভে আহীরকে টেনে আনলাম কলকাতায়। নিজের রোগগ্রস্থ শরীরটা দেখিয়ে ওর সিমপ্যাথি কুড়োনোর জন্যে? না ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করে ওর ভালোবাসা আদায়ের জন্যে? না কি শেষ বারের মত একবার দেখার জন্য? কিন্তু অসুস্থ সমি তো কিছুই জানে না। সে জানেই না তার প্রেমের অজ্ঞাত জগতে অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘটেছে তার বাবা মার অনুপ্রবেশ। সে যে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে আছে হসপিটালের বিছানায়। তাই এই মুহূর্তে আহীরকে পেতে চাওয়াটা অর্থ-হীন। চাওয়াটা হয়ত অর্থহীন নয় কিন্তু পাওয়াটা অর্থহীন। মানুষ কি চাইবে সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু পাওয়াটা নির্ভর করছে তার মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সির উপর। আর এই মুহূর্তে অসুস্থ সমি মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে তার কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। তাই তো মুখফুটে কাউকে বলতে

পারছে না, তোমরা আহীরকে একবার এনে দাও আমার কাছে। বলবে না, কারণ তার মনে হয়েছে তার ভালবাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া আহীরের ক্ষমতার বাইরে। আর আহীরকে ছাড়া সে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই, সেই সনাতন প্রেমের সংবেদনের নিবিড়তাই সমিকে এরকম নিষ্ঠুর অভিমানী করে তুলেছে।

কিন্তু আমি এখনো আমার এফিসিয়েন্সি হারাইনি। আমার শরীরে অসহ্য সমির যন্ত্রণা। কিন্তু মনের চাপা ক্ষোভ আমার ইচ্ছাশক্তিকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে। আমি অনেক কিছু করতে পারি—ভেঙে গড়ে অবার ভাঙতে পারি—আহীরকে আগ্রা থেকে এখানে টেনে আনতে পারি—ওকে ওর নিরুপায়তা থেকে মুক্তি দিতে পারি—দেব মুক্তি। সেই জন্যেই তো ওকে টেনে এনেছি আমার মৃত্যুশয্যার পাশে। যথা সময়ে আহীব আমাদের বাড়ি এসে পৌঁছবে। বাপি মা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। প্রাথমিক পরিচয় পর্বের পর সামান্য সৌজন্য মূলক আদান প্রদান তারপরই সরাসরি সমিকে নিয়ে শুরু হবে আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনা। সব শুনে আহীর নিশ্চই হস্‌পিটালে যেতে চাইবে। সেটাই তো স্বাভাবিক। পাশাপাশি সিটে দুজন বসে আছে। বাপি আর আহীর। কলকাতার রাস্তা ধরে গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে হস্‌পিটালের দিকে। দুজনেই নীরব এবং চিন্তামগ্ন। কি ভাবছেন বাপি! ভাবছেন ছেলেটা বেশ। সমির জন্য এমন একটা সুন্দর ছেলেই আমি চেয়েছিলাম। সমির পছন্দের তারিফ করতে হয়। আজ আহীরকে দেখে মেয়েটা নিশ্চই বাঁচতে চাইবে। মৃত্যুর খেয়াল মুছে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠতে চাইবে। আমি আবার ফিরে পাব সমিকে। ঈশ্বর, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। বাপি আহীরের দিকে তাকালেন। ওর মুখটা গম্ভীর। জানালার কাচের সার্সী ভেদ করে দৃষ্টি চলে গেছে বাইরে। ওর ভাবনার গতি কোন দিকে মোড় নিয়েছে কে জানে! হয়ত ভাবছে, একটা জেদি মেয়ের খামখেয়ালিপনার স্বীকার হয়েছি আমি। কেন যে ওর চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম কে জানে। না দিলে আজ এ ঝামেলায় পড়তে হত না। সব কাজকর্ম ছেড়ে ফালতু সময় নষ্ট…। আমার ওরকম সিরিয়াস কন্ডিশানে আহীর এসব ভাবতে পারে! না কি ভাবছে, সমি আমাকে এত ভালোবাসে আগে বুঝিনি। ওকে এভাবে কষ্ট দেওয়া উচিত হয় নি। যেমন করেই হোক ওকে সারিয়ে তুলতেই হবে। তারপর… তারপর…জানি না। আমি জানি না আহীর কি ভাবছে। আমি ওকে বুঝতে পারি না। বুঝতে পারছি না।

হস্‌পিটালের সিঁড়ি দিয়ে আহীর উঠছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার কেবিনের দিকে। কি ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে। আহীরের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার অভিমানী মন সে ইচ্ছেকে দু পায়ে মাড়িয়ে আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, 'নো কম্প্রোমাইজ। নিজেকে কঠোর কর। দুঃখ প্রকাশের সামান্যতম সুযোগটুকু ওকে দিও না। ওকে মুক্তি দাও।

ওর নিরুপায়তা থেকে মুক্তি দাও ওকে।'

দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকল আহীর, দাঁড়িয়েছে বিছানার পাশে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে উঠে আসা একটা বুভুক্ষু মেয়ের শরীর। শরীর না শব বোঝা যাচ্ছে না। ভাবছে মাত্র দুমাস আগে এই মেয়েটাকে দেখেছি। এই কয়দিনে কি চেহারা করেছে নিজের! এত নিষ্ঠুর ভাবে কেউ নিজেকে কষ্ট দিতে পারে! মেয়েটা সত্যি পাগল। আমার উপর ঝুঁকে পড়ে ও আমাকে ডাকছে, 'সমি, সমি—'

আমি সাড়া দিচ্ছি না। চোখ খুলছি না। সাড়া দেব কি করে আমি তো শুনতেই পাচ্ছি না। আহীর ধীরে ধীরে আমাকে স্পর্শ করল। এ কি! এত ঠাণ্ডা কেন! আমার স্পন্দনহীন শরীরটা আঁকড়ে 'সমি' বলে চিৎকার করে ডাকে। পাশের কেবিন থেকে ছুটে আসেন ডাক্তার, নার্স, সেই সঙ্গে বাপিও। আমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার নিরাশ হয়ে বললেন, 'ও নো! আই অ্যাম সরি। শী ইজ নো মোর।'

আহীর যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একবার আমার মুখের দিকে তাকায় একবার ডাক্তারের মুখের দিকে। আমাকে ভালো করে ছুঁয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে। কি রকম বোকা হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলছে, 'না ডাক্তার বাবু, আপনি ভালো করে দেখুন, সমির কিচ্ছু হয়নি। ও ভীষণ দুর্বল তো বোধ হয় সেন্সলেস হয়ে পড়েছে। আমার সাথে দুটো কথা বলার জন্য ও এখান থেকে আগ্রাতে ফোন করেছিল আর আমি নিজে এখানে এসেছি ও আমার সাথে কথা বলবে না! তাই কখনো হয়? আপনি ওকে একবারটি জাগিয়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি, ওকে আমি সারিয়ে তুলবোই। প্লীজ ডাক্তার বাবু, আপনি ওকে একটু দেখুন না। আমি জানি সমি ভালো আছে। ওর কিছু হয়নি...।'

আহীর মুখে বলছে সমির কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু মনে মনে একটু একটু করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সমি আর বেঁচে নেই, মারা গেছে। ও সমিকে নয়, সমির মৃত শরীরটাকে আগলে বসে আছে।এ বিশ্বাস মনের যত গভীরে গিয়ে স্পর্শ করছে ও ততই বাস্ট হচ্ছে। আহীর কাঁদছে। আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠছে। সার্থক আমার মরণ। ময়ূরের মত পেখম মেলে নাচতে ইচ্ছে করছে আমার। ঠিক হয়েছে, বড্ড জব্দ। তুমি কি ভেবেছিলেন, আমার জীবনটা কোন হিন্দী ফিল্মের স্ক্রিপ্ট! প্রথমে নায়ক কর্তৃক নায়িকা প্রত্যাখ্যাত। সেই শোকে নায়িকার মৃত্যু পথে গমন। নাকে অক্সিজেন পাইপ গুঁজে হস্পিটালে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই। এ দুঃসংবাদ পেয়ে নায়ক সেই দূর পরদেশ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। তারপর, অপারেশন থিয়েটার—লাল আলো—থোড়া সাস্পেন্স—অপারেশান সাক্সেসফুল।

এবার নায়কের দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা এবং আতশবাজী পুড়িয়ে ধুম-

থামসে শাদী···ব্যাস্। ধরা বাঁধা রাস্তা ধরে স্কেটিং স্যুতে পা গলিয়ে স্লিপ গড় গড় করে এগোতে এগোতে একেবারে দ্যা এণ্ড—এ গিয়ে থামবে। অত সোজা নয়, এটা বাস্তব ; এখানে ও সব ফিল্মী প্রক্সি চলে না। যতই কাঁদো আমি আর ফিরছি না। ভালোই তো হল তোমাকে আর নিরুপায় হতে হবে না আমার জন্য। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, জান্ ছুটা ইস্ বিগ প্রবলেম সে।

হায় আল্লা, বাপি কই! এতক্ষণ আহীরকে নিয়ে বসে আছি বাপির কথা মনেই নেই। ঐ তো বাপি। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি তো কাঁদছেন না! সামনে একমাত্র মেয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে আর ওনার চোখে জল নেই! ও বুঝেছি, শোকে পাথর হয়ে গেছেন। আহীর আমাকে ছেড়ে বাপির দিকে এগিয়ে গেল।

'স্যার, স্যার সমি কথা বলছে না আমার সাথে। ও এখনো অভিমান করে আছে আমার উপর। আপনি ওকে ডাকুন ঠিক সাড়া দেবে। ও আপনাকে বড্ড ভালোবাসে। আপনি ডাকলে সাড়া দেবেই। ডাকুন না স্যার ; স্যার—'

ও নো! বাপির শরীরও নিথর। না না এ অসম্ভব। আমাকে বাঁচতেই হবে। তা না হলে গোটা পরিবারটা ধ্বংশ হয়ে যাবে। আমার আর বাপির এরকম খবর শুনে মা কি বাঁচতে পারবেন না কি! আর ঠাকুমা! ছোট পিশির মৃত্যু শোক ভুলেছেন আমাকে নিয়ে। আমার মৃত্যু শোক ভুলবেন কাকে নিয়ে! এমন তো কেউ নেই। ঠাকুমাও মারা যাবেন। ইম্পসিবল! এতগুলো মানুষের মৃত্যুদায় আমি বইতে পারব না। এ তো এক ধরনের গণহত্যা। মহাপাপ; নরকের চাইতেও জঘন্যতম জায়গায়ও আমার ঠাঁই হবে না। ছিঃ! ধিক্কার নিজেকে।

আমার বিবেকবান সচেতন মন আমাকে তিরস্কার করছে—"ভালোবাসার যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা নেই যদি ভালোবাসতে গেছিলে কেন? এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? তুমি জানতে না তুমি ছাড়া তোমার বাড়ির লোকের কি হাল হতে পারে? আহীর তো দুদিন পর ভুলে যাবে তোমার কথা। সুন্দরী কোন মেয়েকে বিয়ে করে সুখে কালাতিপাত করবে। আর করবে নাই বা কেন ; সে কি তোমার মত উন্মাদ না কি! নিশ্চই করবে—সেটাই স্বাভাবিক, এতে কোন অন্যায় নেই। তুমি ওকে ভালোবাসতেই পার কিন্তু ও তোমাকে ভালোবাসবে কি না সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে তুমি জোর করতে পার না। সংকীর্ণমনা মানুষের মত ওকে ব্লেম করতে পার না। বরং এভাবে ডিস্টার্ভ করার জন্য আহীরের কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। ইমিডিয়েট।"

অনেকদিন পর খাতা কলম নিয়ে বসলাম।

অভিপ্রেষু আহীর,

প্রথমেই তোমার কাছে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি একটু সময়ের জন্য। নু না,

তোমাকে অহেতুক বিরক্ত করতে এ চিঠি লিখছি না। আমি জানি তুমি আমার চিঠির প্রতীক্ষায় ছিলে না। (নিজেকে এতটা সৌভাগ্যপূর্ণ ভাবার মত বোকা আমি নই।) তবুও লিখছি। এটা আমার দুর্বলতা বলতে পার। আর হয়ত ভবিষ্যতেও লিখব। সে তুমি আমাকে চিঠি দাও আর নাই দাও। ভেবো না আমি তোমার উপর অভিমান করে বসে আছি; কারণ আমি তার উপরই অভিমান করি যে আমার অভিমানের মূল্য দেয়। তুমি এভাবে রী-অ্যাক্ট করবে জানলে আমি এ সত্যটাকে কোনদিনই সামনে আসতে দিতাম না। ভেবেছিলাম তোমার কথা কাউকে বলতে না পারি অন্তত তোমাকে তো বলতে পারব! কিন্তু তুমি শুনতে চাইবে না বা এভাবে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নেবে বুঝতে পারি নি। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখ বন্ধু। আমি তোমাকে ভালোবাসি। সো হোয়াট? তারমানে এটা নিশ্চই নয় যে তুমিও আমাকে ভালোবাসতে বাধ্য! কাম অন্ ইয়ার ডোন্ট বী সিলি! আমাকে এতটা ন্যারো মাইনডেভ্ না ভাবলেই বোধ হয় ভালো করতে। এই তুমি গর্ব কর আমাকে চিনেছ বলে! সত্যি কথাটা স্পষ্ট করে বলার সাহস যেমন আমার আছে সে রকম সত্যটাকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতাও আমি রাখি। সে সত্য যতই নির্মম হোক না কেন। আমি জানি আহীর, তোমার হতে চাওয়াটা অমলকান্তির রোদ্দুর হতে চাওয়ার মতই চিরকাল নাগালের বাইরে রয়ে যাওয়া এক সাধ্যহীন সাধ; আই নিউ ইট। তুমি খামোকা টেন্সড্ হচ্ছ কেন? তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমার এ নিরবতা আমার অপরাধ বোধকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলছে? নিজের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছি আমি। আমি নিশ্চত আমার শেষ চিঠিটা না পাঠালে এতদিনে অন্তত একটা চিঠি আমাকে দিতে। নুনা হেসো না। তুমি কি ভাবছ আমি কিছু বুঝি না? শোন, শোন— তুমি যদি ভেবে থাক যে আমি তোমার কাছে কনফেস করে কোন অপরাধ করেছি তাহলে শাস্তি দাও, আমি তৈরী। (অবশ্য শাস্তি দেবার অবকাশ যদি তোমার থাকে।) তবে দুম করে যেন বোলে বোস না যে কলকাতার কোন ছেলেকে বিয়ে কর। সে আমি পারব না। তবে হ্যাঁ, সুদূর ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বিয়ে করি তো তোমাকে অবশ্যই ডাকব, পিঁড়ি ধরার জন্য! হাসছ যে? তুমি তো এটাই চাও, হোক না আমার কষ্ট তাতে তোমার কি?

আহীর, আমাদের সমাজে ছেলেরা বিয়ে করে, আর মেয়েদের বিয়ে হয়। আমি যদি নিজেকে ঐ বিয়ে হওয়া মেয়েদের দলে দাঁড় করাতাম, তাহলে হয়ত এতদিন আমার বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, নিজে পছন্দ করে। আমার সাথীকে আমি নিজে খুঁজে নিতে চেয়েছিলাম উইদাউট এনি হেল্প। নিজেকে কথা দিয়েছিলাম, যদি খুঁজে পাই তবেই করব তা না হলে নয়।' সেদিন একবারও ভাবিনি খুঁজে পেয়েও যদি হারিয়ে ফেলি তখন? তাতে কি! এখন ভেবে নেব। তাই বলে তুমি আমার ভুল বুঝবে? দোহাই

বন্ধু, এভাবে আমাদের সম্পর্কে ইতি টেনো না। আবার নতুন করে আজনবী হয়ে যেও না প্রীজ। তোমাকে হারাতে বড্ড কষ্ট হবে, বিশ্বাস কর।

কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন তোমায় ফোন করে বিরক্ত করব না, বলব না চিঠি দিও। কিচ্ছু চাই না আমার, তোমার প্রতিবিম্বও নয়। আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার কবিতা। আশা করি আমার এ চিঠি তোমাকে ভার মুক্ত হতে সাহায্য করবে। চলি। ভালো থেকো।—

সমি

এ চিঠি কাউকে দিয়ে পোস্ট করা যাবে না। আমি চাই না আহীর নামটা কেউ জানুক। সুতরাং আমাকেই বের হতে হবে। অনেক দিন পর বাড়ির বাইরে পা রাখলাম, আর বুঝতে পারলাম সত্যিই আমি কতটা বদলে গেছি। পরিচিত যার সঙ্গেই দেখা হয় সেই বলে, 'কোথায় গিয়েছিলিস এতদিন, দেখতে পাইনি কেন? কি ব্যাপার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন? কি হয়েছে শরীর খারাপ?…'

হেসে যতটা পিঠ বাঁচিয়ে চলা যায় চলছি। এই তো আমি হাসতে পারছি। বাঃ! আজ নিজের উপর থেকে আরো একটা ধারণা বদলে গেল। এতদিন বলতাম, 'হাসতে না পারলে হাসব না, কিন্তু আন্তরিকতা হীন দেঁতো হাসি আমি হাসতে পারি না।' কে বললে পারি না! এই তো বেশ হাসছি। এ হাসিতে তো আন্তরিকতা নেই। কেবলই মনে হচ্ছে এদের সাথে দেখা না হলেই ভালো হত। ইচ্ছে করছে না কথা বলতে।

নিত্যকার অভ্যাস মত সেদিনও দুপুর বেলা বাইরের দালানে গেছি কোন চিঠি এসেছে কি না দেখতে! দেখি একটা ইনল্যাণ্ড খাম পড়ে আছে। বুকটা চড়াৎ করে উঠল, আহীরের চিঠি! হাতে তুলে নিয়ে দেখি বাপির নাম লেখা! কে পাঠিয়েছে দেখতে গিয়ে দেখি—

Dr. S. Mandal. Box No:…Aajkal. সর্বনাশ! এ নিশ্চই কোন পাত্র পক্ষের চিঠি। বাপি আজকাল পেপার থেকে আমার বিয়ের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন, এ নিশ্চই তার রিপ্লাই। ঝট্‌পট্ চিঠিটা লুকিয়ে ফেললাম। এখানে আপাতত কেউ নেই। বাপি কলেজে, মা ছাতে। ঘরে এসে খামটা খুললাম। আমার সন্দেহ নির্ভুল।

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া নিজের পূর্ণ পরিচয় বর্ণনা করলাম………।
উপরোক্ত বিবরণে আগ্রহী হইলে পাত্রীর ছবি সহ সত্তর যোগাযোগ করুন।

নমস্কারান্তে—

পাত্র নিজেই লিখেছে। বাট আই অ্যাম সরি ডাক্তার বাবু! আমি এখন বিয়ে করার মুডে নেই। আহীর আমার মুড বিগড়ে দিয়ে গেছে। সুতরাং এ চিঠি বাপির

কাছে পেঁছিবে না। চিঠির যথাযথ মূল্য দিতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত। প্লীজ আপনি অন্য কোথাও ট্রাই করুন, অ্যান্ড এক্সকিউজ মী।

সন্ধ্যেবেলা ডায়নিং টেবিলে মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছি। বাপি এসে দাঁড়ালেন সামনে। আমার বর্তমান অবস্থায় বাপি যথেষ্ট চিন্তিত কিন্তু মার মত করে আমাকে সান্ত্বনা দেন না। মাথায় হাত রেখে বললেন, 'সমি, কেন এরকম গুম হয়ে বসে আছিস! অন্য কিছু করতে ভালো না লাগে বই পড়। জানিস তো, বই এর মত ভালো বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। সবাই ছেড়ে চলে গেলেও বই তোকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বই পড়, ভালো থাকবি।'

বই-এর র‍্যাক থেকে কাঁচের সাটার টানার শব্দ হল। একটা মোটা বই এনে আমার সামনে রাখলেন, 'পড়। মনটা নিজের দিক থেকে সরিয়ে বইতে দেবার চেষ্টা কর। দেখবি কষ্ট অনেক কমে গেছে!'

বাপি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বইটা পড়ে আছে সামনে। বিভূতি-রচনাবলী; ইচ্ছে হচ্ছে না পাতা উল্টে দেখি। তাছাড়া আমার মনের যা অবস্থা তাতে করে বিভূতি-রচনাবলীতে কাজ হবে না। হ্যাঁ; এ অসুখের ওষুধ আছে রবি ঠাকুরের কাছে। মানুষের মনের কথা রবি ঠাকুরের মত করে আর কেউ বলতে পারে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে সঞ্চয়িতাটা বের করলাম। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে 'বিদায় অভিশাপ' চখে পড়ল। নিজেকে দেবযানীর মত অসহায় প্রত্যাখ্যাত মনে হচ্ছে। পড়ছি মনে মনে। এর আগে কতবার পড়েছি কিন্তু বুকের মাঝে এমন রক্তক্ষরণ হয়নি কখনো। আজ হচ্ছে। তুমি কেন লিখেছ রবি ঠাকুর, 'প্রেম অন্তর্যামী?' দেবযানীর প্রেম কি বুঝতে পেয়েছিল কচের অন্তরের কথা? প্রেম অন্তর্যামী হলে সেদিন দেবযানী এত কষ্ট পেত না। আজ আমি কষ্ট পেতাম না। তোমাকে তো ভালোবেসে কখনো আমাদের মত কষ্ট পেতে হয়নি তুমি তো বলবেই প্রেম অন্তর্যামী। আমার কাছে প্রেম আলেয়া, রামধনুর মত একটা সুন্দর মিথ্যে, মৃত্যু উপত্যকার এক লোভনীয় হাতছানি। আমি প্রজ্ঞা নই রবি ঠাকুর কিন্তু আমার যে মন পুড়েছে; এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে প্রেমের অন্য ব্যাখ্যা দি কি করে বল! আমার প্রেম যে আমাকে অশ্রু ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। যুগ যুগ ধরে কচেরা দেবযানীদের কাঁদিয়ে এসেছে। এঁদের কাছে নারীর অযাচিত প্রেম সুলভ তৃণসম। চিরকাল পদ পিষ্টে দলিত মথিত হয়েই এ প্রেম পূর্ণতা পায়। আমি কাঁদছি—আমি কাঁদছি।

মনের জ্বালা জুড়োতে তোমার দরবারে এসেছিলাম কবি। তোমার স্মরণে এসে নিজেকে ভুলতে চেয়েছিলাম। নতুন করে মনে পড়ে গেল সবকিছু। হৃদয়ের হুতানল নির্বাপিত করতে তোমার সুধা ঝর্ণার নিচে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম! এ যে দেখি দাবানলের লেলিহান শিখা স্বর্প জিহ্বা হয়ে আমাকে দংশন করছে। সঞ্চয়িতায় মাথা রেখে কাঁদছি। কবির উপর অভিমান হয়েছে আমার।

* * *

চোখের সামনে এ অধঃপতন কতদিন আর নিরবে সহ্য করা যায়! আমার ব্যবহারে বাড়ির লোক চরম অশান্তিতে ভুগছেন। এমন কি ঠাকুমাও। উনি এখন এখানে। চেক্‌আপ করাতে এসেছেন। ঠাকুমাকে দেখাশুনা করার দায়িত্ব আমার। প্রতিবারের মত এবারেও সে কর্তব্যে সামান্যতম ত্রুটি রাখিনি। ঠাকুমাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাচ্ছি। আমাকে নিরব দেখে ঠাকুমাই শুরু করলেন, 'কেন এরকম চুপচাপ আছিস সমি? এতে কি লাভ হচ্ছে? আর কোন মুখপোড়া তোর লেখা ফেরৎ দিয়েছে শুনি! অমন সুন্দর সুন্দর গল্প, শুনলে মন ভরে যায়....'

আমার অধিকাংশ গল্প উপন্যাস ঠাকুমার শোনা। এখন আর নিজে পড়তে পারেন না। এখানে এলে খালি বলেন, 'তোর গল্পগুলো পড়ে শোনা। আমার খুব ভাল্‌লাগে।' উনি আমার একনিষ্ঠ শ্রোতা। শুধু শ্রোতা নন্‌ সমালোচকও বটে। গল্প শুনতে শুনতে দারুণ সব রিমার্কস্‌ করেন। সংকীর্ণতার সীমা অতিক্রান্ত করে অনেক উচ্চমানের কথা বলেন। মনে আছে বেশ কয়েক বছর আগের কথা, 'জ্বলন্ত দলিল' বলে একটা গল্প শুনিয়েছিলাম ঠাকুমাকে। মাতালদের নিয়ে লেখা। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বললেন, 'জানিস সমি, কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কেবলই ভাবছিলাম তুই এত সুন্দর করে এ গল্প লিখলি কি করে! আমাদের পরিবারে কেউ তো কখনো মদ ছোঁয়নি। মাতালদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ কখনো হয়নি তোর। তাহলে এদের পরিবারের যন্ত্রণার কথা তুই এত গভীরভাবে অনুভব করলি কি করে! ওদের দুঃখ-দুর্দশার কথা এত সুন্দরভাবে ভাষায় প্রকাশ করলি কি করে! গল্পটা আমার এত ভালো-লেগেছে যে কি বলব....'

সেদিন মনে হয়েছিল, সার্থক আমার লেখা। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর হয় না কি!

'এবারে এলাম, একটাও গল্প শোনালি না। ভালো করে কথাই বলছিস না। ডাক্তার দেখানো হয়ে গেলে চলে যাব। এবারে আর বেশী দিন থাকব না....'

মনে হল একবার বলি। কেন যাবে? এখন ওসব যাওয়া টাওয়া হবে না। এসেছ কদিন থেকে যাও। যেমন প্রতিবারে বলি আর কি। কিন্তু মুখ দিয়ে একটাও কথা বের হল না। ভাবনাগুলো মনের কোনো উঁকি দিয়ে মনের সাগরেই তলিয়ে গেল; কথায় প্রকাশ পেল না। ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখি আমাদের আগেই বাপি পেঁছে গেছেন। ঠাকুমার চেক্‌আপের পর ডাক্তারবাবু আমাকে ডাকছেন। আমি তো অবাক। এরকম কথা তো ছিল না। বাপির দিকে তাকাতে উনি আমাকে ইশারা করে যেতে বললেন। ও বুঝেছি, এতদিন অনুরোধ উপরোধ করে ডাক্তারের কাছে আনতে পারেন নি। তাই আজ সুযোগটা এভাবে কাজে লাগালেন। আমার খুব রাগ হচ্ছে। ওখানে কিছু বলা মানেই পাঁচ জনের সামনে সিন ক্রিয়েট করা। যেটা

আমার রুচিতে বাধে, আর মোটেও শোভন জনক নয়। তাই বাধ্য হয়েই ভিতরে গেলাম। ডাক্তারবাবু সস্নেহে জিগ্যেস করছেন, 'কি হয়েছে রে মা? কে এত ডিপ্রেশানে ভুগছিস। আমাকে সব খুলে বল, কোন ভয় নেই। তুই ভালে হয়ে যাবি।'

আমার মনের সবচাইতে দুর্বল স্থানে স্পর্শ করেছেন উনি। জানি আমি আর ভালো হব না। তবু ওনাকে সবকিছু বলতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে মুখের সব রন্ধ্রগুলো দিয়ে কথাগুলো কান্না হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। আমার অস্বস্তি লাগছে।

'বলনা, বলনা কি হয়েছে। কিসের এত কষ্ট তোর?'

'কিছু হয়নি। আমি ভালো আছি।'

উনি হাসছেন, 'ডাক্তার আমি না তুই? বাবা আমাকে সব বলেছেন। তুই বাড়িতে কারুর সাথে কথা বলিস না। আমার সাথেও বলবি না? শো দেখি। প্রেসারটি দেখব···কষ্টের কথা কাউকে বললে কষ্ট কম হয় রে পাগলি। বল আমাকে।'

ডাক্তারবাবুকে বলব আহীরের কথা! উনি কি পারবেন আহীরকে আমার কাছে এনে দিতে!···নাহ্, এ ভার আমি একা বইব।

'ওঠ। শরীর মোটেও ভালো নেই। বললি না তো কিছু! বাবাকে ডাক।'

দরজা খুলতেই বাপি ভিতরে এলেন। 'শুনুন, চিন্তার কিছু নেই। আমি ওষুধ দিচ্ছি। এখন ওর খাওয়া আর ঘুমটা বিশেষ প্রয়োজন। ঘুমের ওষুধও দেব; রাত্রে ঘুম হবে। সব কষ্ট ভুলে যাবে। তবে মেয়েটা আমাদের বড্ড অভিমানী। ওর মনের কথা কাউকে বলবে না। আমি ওকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করলাম, আমাকেও বলবে না।'

'আবার কবে নিয়ে আসব?'

'আপনাকে আর আসতে হবে না। ও নিজে আসবে। যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবি। আমার সাথে একটু গল্প করে যাবি। যা।'

রাত্রে ঠাকুমাকে ওষুধ খাইয়ে নিজের ওষুধটা বের করেছি। মনে পড়ছে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো—'রাত্রে ভালো ঘুম হবে। ভুলে যাবে সব কষ্ট।'

এ ওষুধ খেলে যদি আহীরকে ভুলে যাই! এমনটাও কি সম্ভব হতে পারে! ভয় পাচ্ছে। দরকার নেই আমার কষ্ট লাঘব করে। এ কষ্ট আমার বেঁচে থাকার ইন্ধন। এ আমি ভুলতে চাই না। রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে আহীরকে একান্ত ভাবে খুঁজে পাই। এ পাওয়া থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে পারব না। খাব না ওষুধ। কিছুতেই খাব না। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ক্যাপসুল ট্যাবলেটগুলো জায়গা পেত পাশের ডোবায় আর মিক্সচার বেসিনে। একদিন তো ধরা পড়ে গেলাম, অবশ্য সরাসরি নয়। অনুমানের উপর ভিত্তি করে বাপি বললেন, 'ওষুধগুলো নিয়মিত খাচ্ছিস তো সমি, না কি সব ফেলে দিচ্ছিস? একদিনও তো খেতে দেখলাম না।'

'না না, খায় খায়।' ঠাকুমা বললেন।

'ওষুধ নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখেছি, খেতে দেখিনি।'

'খায় রে বাবা। আমাকে ওষুধ খাইয়ে তারপর খায়।'

ওষুধের কোর্স কমপ্লিট। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আজও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আজ সকাল থেকে আকাশটা ভীষণ মেঘলা করে আছে। একটু আগে টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি স্নান সেরে ভিজে জামাগুলো ছাতে শুকোতে দিতে গেছি শুনতে পেলাম কাকিমা ডাকছেন। ছুটে রেলিং-এর কাছে এসে দেখি কাকিমা বলছেন—

'সমি তোমার ফোন এসেছে। একটু পরে আবার করবে।'

আহীর! আহীর ফোন করেছে! এই মুহূর্তে আর কারুর কথা মনে পড়ছে না। আমার হার্ট বিট্‌ ডাবল হয়ে গেছে। কাকুর বাড়িতে বসে আছি। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। বুকের নিচে দুরু দুরু শব্দ হচ্ছে। সামনে ফোন; ভাবছি কি বলব। ও কোথা থেকে ফোন করছে! আগ্রা থেকে, না দেশে ফিরেছে! রিং হচ্ছে।

'হ্যালো!' কথা না বলে বলে গলাটা চোক্ট হয়ে গেছে।

'হ্যালো—কে কথা বলছেন?'

'আমি কুহেলি।'

'ও—সমি! আমি মামা বলছি।'

আমি চুপ করে গেছি। যেন বুঝতেই পারছি না কে। তবে এটা বুঝতে পেরেছি আহীর নয়।

'হ্যালো! হ্যালো সমি—'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'কি ব্যাপার কথা বলছিস না কেন? শোন, বাপিকে বলবি এই সপ্তাহে শনিবার আমি যাব। বাপিকে থাকতে বলিস। কি রে!'

'হ্যাঁ, বলব।'

'তোদের খবর কি?'

'ভালো।'

'তোর মা কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'আচ্ছা ছাড়ছি, বাপিকে থাকতে বলিস কিন্তু। আমি যাব।'

মামা ফোন নামিয়ে রেখেছেন। তাড়াহুড়ো করে কি যেন হয়ে গেল। আমার ঘোর এখনো কাটেনি। কাকিমা ঘরে ঢুকলেন।

'কি গো দাঁড়িয়ে আছ?'

'অ্যাঁ! মামা ফোন করেছিল।' বোকার মত হাসার চেষ্টা করছি।

কাকিমা রান্না ঘরের দিকে গেলেন, 'বোস না। আবার মনে হয় বৃষ্টি আসবে।'

'হ্যাঁ, চলে যাই।'

'আরে বোস না। এইটুকু তো যাবে, যাই যাই করছ কেন।'

আমার চোখ চলে গেছে বিছানার কোনে। রবি ঠাকুরের শেষের কবিতা।

'কাকিমা—তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব, দেবে?'

'কি গো?'

'শেষের কবিতা।'

'হ্যাঁ, না দেবার কি আছে! নিয়ে যাও। আগে পড় নি?'

'দুর্ভাগ্য বশত না। তোমার আলমারিতে অনেক বই।'

'আরো ছিল। সব পড়বে বলে নিয়ে পরে আর দেয় না। কি করে ভুলে যায় বুঝি না।'

'তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আমি দিয়ে যাব, মলাট করে।'

'তাহলে তো ভালোই হল। আর তুমি ভুলে গেলেও আমি নিয়ে আসতে পারব।'

'তার দরকার হবে না। আসি।'

'আবার এস। বই দিতে নয়, এমনি।'

'আসব।'

দুদিনে বইটা শেষ করলাম। একবার পড়ে হল না, আবার পড়লাম; বার বার। কিন্তু নিজের গণ্ডীর বাইরে এসে কিছু ভাবতে পারছি না। আমার সংকীর্ণ মনে এত উদারতা কোথায় পাব! আমি যে প্রজ্ঞা নই। তাইতো ভাবছি লাবণ্য—অমিত-এর পারস্পরিক ব্যবধান বন্যা-মিতা-তে এসে থেমে গেল কেন! কেন ওরা লীন হতে পারল না! এ যেন সেই সমুদ্র আর অম্বরের ব্যবধান। সাগরের বুকে প্রতিচ্ছবি দেখে তবেই আকাশ নিজেকে চিনতে পারে। আর সাগরের যত রূপ যত গভীরতা সে তো আকাশেরই জন্য। ঢেউ এর মাথায় মাথায় আকাশ যদি নিজেকে মেলে না ধরতো তাহলে সাগর কি এত রূপসী হত। ওদের রূপ একে অপরের পরিপূরক। অথচ কি নিদারুণ সত্য, ওরা কখনো পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারে না। দুয়ের মধ্যে এক অনন্ত অন্তরীক্ষ। কিন্তু আমি স্পর্শ করতে চাই। অন্তরীক্ষের সকল বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ছুঁতে চাই আহীরকে। আমি সাগরের সৌন্দর্য চাই না। অম্বরের উদারতাও আমার মধ্যে নেই। আমি সাধারণ একটা মেয়ে। আমি শুধু ভালোবাসতে চাই। তোমার প্রেমের বিরহবহ্নি দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেঘ করে নাও। আমি তোমার বুকে ভেসে বেড়াতে চাই আহীর। আমার অধিকারকে স্বীকৃতি দাও—

আমি অনূঢ়া স্বয়ম্বরা
তব প্রণয় পিয়াসী রোহিনী
হে মোর চন্দ্র প্রভু
আজি সন্তপ কর শুভ যামিনী॥

'সমি, বাপি তোকে ছাতে ডাকছে।'

ছাতে যেতেই বাপি জানতে চাইলেন 'কি করছিলিস ?'

'কিছু না, বসেছিলাম।'

'তুই আর ডাক্তার খানায় যাবি না ?'

'না।'

'তাহলে সাইকিঅ্যাট্রিস্টের কাছে চল।'

আমার অবাক লাগছে। আমি কি পাগলের মত কোন আচরণ করছি ! এই তো গত কাল না পরশু ঠাকুমা মার কাছে বলছিলেন, 'তুমি দেখে নিও বৌমা, এরকম গুমে হয়ে থেকে থেকে ও বড় ধরনের একটা মানসিক রোগ বাঁধিয়ে বসবে। তখন আর কিচ্ছু করার থাকবে না। এখনই কিছু বললে মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। দিনরাত একই চিন্তা করে করে পাগল হয়ে যাবে মেয়েটা। ও যা চায় তাই দাও।'

'কি দেব ওকে, ও তো কিছুই চায় না। কিছুই বলছে না।' মা কাঁদছেন।

'চুপ কর, কেঁদে কি করবে। ওকে এখান থেকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা বল। এখন বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া খুব দরকার। ওকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দাও। সেখানে পাঁচজনের সঙ্গে থাকলে মনটা ভালো থাকবে।'

'আমি বলেছিলাম, রাজি হয়নি। বেহালায় যাবার কথাও বলেছিলাম…।'

'ঠিক আছে ঘুম থেকে উঠুক, আমিই বলব। সে রকম বুঝলে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

আমার চোখে ঘুম নেই। আমাকে নিয়ে ঠাকুমা মার আলোচনাগুলো কানে আসছে।

'কিরে, চুপ করে আছিস ! যাবি তো ?'

'আমি কি পাগল হয়ে গেছি বাপি ?'

'পাগল হবি কেন ! শুধু পাগলরাই কি সাইকিঅ্যাট্রিস্টের কাছে যায় না কি ? ওনারা যে কোন ধরনের মানসিক সমস্যার সমাধান করেন।'

'আমার কোন মানসিক সমস্যা নেই।'

'তাহলে এরকম করছিস কেন ? তুই নিজে বুঝতে পারছিস না কতটা বদলে গেছিস ? আগে এরকম ছিলিস ?'

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছি।

'শোন, আমি ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। উনিই বললেন তোকে সাইকিঅ্যাট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে। একজন ভালো সাইকিঅ্যাট্রিস্টের ঠিকানাও দিয়েছেন আমাকে।'

'আমি যাব না।'

'তুই কি চাইছিস বলত ?'

'কিচ্ছু না।'

'তাহলে এভাবে কতদিন চলবে ? দিনের পর দিন তোকে এভাবে দেখতে দেখতে

আমরা ফেড্ আপ হয়ে গেছি। দু মাস হয়ে গেল : আর কতদিন সহ্য করব বল! কেন এমন করছিস সমি? আমার কথা শোন…।'

বাপির যন্ত্রণা, কথা হয়ে আমাকে স্পর্শ করছে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। নিচে আসার জন্য পা বাড়াতেই বাধা পেলাম। 'কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া—সমি, অবাধ্য হোস না। আমার কথা শোন বাপি—'

বাপির কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। আমাকে কাঁদতে দেখে উনি আরো কষ্ট পাবেন। তাই চোখের জল লুকিয়ে চলে এলাম। ভাবছি, আমাকে যদি জোর করে সাইকিঅ্যাট্রিস্টের কাছে নিয়ে যায়! সিনেমায় দেখেছি, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে ওনারা প্রথমে রোগীকে হিপ্নোটাইজড্ করেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় অবচেতন মনের কথাগুলো টেনে বের করে আনেন। ঐ অবস্থায় পড়লে আমি তো আহীরের কথা সব বলে দেব। আমার চেতন অবচেতন মনে আহীর ছাড়া যে আর কিচ্ছু নেই। কি হবে তখন? সব কিছু শুনে বাপি নিশ্চই আহীরদের বাড়ি যাবেন। ওর বাবার কাছে গিয়ে অনুরোধ করবেন। দয়া করে আপনার ছেলেকে দিন তা না হলে আমার একমাত্র মেয়েটা পাগল হয়ে যাবে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সামনে বাপি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ও নো! ইম্পসিবল! বাপিকে এভাবে আমি কারুর কাছে ছোট করতে পারি না। ধিক্ আমার এ অর্থহীন জীবন। চাইনা আহীরকে। নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে এতবড় মূল্য দিতে পারব না। তাছাড়া আমাকে বিয়ে করার জন্য আমি কাউকে বাধ্য করতে পারি না। জোর করে ভালোবাসা আদায় করা যায় না; এতো সবাই জানে। তাছাড়া আহীরের জীবনে আমার উপস্থিতিটা নিদারুন এক অস্বস্তি হয়ে বেঁচে থাকুক এটাও আমার কাম্য নয়। হে ভগবান, কি করি আমি! নিজের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ধ্বংস হয়ে গেছি। একা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কর কাছে সাহায্য চাই! কে দেবে এই শ্বাসরুদ্ধ কর চক্রব্যূহ থেকে মুক্তি! কেউ নেই, কেউ নেই আমার। আমি একা। কাউকে বলতে পারব না আমার এ পরিস্থিতির কথা। তবে তেমন কোন পরিস্থিতি সামনে এলে আহীরের কোন নিশানা রাখব না আমার কাছে। ওর সব চিঠি ছবি যা কিছু ওর সঙ্গে জড়িয়ে সব পার্সল্ করে আগ্রায় পাঠিয়ে দেব। কাউকে জানতে দেব না আহীরের কথা। কিন্তু ওর সাথে অতিক্রান্ত যে মুহূর্তগুলো আমার মনে গচ্ছিত আছে, সেগুলো পার্সল্ করব কি করে! সেই থেকে তো ওরা হদিশ পেয়ে যাবে; তখন! না, আমি কিছুতেই সাইকিঅ্যাট্রিস্টের কাছে যাব না। আমার কষ্টের ঠিকানার সন্ধান আমি কাউকে দেব না। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেলেও না। পাগল হয়ে গেলে ভালোই হবে। রাঁচিটা ঘুরে আসা যাবে, কখনো যাইনি তো! জানি তখন হয়ত বেড়াবার মুডে থাকব না। হয়ত কোন বাস্তব সেন্সই থাকবে না। অন্য কোন জগতে ঘুরে বেড়াব। এমনটাও হতে পারে! আমার ভয় পাচ্ছে। শুনেছি পাগলদের কোন যন্ত্রণা নেই। পাষানের ও তো কোন যন্ত্রণা নেই। অনুভূতি হীন একটা জড় বস্তু। মনটা কি তাহলে

পাষাণ হয়ে যাবে! সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা এসব কোন অনুভূতিই কি আর ধরা পড়বে না মনের আয়নায়! আমি সেই চরম মুহূর্ত'টার কথা ভাবছি। কি অসম্ভব নিষ্ঠুর যন্ত্রণা পেয়ে তবেই না একটা সুক্ষ মন যন্ত্রণাহীন পাষানে পরিণত হয়! সে যন্ত্রণাটা কেমন! আমি কি পেয়েছি! কি জানি, মনে হয় না। ঈশ্বর, তুমি আমার হৃদয়কে আঘাত দিতে দিতে এমনই পাষাণ করে তোলো, যাতে আঘাত আমার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে ফিরে যায়। আঘাতকে আঘাত করার মত পাষাণ হৃদয় নিয়ে আমি নিশ্চই আহীরকে ভালোবাসতে পারব না! সবাইকে ভুলে যাব। সবাই কে? মা কেও! হ্যাঁ, সবাইকে। আর কাউকে চিনতে পারব না! শুধু বোকার মত তাকিয়ে থাকব কিছু বুঝতে পারব না। বেশ হবে তখন। এখানকার সব ডাক্তার ফেল। রাঁচিতে রেখে স্পেসাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু কোন ইমপ্রুভমেন্ট নেই। সারাক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। দৃষ্টিশূণ্য ভাবে তাকিয়ে থাকি দূরে, বহু দূরে। না, আর পাঁচটা পাগলের মত ভায়লেন্ট হয়ে উঠি না কখনো। যারা চিৎকার চেঁচামেচি করে তাদের সারিয়ে তোলা তুলনা মূলক সহজ। কারণ তারা কি করছে দেখে তারা কি চায় বা কিসের জন্য পাগল হয়েছে এটা বোঝা যায়। কিন্তু আমি তো মূক। বোবার শত্রুও নেই মিত্রও নেই। একা; এ দুনিয়ায় একা। শারীরিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য শারীরবৃত্তিয় কাজগুলো ছাড়া আর কিছুই করি না। আমার মন মরে গেছে। আমি অর্ধেক মানুষ হয়ে বেঁচে আছি। ভালোবাসার কি নিদারুন পরিণতি! আমাকে পাগল অবস্থায় দেখে আহীর কি ভাববে! কি ভাববে পরের ব্যাপার, ও জানবে টা কি করে! আমার কোন বন্ধু তো ওর কথা জানে না যে খবর দেবে, 'আহীর বাবু সমি আপনার জন্য পাগল হয়ে গেছে।' ইয়েস! বন্ধু; এই বন্ধু শব্দটা মাথার মধ্যে স্ট্রাইক করে গেল। আমার বন্ধু জানে না তো কি হয়েছে ওর বন্ধু তো আমায় জানে। মিস্টার মহেন সান্যাল। ওই খবর দেবে—

ফোনে রিং হচ্ছে। রিসিভার তুলে নিল।

'হ্যালো—আহীর বাসু স্পিকিং।'

'হ্যালো আহীর। আমি মহেন বলছি।'

'কি ব্যাপার, তুই কোথা থেকে?'

'রাঁচি থেকে। শোন, তোকে ভীষণ দরকার। তুই ইমিডিয়েট ছুটির জন্য অ্যাপ্লিকেশান দে। তোকে এখানে আসতে হবে একবার।'

'হোয়ট। রাঁচিতে! আমি ওখানে গিয়ে কি করব?'

'ফোনে এত কথা বলা যাবে না। শুধু জেনে রাখ তোর উপর একটা মেয়ের জীবন নির্ভর করছে—'

'মেয়ের জীবন! কি সব বকছিস?'

'বললাম তো, ফোনে এর বেশী বলা সম্ভব নয়। মন দিয়ে শোন; একটা ফোন নাম্বার নোট করে নে। ছুটি স্যাংশান হলে সঙ্গে সঙ্গে এই নাম্বারে আমাকে ফোন

করে জানাবি কবে কিভাবে আসছিস। আমি স্টেশানে থেকে তোকে রিসিভ করে নেব।'

'কিন্তু কি বলে ছুটি চাইব? তুই তো জানিস এখন এখানকার—'

'ও সব আমি শুনতে চাই না। তুমি কি বলে ছুটি ম্যানেজ করবে সেটা তোমার ব্যাপার। আশা করি একটা জীবনের মূল্য তুই বুঝিস। সো, আই অ্যাম ওয়েট ফর ইউ অ্যান্ড ইউ মাস্ট বী কাম ইমিডিয়েটলি। বাই, সি ইউ।'

আহীর মহা ঝামিলায় পড়ে গেছে। মহেন এমন অর্ডার করল, না গিয়েও উপায় নেই। কি যে হেঁয়ালি করে, কিছুই বোঝা গেল না। শেষ-মেষ ছুটি মিলল। নির্দিষ্ট সময়ে দেখা হল দু বন্ধুর। ধরা যাক, রাঁচিতে মহেনের পিসির বাড়ি। আহীরকে স্টেশান থেকে পিক্‌আপ করে মহেন পিসির বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে।

'তোর আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না। কি ব্যাপার বলত, এভাবে ডেকে আনলি কেন?'

'বলছি। সব বলব তোকে। আগে বাড়ি চল।'

'না, এক্ষুনি বল। যেতে যেতে শুনব।'

'তোর কুহেলিকে মনে আছে?'

'কুহেলি! কে কুহেলি?'

'ভুলে গেছিস কুহেলিকে!' মহেন অবাক। ঠোঁটে ভেসে ওঠে এক চিলতে হাসি। যার অর্থ আহীর ঠিক বুঝতে পারে না। মহেন বলে, 'কুহেলিও ভুলে গেছে তোকে। শুধু তোকে নয় নিজের বাবা মা, এমনকি নিজেকেও ভুলে গেছে।'

'মহেন, শুনেছি লোকে পাগল হয়ে রাঁচিতে আসে, তুই তো সুস্থ ছিলিস ভাই। তাহলে কি এখানে এসে পাগল হয়ে গেছিস?'

'পাগল আমি হইনি আহীর। কুহেলি পাগল হয়ে গেছে! তোর মনে পড়ছে না? একটা মেয়ে তোকে খুব সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখত। প্রথমে তোর সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল; পরে তোকে ভালোবেসে ফেলে। সে কথা ও তোকে জানিয়েও ছিল—'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কুহেলি, কুহেলি সান্যাল। সে তো অনেক দিনকার কথা। আমার কাছে ওর কয়েকটা ফটোও বোধ হয় থেকে থাকবে। কি হয়েছে ওর?'

'কুহেলি এখন এখানেই আছে। রাঁচির স্যানিটেরিয়ামে গত ছ মাস ধরে ওর চিকিৎসা চলছে।'

'তুই জানলি কি করে?'

'আমার এক রিলেটিভ, রাকেশদা ঐ স্যানিটোরিয়ামের এমপ্লয়ি। এমনিতে ওখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু রাকেশদার সাথে আমি গিয়েছিলাম; তখনই কুহেলিকে দেখি।'

'তুই এতটা কন্‌ফার্ম হয়ে বলছিস কি করে ওটা কুহেলি? তুই তো ওকে দেখিস নি, তোর ভুলও তো হতে পারে!'

'ইম্‌পসিবল ! আমার একটুও ভুল হয়নি। আমি ওকে সরাসরি দেখিনি ঠিকই কিন্তু তোর কাছে ওর ফটো দেখেছি। মিথ্যে বলব না, প্রথমটা আমারও একটু ডাউট ছিল। যতই হোক ছবি দেখে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাছাড়া একই রকম দেখতে দুটো মানুষ থাকতেই পারে। তাই রাকেশদাকে অনুরোধ করেছিলাম ওর ডীটেইল্‌ টা জেনে আসতে। আর রাকেশদা এসে যা বলল—'

'কি বলল ?' সাগ্রহে প্রশ্ন করে আহীর।

'মেয়েটির নাম কুহেলি সান্যাল। বাবার নাম মহেন সান্যাল। তুই তো বলেছিলি কুহেলির বাবার নাম আর আমার নাম এক! ওর বাড়ি কলকাতায়।'

আহীর স্তম্ভিত। কি যেন ভাবছে। হয়ত ভাবছে, ভাগ্যিস এই মেয়েটার সাথে নিজের জীবন জড়াই নি। জড়ালে কি সমস্যাতেই না পড়তে হত। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন।

'কি ভাবছিস ?'

'অ্যাঁ! কিছু না।' মহেনের প্রশ্নে চিন্তায় ছেদ পড়ে।

'কিছু তো একটা অবশ্যই ভাবছিস।'

'হুঁ, ভাবছি। ভাবছি কেন এমন হল।'

'আমি বলি ?'

'তুই জানিস ?'

'জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।'

'কি অনুমান করছিস ?'

'কিছু মনে করবি না ?'

'আরে! মনে করব কেন ?'

'কারণ, আমি যে কজ্‌টা দেখাব সেটা তোর ভালো নাও লাগতে পারে।'

'বল, কি বলতে চাইছিস ?'

'যদি বলি, কুহেলি তোর জন্য পাগল হয়ে গেছে !

'আমার জন্য ! বাট হোয়াই ?'

'তোর নিশ্চই মনে আছে ও তোকে একবার আগ্রায় ফোন করেছিল ! সেদিন তুই ওকে বলেছিলিস তুই নিরুপায়। মানে ও যা ভাবছে সেটা মেনে নেওয়া তোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তো ?'

'হ্যাঁ, তাতে হয়েছে টা কি ?'

'তারপর থেকেই কুহেলি নিজেকে গুটিয়ে নেয়। একটু একটু করে জীবন থেকে সরিয়ে আনে নিজেকে। সবসময় গুম হয়ে থাকত। কারুর সাথে কথা বলত না। দিনরাত কি যেন চিন্তা করত। এভাবে চলতে চলতে একদিন হারিয়ে ফেলে নিজের ভারসাম্য।'

'তুই এতসব জানলি কি করে ?'

'আমি ওর ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি। ওর কেস হিস্ট্রি পড়েছি। ভাবিস না, তোর কথা কিছু বলিনি।'

'কিন্তু ওই তো আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়নি। তুই তো জানিস, ও আমার চিঠি ছবি যা কিছু ওকে দিয়েছিলাম সব ফিরিয়ে দিয়েছে। তুই নিজে সে পারসেল খুলেছিলিস।'

'হ্যাঁ, শুধু খুলিই নি; সেদিন ওর সম্বন্ধে অনেক নেগেটিভ মন্তব্যও করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি কেন মেয়েটা ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'কেন?'

'কারণ তোর উপর কোন আঁচ আসুক ও সেটা চায়নি। ভেবে দেখ, কুহেলি কেন পাগল হয়ে গেছে সে কারণ খুঁজতে ডাক্তাররা ওর একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখতেন! আর তখনই তোর চিঠি ছবিগুলো পেয়ে ডায়রেক্ট তোর সাথে যোগাযোগ করতেন! তাতে কুহেলির চিকিৎসার সুবিধা হত। তোকে পেয়ে ও হয়ত ভালোও হয়ে যেতে পারত! কিন্তু সে সব কোন রাস্তাই কুহেলি খোলা রাখেনি। আমার মনে হয় কুহেলি বুঝতে পেরেছিল, ও ধীরে ধীরে ওর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। তাই চরম কিছু একটা ঘটে যাওয়ার আগে ও নিজের জীবন থেকে তোকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল।'

'মহেন—মহেন বিশ্বাস কর এ আমি চাইনি। কুহেলি আমাকে এত ভালোবাসে এ আমার কল্পনার বাইরে। আমাদের মাত্র দিন দুই দেখা হয়েছিল তাও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। ঐ অল্প পরিসর সময়ে…এও কি সম্ভব মহেন! আই কান্ট বীলিভ ইট!'

'কুহেলি তোকে না দেখেই ভালো বেসেছিল আহীর। ওর চিঠি লেখার ধরণটা আমার এখনো একটু একটু মনে আছে। ভীষণ রোম্যান্টিক। তখন তো তোদের দেখাই হয়নি, অথচ এমনভাবে চিঠি লিখত যেন কত দিনের প্রেম।'

'আমাকে ওর কাছে একবার নিয়ে যাবি মহেন?'

'নিশ্চই। সেই জন্য তো এখানে ডেকে আনলাম তোকে। তবে, মনে হয় পার্মিশান পেতে একটু—'

'কোন অসুবিধা হবে না। আমি আগে ডাক্তারের সাথে কথা বলব। যা কিছু ঘটেছে সব বলব। আমি কুহেলিকে ভালো করে তুলব মহেন। উনি নিশ্চই আমাকে সাহায্য করবেন!'

'করবেন বৈকি। উনি বলছিলেন, মেয়েটা কেন পাগল হয়ে গেছে সে কারণটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; কোন পথ ধরে চিকিৎসা চালাব! ও আর পাঁচটা পাগলের মত নয়। কথাও বলে না যে কথা শুনে বোঝা যাবে ওর মনে কি আছে। ছ মাস আগে যখন প্রথম এই স্যানিটোরিয়ামে আসে তখন যা অবস্থা ছিল এখনো সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোন ইমপ্রুভমেন্ট নেই। তোকে পেলে একটা মিরাকল হবে। কুহেলি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।'

পরদিন কথা অনুযায়ী কাজ করল দুই বন্ধু। সব শুনে ডাক্তার তো অবাক, কিন্তু খুব খুশী। আহীর অনুমতি পেল আমার সাথে দেখা করবার। একটা সানবাঁধান বেঞ্চে আমি একা বসে আছি।

আহীর একা এসে দাঁড়াল আমার সামনে, 'কুহেলি—'

মুখ তুলে তাকালাম। দু চোখে অপার বিস্ময়। আমি কি স্বপ্ন দেখছি! হতেও পারে, আমার স্বপ্ন দেখার চোখ দুটো তো ভারি স্বচ্ছ! কতবার তো এমনি করে আহীরকে দেখেছি। এতে অবাক হবার কি আছে! মাথা নামিয়ে নিলাম।

'কুহেলি—কুহেলি আমি আহীর। আমাকে চিনতে পারছ না? দেখো—দেখো ভালো করে। আমি আহীর।'

আহীর দুহাতে আমার মুখটা তুলে ধরে অনুরোধ করছে। এবার আর স্থির থাকতে পারলাম না। এতগুলো বছর পর এভাবে সশরীরে আহীরকে দেখতে পাব ভাবিনি। ওর হাতদুটো শক্ত করে ধরতে চাইছি, পারছি না। আমার হাত কাঁপছে। যেন সব শক্তি হারিয়ে গেছে। আমি হাসছি না কাঁদছি নিজেই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে ওকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদি। মনের কোনে গুমরে মরা কথাগুলো অশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দিক ওর জামা। বুকের মধ্যে জমে থাকা যন্ত্রণার পর্বতটা আহীরের শরীরের উষ্ণতায় গলতে শুরু করেছে। পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। আমি যেন এক্ষুনি পড়ে যাব। আমার অভিব্যক্তি দেখে আহীর বুঝতে পেরেছে আমি ওকে চিনেছি। ও অবিভূত। চোখ দুটো আনন্দে ছলছল করছে। বলছে, 'আমি জানতাম তুমি আমায় চিনতে পারবে। আমি তোমাকে নিতে এসেছি কুহেলি। তোমাকে আর এখানে থাকতে হবে না। আমার কাছে নিয়ে যাব। তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'এক্সেলেন্ট! আমি এটাই চাইছিলাম। আমি চাইছিলামও কাঁদুক-হাসুক। ওর মধ্যে জমে থাকা কষ্টটা কান্না হাসি হয়ে বেরিয়ে যাক। ভেরি গুড।'

সোচ্ছাসে কথাগুলো বলতে বলতে ডাক্তারবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে আহীরের বন্ধু। আমি স্থির। এতক্ষন যে ডাক্তার আমাদের লক্ষ্য রাখছিলেন আমি জানতাম না। ও—তার মানে আমাকে সুস্থ করার জন্য ডাক্তারই সন্ধান করে আহীরকে ডেকে এনেছে! ও নিজে থেকে আসেনি! আহীরের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। আহীর ডাকছে—

'কুহেলী—কুহেলি দাঁড়াও। যেও না।'

'যেতে দিন ওকে। একসাথে এতটা এক্সাইটমেন্ট ঠিক না। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি ও ভালো হয়ে যাবে। আপনি ওকে নিয়ে…।'

আর শুনতে পাচ্ছি না। আমার ইচ্ছে করছে পিছন ফিরে আহীরকে একবার দেখি, কিন্তু নিজেরই মধ্যে কার যেন কড়া নির্দেশে মাথা নিচু করে এগিয়ে চলেছি ঘরের দিকে। মনটা তোলপাড় করছে। দীঘির শান্ত জলে কে যেন পাথর ছুঁড়েছে। তুমি কেন এলে আহীর! আমি তো একটু একটু করে নিজেকে তৈরী করছিলাম।

তোমাকে ছাড়া নিজেকে বাঁচতে শেখাচ্ছিলাম। আমি তোমার কেউ নই, এই সত্যটা নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। এভাবে ধূমকেতুর মত এসে আমার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিলে। তুমি ফিরে যাও আহীর। আমার এ অভিমানে পোড়া ভালোবাসা তোমার কাছে কিছু দাবী করে না। তোমাকে মুক্তি দিলাম; যাও আহীর ফিরে যাও। আমি জানি তুমি মহানুভব। আর তোমার এ মহানুভবতার প্রমাণ দিতে তুমি হয়ত আমার মত একটা পাগল হয়ে যাওয়া মেয়েকে বিয়ে করতে পিছ পা হবে না কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আর কখনো ভালো হব না আমি। আমি ভালো হতে চাই না। চাই না তোমার করুণা। আমার ভালোবাসা প্রতি ভালোবাসা চেয়েছিল, করুণা নয়। তুমি আর যাই কর করুণা দেখিয়ে আমাকে অপমান করতে পার না। আমি যাব না তোমার কাছে। আমি জীবন বিমুখ। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি এ পৃথিবীর সব আনন্দ থেকে। আমি অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি। এতদিন যার জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা, সে আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছে আমাকে; আর আমি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাইছি সেই অমোঘ স্পর্শ থেকে। পাগলদের মধ্য থাকতে থাকতে আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলাম! হ্যাঁ তাই। আমি বিদ্রোহী। আজ আমার নিরুপায় বলার পালা। আমিও রাগ করতে জানি। এতদিন কোন খোঁজ নাওনি আমার। কেন এত কষ্ট দিলে?

কষ্ট এখনো হচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি যদি পাগল হয়ে যেতে পারতাম তো কি ভালোটাই না হত। সত্যি কি আহীর আমাকে ভুলে গেল? এখনো চিঠি আসছে না কেন! চিঠির কথা মনে পড়তেই বাইরের বারান্দায় গেলাম। জুতোর র‍্যাকের উপর একটা ইনল্যান্ড লেটার পড়ে আছে। উপরে বাপির নাম; ছোট কাকু পাঠিয়েছেন। চিঠিটা বাপির বই-এর উপর রেখে দিয়ে চলে এলাম। হঠাৎ মনে হল চিঠিতে আমার ছেলে দেখার ব্যাপারে কোন খবর নেই তো! কারণ আমার বিয়ের পাত্র দেখার গুরু দায়িত্বটা ওনার উপরই বর্তেছে। আর এতদিন ধরে মহা নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করছেন। ছোট কাকু প্রায়ই বাপিকে এ রকম পাত্র সন্ধানী চিঠি পাঠিয়ে থাকেন, তাই আমার ভাবনাটা অযৌক্তিক নয়। যদিও অন্যের চিঠি পড়া অন্যায় তবুও সে অন্যায় করলাম। আমার সন্দেহ নির্ভুল। এক ইনকামট্যাক্স অফিসার পাত্রের সন্ধান দিয়ে আমাকে দেখতে আসার দিন নির্ধারণ করে জানাতে বলেছেন। আমি দুঃখিত কাকু। এ চিঠি বাপিকে দিতে পারব না। পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি বিয়ে করব না। এ তো আমার অনেক ছোটবেলাকার জেদ। মাঝে কদিন আহীরকে দেখে মনে হয়েছিল বিয়ে করলেও করা যেতে পারে। কিন্তু সুর সাধার আগে তারই যে ছিঁড়ে গেল—মনের কোনে এক বাস্তব প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। কি করব আমি? কি ভাবে কাটাব এ জীবন? আত্মহত্যা বা পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এভাবে দিন রাত ঘরের মধ্যে স্থবির হয়ে বসে থাকা, তাও অসম্ভব। ভালোবাসা মনকে সমৃদ্ধ করে, তাহলে আমার

ভালোবাসা আমাকে এভাবে কুক্ষিগত করছে কেন! কেন এত আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে। নিজের কষ্ট, নিজের দুঃখ, নিজের ভালোলাগা এছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। আমি তো এরকম ছিলাম না! এক সময় ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট পড়তে পড়তে ভীষণ কান্না পেত। ঐ ছোট্ট একরত্তি ছেলেটার কষ্টের কথা ভেবে মনটা ভারি হয়ে উঠত। তখন ঠিক করেছিলাম বড় হয়ে অনাথ আশ্রম থেকে একটা ছোট্ট ছেলে নিয়ে আসব ; নাম দেব অলিভার। নিজের কাছে রেখে মানুষ করব। স্যার ডিকেন্সের অলিভাবের সব দুঃখ মুছে দেব আমার অলিভারকে দিয়ে। এতদিন ভুলে গেছিলাম সে কথা ; আজ মনে পড়ল। আর এমন একটা সময় মনে পড়ল যখন আমি বাঁচার আশ্রয় খুঁজছি। আমার চেনা পরিবেশ পরিচিত পরিজনের বাইরে অন্য একটা জীবন চাইছি। নিজেকে আর একবার স্বার্থপর মনে হচ্ছে। স্যার ডিকেন্সের রচিত, চিমনি ঝাড়ুদার মিস্টার গ্যামফীল্ডের মত স্বার্থপর। আজ নিজের প্রয়োজনে অলিভারকে চাইছি। আমি কোন অরফ্যানেজে চলে যাব। প্রকৃতই যারা ভালোবাসার কাঙাল তাদের জন্য উৎসর্গ করব নিজেকে। নাহ্, অযাচিত প্রেম যাদের কাছে মূল্যহীন তাদের জন্য আর অশ্রু নয়। অনেক কেঁদেছি। রাতের অন্ধকার, শুকনো ফুল, তীর বেঁধা পাখি, ঝরাপাতা, ফুরিয়ে যাওয়া জীবন এসব নিয়ে অনেক ভেবেছি। আর নয়। এবার ভাবনাগুলো বাস্তবের শক্ত মাটির কাছাকাছি আসতে চাইছে। কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে দিগভ্রান্ত পথিকের মত এতদিন ভুল পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এবার রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। অনেক দিন পর আমার আনন্দ হচ্ছে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট আমি লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি। আমার জন্য অনেক অলিভাররা অপেক্ষা করছে। আমি আসছি অলিভার, এক্ষুনি আসছি। বই এর আলমারিতে হাল্কা সবুজের কভার দেওয়া ডিকেন্স। সাটার সরিয়ে বের করে আনলাম বইটা।

হ্যালো অলিভার! কেমন আছ বন্ধু? আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভুলে গেছিলাম তোমায়। স্বপ্নের মেঘে ভর দিয়ে সুখের পায়রা হয়ে উড়ে যেতে চেয়েছিলাম প্রেমের স্বর্গ রাজ্যে। আমার সাথী আমাকে চিনতে পারেনি অলিভার ; তাই তোমার কাছে ফিরে এলাম। তোমার ঐ ছোট্ট বুকটায় আমাকে আশ্রয় দাও। কত রাত আমি ঘুমোইনি। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোতে দাও আমায়। আমার অশ্রু সিক্ত চোখ দুটোতে তোমার নরম হাতের উষ্ণতা দাও। আমাকে বাঁচার পথ দেখাও অলিভার, সত্যিই আমি বাঁচতে চাই।

বাপিকে বলব, আমি অনাথ আশ্রমে যেতে চাই। এভাবে আর বাঁচতে পারছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাপি অন্য কিছু সন্দেহ করবেন না তো! কেন করবেন! এটা আমার নতুন কোন বায়না নয়, আগেও বহুবার বলেছি। কোনরকম গুরুত্ব পাইনি। এবারে আর এড়িয়ে গেলে চলবে না। অনুমতি দিতেই হবে। তা না হলে চুরি করে পালিয়ে যাব, তারপর যা হয় হবে। কিন্তু এখন বললে মুশকিল আছে। বাপি মাকে রাজি করানো গেলেও ঠাকুমা কিছুতেই রাজি হবেন

না। উনিই তো বাপিকে বেশী বলেন, সমির বিয়ে দে, নাতজামাই দেখে তবেই মরব। আর সেই নাতনি নাতজামাই আনার বদলে যদি আশ্রমে যেতে চায় তাহলে তো আর রক্ষে নেই। এখন বললেই ফ্যাসাদে পড়ে যাব, আর কটা দিন ধৈর্য ধরি। ঠাকুমা দেশে ফিরে গেলেই কথাটা পাড়ব। ততদিনে নিজেকে একটু সুস্থ করে নি। মনে যাই থাক, শরীর অসুস্থ হলে আশ্রমেও জায়গা হবে না। বইটা পাশে মুড়ে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। অনেক দিন পর নিজেকে দেখছি; একটু মন দিয়ে। আগের থেকে রোগা হয়ে গেছি কি? হতে পারে। সবাই তো তাই বলছে। মুখে অনেক ব্রণ বেরিয়েছে। চোখ দুটো ভিতর দিকে ঢুকে গেছে; চারিদিকে চওড়া কালো স্পট। নিজের রূপ নিয়ে আমার মনে কখনো কোন কমপ্লেক্স ছিল না। সুন্দরী মেয়েদের অকপটে সুন্দরী বলতে কখনো দেরি হয়নি। বা কখনো আফসোস হয়নি ইস্, কেন একটু সুন্দর হলাম না! এখন হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার বোধহয় আর একটু সুন্দর হওয়া উচিত ছিল। তাহলে আহীর এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারত না। ও আরো সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবে। পদ্মিনীর মত সুন্দরী। আমার হাসি পাচ্ছে। কতদিন হাসিনি। দেঁতো হাসি নয়, প্রকৃত হাসি।

'দেখ ভালো করে, কি অবস্থা করেছিস নিজের।'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। খেয়াল করিনি।

'জীবনে কোনদিন যা হয়নি তাই হয়েছে। চোখের কোণে কালো ছোপ পড়েছে কালো ছোপ কেন হয় জানিস? মনে দুঃশ্চিন্তা থাকলে। একটু আনন্দে থাকার চেষ্টা কর সমি। ভালো ভাবে বাঁচ।'

এই এক বিপদ। মা একবার বলতে শুরু করলে আর রক্ষে নেই। থামতেই চান না, বকেই যান বকেই যান।

আমার আনন্দময়ী আশ্রমে যেতে ইচ্ছে করছে। এটা কোন মানুষের থাকার আশ্রম নয়। আনন্দময়ী ঠাকুরের মন্দির। বাড়ির থেকে হেঁটে মিনিট দশেকের পথ। প্রতিমাটা একটু অন্য রকম। পর পর দুটো শিব মূর্তি তারপর কালী। মন্দিরে একটা অদ্ভুত নিরবতা আছে। আর এই নিরব পরিবেশটাই আমাকে টানে। কিছুটা সময় একা থাকতে, একেবারে নিজের সাথে থাকতে ইচ্ছে করছে। গেলাম। নিচে জুতো খুলে মন্দির চত্তরে বসে আছি। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা মনটা খুঁটে খুঁটে এক জায়গায় জড়ো করেছি। অনেকেই আসছে মন্দিরে। কারুর মুখে কথা নেই। প্রতিমার সামনে হাত জোড় করে কি চাইছে ওরা! কিছু একটা চাইছে অবশ্যই। ভগবানের সামনে মানুষের হাত সব সময় পাতাই থাকে। ধন দাও, দৌলত দাও, সন্তান দাও, সম্মান দাও…। আমি কি চাইব! কিচ্ছু না। ব্যর্থতা, আঘাত, যন্ত্রণা, একাকিত্ব এসব দিয়ে তো তুমি আমার ঝুলি ভরে দিয়েছ ঠাকুর। আর কি চাই আমার! তোমার দানে আমি সমৃদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা তুমি আমার দুচোখে অফুরন্ত জল দিয়েছ। কেঁদে হালকা হবার ক্ষমতা দিয়েছ। এর চেয়ে বড় দান আর হয় না কি! তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। শুধু একটা

প্রার্থনা আছে—'আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নই। তবে পুনর্জন্ম বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আমি আবার সমি হয়ে জন্মাতে চাই। ঠিক এমনি করে ভালোবাসতে চাই আহীরকে; আরো অনেক, অনেক বেশী ভালোবাসা দিয়ে। আর আহীরের মনে আমার জন্য যদি প্রেম দিতে না পার, তো আমার মনে ওর উপেক্ষা সহ্য করার মত ক্ষমতা দিও।"

মন্দির থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরেছি। ভাবছি, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন আহীরের সাথে দেখা হয়! অচেনা কোন পথের বাঁকে, অথবা অনেক লোকের ভিড়ে, বাসে বা ট্রেনের কামরায়! রবি ঠাকুরের 'হঠাৎ দেখা' মনে পড়ছে। আজ থেকে পাঁচ দশ বিশ বছর পর। তখন আহীর আমাকে চিনতেই পারবে না। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে আর কোনদিনই দেখা হল না! না না, মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। দেখা হবেই। সত্যিই যদি আহীরকে ভালোবাসি তাহলে দেখা আমাদের হবেই। আমার ভালোবাসা যদি কেবল ভিত্তিহীন আবেগ না হয় তাহলে আহীর আমার সাথে দেখা করবেই। আর যদি না করে, তাহলে! তাহলে কি? জানব আমার ভালোবাসার ক্ষমতা নেই। আমি ওকে ভালোবাসি না। ও গড! নিজের ভালোবাসাকে নিয়ে জুয়া খেলছি! পিছন ফিরে তাকালাম। মন্দির এখনো দেখা যাচ্ছে।

* * *

এখন সারাক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকি। আগে যে সময়টা শুয়ে বসে চিন্তা করে কাটাতাম এখন সেই সময় গল্পের বই পড়ি। যতটা বেশী সময় পারা যায় মনটাকে বই এর পাতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করি। পড়তে পড়তে মাথার যন্ত্রণা হয় তবুও পড়ি। পুশকিন, মঁপাসা, সেক্সপিয়ার একটার পর একটা শেষ করে চলেছি। সঙ্গে রবি ঠাকুর আর সুকান্ত তো রয়েইছে। বাড়ির অবস্থা একটু সুধরেছে। এতদিন যাই যাই করে আমার ঐ অবস্থা দেখে ঠাকুমা যেতেও পারেননি। এখন বলছেন, 'সমি একটু সুস্থ রয়েছে এবার আমি যাই।'

মাত্র দুদিন হল ঠাকুমা বাড়ি গেছেন। আমি সাত সকালেই সঞ্জিব চট্টোপাধ্যায়ের 'সোফা-কাম-বেড' খুলে বসেছি। এই বই একবার ধরলে শেষ না করে থামার উপায় নেই। গত রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিলাম; তাও শেষ হয়নি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হচ্ছিল কখন শেষ করব। চটুল হাস্যরসে ভরা এ গল্পগুলো বিশুদ্ধ হাসির খোরাক। যতই মন খারাপ থাক, না হেসে পারা যায় না।

'সমি, ফিল্টারে একটুও জল নেই, আনতে হবে কিন্তু।'

মার কথা শুনে উঠে এলাম। আগের মত আর গোঁতোমি করি না! যা বলেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা করি। খালি কলসিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কল পাম্প করছি, কারখানা থেকে কাকা আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলছে, 'সমি, কাল আহীরের ফোন এসেছিল, তোকে ডেকে দিতে বলেছিল আমার সময় হয়নি। আজ

বারটার সময় আবার করবে বলেছে।' কার ফোন! আহীরের! ঠিক শুনলাম তো! জিগ্যেস করলাম—

'কার ফোন?'

'আহীরের।'

আমার আনন্দে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি হাসছি অথচ দৃষ্টি ঝাপসা। এই মুহূর্তে কেউ আমার মুখের দিকে তাকালে পাগল বলে ভুল করতে পারে। জল ভরা কলসিটা যে কাঁখে তুলব তা পারছি না। আমার সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘরে এসে দেখি মাত্র দশটা বাজে। এখনো দু ঘণ্টা। আমার জীবনের সবচাইতে দীর্ঘতম সময়। দু যুগ কতটা দীর্ঘ হয় এই দু ঘণ্টা ধরে তিল তিল করে অনুভব করছি। কাকার অফিস ঘরে বসে আছি। ছোট্ট ঘরটার চার দেওয়ালে নিজের হৃতকম্পের প্রতিধ্বনি শুনছি। এক সময় সে ধ্বনি ছাপিয়ে ফোন বেজে উঠল—

'হ্যালো—'

'হ্যালো, এটা কি… ?'

'ইয়া।'

'আপনি—'

'কুহেলি। কেমন আছ?'

'হাই! ভালো। কি করে বুঝলে আমি?'

'তোমার কণ্ঠস্বর আমি ভুলিনি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'মিথ্যে বলব না; ভালো থাকার চেষ্টা করছি। কোথা থেকে ফোন করছ?'

'আমি বাড়ি এসেছি। চিঠি পেয়েছ?'

'কই, না তো!'

'সে কি! এতদিনে তো পৌঁছে যাবার কথা। তার মানে তুমি জান না?'

'কি গো?'

'আমি আগ্রা থেকে আউট।'

'তার মানে!'

'আমার ট্রান্সফার হয়েছে।'

'কোথায়, আন্দামানে?'

'তুমি কি করে জানলে? চিঠি পেয়েছ নিশ্চই।'

'তা কেন হবে! গতবারেই তো বলেছিলে এর পরের ট্রান্সফার আন্দামানে।'

'গতবারে মানে?'

'এর আগে আমরা যখন দেখা করেছিলাম!'

'ও আচ্ছা, সেই করে বলেছি তোমার এখনো মনে আছে!'

তোমার সব কথা আমার মনে আছে আহীর, কিছু ভুলিনি। আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির মত সব স্পষ্ট দেখতে পাই; অনুভব করি তাদের সজীবতা।

'শোন, আমি সোমবার চলে যাচ্ছি। দু বছরের জন্য—'

'হোয়াট! দু বছরের জন্য মানে?'

'মানে সোমবার যাচ্ছি দু বছর পর আসব।'

'কেন?'

'কেন কি! দু বছরের পোস্টিং। যাওয়ার আগে তোমার সাথে একবার দেখা করতে চাই। হ্যালো—সমি।'

'শুনছি, বল।'

'কি ভাবছ? দেখা করবে না আমার সাথে?'

'কবে?'

'কাল কি করছ?'

'কিছু না।'

'কাল আসতে পারবে?'

'পারব। কোথায়?'

'সেম প্লেস।'

'কটায়?'

'এই—এগারটায়? পারবে না?'

'আসছি।'

'শোন, আজ ছাড়ছি অ্যাঁ! কাল কথা হবে। কিছু কেনাকাটা বাকি আছে। হাতে একদম সময় নেই গো।'

'ও. কে। বাই।'

'বাই। সি ইউ।'

কেন ঠাকুর, কেন? আমার সাথেই বার বার এ রকম ঘটনা ঘটে কেন? আমি তো আমার দুর্ভাগ্যের সাথে কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি আবার আহীরের সাথে দেখা হবে ভাবিনি। ও ফোন করেছে শুনে ভেবেছিলাম আগ্রা থেকে কল করেছে। দু চারটে কথা হবে এর বেশী কিছু না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে গেলাম ওকে। কাল আমরা দেখা করছি। আহীর আবার আমার সাথে দেখা করতে আসছে। তারমানে! তারমানে আমি আহীরকে সত্যি সত্যি ভালোবাসি। আমি জিতে গেছি। নিজের ভালোবাসাকে নিয়ে জুয়া খেলে জিতে গেছি আমি। আমার অনির্বচনীয় আনন্দ হচ্ছে। অনেকদিন পর এ আনন্দের আস্বাদন পেলাম।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেল ওয়েট করছি এখনো বাবুর পাত্তা নেই। এবার একটা ঘড়ি গিফ্‌ট করতে হবে দেখছি। আরো পনের মিনিট কাটল একই ভাবে। এগারটায় কথা দিয়ে মূর্তিমান এলেন পোনে বারটায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট। আমি কারণ জানতে চাইলাম না। ওই জিগ্যেস করল, 'কখন এসেছ?'

'যখন আসতে বলেছিলে।'

'সরি, আই অ্যাম লেট। কটা বাজে এখন?'

'পৌনে বার।'

'কোথায় যাবে ?'

'চল না যেখানে হোক।'

'কোথায় ? জায়গাটা বলবে তো।'

'দক্ষিনেশ্বরে যাবে ?'

আহীর হাসছে, 'দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে কি করবে ; তার চেয়ে কালীঘাটে যাই চল।'

ওর বাঁকা হাসির অর্থ বুঝতে আমার একটুও দেরি হল না। কালীঘাটে যাব কেন শুধু শুধু! ঘরে পুরুত ডেকে ধুমধাম করে বিয়ে হবে আমাদের! বোকা কোথাকার!

'আগে চল কোথাও গিয়ে খাই। বড্ড খিদে পেয়েছে। পরে ভাবা যাবে কোথায় যাব।'

আমরা হাঁটতে শুরু করেছি মেট্রোর দিকে।

'এখানে খাওয়ার ভালো জায়গা আছে তো ?'

'অনেক আছে, খেয়ে শেষ করতে পারবে না।'

'পরশু কোথায় গেছিলে ?'

'কোথাও না তো। বাড়িতেই ছিলাম। তুমি ফোন করেছ কাকু আমায় বলতে ভুলে গেছিল।'

'হ্যাঁ, কি হয়েছে জান ; ওদিক থেকে রেস্‌পন্‌স পেয়ে আমি তো বলেছি – হ্যালো কাকু, কুহেলিকে একটু ডেকে দেবেন প্লীজ। ওদিক থেকে বলছে, আমি কাকু নই। বাব্‌বাবা, কাকে কাকু বললাম! পরের বারেও একই প্রবলেম, গম্ভীর গলায় বলছে আমি কাকু নই।'

'কারখানার কর্মচারীগুলো মাঝে মাঝে ফোন তোলে। ওদেরই কাউকে বলেছ হয়ত। তুমি কুহেলি বলেছ বলে ওরা বুঝতে পারেনি, তা না হলে ওরাই আমাকে ডেকে দিত।'

'ও তাই তো! তোমার ডাক নামটা যেন কি! খেঁপি না পেঁচি কি যেন একটা ?'

'ভুলে গেছ ? বাহ্‌! ভেরি গুড।'

'এই ভুলিনি। আমার ডায়রিতে লেখা আছে।'

'তবে আর কি, ওতেই হবে। চল, এটাতে যাবে ?'

'এতো চাচাদের হোটেল।'

'তাতে কি ; তুমি তো সর্বভুখ। সবকিছু চলে তোমার।'

'কিন্তু তোমার তো চলে না।'

'নাই বা চলল, আমার সাথে তোমার কি সম্পর্ক!'

'তুমি খাবে না ?'

'খিদে পেয়েছে তোমার, আমি খাব কেন ?'

'যাঃ! তাই আবার হয়! এস এস পরেরটায় কি আছে দেখি। এই তো, এটা চলবে। এস।'

পার্কস্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্ট। ফাঁকা টেবিল দেখে বসলাম। ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই আহীর জিগ্যেস করল, 'কি আছে দাদা ?'

ওয়েটার গড় গড় করে বলে গেল একশ আটটা নাম। এদের খাবারের নাম বলার ভঙ্গিমাটা আমার বেশ ভালো লাগে। শুধু জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা, কলিং বেলে হাত পড়ে যাওয়ার মত একটানা বাজতে থাকবে।

'কি খাবে গো ?'

'তুমি যা খাবে নাও।'

'ধোসা।'

'একটা প্লেট কিন্তু।' ওয়েটার কে বললাম।

'এই, সত্যি খাবে না ?'

'না গো, ভাত খেয়ে এসেছি। আচ্ছা তোমার থেকে একটু নেব।'

খেতে খেতে ও কত কথা বলছে। সব আমার কানে ঢুকছে না। আমি ভাবছি, কি আছে এই ছেলেটার মধ্যে, যা আর অন্য কারুর মধ্যে খুঁজে পেলাম না! আমি ওকে নিয়ে এত ভাবি এত কষ্ট পাই তার কণা মাত্র ও জানে না।

'তুমি হঠাৎ আগ্রাতে ফোন করলে ?'

'এমনি। তোমার সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।'

'আমি কিন্তু ভাবিনি তুমি ফোন করেছ। ভেবেছি ছোটদা হবে; ও তো মাঝে মাঝে করে। আমাকে গিয়ে বলছে, আপকা ফোন। আমি জিগ্যেস করেছি, কন্, ভাইয়্যা? বলে, নেহী কুহেলি। ওয়াও! ছুটেছি সঙ্গে সঙ্গে।'

'সেদিন আমার টাকা ফুরিয়ে গেছিল জান!'

'কি করলে ?'

'কি করব, একশ বাইশ বিল হয়েছে ব্যাগে মাত্র তের টাকা আছে। ঐ দিয়ে এলাম; পরের দিন বাকিটা দিয়ে এসছি।'

'মেয়ে বলে এই ফেসিলিটিটা পেয়ে গেলে। ছেলে হলে দরজা দেখিয়ে দিত। আসুন দাদা।'

'এটা ছেলেদের দোষ। ওরা ভীষণ ফ্রড হয়। বিশ্বাসের মূল্য রাখে না।'

আহীর খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়েছে আমার দিকে। বললাম, 'সব ছেলে নয়। অনেকেই।' ও হাসছে।

'একটা ধোসা খেয়ে পেট ভরেছে? চল র‍্যালিসে যাই, তোমাকে কুলফি খাওয়াব। জয়নগরের মোয়ার মত র‍্যালিসের কুলফি বিখ্যাত।'

'কোথায় সেটা ?'

'এই আসে পাশে কোথাও হবে। অনেক দিন আগে এক বন্ধুর সাথে এসেছিলাম, ঠিক খেয়াল নেই।'

'বন্ধু কি ছেলে না মেয়ে ?'

'আরে ! প্রশ্ন করে দেখো ! ছেলে ।'

'ভুলে গেছ তো যাবে কি করে ?'

'তাতে কি হয়েছে, খুঁজে নিতে কতক্ষণ !'

ওয়েটার বিল নিয়ে এসেছে । ওকেই জিগ্যেস করলাম ।

'দাদা র‍্যালিসটা কোন দিকে পাব ?'

'মেট্রোর সামনে দিয়ে সোজা চলে যান । একটা ক্রসিং পরেই বাঁদিকে পড়বে র‍্যালিস ।'

'থ্যাংকইউ ।'

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ডিরেক্শান অনুযায়ী হাঁটতে শুরু করলাম । খুঁজে আর পাই না । একটা দোকানে জিগ্যেস করতে বলল । পিছনে ফেলে এসেছেন । আবার ব্যাক করলাম । অবশেষে পেলাম খুঁজে । টেবিলে পড়ে থাকা মেনুকার্ডটা নিয়ে আহীর খানিকক্ষণ ইয়ার্কি করল । তারপর কথায় কথায় বলছে, 'চিঠি দেবে তো ? অনেক বড় করে চিঠি লিখবে, সুন্দর সুন্দর ভাষা দিয়ে । একটা কিছু দাও আমার নতুন ঠিকানাটা লিখে দি ।'

ছোট্ট প্যাডটা বের করে দিলাম । ঠিকানা লিখতে লিখতে বলছে, 'তোমাকে একটা কথা বলার আছে ।'

'বল ।' লেখা শেষ করে প্যাডটা আমাকে দিয়ে একটু ইতস্তত করছে, 'কি ভাবে বলি বলত ?'

'কেন ! কথাটা যে রকম সে ভাবেই বলবে ।'

'না, মানে—আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না !'

'বেশ তো, তুমি তোমার মত করে বল, আমি গুছিয়ে নেব ।'

আমার কথা শুনে ও হাসছে । আমি অনুমান করতে পারছি ও কি বলতে চাইছে । নিশ্চই আমার চিঠির ব্যাপারে কিছু ।

'তোমার চিঠি পড়লাম । কি উত্তর দি বলত ? আমি—আমি মানে—কি বলি—'

'কিছু বলতে হবে না । তুমি তো চিঠি দিয়েছ । এখনো আসেনি তবে এসে যাবে । ততদিন অপেক্ষা করব । চিঠি এলে জেনে নেব তুমি কি বলেছ ।'

আহীরকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিলাম । ও অপ্রিয় কথাটা বলতে না পেরে খুশী । খানিক চুপ করে প্রসঙ্গ বদলে বলল—

'আগ্রা থেকে একদিন ফোন করেছিলাম জানো !'

'তাই ! জানি না তো । কাকিমা তো কিছু বলেনি আমাকে ।'

'কাকিমা জানলে তো বলবেন ; ফোন ধরেছিলেন তোমার কাকু । কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে কি, আমি তোমার কাকুর কথা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু উনি শুনতে পাচ্ছেন না আমার কথা । বেশ কিছুক্ষণ ধরে ট্রাই করলাম । সে দেখি যে কে সেই । তোমার

কাকু খালি হ্যালো হ্যালো করছেন। দূর! এভাবে কথা বলা যায় না কি! ভেবে-ছিলাম লাইন পেলে খানিকক্ষণ গ্যাঁজাব তোমার সঙ্গে।'

'কখন করেছিলে?'

'সন্ধ্যে নাগাদ। এই সাতটা সাড়ে সাতটা হবে।'

ইস্, লাইনটা পেলে কি ভাল হত! মুখে বলছি না, ভাবছি।

'আজ বাড়ি থেকে কি বলে বেরিয়েছ?'

'সেই একই কথা। লেখা দিতে যাচ্ছি।'

'তোমার ফাইল কই? লেখা কোথায়?'

'ব্যাগে।'

'দাও না একটু দেখি।'

'না। তুমি এখন বসে বসে পড়বে না কি! আমি বের হব, থাক।'

'আরে দাও না, প্লীজ। একটুখানি পড়ব। দাওনা দাওনা। এই—দাওনা।'

আমার ব্যাগে সব সময় দু একটা লেখা থাকেই। একটা বের করে দিলাম। 'জ্বলন্ত দলিল।' ও খাওয়া বন্ধ করে লেখাটা পড়ছে। আমি তাকিয়ে আছি ওর দিকে। আমার লেখার প্রতিফলন দেখছি আহীরের মুখে। একটু একটু হাসছে ও। শেষে আর চুপ করে থাকতে পারল না। মন্তব্য করেই ফেলল। 'এ কি! যারা ড্রিঙ্ক করে তাদের প্রতি তুমি এই ধারণা পোষণ কর?'

'কেন, আমার ধারণাটা কি ভুল?'

'পুরোটা না হলেও, কিছুটা ভুল তো অবশ্যই।'

'যেমন—'

'যেমন, এই যে তুমি টোটালি মদের এগেন্সটে লিখেছ; সব ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছ। কিন্তু মদের একটা ভালো দিকও আছে। তুমি কি জান, একটা নির্দিষ্ট লিমিট রেখে নিয়মিত ভাবে খেলে হার্ট ভালো থাকে।'

'জানি, কিন্তু কটা লোক ঐ লিমিটটা মেনটেইন করে বলতে পার? কটা লোক হার্ট সুস্থ রাখার জন্য ড্রিঙ্ক করে? আর হার্ট সুস্থ রাখার জন্য মদ খেতে হবে কেন, এর অন্য ট্রিটমেন্ট আছে। তুমি বোধ হয় জান না; এক কাপ ঈষদ উষ্ণ জলে দুই কি এক চামচ মধু মিশিয়ে রোজ সকালে যদি একবার করে খাওয়া যায় তাহলে হার্ট ভালো থাকে। এটা আয়ুর্বেদ বলছে, আমি নই। আমি তো ঠিক করেছি ভবিষ্যতে যদি কোন দিন পার্টি দি তো সবাইকে হুইস্কির বদলে মধু জল খাওয়াব।'

আহীর হাসছে খুব। 'আরে একটু হাই সোসাইটিতে গেলে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। ক্যাজুয়ালি চলছে এসব—'

'ইয়েস! আমি এটাই বলতে চাইছি। তোমাদের মত শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষেরাই তো স্ট্যাটাসের দোহাই দিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার চেষ্টা করে।'

'এই এই—তুমি যা বলছ' যা লিখেছ, এগুলো আমারও বিপক্ষে সেটা জান কি?'

'জানি তো। আর জানি বলেই তো ঐ লেখাটা তোমায় পড়তে দিলাম।'

'দাঁড়াও একবার, রাস্তায় বের হও তোমায় দেখাচ্ছি মজা। পাবলিক কে দিয়ে পেটানি খাওয়াচ্ছি।'

'অপ্রিয় সত্য বলার পুরস্কার সব সময় এই রকমই হয়। তুমিই বল না, পারবে এই লেখার একটা লাইনকে অস্বীকার করতে? একটা লাইনকে ভুল প্রমানিত করতে?'

'মানছি। মানছি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু তুমি ডায়রেক্ট হিট্ করেছ। সরাসরি আঘাত করেছ সমাজের উপর তলার মানুষদের।'

'দেখ, আমি ঘুরিয়ে নাক দেখাতে শিখিনি। যেটা অন্যায় সেটা সব সময় অন্যায়। একটা সাধারণ লোক করলে অন্যায় আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই কাজটা করলে ন্যায় হয়ে যাবে, এটা কখনোই হয় না।'

'হয় বাবা হয়। তোমার অভিজ্ঞতা কম তাই জান না।'

'মোটেই না। একজন আকণ্ঠ বাংলা মদ খেয়ে শুঁড়িখানায় উল্টে পড়ে আছে আর একজন বোতলের পর বোতল বিলিতি টেনে ঝিক্ মিক্ টুনি লাগান ক্যাসিনো বারে কেতরে পড়ে আছে। এদের দুজনের মধ্যে কি তফাৎ বলতে পার! কোন তফাৎ নেই। এরা দুজনেই মাতাল। দুজনেই পড়ে আছে মদের ঠেকে। তবে হুঁ্যা, একটু তফাৎ আছে বৈকি; যে দিশি খেয়ে পেট ভর্তি করেছে তার বৌ-বাচ্চাদের আজ হরি মটর। আর যে ভদ্দোরলোক বিলিতি পান করেছেন তাঁর বৌ-বাচ্চারা হয়ত সেই মুহূর্তে কোন ফাইভ স্টার হোটেলে ডিনারে ব্যস্ত। আমার তো মনে হয় এই ওপর তলার লোকেরাই আসল কালপ্রিট।'

'কেন?'

'কারণ খেয়াল করে দেখবে গরীবরা সব সময় বড় লোকদের মত করে বাঁচতে চায়। তাদের লাইফ স্টাইল নকল করে নিজেদের দৈন্যতা ঢাকার চেষ্টা করে। আর সেটা করতে গিয়েই এরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। বাড়ির লোকেদের প্রতি কর্তব্য ভুলে যায়, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ওপর তলার মানুষেরাই ইনসিস্ট করে এদের মদ খেতে, নেশা করতে।'

'যাই বল। তোমার লেখার ভাষা বিতর্কিত। মানে মিষ্টি কথায় জুতো না মেরে তেতো কথায় জুতো মারার একটা ব্যাপার আছে। এর থেকে একটা দ্বন্দ্ব আই মিন, কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করতে পারে!'

'আই নো। সেইজন্য এটা কেউ ছাপতে সাহস করেনি। যাকেই দেখিয়েছি, মতামত প্রকাশ করেছেন, লেখাটা সুন্দর। বাট আই অ্যাম সরি। আই কান্ট পাব্লিশ্ট দিস্ স্টোরি।'

'মদের প্রতি তোমার এত বিতৃষ্ণা এটা না পড়লে জানতেই পারতাম না।'

'দেখ মদের প্রতি বিতৃষ্ণা নয়। বিতৃষ্ণা রেজাল্টের প্রতি। আমি কোন ব্যাপারেই গোঁড়া নই। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি একমাত্র বিষ ছাড়া আর সব খাদ্য

বস্তু টেস্ট করে দেখার অধিকার মানুষের আছে। আমি বিড়ি, সিগারেট, হুঁকো, পান, তামাক সব খেয়ে দেখেছি। হাসছ! রিয়্যালি, আই মিন ইট। কোনদিন সুযোগ পেলে মদও খাব। শুধু তাই নয় ড্রাগও খেয়ে দেখার ইচ্ছা আছে—'

'সেকি! তোমার বাবা জানতে পারলে পিটবেন ধরে।'

'জানবেন না। তবে এ কথা তার মুখেই মানায়, যার কৌতূহলে রাশ টেনে ধরার ক্ষমতা আছে। নেশাকে বুড়ো আঙুল দেখানোর মত সেল্ফ কন্ফিডেন্স আছে যার।'

'তারমানে তোমার আছে।'

'নিশ্চই। চল অনেক আলোচনা হয়েছে এবার ওঠ।' একটা প্যাকেট দিলাম, 'এই নাও, রাখ এটা।'

'কি গো এতে?'

'খুলেই দেখ না।'

সোনালী রোলেক্সের বাঁধন আর আর রঙিন মলাটের মোড়ক খুলে আহীর বের করল বইটা। উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'ওয়াও! বনলতা সেন! থ্যাংকইউ বনলতা। এটা ওখানে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

আমি ব্যাগ থেকে টাকা বের করতেই বিভ্রাট। ও বিল পে করবে।

'তুমি রাখ, আমি দিচ্ছি।'

'কেন! এখানে আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি। দস্তুর মত খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসেছি। তুমি দেবে কেন?'

'তাতে কি হয়েছে। রাখ রাখ।'

'ইমপসিবল্। কুলফি খাওয়ানোর কথা আমি বলেছিলাম। সুতরাং আমি দেব।'

'আচ্ছা ডেঁপো মেয়ে তো! খালি একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করে।'

'ইয়েস, আগে যুক্তি খণ্ডন কর তবে।'

'ঠিক আছে, দাও। তোমার বাবার পয়সা আছে—'

'এই—বাবার পয়সা আছে বলবে না। এটা মোটেও বাবার পয়সা নয়। নিজের উপার্জন করা পয়সা।

'ও হো! আই অ্যাম সরি।'

'ইট্স ও. কে।'

র‍্যালিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। সকালে টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছিল তাই রাস্তা ঘাটও কাদা। আর কলকাতার রাস্তার হাল তো অপারেশান টেবিলে ছেঁড়া কোটা রুগীর মত। সারা বছর ধরে অপারেশন চলছে; এখানে খাবলা ওখানে খোবলা, সেখানে বাঁশ পোতা রড পোতা। তেমনই একটা জল জমা ক্ষত স্থানে এসে আহীর আটকে গেল।

'ইস্! কি কাদা গো।'

'তোমার জন্য তো। তুমি এদিক দিয়ে এলে কেন? আমার শাড়ীতে কাদা লেগে গেল।'

'বোঝ! এতেও আমার দোষ?'

'তা নয় তো কি, আমি তোমার পিছন পিছন আসছি। তুমিই তো কাদার দিকে এলে।'

আহীর পিছন ফিরে আমাকে দেখছে, 'আজ খুব ভাল্‌লাগছে তোমাকে।'

'থ্যাঙ্কইউ! কি কথার কি জবাব।'

'আমি জানতাম, তুমি একটা সুন্দর শাড়ী সুন্দর করে পরে আসবে!'

'তাই! সকালে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমি তো জামা পরে আসছিলাম, পরে মনে হল শাড়ী পরি। তাহলে আমাদের মধ্যে টেলিপ্যাথি আছে বল!'

'হতে পারে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি বলত?'

'কি জানি।'

'মানে!'

'চল না। সামনে রাস্তা পড়ে আছে হাঁটি। এবরে তাজমহলে গেছিলাম জান আগ্রা ছাড়ার আগে একবার দেখে এলাম। তোমার বাবাও গেছিল—'

'আমার বাবা!'

'মহেন।'

'ও—তোমার বন্ধু। তাই বল।'

'তোমার কথা বলতে ও কি বলল জান?'

'কি?'

'বলে, আমার মেয়েকে নিয়ে খুব ঘুরছিস! আমি বললাম, কি করব বল! তোমার মেয়ে যদি এরকম করে চিঠি দেয় আমি কি করতে পারি!'

'এবারেও আমার চিঠি ওকে দেখিয়েছ?'

'হ্যাঁ—'

'দেখে কি বলল? ঠাট্টা করছিল?'

'ঠাট্টা করবে কেন! ওটা ঠাট্টা করার মত চিঠি!'

আমি আর কিছু বলছি না। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি। আমার মনটা অন দিকে মোড় নিচ্ছিল। আহীর হঠাৎ বলল, 'এই, চাঁদ দেখবে?'

আমি তো অবাক। এই দিন-দুপুরে চাঁদ কোথায় পাব! সূর্যদেবের কৃপা আকাশ এখন ঝলমল করছে।

'কি গো, দেখবে?'

'কোথায় পাব এসময় চাঁদ?'

'আমি দেব।'

'ধ্যাৎ! খালি ইয়ার্কি।'

'আরে ইয়ার্কি না। তুমি দেখবে কি না বল না।'

'কোথায়?'

'আছে—আছে—চল, আজ তোমাকে আকাশ ভরা চাঁদ তারা দেখিয়ে আনি।'

আমি বুঝতে পারছি না। বোকার মত তাকিয়ে আছি। আহীর সামনের দিকে দূরে আঙুল দেখাল। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম। আমি হাসছি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। না, দিনের বেলায় তারা দেখব বলে নয়। কেন যে হচ্ছে বোঝাতে পারছি না। আহীরের প্রতি আমার ভালোবাসা আমারই ক্ষত-বিক্ষত মনটাকে যেন স্নেহের প্রলেপ দিয়ে যাচ্ছে। আহীর কি অদ্ভুত সুন্দর ভাবে হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে ওকে। ঠোঁটের উষ্ণস্পর্শে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে আমার দুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে ওকে খুন করে ফেলি। এক্ষুনি যদি চারিদিক জনশূন্য হয়ে যেত, অথবা গুপি বাঘার ভূতের চটি যদি আমাদের পায়ে থাকত তাহলে তালি দিয়ে উড়ে যেতাম কোন জনহীন মরুপ্রান্তে বা নির্জন উপত্যকায় অথবা গহন অরণ্যে কিংবা উঁচু পাহাড় ঘেরা কোন মানব বর্জিত রাজ্যে। কি ভালোটাই না হত। আমার প্রেম দিয়ে আমি ওকে পাগল করে দিতাম। কিন্তু এই জনবহুল পাবলিক প্লেসে এরকম লাগাম ছাড়া ইচ্ছে হওয়ার কোন মানেই হয় না।

'তুমি এখানে দাঁড়াও, চুপটি করে।'

আমাকে দাঁড়াতে বলে আহীর টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইন দিল। অনেক মানুষের ভিড়ের মাঝে আমি দূর থেকে দেখছি ওকে। ভাবছি এই ক'মাস আগে এত অচেনা লোকের মত আহীরও তো অচেনা ছিল। যেমন এই ছেলেটা অচেনা, ঐ ছেলেটা বা ঐ ছেলেটা। এদের কাউকেই চিনি না। কোথায় থাকে কি নাম কিছুই জানি না। এখন আহীরকে কি এদেরই মত একজন ভাবতে পারি না! চোখে চোখ পড়ে গেল। আহীর তাকিয়ে ছিল আমার দিকে; হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অসম্ভব, এই মানুষটাকে ছাড়া সুস্থ ভাবে বাঁচা অসম্ভব। আর কারুর সাথে আমি ওকে মেলাতে পারব না।

আহীর টিকিট দুটো আমার হাতে দিয়ে বলল, 'ধর। হারিয়ে ফেল না যেন। আমি এক্ষুণি আসছি।'

কিছু জিগ্যেস করার আগেই চলে গেল। মিনিট খানেক একা দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কে যেন আমার চুলের বেনীটা ধরে টানল। চমকে তাকাই পিছন দিকে, 'তুমি! এমন ভয় দেখাও না! কোথায় গেছিলে?'

'জলের সন্ধানে।'

'খেয়েছ?'

'পেলাম ই না, চল বেরিয়ে দেখা যাবে। ঐ যে দরজা খুলেছে।'

লম্বা লাইনটা ভিতরে ঢুকছে। ভিড়ের ঠেলা গুঁতোয় আহীর আমার কাছে আসতে পারছে না। অনেক কষ্টে পাশে এসে দাঁড়াল।

'আমার পিছন পিছন এস। তা না হলে কিন্তু অন্য কাউকে নিয়ে ঢুকে পড়ব। আমার কাছে টিকিট।'

'যাও না। তোমার পিছনে একজন হ্যাণ্ডসাম দাঁড়িয়ে আছে, ওকে নিয়ে যাও।' আমি সাগ্রহে পিছন দিকে তাকালাম। দেখি এক অবাঙালী বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমি হাসতে গিয়েও থেমে গেলাম। কি ফাজিল দেখ। চ্যাংড়ামিতে ওস্তাদ। আমাকে ঠকিয়ে হাসছে।

ভিতরে ঢুকে ধারের দিকে একটা সিটে বসলাম। আহীর বসেছে আমার বাঁ দিকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলছে, 'আমি এখন ঘুমাব। তুমি দেখ, শেষ হয়ে গেলে ডেকে দিও।'

'তুমি এখানে টিকিট কেটে ঘুমাতে এসেছ?'

'এক ঘণ্টা ঘুমাতে পারলেই টিকিটের দাম উসুল। দেখছ না কি আরাম দায়ক পরিবেশ। নরম চেয়ার, মাথার কাছে ফ্যান ঘুরছে। এবার থেকে ভাবছি বাড়িতে ভাত খেয়ে এখানে টিকিট কেটে ঘুমাতে আসব।'

'আমি কিন্তু ডাকতে পারব না। শেষ হয়ে গেলে চলে যাব।'

'তুমি না ডাক, এরাই ডেকে দেবে। একটা টিকিটে তো আর দু ঘণ্টা ঘুমোতে দেবে না!'

'বারে, তুমি ঘুমোবে আর আমি বুঝি একা একা বোর হব!'

'বোর হবে কেন! দেখনা কত কিছু দেখাবে, চাঁদ, তারা, রাশি-টাশি কত কিছু। ঐ দেখ ওটা কি বলত?'

'সেকেণ্ড ব্রীজ।'

'হ্যাঁ, দেখ কলকাতায় যত বড় বড়—কি বলব—স্থাপত্য আছে প্রত্যেকটার মডেল এখানে পাবে। ঐ দেখ, ব্যাণ্ডেল চার্চ, ভিক্টোরিয়া, আর ঐ যে বাঁশটা, মনুমেন্ট।'

লাইট অফ হয়ে গেল।

'এবার তুমি দেখ। আমাকে আর জ্বালিও না।'

'তাহলে আমিও ঘুমাব।'

'সেই ভাল, দুজনেই ঘুমোই এস। শেষ হলে ওরা ডেকে দেবে।'

আহীর আর কোন কথা বলছে না। ঘাড়টা চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে চুপ করে আছে। অন্ধকারে ওর মুখটা ঠিক মত দেখতে পাচ্ছি না। আমি ওকে দেখছি, ও নিশ্চই চোখ বন্ধ করে আছে। তা না হলে আমাকে দেখতে পেত। হয়ত জিগ্যেস করত, কি দেখছ। আমার খুব রাগ হচ্ছে। এদিকে মাথার উপরে কালো আকাশে ছেয়ে গেছে অসংখ্য তারা। ঝিকমিক করছে। মনে হচ্ছে কোন নিপুণ সূচী শিল্পী কালো মখমলের সামিয়ানার উপর রুপালী চুমকির কারুকার্য করে গেছে। পরিবেশটা শান্ত। কেবল একটা অস্পষ্ট নারী কণ্ঠ কি সব বলে চলেছে। আহীর একই ভাবে রয়েছে। ও কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল না কি! একেবারে আনরোম্যান্টিক! মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি গজাচ্ছে। অন্য কোথাও উঠে যাই। এত সিট তো ফাঁকা আছে। বেশ জব্দে পড়বে। চোখ খুলে আমাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজবে। হেভি মজা হবে। ভাববে সমি সত্যি সত্যি বাড়ি চলে গেল না কি! যাই, উঠেই যাই—

উঠতে গিয়েও বসে পড়লাম। ও যদি আমাকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার করে ডাকে! ব্যাপারটা কি রকম হবে! চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। একটা পুরুষ কণ্ঠে নারীর নাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ধ্যাঃ! যত সব ছেলেমানুষী চিন্তা ভাবনা। আমার পরিণত মন অপরিণত মনকে শাসন করছে। দূর! আমার প্রচণ্ড শীত করছে। দেখে দেখে এমন একটা জায়গায় এসে বসেছি, মাথার কাছে বন্ বন্ করে করে ফুল স্পীডে পাখা ঘুরছে। রোদ থেকে এসে প্রথম প্রথম ভালো লাগছিল। এখন অস্বস্তি হচ্ছে। কি রকম ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে হাত পা। আর এদিকে কি সব ছাই ভস্ম দেখাচ্ছে, মাছের কাঁটা, ময়ূরের মাথা। অ্যানাউন্সারের গলাটাও স্পষ্ট নয়, কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না। খুব বিরক্ত লাগছে। আর এই ছেলেটাও সে রকম। রাস্তা ঘাটে যেখানে পারছে ঘুমিয়ে পড়ছে। কুম্ভকর্ণের শালা। মনে হচ্ছে এক ধাক্কা মেরে শালাকে তুলে দি। ভাল্লাগে না; কান্না পাচ্ছে আমার। মাথা নিচু করে বসে আছি। মাথার উপর যা হচ্ছে হোক আমি দেখব না। সবে কাঁদব কাঁদব মুডটা হয়েছে আহীর ডাকছে আমাকে।

'এই, কি হয়েছে গো? দেখছ না? দেখ না দেখ না—কত কিছু দেখাচ্ছে। মুখটা তোলো।'

আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছি। আমার বুঝি রাগ নেই!

'কি হয়েছে সমি, শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'তাহলে এভাবে বসে আছ কেন? দেখ। ও বুঝেছি, তুমি চাঁদ দেখবে বলে বসে আছ? বাহ্! কি রহম তীর মাস্তিসে দ্যাহো। ঐ দ্যাহো চাঁদ দিখাইছে বটে।'

এ আবার কি ভাষা। যতই হাসবার চেষ্টা কর আমি হাসছি না। ঠাণ্ডায় আমার কষ্ট হচ্ছে।

'এই, আমরা কেমন ঘুরছি দেখ। দেখ না।'

আমরা ঘুরছি! কই বুঝতে পারছি না তো! ওমা, তাইতো! চোখের সামনে সব কিছু কেমন সরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা বৃত্তাকারে ঘুরছি।

'কি দারুণ লাগছে না?'

'হুঁ! মাথা নিচু করে বসে ছিলে কেন? বোকা কোথাকার!'

বাঁ হাতটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে, 'আমার হাতটা একটু ধরবে?'

'কেন গো? এাক! তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন? কি হয়েছে?'

'কিচ্ছু না।'

'দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি।'

আহীরের দুই হাতের চাপে আমার হাত পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হীম শীতল অসাড় আঙুলগুলো ওর শরীরের উত্তাপে যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে।

'তোমার হাতটা কি সুন্দর গো! আঙুলগুলো সরু সরু। এত সরু আঙুলে অত বড় বড় গল্প লেখ কি করে? এই—শুনতে পাচ্ছ না! অত পাকা পাকা কথা কি করে লেখ?'

'ওটা আমার বাঁ হাত।'

'হলেই বা বাঁ হাত। তোমার ডান হাতটাও নিশ্চই এমন সুন্দর। দেখি—'

আমি হাতটা টেনে নিতে চাইছি। ও বুঝতে পেরে আরো শক্ত করে চেপে ধরল। আমি বন্দী। একি আমার সুখের বন্দী দশা! বুঝতে পারছি আমার পরাভব ঘটেছে; আর এ পরাভব জয়ের চেয়েও আনন্দের। আমার হাতটা ওর বুকের সাথে লেগে আছে। আঙুলের মাঝ দিয়ে ও নিজের আঙুলগুলো গলিয়ে দিয়েছে। দুহাতে এমন করে ধরেছে আমি হাতটা নাড়তেই পারছি না। চেয়ারে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে কি দেখছে আহীর! কৃত্রিম আকাশের কৃত্রিম কালপুরুষ! আমার ওদিকে মন নেই। আমি সন্তর্পনে শোনার চেষ্টা করছি, আহীরের আঙুলগুলো আমার আঙুলের কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলছে। গোপনে চলেছে গোপন সম্ভাষণ। তৃতীয় ব্যক্তির শোনা মানা।

শো শেষ। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল। আহীর এখনো আমার হাতটা ধরে আছে। আমি টানতেই বাঁধন আলগা হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে আর সকলের সাথে পা মিলিয়ে বাইরে এলাম। বৃত্তাকার করি ডোরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের স্ট্যাচু আর সারা ব্রহ্মাণ্ডের নানান জিওগ্র্যাফিক্যাল ডকুমেন্টস্ সাজান রয়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখছি।

সামনে আহীর দাঁড়িয়ে পড়েছে। অত মন দিয়ে কি দেখছে কে জানে! আমি ওকে ফেলে এগিয়ে এলাম। পূর্ণগ্রাস সূর্য্য গ্রহণের ডায়মণ্ড রিং দেখছি। ডায়মণ্ড রিং সব চাইতে সুন্দর দেখা গেছিল ডায়মণ্ড হারবার থেকে। আরে! কি দারুণ মিলে গেছে, আগে তো ভেবে দেখিনি। সত্যি, অপূর্ব সুন্দর জিনিসটা। এই বিরল অনুপম দৃশ্যটা সচোক্ষে দেখতে পেয়েছি বলে মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ছবিটাও কি প্রমিন্যান্ট তুলেছে। মোহিত হয়ে দেখছি। আহীর আচম্‌কা এক টান মারল চুলটা ধরে, 'কি দেখছ?'

'উহ্ মাগো! লাগেনা বুঝি?'

'লাগে বুঝি!' দাঁত বের করে হাসছে।

'না—'

আহীর একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরল। ধীরে অথচ স্পষ্ট। নির্জন ফাঁকা করিডোরে কি অপূর্ব শোনাচ্ছে। আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি গেটের দিকে। বাইরে বের হতেই আমার কাশি শুরু হল। আহীর জিগ্যেস করছে,

'এবার কোথায় যাবে?'

'নন্দনে চল।'

'চল। গাড়িতে যাবে তো?'

'গাড়িতে কি যাবে! আর দু পা হাঁটলেই রবীন্দ্র সদন।'

'তুমি এত কাশছ কেন? এখনো ঠাণ্ডা লাগছে?'

'না'।

'তাহলে ?'

'তুমি দেখে দেখে এমন একটা জায়গায় গিয়ে বসলে ! একদম পাখার সামনে—'

'আগে বলবে তো। অন্য কোথাও উঠে যেতাম। য্যাঃ, এমন বোকার মত কাজ র ! আমি নিজেকে গিলটি ফিল করছি।'

আমি হাসছি। গিলটি ! তুমি জান তোমার অপরাধ কতটা ? এই সামান্য ়্যাপারে গিলটি ফিল করছ !'

'তার মানে ! আমার আরো অনেক অপরাধ আছে না কি ?'

আমি চুপ করে গেছি ; আর কিছু বলছি না। কিন্তু ও আমাকে চুপ করে ়াকতে দেবে না। 'এই, বল ; বল আমার কি অপরাধ।'

'থাকনা, নাই বা জানলে।'

'না থাকবে না। আমাকে জানতেই হবে।'

'বড্ড রোদ, ছাতাটা খোল না।'

'কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোর না।'

'আরে ! সত্যি বলছি, ভাল্‌লাগছে না রোদটা। খোল না ছাতাটা।'

আহীর ওর ছাতাটা খুলতে খুলতে বলছে, 'তোমার কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি সত্যিই জানতাম না।'

'তুমি একা মাথায় দেবে ! আমাকে একটু দাও।'

'নাও। এবার বল।'

'বাদ দাও ওসব। একটা গান শোনাও।'

'কি গান ?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'তুমিই বল।'

'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে…। শোনাও।'

প্রথম খানিকটা গাইল আহীর। বলছে, 'এর পরের সুরটা ভুলে গেছি ধরিয়ে দাও।'

সুরটা বলে দিতে ও আবার গাইছে। আমি জানতাম গানের কথা বললে ও পূর্ব প্রসঙ্গ ভুলে যাবে। আমার আফসোস হচ্ছে, আমি যদি আহীরের মত সুন্দর গাইতে পারতাম ! তাহলে ওর সুরে গলা মেলানো যেত। গান শেষ করে ও অন্য ফুটে তাকিয়ে আছে। দুজন অ্যাংলো। দুজনেই মহিলা। পোশাকের কি বাহার ! আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, ঐ পোশাকে রাস্তায় বের হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমাদের দেশের ভিখারীরাও বোধহয় নিজেদের পোশাকের ব্যাপারে এতটা কার্পণ্য করে না। অবশ্য এ কার্পন্য তো অভাবে নয় স্বভাবে। তবে ওদের কাছে এটা কোন ব্যাপারই নয়। তবুও ভাবি, ওরা তো দেখতে পাচ্ছে আমাদের দেশের মেয়েরা এতটা উগ্র ভাবে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করে না। পোশাকে একটু শালীনতা আনলেই হয়, এতে কি এমন ক্ষতি হবে ওদের ! এ যেন পুজো

মণ্ডপে সুইমিং কস্টিউম পরে চলে এসেছে। আহীর কি ওদের দিকেই তাকিে আছে! মনে হয়। বললাম, 'দেখো না—দেখো না।'

'এই—আমি মোটেই দেখছি না।'

'দেখছ না তো কি করে বুঝলে আমি কি দেখতে না করছি?'

'আরে এসব জিনিস আমাদের কাছে ডাল ভাত। নতুন করে আর দেখার কিছ নেই। আগ্রাতে তো এদের ভিড়ই বেশী।'

'আগ্রার জিনিস দেখেছ। এখন সুযোগ পেয়েছ কলকাতার জিনিস দেখছ।'

'হ্যাঁ, দেখছি তাতে হয়েছে টা কি! ওরা তো আমাদের দেখানোর জন্যই পরেছে।

'কখনো না। ওটা ওদের পোশাক তাই পরেছে।'

'তুমি ও রকম পরতে পারবে?'

'ধ্যাৎ! অসভ্য।'

'তুমি একদম সাজনা কেন সমি? একটু সাজতে পা'র তো!'

'কি হবে সেজে?'

'কি আবার হবে! মেয়েরা কেন সাজে; সুন্দর দেখাবার জন্য। ঐ দে'খ, ঐ মেয়েটা কি সুন্দর সেজেছে!'

একজন উটতি আধুনিকাকে দেখাল আহীর। বয়স আমাদের চাইতে অল্পই হবে। কুকুরের গলার বেল্টের মত মেয়েটা কি একটা বেঁধেছে গলায়। গোটা বেড়ট কালো, কণ্ঠনালীর কাছে লরির হেডলাইটের মত বড়সড় একটা সাদা পাথর। চুরিদারের ওড়নাটা গায়ে না দিয়ে খোঁপায় জড়িয়েছে। মা তারার মত ঠোঁট দুটো রক্তাক্ত। চুড়িদারের সঙ্গে কলার ম্যাচ করে এক গাঁট লম্বা মুক্তো বসানো টিপ। ঝাঁটার গুলোর মত মোটা ঐ একই রঙের বালা। পায়ে সরু পেন্সিলের মত এক বেগদা লম্বা হিল জুতো। সেদিকে তাকিয়ে আমারই পা টলমল করছে। কান থেকে দোদুল্যমান গহনা দুটি কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে। আধুনিক হিন্দী ফিল্মের নায়িকাদের মেক্‌আপের কি নিখুঁত অনুকরণ। অসীম ধৈর্য্য। নিজেকে এত সুন্দর পরিপাটি করে তৈরী করতে মেয়েটির না জানি কত সময় লেগেছে! তোমার পারিশ্রম সার্থক হে অনামিকা, তোমাকে আহীরের ভালো লেগেছে। আহীর আমাকে ঐ বেশে দেখতে চাইছে ভেবে আমার হাসি পাচ্ছে। আমাকে হাসতে দেখেও বলছে—

'না না, তুমি ওভাবে সাজবে কেন! তুমি তোমার মত করে সাজবে। অন্য ভাবে। কিন্তু সাজবে।'

'আচ্ছা, এবার চেষ্টা করব।'

কথায় কথায় আমরা নন্দনের কাছে এসে পেঁ'ছেছি। ফোমের জ্যাকেটের একটা কাটা হাত পড়ে আছে ফুটপাথে। সেটা দেখিয়ে আহীর বলছে—

'ঐ দেখ, তোমার আধুনিক কবিতা লেখার উপকরণ পড়ে আছে।'

'ধ্যাৎ, এটা দেখে আবার কবিতা লেখা যায় না কি! এমন কথা বল—'

'কেন যাবে না! লিখবে—

জ্যাকেটের একটা কাটা হাত,
ফুটপাথে পড়ে আছে একাকি
নিঃসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায়।
আজ বাড়ি থেকে এক বাটি ডাল খেয়ে বেরিয়েছি।
ডালটা ঠিক সিদ্ধ হয়নি।...

এর পরে আরো লিখবে; আমি শুরুটা করে দিলাম। তোমার এ কবিতা পড়ে অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বোদ্ধা সমালোচকগণ চিন্তা করবেন, জ্যাকেটের ঐ কাটা হাতটার সঙ্গে ডালের কি সম্পর্ক! আর ডালটাই বা সিদ্ধ হল না কেন! আর যদিও বা সিদ্ধ হল না তো কবি খেলেনই বা কেন!'

ও বলেই চলেছে। আমি হাসছি খুব। অনেক দিন পর হাসছি।

'হাসছ যে! কবিতাটা ভালো না?'

'সত্যি, তুমি পারোও বটে। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা? মানছি আধুনিক কবিতায় ছন্দের বন্ধন নেই। কিন্তু ছন্দহীনও তো নয়। আধুনিক কবিতার নিজস্ব একটা ছন্দ আছে।'

'আরে! আমি কি সেটা অস্বীকার করছি না কি?'

'না; আজকাল অনেককে মন্তব্য করতে শুনেছি। দেওয়ালে এক তাল কাদা বা বরফ ছুঁড়ে দিলে না কি মডার্ন পেন্টিং হয়ে যায়। অথবা খবরের কাগজের কয়েকটা হেডিং ছোট বড় লাইনে সাজিয়ে পর পর জুড়ে দিলেই আধুনিক কবিতা তৈরী হয়ে যায়। আর যেটা যত বেশী দুর্বোধ্য হবে সেটা তত উচ্চমানের আর্ট।'

'ওসব তো নিন্দুকেরা বলে, আমি নই। আমার আধুনিক কবিতা ভালোলাগে। সত্যি বলছি।'

নন্দনের পিছনের গেট দিয়ে ঢুকলাম আমরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে আহীর বলছে, 'কোথায় বসবে গো? চারিদিক তো ফিল্‌আপ।'

'তাই তো দেখছি। এত ভিড় হয়েছে কেন আজ!'

'চল, পিছন দিকটায় যাই। প্রথম দিন যেখানে বসেছিলাম।'

পিছনে গিয়ে দেখলাম সে জায়গাটাও রিজার্ভ। পুকুর পাড়ে বসলাম।

'তুমি সাঁতার জান?'

'জানি।'

'তোমাদের বাড়ির কাছে পুকুর আছে?'

'না।'

'তাহলে! তুমি তো ছোটবেলায় এখানে চলে এসেছ, কোথায় সাঁতার শিখলে?'

'প্রত্যেক বছরই তো দেশে যাই, ওখানেই শিখেছি। দূর! এখানে বসা যায় না কি! পা হড়কে যাচ্ছে। কি ঢালু দেখছ না!'

'কি করবে বল, কোথায় বসবে! চারিদিক ভর্তি দেখ।'

'কি ঢালু এখানে, পা-ই রাখতে পারছি না।'

'জুতোটা খোল একবার।'

'কেন ?'

'তোমার পা টা দেখব।'

'যাঃ!' কি ছেলেমানুষী আবদার।

'ও হ্যাঁ! ভালো কথা, তখন কি সব উল্টো-পাল্টা বকে কথা ঘুরিয়ে দিলে। বল, আমি কি অপরাধ করেছি।'

'আবার সেই কথা ?'

'তোমাকে বলতেই হবে।'

'কি করবে শুনে ?'

'আগে তো শুনি তারপর ভেবে দেখা যাবে কি করব।'

'নাই বা শুনলে ; তুমি আমার চোখে অপরাধী হয়ে থাক। কিন্তু আমি তোমার চোখে তোমাকে অপরাধী করতে পারব না। সে ভারি অন্যায় হবে।'

'ও সব জটিল কথা আমি বুঝি না। সহজ করে বল।'

আমি হাসছি। ভেবে পাচ্ছি না কি দিয়ে প্রসঙ্গ বদলাব। ও বলছে, 'লাস্ট যে চিঠিটা দিয়েছ—একটু ভেবে দেখ তো, আমাকে কিরকম ভৎসনা করেছ তুমি! আমি কি সত্যিই এত ভৎসনা পাওয়ার মত অন্যায় করেছি ?'

আমি অবাক। 'ভৎসনা! আমি তোমাকে ভৎসনা করেছি! তুমি পারলে একথা বলতে ?'

'আরে! রেগে যাচ্ছ কেন ?'

'না না, তুমিই বল। এই ভৎসনা শব্দটা ব্যবহার করতে পারলে? আমি পারি তোমাকে ভৎসনা করতে ?'

'তুমি শব্দটাকে ওভাবে নিচ্ছ কেন! এতো আর কোন দিদিমনি ছাত্রকে ভৎসনা করছে না। তুমি আমাকে ভৎসনা করেছ, ভালোবেসে। লভ অ্যান্ড পেয়ার সে। জান তো, আগ্রাতে আমাদের একজন কুক্ আছে ; খুব ভালোবাসে আমাদের। ধর আমরা কয়েকজন নেই, মানে পরে ফিরেছি। সেদিন হয়ত ভালো মন্দ নতুনত্ব কিছু রান্না হয়েছে ও আমাদের জন্য চুরি করে সরিয়ে রাখত। আমরা হয়ত বললাম, কি আজ হবে না? মুখে আঙুল দিয়ে বলত, চুপ, কিসি কো বাতানা নেহী হ্যাঁ! ম্যাঁয়নে রাখ্ দিয়া লভ অ্যান্ড পেয়ার সে। ও কথায় কথায় এটা ইউজ করে, লভ অ্যান্ড পেয়ার সে।' সেই রকম তুমি আমাকে লভ অ্যান্ড পেয়ার সে ভৎসনা করেছ। তাতে হয়েছেটা কি!'

'মোটেও আমি তোমাকে ভৎসনা করিনি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমাকে ভৎসনা করনি। আমি শব্দটা উইথড্র করে নিচ্ছি। এবার সত্যি করে বলত, তোমার কি হয়েছে ?'

আমি কিছু বলছি না। কি বলব বুঝতে পারছি না। আমাকে নিরব দেখে আহীর বলতে শুরু করল, 'তোমার সাথে দেখা হবার পর আগ্রায় গিয়ে প্রথম যে চিঠিটা পেলাম—ওটা পড়ে ক'দিন খুব চিন্তা করেছি। বার বার পড়েছি চিঠিটা। বোঝার চেষ্টা করেছি, এ মেয়েটা কি চায় আমার কাছে! দেখ সমি, তোমার ভাগ্য যদি একটু প্রসন্ন হত তাহলে তুমি হয়ত আমার বৌদি হতে—'

'ও কথা বলছ কেন! তোমার বৌদি হতে না পারাটা আমার দুর্ভাগ্য বলে আখ্যা দিচ্ছ কেন! তুমি খুব ভালো করেই জান এটা আমি চাইনি। হ্যাঁ, একেবারেই চাইনি বললে ভুল বলা হবে। তবে সেটা ছিল আমার ছেলেমানুষী, খামখেয়ালিপনা। আর এর পিছনে তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা কাজ করেছে। প্রথমে বুঝিনি। বুঝলে এ হঠকারীতা করতাম না। এখন বুঝি কি অসম্ভব বদলে গেছি আমি। আর এই বদলে যাওযাটা বাড়ির কেউ মেনে নিতে পারছে না।'

'কি কর এখন বাড়িতে?'

'কিছুই না। কি করব!'

'তোমার অভিনয় কেমন চলছে?'

'আর যাই না।'

'কেন?'

'অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছ! কেন?'

'এমনি।'

'কি করছ তাহলে এখন, শুধু টিউশনি করে সময় কাটছে?'

'টিউশনিও ছেড়ে দিয়েছি।'

'হোয়াট! কম্পিউটার ছেড়েছ, অভিনয় ছেড়েছ, টিউশনি ছেড়ে দিয়েছ। কেন সমি?'

'কিচ্ছু ভাললাগে না আর, বিশ্বাস কর। বাইরে বের হতে ইচ্ছে করে না।'

'আমার জন্য?'

'তোমার জন্য হবে কেন। কারুর জন্য কেউ কিচ্ছু করে না। মানুষ বড় স্বার্থপর জানতো। আমার নিজের ভালোলাগে না তাই যাই না।'

'কিন্তু তোমার এই ভালো না লাগার জন্যে তো আমি দায়ী।'

'তা কেন! তোমাকে আর পাঁচটা বন্ধুর মত সহজভাবে মেনে নিতে না পারাটা তো আমারই অক্ষমতা। এখানে তোমার দোষ কোথায়!'

'তোমার বাড়িতে এ ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন করেন নি?'

'করেছে বৈকি, তবে আমি কিছু বলিনি। তুমি ভেব না। তোমার কথা কাউকে বলিনি।'

'কেন বলনি?'

'কি হবে বলে! তাছাড়া এ আমার একার যন্ত্রণা, একান্তই নিজের। এর ভার

আমি একা বইব। আর আমাকেও তো বাঁচতে হবে; বলে দিলে আমি যে হালকা হয়ে যাব। কি নিয়ে বাঁচব তখন!'

'তোমার লেখা! তুমি লেখা নিশ্চই ছাড়নি?'

আমি হাসছি। আহীর সংশয় মিশ্রিত কণ্ঠে এমনভাবে জিগ্যেস করল না হেসে পারলাম না। কিন্তু আমার ভিতরটা কাঁদছে। কতদিন লিখিনি। জানি না এতদিন না লিখে আছি কি করে।

'হাসছ যে! লেখাও ছেড়ে দিয়েছ?'

'নাহ্, এতদিন লিখিনি, লিখতে পারিনি কিছু। এবার লিখব।'

'তুমি লেখা ছাপাবার কথা ভাব না?'

'ভেবে কি লাভ! বই ছাপাতে অনেক পয়সা লাগে। আমার অত পয়সা কোথায়! তবে একেবারেই যে ভাবি না তা নয়। ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে।'

'আমাকে তখন জানাবে তো?'

'না। কাউকে জানাব না। কাউকে নয়।'

'আমাকেও নয়?'

'না। সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব। ছদ্মনামে লিখব।'

'তুমি পারবে আমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে?'

'চেষ্টা করব।'

'না না, ওটি কোরো না। আমার কাছ থেকে তুমি সরে যেও না। তোমার পেন নেমটা আমাকে বল।'

'কি করবে জেনে?'

'বারে! তোমার প্রকাশিত বই তুমি হয়ত আমাকে দিতে ভুলে গেলে; আমি তো বাইরে থেকে কিনে পড়তে পারব! কত আনন্দ পাব বলত! সব্বাইকে বলব, এই বই এর লেখিকাকে আমি চিনি। শুধু চিনি নয়, খুব কাছ থেকে দেখেছি, মুখে কোথায় কটা তিল আছে তাও জানি।'

শেষের কথাগুলো ধীরে বলল। আমারই মত দুহাতের উপর মাথা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো শান্ত গভীর। এতটাই গভীর যে ও চোখে আমার প্রতিচ্ছবি পড়ে হারিয়ে গেছে। আহীরের মুখটা একজন দরদী প্রেমিকের মুখের মত। ওর দৃষ্টি আমার বুকে কাঁপন ধরাচ্ছে। আমার পরাস্ত মনটা অসহায় ভাবে বলছে. ওভাবে দেখোনা আহীর, আমার বাঁচার অন্তিম শক্তিটুকু কেড়ে নিও না। তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আমাকে এভাবে সম্মোহিত কোর না। আমাকে বাঁচতে দাও।

আমিই মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তাকাতে পারছি না ওর দিকে।

'কি হল, মুখ ঘুরিয়ে নিলে যে?'

'তাকাতে পারছি না তোমার দিকে।

'কেন?'

'জানি না।'

'তোমাকে কেউ দেখতে আসেনি?'

'কি জন্য?'

'তোমার বিয়ের ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ।'

'পাত্র নিজে এসেছে কোনদিন?'

'না।'

'কেমন লাগে তোমার?'

'ভালো যে লাগে না এটুকু বলতে পারি। শুধু আমার কেন, কোন মেয়েরই ভালোলাগে না। কিন্তু মেয়েদের ভালোলাগা মন্দলাগার মূল্য কজন দেব বল!'

'কি মনে হয় তখন?'

'ওর চাইতে চরম অস্বস্তিকর ব্যাপার বোধ হয় আর কিছু হয় না। রং কালি মেখে সং সেজে অচেনা লোকেদের সামনে নিজেকে প্রদর্শিত করা। মনে হয় জোড়ায় জোড়ায় চোখগুলো আমার সর্বাঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—'

'তুমি কি ভাব, যারা তোমাকে বাড়ির বৌ করবে তারা না দেখেই তোমাকে নিয়ে যাবে?'

'তা কেন! দেখবে অবশ্যই। ছবি দেখে পছন্দ করা যায় না? হ্যাঁ, এখন বলবে ছবিতে পারফেক্ট ওঠে না। কালো মেয়েকে সাদা করে দেয় বাঁটো মেয়েকে লম্বা করে দেয়। আরে বাবা চাঁদামাছকে তো আর চাঁদ করা যায় না! ছবি দেখে একটা অনুমান তো করা যায় বস্তুটি কেমন! বাড়ির লোকের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। যারা বিয়ে করবে তারাই পরস্পর দেখা করে কথা বলে নিতে পারে। এতে তো কোন অপরাধ নেই। তা না, হার্ডল রেসের ব্যারিকেট টপকানোর মত মেয়েদের একটা একটা করে গাঁট টপকাতে হয়। প্রথমে মাসি মেসো, তারপর মামা মামি, তারপর বাবা মা, তারপর দাদা বৌদি, তারপর দিদি জামাইবাবু; এঁদের পছন্দ হলে তারপর পাত্র স্বয়ং একপাল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেয়ে দেখতে আসবেন, যেন বারোয়ারি পুজো মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে এসেছেন। তারপর এক পেট প্রসাদ খেয়ে বলবেন, পরে খবর দেব। ভেবে দেখ একবার মেয়েটার মনের অবস্থা। এতগুলো মানুষ তার রূপ গুণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাকে বাতিল করে গেল। সে নিজের কাছে কতটা ছোট হয়ে গেল বলত! কতটা অপাংক্তেয় মনে করছে সে নিজেকে!'

'এটা ঠিক। এভাবে হ্যারাজ করার কোন মানেই হয় না। এ তো অভদ্রতার নামান্তর মাত্র।'

'তুমি জান না, এখন মেয়ে দেখতে আসাটা একটা উৎসব হয়ে গেছে। আর কি সব অ্যাবসার্ড প্রশ্ন! ভিক্টোরিয়া দেখেছেন? বলুন তো ভিক্টোরিয়ার পরীর

কটা ডানা ? মনুমেন্টের উচ্চতা কত ? আপনার বাবা অবসর গ্রহণের পর কি পরিমাণ টাকা পেয়েছেন ? আপনার দাঁতটা একটু দেখাবেন ? দিস ইজ ডিস্‌গাস্‌টিং আহীর। এরা মেয়ে দেখতে এসেছে না চ্যাংড়ামো করতে এসেছে !'

'এমনও হয় না কি ! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। আগেকার দিনে না হয় বয়স্ক লোকেরা মেয়ে দেখতে যেত আর বলত, মা একটু হেঁটে দেখাও তো, শাড়ীটা একটু তোল পা টা দেখি, খোপাটা খোল চুলটা দেখি। এখন এসব নেই।'

'আছে। ভেবোনা এগুলো আমি গল্পের মত বানিয়ে বলছি। ব্যক্তিগত ভাবে যে মেয়েটি এ প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়েছে সে নিজে জানিয়েছে। আমি জেনেছি খবরের কাগজ পড়ে। আরে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। আমার এক দিদিকে পাত্র নিজে দেখতে এসে বলছে আপনার শাড়ীটা তুলুন পা টা একটু দেখব। ভাবতে পার ! হার্ডলি পাঁচ থেকে ছ' বছর আগেকার কথা বলছি।'

'এগুলো সমর্থন করা যায় না; কোন মতেই না। তবে মেয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এবং সেটা অত্যন্ত ভদ্র ভাবেও হয়। আমি তো যাই আমার দাদার মেয়ে দেখতে।'

'খুব অন্যায় কর। কেন যাও ? তুমি এমন গ্যারান্টি দিতে পার কি, যে তোমার পছন্দ করা মেয়েকেই তোমার দাদা বিয়ে করবেন ? ধর তুমি একজনকে পছন্দ করে এলে, তোমার দাদা সেই মেয়েটাকেই দেখে অপছন্দ করলেন। এমনটা তো হতেই পারে, অসম্ভব কিছু নয়। এখানে তোমার পছন্দের কি মূল্য রইল ? প্রয়োজন ছিল কি তোমার যাওয়ার ? আজকাল শিক্ষিত ছেলেদের বলতে শুনেছি, আগে তোমরা দেখে এস তোমাদের পছন্দ হলে আমি যাব। আরে পাঁঠা. বিয়েটা তো করবি তুই; তোর বাড়ির লোক তো আর করবে না ! পছন্দের ফার্স্ট প্রেফারেন্স তোর। তোর পছন্দের উপর তো কারুর কথা চলতে পারে না। আর চলা উচিতও নয়। পাত্র-পাত্রীকে অপছন্দ করার অধিকার একান্তভাবে তাদের পরস্পরের। আর আজকাল সেকালের মত খোকা-খুকিদের বিয়ে হয় না। আজকালকার পাত্রী-পাত্ররা যথেষ্ট ম্যাচিওর। তাই নিজের সাথীকে বুঝে নেবার মত পর্যাপ্ত বুদ্ধি বা ক্ষমতা দুটোই থাকে।'

'আর ধর যাদের নেই !'

'যাদের নেই তারা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করবে গার্জিয়েনের উপর। অত ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করার কি আছে ! যা দেখে দেবে তাই বিয়ে করবে।'

'সে না হয় হল, কিন্তু এমন কিছু কিছু কন্‌জারভেটিভ ফ্যামেলি আছে'—

'দেখো কন্‌জারভেটিভ কথাটা ভীষণ আপেক্ষিক। ধর কোন পরিবারের একটা মেয়ে যার কোন বন্ধু নেই, আই মিন্‌ কোন ছেলের সাথে বন্ধুত্ব নেই। কারণ বাড়ির লোকের তীব্র আপত্তি। একদল বলবে এটা কন্‌জারভেটিভ পরিবার। আবার দেখ, আর একটা পরিবারের মেয়ে যার ছেলে বন্ধু আছে, তাদের সাথে বাড়িতে আড্ডা মারে গল্প করে কিন্তু তাদের সাথে বাইরে কোথাও যেতে দেওয়া হয়

না। কেউ কেউ বলবে পরিবারটা কন্‌জারভেটিভ। আবার এমন অনেক কন্‌জারভেটিভ পরিবার আছে যাঁরা মেয়েকে কোয়েড স্কুলে বা কলেজে পড়াবার কথা ভাবতেই পারেন না। ছেলেদের অন্য গ্রহের প্রাণী বা ছোঁয়াচে রোগগ্রস্থ বলে মনে করেন। এখন বল, তুমি কন্‌জারভেটিভ ফ্যামেলি বলতে কি বোঝাতে চাইছ?'

'আমি ঐ থার্ড ফ্যামেলির কথা বলছি। ধর কোন অচেনা ছেলের সঙ্গে একা তাঁদের মেয়েকে কথা বলতে দিতে নারাজ। সে ক্ষেত্রে কি হবে?'

'পাত্র যদি নিজে পাত্রী দেখতে আসে তাহলে কোন পাত্রী পক্ষ আপত্তি করে বলে তো আমার জানা নেই। সে যতই কন্‌জারভেটিভ হোক—'

'আরে আমি সেকথা বলছি না। তুমি এইমাত্র বললে না, একাকি পরস্পরকে বুঝে নেওয়ার কথা—'

'হ্যাঁ তাতে হয়েছেটা কি! যে ছেলের সঙ্গে মেয়ে তার ভবিষ্যত জীবনটা কাটাতে চলেছে তার সাথে একা কিছুটা সময় থাকলে কি হবে, মেয়ের গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে?'

'সেটা না হয় আমি বুঝলাম কিন্তু ঐ পরিবারটাকে বোঝাবে কি বলে?'

'দেখো. এটা বিশ্বাসের প্রশ্ন। মানুষের প্রতি যদি এই সামান্য বিশ্বাসটুকু না থাকে তাহলে তো সমাজে বাঁচাই দুরূহ। আমি অন্ধকার হলে বসে সিনেমা দেখছি; আমার পাশের চেয়ারে একটা অচেনা ছেলে বসে আছে। সে যে আমার সাথে অশালীন আচরণ করবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে করবে না। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি তার পাশে বসে আছি। এটা না থাকলে আমি তো কোনদিন বাইরেই বের হতে পারব না। এত ন্যারো মাইন্‌ডেড হলে প্রতিটা পদক্ষেপে অবিশ্বাস ঘিরে ধরবে। ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে পা রাখলেই অনিশ্চিত আশংকা, নিরাপত্তা হীনতার ভয়। আমার মনে হয় এতে সন্তানের ক্ষতিটাই বেশী।'

'আর যে মেয়েরা তোমার এ যুক্তিকে অযৌক্তিক বলে মনে করবে, তাদের কি বলবে?'

'তাদের জন্য তো আমার এ যুক্তি নয়। তারা করুক না সনাতন পদ্ধতিতে পাত্র পাত্রী নির্বাচন। কে না করেছে! তুমি এর বিকল্প জানতে চেয়েছিলে তাই বললাম। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জান! আমি তো এখানে বসে বসে এত বড় বড় কথা বলছি। এত লম্বা চওড়া রেভলিউশনারি বক্তৃতা দিচ্ছি, আমাকেও বেশ কয়েকবার এ রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। কোন রকম প্রতিবাদ করতে পারিনি, আর করলেও সে প্রতিবাদ মূল্য পায়নি। পাত্র পক্ষ আসার এক ঘণ্টা আগে আমাকে জানান হয়েছে, আজ কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সামনে আমাকে সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে বসতে হবে। ব্যাস্, এ ব্যাপারে নো আর্গুমেন্ট। আমাকে রীতিমত মেন্টালি প্রেসারাইজড্ করা হয়েছে, বাবা কাকার

সম্মান যদি আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই তাহলে যেন ভিজে বিড়ালটি হয়ে ওনাদের সামনে যাই। এ ব্যাপারে আমার যে কোন মতামত থাকতে পারে সেটা কেউ ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না। আরে বাবা, আমি কাদের সামনে যাচ্ছি! আমাকে পছন্দ বা অপছন্দ করার অধিকার আমি কাদের দিচ্ছি! সেটা জানার রাইট আমার নেই? ছেলের ছবি দেখতে চাইলে কি বলে জান! অবাক হয়। বলে, 'তুই কি ছেলের ছবি দেখবি!' আগে তোকে তারা পছন্দ করুক তবে তো! ছেলেরা আগে ছবি দেবে না। কেন দেবে না? সংবিধানে নিষেধ আছে না কি? তুমি হাসছ! এগুলো শুনলে আমার রাগে মরে যেতে ইচ্ছে করে। সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয় কখন জান! যখন শিক্ষিত, যুক্তিবাদী বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা এ কথা বলেন। তখন নিজেকে সান্তনা দেবার ভাষা খুঁজে পাই না। ভীষণ অসহায় মনে হয় নিজেকে।'

'তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন?'

'সরি, আই অ্যাম সরি। আমি একটু এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া আজ অনেকদিন পর এত কথা বলছি। আর একটা মজার কথা শুনবে! এক উন্নত মানসিকতার পাত্রপক্ষ আমাকে দেখতে আসার আগেই পাত্রের ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছবি দেখে আমি নেগেটিভ মতামত দিয়েছি। ব্যাস্, এরপর আর কথা এগোতেই পারে না। হঠাৎ শুনলাম ঐ পাত্রপক্ষ আমাকে দেখতে আসছেন। কি ব্যাপার! ঠাকুমা বললেন, 'ওরা তোকে একবার দেখতে চাইছে।' একি অন্যায় আবদার বলত! বললেন, 'দেখুক না একবার দেখলে তুই কি খয়ে যাবি? দেখলে তো ওরা আর পাঁচজনকে বলতে পারবে ওদের বাড়ি একটা সুন্দর মেয়ে দেখে এসেছি।' তার মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। আরে বাবা সুন্দর বলবেন কি অসুন্দর বলবেন সেটা তো ওঁদের ব্যাপার। এতে এত খুশী হওয়ার কি হল! অথচ একদিন ঠাকুমার বাবা বলেছিলেন, 'মেয়ে কি ঘরের পোষা গরু না কি! যে কেউ এসে দেখতে চাইবে আর গলায় খোঁটা দড়ি বেঁধে গোয়াল থেকে টেনে এনে দেখিয়ে দেব! আমি মেয়ে দেখাব না।' এই বলে পাত্রপক্ষকে ঘরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়ে ছিলেন। তিনি তো আমার তৃতীয় পূর্বপুরুষ। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে তো আমার কোন জেনারেশান গ্যাপ্ নেই।'

'সকলের চিন্তা ভাবনা তো সমান নয়। অতি বড় আধুনিক মানুষও তোমার এ কথাগুলো অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, আবার একজন প্রবীন মানুষও তোমার মতামতকে স্বাদরে গুরুত্ব দিতে পারেন। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা। এ ব্যাপারগুলো ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে।'

'অন্যের কথা থাক। তুমি নিজে কি মনে কর?'

'এতক্ষণ পর সেটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন আছে কি?' আমি হাসছি।

'এতক্ষণ অনেক গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়েছে, এবার আমি একটা মজার ঘটনা বলি শোন। একবার আমি আর আমার এক বন্ধু মেয়ে দেখতে গেছি, ঐ বন্ধুর

জনাই। মেয়েটা লেখাপড়া জানে, দেখতে সুন্দর, শান্ত। মেয়ের বাবা কোলিয়ারিতে কাজ করে। একেবারে দেহাতি। কোথায়-গাঁজা মাজা খেয়ে উল্টে পড়ে ছিল কি জানি ; আমরা যেতে কে যেন ডেকে নিয়ে এল। সে লুঙ্গি পরেই আমাদের সামনে চলে এসেছে। তা আসুক, এমন ভাবে বসল আমাদের সামনে যে ওর দিকে তাকানোই দায়।'

'এ বাবা!'

'হ্যাঁ গো। মেয়েটার মা ইশারা করে ডাকছে সে কিছুতেই যাবে না। বলে, না, আমি ইখানেই বুসব বটে। তুমি লিয়ে আস।'

'কি আনতে বলছে ?'

'এই খাবার দাবার আর কি। তারপর চা সিঙাড়া মিষ্টি দিয়েছে। আমাদের বলছে, তুমরা আসবে বইল্যে অনেক দূর থিকা কষ্ট করি আনুসি বটে। খাও, সিঙাড়া খাও বটে। সিঙাড়ার চেহারা দেখে তোমার খেতে ইচ্ছে করবে না। কি হল ?'

'পিঠে কি রোদ লাগছে।'

'ও এক্ষুনি সূর্য্য ঘুরে যাবে।'

'তারপর কি করলে, খেলে সিঙাড়া ?'

'না খেয়ে উপায় আছে। এক কাপ চা দিযে বলছে, খেইয়ে লও বটে। শ্যাষ হইয়ে গিলে আবার দুব।'

'সে কি! আজকাল অতিথিদের চাও রিপিট করে না কি!'

আহীর হাসছে। 'তবে আর বলছি কি, বাবাটা ভীষণ সরল, সাদাসিধে মানুষ।'

'তোমার বন্ধুর হঠাৎ দেহাতি মেয়েকে বিয়ে করার শখ হল কেন।'

'আরে মেয়েটাতো ভালো। সে মামার বাড়ি থেকে লেখাপড়া শিখেছে। মা ও ভালো। মানে মা মেয়ের কথা পরিষ্কার, আমাদের মতই। শুধু বাপটা ও রকম বলে মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না।'

'তাতে কি হয়েছে, বাপকে নিয়ে তো আর ঘর করবে না। মেয়েটা ভালো যখন বিয়ে করলেই পারে।'

'আমিও তাই বলেছিলাম। মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে চল। পাঁচ বছর অন্তর একবার তো শশুর বাড়ি আসবি। শশুর ওরকম তা তোর কি।'

'বিয়ে হয়নি ?'

'না। তবে ঘটনাটা স্মরণীয় হয়ে আছে। এখনো কোথাও আড্ডা বসলে বলি, গুরু তোমার সেই মেয়ে দেখার গল্পটা বল। খেইয়ে লও বটে।'

'চল অন্য কোথাও বসি!'

'কেন ?'

'এখানে বড্ড রোদ লাগছে।'

'ছাতা খুলব ?'

'না।'

'কি হয়েছে ! ওরাও তো খুলে বসে আছে ।'

'ওরা থাকুক । ওরা আছে বলে আমাদেরও থাকতে হবে ! যত সব অসভ্যের দল ।'

'হুঃ ! অসভ্যের দল ।' আমাকে ভ্যাঙাল । 'এতে অসভ্যের কি দেখলে ? রোদ লেগেছে তাই ছাতা খুলেছে ।'

'তাই বুঝি ! দেখনা একবার কেমন রোদ লেগেছে ।'

আহীর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওদের । 'তাই তো, ওরা তো ছাওয়াতে বসে আছে । ছাতা খুলেছে কেন ?'

ওর প্রশ্ন শুনে আমি হাসছি । প্রথমটা বোকা হয়ে গেছিল ! তারপর বুঝতে পেরে বলে, 'ও…বুঝেছি । আমরাও ছাতা খুলব ।'

'আহা ! কি বায়না !'

আহীর আবার দেখছে ওদের । বলছে, 'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে । আগে রোদ ছিল তাই খুলেছে, এখন রোদ চলে গেছে খেয়াল করেনি ।'

'না মশাই, আমি অনেকক্ষণ ওদের দেখেছি । ওরা প্রথম থেকেই ছাওয়াতে ওভাবে ছাতা খুলে বসে আছে ।'

গম্ভীর হয়ে বলছে, 'তুমি তখন থেকে বসে বসে ঐ সব দেখছ !'

'ধ্যাৎ ! অসভ্য । চল চল রোদ আর ভাল্ লাগছে না ।'

'কোথায় যাবে ? চারিদিকে তো ভর্তি ।'

'চলনা এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে ।'

'বাব্বা ! এইটুকু রোদও সহ্য হয় না । জ্বালিয়ে খেল ।'

পুকুর পাড় থেকে উঠে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলাম । গুঁড়ির চারিদিকে বৃত্তাকারে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ।

'আন্দামানে আমি কোথায় থাকব জান ?'

'কোথায় ?'

মুখটা গম্ভীর করে বলছে, 'কাউকে বোলো না যেন । আমিও কাউকে বলিনি, বাড়িতেও না । শুধু তোমাকে বলে যাচ্ছি । আমার দু বছরের শাস্তি হয়েছে । সেলুলার জেলে বন্দী থাকতে হবে !'

'যাঃ ! খালি ইয়ার্কি ।'

'আরে ! বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি । সেই জন্যে তো দুবছর আসতে পারব না ।'

'ইয়ার্কি মেরো না, ঠিক করে বল ।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'না হচ্ছে না ।'

'একদম হচ্ছে না ?'

'ধ্যাৎ ! বল্ না ।'

'সত্যি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

'না ।'

'তাহলে আর কি করা যাবে !'

'বলনা কোথায় থাকবে ?'

'কার নিকোবরের নাম শুনেছ ?'

'হ্যাঁ'—

'ওখানে। আন্দামানের চেয়েও ছোট্ট একটা দ্বীপ। চারিদিকে শুধু জল আর নারকেল গাছে ঘেরা জমি। আর দুদিন ছাড়াই বৃষ্টি।'

'কি করে থাকবে ওখানে অতদিন, বাড়ির জন্য মন খারাপ করবে না ?'

'করলে কি করব ব'ল ! থাকতে তো হবেই।'

'তুমিই তো ইচ্ছে করে ওখানে নিয়েছ। ড্রিমল্যান্ড।'

'দু বছর পর যখন ফিরব আমার সঙ্গে দেখা করবে তো ?'

ওর প্রশ্নটা আমার মনকে আঘাত করে গেল। দু বছর ! এতগুলো দিন থাকতে হবে ওকে না দেখে ! কি করে থাকব আমি।

'কি দেখছ ? দেখা করবে না ?'

'সত্যিই তুমি দু বছর পর আসবে ?'

'হ্যাঁ গো। অতদূরে থেকে কি ঘন ঘন আসা যায় ! বল না, দেখা করবে না ?'

'ততদিন আমি যদি এখানে না থাকি ?'

'কোথায় যাবে ! দু বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে তোমার ? তাতে কি। বিয়েব পরই দেখা করবে। না কি ততদিনে ভুলে যাবে আমায় ?'

কি নিষ্ঠুর ! কি অসম্ভব নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছে আহীর। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আমার দু চোখ ভেজাতে চাইছে উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা। আমি শক্ত হাতে মোকাবিলা করছি নিজের সাথে। এভাবে কেঁদে সিন্ ক্রিয়েট করার কোন মানে হয়। কি ভাববে ও !

আহীর গাইছে, 'আবার হবে তো দেখা এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো···।' একটার পর একটা মান্না দের গান গেয়ে চলেছে। প্রতিটা গানে যেন আমার কথাই লেখা আছে। আমাকে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছে তারা। আমি দু হাতের তালুতে মুখ ঢেকে আহীরের কণ্ঠে আমার হৃদয় ভাঙার প্রতিধ্বনি শুনছি। আহীর আমার নিঠুর দরদী। যে মনটা ও নিজের হাতে ভাঙছে, সেই মনকে জুড়তে গিয়েই এমনি করে সঙ্গীত সুধায় আপ্লুত করছে তাকে। ও গাইছে, 'হায়রে হৃদয় চেয়েছি তোমার মতন হৃদয়হীনার কাছে···।' লাইনটা কানে আসতেই মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। ও গান বন্ধ করে বলছে, 'না,না, তোমাকে বলছি না। তোমাকে কি হৃদয়-হীনা বলা যায় !'

আমার ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। নিজের প্রতি তাচ্ছিল্য, 'এখন দেখছি হৃদয়হীনা হলেই ভালো হত। কম্ সে কম কিছু তো চাইতে আমার কাছে !'

'এবার তুমি শোনাও।'

'কি ?'

'গান।'

'কেন গাইতে বলছ! তুমি তো জান আমি গাই না।'

'একটা গাও; আমার জন্যে। আমি যে এতক্ষণ তোমাকে কত গান শোনালাম!'

'বিনিময় চাইছ?'

'হ্যাঁ, চাইছি। শোনাও।'

'আমি তোমাকে যা দিয়েছি তার বিনিময় যদি চাই, পারবে দিতে?'

'তুমি আমাকে যা দিয়েছ তা কেউ কোনদিন দেয়নি। আর এর বিনিময় দেবার ক্ষমতাও আমার নেই। কি করে দেব বল, আমি তো তোমার মত কবিতা লিখতে পারি না!'

আমি অবাক। তোমার চিন্তার গভীরতা এত কম আহীর! আমি তোমাকে শুধু কবিতা দিয়েছি! হা ঈশ্বর! মানুষের জীবনের সবচাইতে পবিত্র ঐশ্বর্য্য তার প্রথম ভালোবাসা। যে ভালোবাসার আর এক নাম ঈশ্বরের আশির্বাদ। আমি আমার সেই অমূল্য ঐশ্বর্য্য দিয়ে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি। সে গৌরবের দ্যুতি তোমার হৃদয়কে আলোকিত করল না কেন আহীর? কেন তুমি বন্ধ আগলে লুকিয়ে রাখতে চাইছ আমার সকল প্রাপ্তিকে? মুক্ত কর, আমার অধিকারকে মুক্ত কর আহীর।

'আবার কি ভাবতে বসলে?'

'চ'ল, এবার ওঠা যাক।'

'আর একটু বোস না।'

'সন্ধ্যে হয়ে আসছে না!'

'আসুক। আমি তোমাকে বাড়ি পেঁছে দেব।'

'সত্যি! তুমি যাবে? চ'ল না।'

ও হাসছে। 'আগে বোস তো তারপর।'

'যেতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব। ওঠ।'

'বোস না। বোস—আমি কিন্তু আঁচল ধরে টানাটানি করব বলে দিচ্ছি আমাকে চেন না, আমি সব পারি।'

'এর আগে কটা মেয়ের আঁচল ধরে টানাটানি করেছ?'

'এক জনেরও না।'

'তোমার কোন বান্ধবী নেই?'

'না।'

'কেন? জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে এলে—'

'আমি বয়েজ স্কুলে পড়েছি। বি. এসসি. পড়তে এলাম নাইট কলেজ টেক্‌নিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম সেখানেও মেয়ে নেই। কি করব আমি!'

'সো স্যাড্। না না ঠাট্টা করছি না'—

'খুব মজা না! অত হাসির কি আছে!'

'রেগে যাচ্ছ কেন! শোন না—তোমাদের পাড়ায় মানে বাড়ির আশেপাশে নিশ্চই অনেক মেয়ে ছিল, তাদের কাউকে ভালোলাগেনি ?'

এবার আহীর হাসছে। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে অতীতের পাতা থেকে ছোট্ট কোন স্মৃতি তুলে আনতে চেষ্টা করছে। 'ছোটবেলায় একজনকে ভালোলাগত।'

'তারপর ?'

'তারপর কি! তার কবে বিয়ে হয়ে গেছে। এখন মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসে। কোলে একটা হাতে একটা।'

'তাকে দেখে তোমার কষ্ট হয় ?'

'কষ্ট হবে কেন! পাগল।'

'আগ্রায় তো কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে, তাদের কাউকে ভালোলাগেনি ?'

'নাহ্! ওসব আলট্রা মর্ডান হাই-ফাই মেয়ে আমার ভাললাগেনা।'

আমি অনুমান করার চেষ্টা করছি আহীরের প্রথম ভালোলাগা কেমন হতে পারে। একটু কল্পনা করতে চাইছি। আটপৌরে শাড়ী পরা একটা মেয়ে। মাথায় ছোট্ট একটু ঘোমটা। একটা বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আরো একটি। কোলেরটির থেকে তুলনামূলক বড়। মেয়েটির কপালে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। চোখ দুটোতে একটা নিরব ভাষা আছে। একি! এ যে দেখি আমারই চোখ! আমি কি তাহলে এতক্ষণ নিজেকেই দেখছিলাম! য্যাঃ! ফাজিল।

'তুমি কেন বসলে ?'

'কেন ?'

'জিগ্যেস করছি বল না।'

'তুমিই তো বলতে বললে।'

'হ্যাঁ, শুধু বসতে বলিনি। বসে গান গাইতে বলেছি।'

আচ্ছা গোঁ তো ছেলের! ঘুরে ফিরে সেই গানের কথায় ফিরে এসেছে। এমন হেঁড়ে গলায় গাইব যে আর কোনদিন গান শুনতে চাইবে না। মুখে বললাম, 'গান নয়। তোমাকে বরং একটা কবিতা শোনাই। বইটা দাও।'

'কি বই ?' আমার সদ্য প্রেজেন্ট করা জীবনানন্দ দাশ থেকে বনলতা সেন শোনালাম।

'কি খুশী তো ?'

'আগামী দু বছরের জন্য আজকের দিনটাকে সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আজ তুমি আমার সাথে এতটা সময় থাকবে ভাবিনি।'

'কেন ?'

'কাল বললে না! তোমার একটুও সময় নেই! ভাবলাম কলকাতায় কোন কাজে এসেছ তাই আমার সাথে একটু দেখা করে যাচ্ছ।'

'না, আজ শুধু তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি। অবশ্য দমদমে একটা কাজ ছিল হয়নি।'

নন্দন চত্বরে খোলা মঞ্চে নাটক হচ্ছিল। খানিকটা দেখে বেরিয়ে এলাম। তারপরে দুজন দুটো আইসক্রীম খেতে খেতে ফেরার পথ ধরলাম। এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে দেখি আমার বাস দাঁড়িয়ে আছে।'

'চল, বসে কথা বলি। বাস ছাড়লে নেমে আসব।'

বাসে উঠে মনে হচ্ছে অন্তিমলগ্ন আসন্ন। এখুনি আহীরকে ছেড়ে দিতে হবে।

'পরশু আসবে না?'

'কোথায়?'

'আমাকে সি অফ্ করতে। সাতটা পরেরোয় ট্রেন।'

'না।' আমার চোখের সামনে দিয়ে আহীরকে নিয়ে ট্রেনটা একটু একটু করে দূরে সরে যাবে সে আমি দেখতে পারব না। বড্ড কষ্ট হবে।

'আচ্ছা আসতে হবে না। শোন, মন দিয়ে শোন যা বলছি। অ্যাকটিং ক্লাসে আবার যাবে। তুমি অসুস্থ তাই ডাক্তারের কথা মত চলবে। আর অবশ্যই লিখবে। শুধু গল্প কবিতা নয়, চিঠিও। কি, চিঠি দেবে তো?'

'দেব।'

'আর আগে যেগুলো বললাম?'

'চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা করব না! অবশ্যই করবে!'

'আদেশ করছ?'

'হ্যাঁ তাই!'

ওর আদেশ শুনে আমি হাসছি। ড্রাইভার কেবিনের দরজা বন্ধ করল। সিট্ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আহীর। 'আসি সাঁঝ। যা বললাম মনে রেখো।'

'তুমি চিঠি দেবে না?'

'দেব। নিশ্চই দেব।'

আমার সব কথা হারিয়ে যাচ্ছে। কি বলি! গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আহীর পাদানীতে দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা একটু ঘুরতেই লাফিয়ে নেমে গেল ফুটপাথে। কি যেন বলা হল না। আহীর হাত নাড়ছে। এত কথা তো বললাম, কি বলা হল না! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব! একথা মুখে বলার প্রয়োজন আছে! ও কি এখনো বোঝেনি! জানি না, আমি ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে অপেক্ষা আমি করবই। রেজাল্ট যাই হোক ভয় পাই না। আহীরের বিকল্প আমার জানা নেই, জানতে চাইও না। একবার মনে হচ্ছে দুবছর ওকে দেখতে পাব না, আবার মনে হচ্ছে তার আগেই ও আসবে। বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হল ঠিকই কিন্তু কেউ কিছু বললেন না; অনেকদিন পর বেরিয়েছি তো, মনে হয় তাই। কিন্তু আমি তিষ্ঠোতে পারছি না। কেন ওকে বললাম স্টেশানে যাব না! মানছি আহীরকে চলে যেতে দেখে কষ্ট হবে, ভীষণ কষ্ট হবে। তাতে কি! একবার দেখতে তো পেতাম। আরো কিছুটা সময় থাকতে পারতাম ওর সাথে। এই মুখামির জন

নিজের উপর এত রাগ হচ্ছে যে কি বলব। ভাবছি কি করে যোগাযোগ করা যায় ওর সাথে। কাল যদি ও একবার ফোন করে তো ভালো হয়। কিন্তু ফোন করবে কেন, তেমন তো কথা নেই। তবুও সকালটা আশা করে রইলাম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল তারপর সন্ধ্যে, ফোন এল না। ভাবছি কখন যাব, কোথায় দাঁড়াব কিছুই তো বলা নেই। অত বড় স্টেশানে কোথায় খুঁজব ওকে! শুধু ট্রেনের টাইমটা জানি। ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টা-পনের মিনিট আগে নিশ্চই আসবে। আমি আরো একটু আগে যাব, সাড়ে ছ'টায়। ঐ সময় তো বাপি কলেজ থেকে ফিরবেন; স্টেশানে যদি দেখা হয়ে যায়! ভয় করছে, কি করি! কি করে দেখা করি! বাপি যদি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন তো কোন ভয় নেই। কিছু একটা বলে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু দাঁড়াব কোথায়। কত নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তাও তো জানি না। ইস্ কি বোকা আমি, তখন কেন জিগ্যেস করলাম না। আহীর বলেছিল সি টি সি বাসে করে আসে। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালে কেমন হয়! কিন্তু সি টি সি বাস স্ট্যাণ্ডটা কোথায় তাও তো জানি না। যাগ্গে, একটু আগে গিয়ে খুঁজে নিলেই হবে। স্টেশানে দাঁড়ানো থেকে বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো ভালো। ভিড় তুলনা মূলক কম, খুঁজতে সুবিধা হবে। সকাল থেকে একটু একটু টেনশান হচ্ছিল, বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেটাও বাড়ছে। মাকে বলেছি বিকালে তনুদের বাড়ি যাব। মা তো নিষেধ করলেনই না বরং খুশী হয়েছেন এই ভেবে যে আমি আবার বন্ধুদের সাথে মেলামেশা শুরু করেছি। পাঁচটা বেজে গেছে বাপি এখনো আসছেন না। আমি তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এরপরে বের হলে যথা সময়ে পেঁছিতে পারব না। মা বলছেন, 'এত দেরি করে যাচ্ছিস কেন। আরো আগে বের হতে পারতিস। ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তুই চলে যা বাপি এলে আমি বলে দেব।'

কিন্তু যাই কি করে! বাপি যে রাস্তা দিয়ে ফিরবেন ঐ পথেই তো আমাকে যেতে হবে। আর তনুদের বাড়ি যে ওদিকে নয়। দেখা হলে কি বলব, কোথায় যাচ্ছি।

প্রায় সাড়ে পাঁচটায় বাপি এলেন। বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি শুনে বললেন, 'আজ যেতে হবে না, সন্ধ্যে হয়ে এল। কাল বেলাবেলি যাবি।'

আমার মাথায় বজ্রাঘাত। ঢোক গিলে বললাম, 'সন্ধ্যেবেলা না গেলে ওর সাথে দেখা হবে না। বিকেলে ও বাড়ি থাকে না, পড়াতে যায়।'

'তাহলে সকালে যাবি। এখন যেতে হবে না।'

আর কি যুক্তি দেখাব আমি। আমার গলা কাঁপছে— আমি কিন্তু আগেই চলে যেতে পারতাম, শুধু তোমাকে বলে যাবার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

মা বললেন, 'আচ্ছা যাক না, কেন ওরকম করছ! তাড়াতাড়ি চলে আসবে।'

'কেন ওরকম করছি মোটে বুঝতে পারছ না! এক্ষুনি সন্ধ্যে হয়ে যাবে বৃষ্টি আসবে হয়ত।'

'আমি ছাতা নিয়েছি। ভেবোনা তাড়াতাড়ি চলে আসব।'

বাপি দ্বিতীয় বার কোন মন্তব্য করার আগেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ভাগ্য প্রসন্ন তাই সাথে সাথেই বাস পেয়ে গেলাম। যথাস্থানে নেমে দেখি ছ'টা বাজে। দু একজনকে জিগ্যেস করে সি টি সি বাস স্ট্যান্ডটা খুঁজে নিলাম। কিন্তু জায়গাটা এত বড় আর লোক জন এত হ্যাপাজার্ডলি চলাফেরা করছে যে সেখানে কাউকে খোঁজা তো দূরের কথা এক জায়গায় দাঁড়ানোই দায়। যে যে দিক থেকে পারছে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে। বাস স্ট্যান্ডের সামনেই স্টেশানে ঢোকার সাবওয়ের বড় গেটটার পাশে দাঁড়ালাম। মনে পড়ছে গত বারে আহীরকে যখন সি অফ্ করতে এসেছিলাম তখন ও এই গেট দিয়েই স্টেশান থেকে বেরিয়েছিল। তাছাড়া বাস থেকে নেমে এই গেটটাই তো আগে পড়ে। ও নিশ্চই এখান দিয়ে পাশ করবে। চারে যেমন মাছ এসে কিল্‌বিল্‌ করে আমার চোখের সামনে সেরকম কালো কালো মাথা-গুলো কিল্‌বিল্‌ করছে। এত মানুষও পৃথিবীতে আছে! দুটো মানুষের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বটুকু নেই। পথ চলতে গিয়ে পরস্পর ধাক্কা খাচ্ছে। যাগ্‌গে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে ভাবগম্ভীর চিন্তা করার মত মানসিকতা আমার নেই। খড়ের গাদা থেকে সূচ খোঁজার মত আমার চোখ দুটো এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আহীরকে খুঁজছে। এক মুহূর্ত বিরাম নেই। জোয়ারে সমুদ্রের ঢেউ এর মত মানুষের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সাবওয়ের গেটে। একসাথে কত মানুষ ঢুকছে, সকলের মুখ কি দেখা সম্ভব! তবুও দেখছি। যতটা পারা যায় তার চেয়েও বেশী দেখছি। ঘড়ির কাঁটা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। পাঁচ দশ পনের করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত। কোথায় আহীর! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি আসার পর এই গেট দিযে ও পাশ করেনি। আমার ঠিক সামনে একটা লোক দাঁড়িযে আছে; গেটের অন্য প্রান্তে। চোখে দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হয় না। কেন জানি না অনেকক্ষণ থেকে ফলো করছে আমাকে। বেশ কয়েকবার চোখে চোখ পড়ে গেছে। প্রতিবার আমিই চোখ সরিয়ে নিয়েছি। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমার পাশেই কোল্যাপ্সিবল গেট, ওপারে একটা পান বিড়ির দোকান। গেটের গায়ে ঝুলছে জ্বলন্ত কাতাদড়ি। মিনিটে মিনিটে ক্রেতারা আসছে দোকান থেকে সিগারেট কিনে কাতাদড়ি থেকে অগ্নি সংযোগ করে আমার মুখে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমি প্যাসিভ্ স্মোকার। এক ভদ্রলোক ভক্ করে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দিদি একটু নিচে নেমে দাঁড়ান না। আপনার মুখে তো ধোঁয়াগুলো লাগছে।'

নিচে নেমে দাঁড়ালে যে আহীরকে খুঁজতে অসুবিধা হবে। কিন্ত ও এখনো আসছে না কেন! এ ছেলেটার কি সময় জ্ঞান বলে কিচ্ছু নেই! অতদূরে থেকে অসবে ট্রেন মিস্ হয়ে যাওয়ারও ভয় নেই! একটু আগে এলে কি ক্ষতি হয়! অ্যাক্সিডেন্টালি দু একদিন দেরি হতে পারে, রোজ হয় না। ইচ্ছে থাকলে সময় মত আসা যায়।

'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন গো দিদি?'

একটা মাঝবয়সী মেয়ে। এখানেই বসে লেবু বিক্রি করছিল। আমার দিকে

তাকিয়ে আছে জিজ্ঞাসু চোখে। আমি একটু অবাক হলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি সেই লোকটা এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এবারে সে চোখ নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আমি নিশ্চিত হবার জন্য জিগ্যেস করলাম—

'আমাকে জিগ্যেস করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন গো?'

'এমনি। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি তুমি একা একা এখানে দাঁড়িয়ে আছ। জায়গাটা তো ভালো নয়, তাই বলছিলুম।'

তুমিও তো এখানে আছ!'

'আমি আর তুমি কি এক?'

'কেন এক নয়! আমি তো তোমারই মত একটা মেয়ে।'

'কেন দাঁড়িয়ে আছ?'

'আমার দরকার আছে।'

'কি দরকার? কারোর জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কার জন্যে? বাবার জন্যে?'

'না। আমার এক বন্ধু আসবে।'

'তুমি হিন্দু না মুসলমান?'

'কেন বলত?'

'বলনা।'

'দুটোর কোনটাই না।'

মেয়েটা হাসছে। 'এ রকম আবার হয়!'

'হয়।'

'কাকে খুঁজছ?'

'যার জন্য দাঁড়িয়ে আছি!'

'বলনা, তুমি হিন্দু না মুসলমান?'

'তোমার কোনটা দরকার?'

'তুমি যা তাই বল।'

'আমার বাবা হিন্দু মা মুসলমান। এবার তুমি বুঝে নাও আমি কি।'

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও কি আমার মিথ্যে ধরে ফেলেছে! অত বুদ্ধি ওর নেই। আর আমি-ই বা এরকম অদ্ভুত কথাটা বলতে গেলাম কেন! মেয়েটা চলে গেল নিজের জায়গায়। ঘড়ি দেখলাম সাতটা বাজতে পাঁচ। ভাবছি আর পাঁচ মিনিট দেখব। না এলে স্টেশানে যাব। সাতটা পনেরোয় আগ্রার কি মেল ছাড়ে! সম্ভবত কালকা। সঞ্জয় বলেছিল কালকা মেল ন নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে।

ট্রেনের গায়ে চিটানো চার্ট দেখলে পাওয়া যাবে, কোন কোচে রিজার্ভেশান করেছে। ও মাই গড! সেই লোকটা লেবুওয়ালির কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকেই দেখছে। কি চায় ওরা! আমার একটু একটু ভয় করছে। এই হাওড়া স্টেশান থেকেই আমার ভাইকে কারা কিডন্যাপ করেছিল। গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতেই আসছিল তিলক। তখন ও ক্লাস নাইনে পড়ে। বছর খানেক আগেকার ঘটনা। বাস ধরবে বলে দাঁড়িয়ে ছিল। দুটো লোক এসে নানান প্রশ্ন করতে থাকে। কোথায় যাবে, কোথা থেকে আসছ, সঙ্গে কে আছে। বেগতিক দেখে ও চলে আসার চেষ্টা করতেই একটা বড় রুমাল ওর মুখের কাছে এগিয়ে ধরে। সেন্সলেস হয়ে যায়। যখন সেন্স ফিরল তখন ও চলন্ত ট্রেনে বসে আছে, আর দু পাশে সেই লোক দুটো। পালাবার চেষ্টা করলে প্রাণে মেরে দেব বলে থ্রেটনিংও দিয়েছিল। পরের স্টেশানে গাড়ি দাঁড়াতে ও জল খাব বলে বাইরে আসে, সঙ্গে অবশ্য লোক দুটোও নামে। বর্ধমান স্টেশান। জল খেয়ে ফেরার পথে তিলক প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করে। ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়ে স্টেশান মাস্টারের কেবিনে। তারপর সব শুনে ওঁরা গার্ড সঙ্গে দিয়ে ওকে আবার হাওড়া স্টেশানে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। ওকে অবশ্য জিগ্যেস করেছিলেন, কোথায় যাবে। ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছিল। কোথায় যাবে ঠিক বলতে পারছিল না। হাওড়া বলতে, ওরা হাওড়া স্টেশানে পেঁছে দিয়ে যায়। রাত তখন দশটা। ওর কাছে বেশ কিছু টাকা ছিল। সেন্সলেস অবস্থায় সে সবই বের করে নিয়েছে তারা। গাড়ি ভাড়ার পয়সা নেই শুনে সেই গার্ড ওকে দশটা টাকাও দিয়েছিল। কিন্তু ও এতটাই মেন্টালি ডিসব্যালেন্সড হয়ে গেছিল যে কিভাবে বাড়ি ফিরবে বুঝতে পারছিল না। অত রাতে ঐটুকু একটা ছেলেকে স্টেশানে একা ঘুরতে দেখে এক সহৃদয় ভদ্রলোক নিজের বাড়িতে নিয়ে যান ওকে। সে রাতটা আশ্রয় দেয় নিজের কাছে। পরদিন খাইয়ে দাইয়ে কিছু টাকা হাতে দিয়ে ওকে বাড়ি ফেরার বাসে তুলে দেন। আমার জীবনেও কি এরকম কোন চমকপ্রদ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে! তিলকের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি, 'আমার ভীষণ ভয় করছিল রে দিদি। মনে হচ্ছিল তোদের কাছে আর কোনদিন ফিরতে পারব না। আর কোনদিন মা কে দেখতে পাব না!...'

এরাও কি আমাকে কিডন্যাপ করবে না কি! ম্যারুফিয়া মাখানো রুমাল আমার সামনে আনার আগেই আমি রুমাল দিয়ে নিজের নাকে চাপা দিলাম। প্রিকশান ইজ দ্যা বেটার দ্যান কিউয়্যর। কিন্তু হিন্দু না মুসলমান জানতে চাইছিল কেন। কিডন্যাপার্সরাও কি আজকাল সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল না কি! কিডন্যাপ করার আগে জাত জানতে চাইছে! ধর্মনিরপেক্ষ দেশের কি শোচনীয় অবস্থা। ঠিক হয়েছে এবার নিজেরা ঠিক কর আমি হিন্দু না মুসলমান! কিন্তু আহীর এখনো আসছে না কেন! সাতটা বাজে। আহীর প্লীজ তুমি এস। আমি আর পারছি না দাঁড়াতে সমূহ বিপদ। ট্রেন ছাড়তে মাত্র পনের মিনিট বাকি। যদি দেখা না হয়—না না। ঠিক আসবে।

'সমি ! তুমি এখানে !'

চমকে তাকাই। আহীর দাঁড়িয়ে আমার সামনে। আমি ঠিক দেখছি তো ! উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করে নিয়েছি। আহীর অবাক। বলছে—

'কি ব্যাপার, তুমি তো আসবে না বলেছিলে ! কখন এসেছ ?'

'ছ'টায়।'

'ও সিট্ ! এক ঘণ্টা এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?' আমরা স্টেশানের দিকে হাঁটতে শুরু করেছি। আমি কোন কথা বলছি না। ওর সাথে দেখা হবে কি হবে না এই দোটানায় যখন ছিলাম তখন আহীর এসে ডাকল। সে ঘোর এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আহীরের সাথে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারছি না। ওর ডান হাতে ব্রিফকেস্, বাঁ হাতে আমাকে ধরে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

'সেদিন তাহলে কেন বললে আসবে না ? এই—'

'তোমার চলে যাওয়াটা দেখতে পারব না বলে।'

'তাহলে এলে যে ?'

'থাকতে পারলাম কই !'

'পাগলি ! এভাবে আসে ! বলা নেই কওয়া নেই। আমি যদি ঐ গেট দিয়ে না ঢুকতাম ? প্রায় দিনই তো পাশের গেটটা দিয়ে ঢুকি। কি করতে তখন ? এত লোকের মাঝে কোথায় খুঁজতে আমাকে ? এমন ছেলেমানুষী কর না !'

'তুমি এত দেরি করলে কেন ? আমার কি ভয় করছিল। একটা লোক হাঁ করে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। একটা মেয়ে এসে জিগ্যেস করছিল তুমি হিন্দু না মুসলমান।'

'কেন ? সে খবরে ওর কি ?'

'জানি না।'

'আমি তো ভেবেইছিলাম আজকের ট্রেনটা আমি আর ধরতে পারব না। বাসটা এরকম বেগড়ামো করবে—'

'শুধু বাসের দোষ তুমি বাড়ি থেকে একটু তাড়াতাড়ি বের হতে পার না। আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

'রাগ কোর না গো। আমি কি করে জানব বল তুমি আসবে !'

লিস্ট চেক করে ও কামরায় উঠল।

'এস, ভিতরে বসি।'

সিট্ খুঁজে ও বসল, আমি বসলাম সামনের সিটে।

'বাড়িতে আজ কি বলে এলে ?'

'বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি।'

'কেন এত পাপ করছ বলত !'

'তোমার জন্য তো। আমার পাপের ফিফ্‌টি পার্সেন্ট তুমি শেয়ার করবে।'

'না। তোমার পুণ্যটা আমি নেব। পাপটা তুমি একা বইবে।'

'শুধু পুণ্য নেওয়া যায় না মশাই, তার সাথে পাপও নিতে হয়।'

আহীর হাসছে। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'হাসছ কেন ?'

'তোমাকে দেখে। রিঅ্যালি ইউ আর লাকি। আমি ভাবতেই পারছি না। তুমি কি ভেবে ওখানে দাঁড়িয়েছিলে ! ধর আমি যদি ঐ গেট দিয়ে আসতাম ?'

'তোমাকে আসতেই হত, আমি ঐ গেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম না !'

'তুমি তো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলে। কি করে খুঁজছিলে আমায় ? আমি না দেখতে পেলে, তুমি তো দাঁড়িয়েই থাকতে। সত্যি, তুমি ভীষণ লাকি।'

ধীরে ধীরে সময় ফুরিয়ে আসছে। মনের মধ্যে কেমন এক অস্থিরতা। ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে।

'শোন, যা বলেছি মনে আছে তো ? আবার কাজ শুরু কর। ঘরে চুপচাপ বসে থেকো না। আর হ্যাঁ, গতদিন ভুলে গেছিলাম। তোমার এম. এ. পড়ার কি হল খোঁজ নিয়েছ ? ফর্ম ফিল্‌আপ কোরো কিন্তু।'

'আর কিছু বোল না।'

'কেন ?'

'পারব না তোমার কথা রাখতে।'

'কেন পারবে না ! আগে তো পারতে। কথা দাও প্লীজ।'

কথা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি নিজের কাছে অচেনা। কি করব, কি করতে পারি কিছুই জানি না। বলেছিলাম তো আজ আসব না, পারলাম কথা রাখতে ! এক অনিশ্চিত ফলাফলের কথা জেনেও ছুটে এসেছি এখানে। শুধু মনের মধ্যে একটু বিশ্বাস ছিল, দেখা হবে।

'চল, জলটা কিনে আনি। এস।'

ট্রেন থেকে নেমে একটা স্টলের দিকে যাচ্ছি। ও বলছে, 'কি খাবে ?'

'প্লীজ কিছু খেতে বোল না। প্লীজ—'

ওর হাতটা আলতো করে ঠেকাল আমার গালে। 'আজ তোমার মুখটা খুব শুকনো লাগছে। একটা সফ্‌ট ড্রিংক্‌ ?'

'প্লীজ—'

'ও কে ও কে—নিতে হবে না।'

'আমার একটা কথা রাখবে ?'

'নিশ্চই, বল। তুমি তো কিছুই বলছ না। চুপচাপ আছ।'

'গিয়েই একটা চিঠি দিও। পরে আর না দিলে কিছু বলব না।'

'তুমি এ রকম ভাবছ কেন বলত ? আমি সত্যিই চিঠি দেব। মিছিমিছি খারাপ করছ।'

দোকান থেকে একটা জলের বোতল কিনতে দোকানদার এক গাদা খুচরো ব্যালেন্স দল।

'এত খুচরো দিচ্ছেন! ক্যারি করতে অসুবিধা হবে, চেঞ্জ করে দিন না।'

'দু টাকার নোট নেই দাদা।'

'কয়েন দিন।'

'কয়েনও নেই।'

'ঠিক আছে আমি দিচ্ছি।' ব্যাগ খুলে টাকা বের করছি। একটা ভিখারী এসে াঁড়িয়েছে পাশে। আহীর ঐ খুচরো থেকে একটা পয়সা দিয়ে বাকিটা আমার ব্যাগে দয়ে দিল। হঠাৎই কানে এল গাড়ি ছাড়ার সিগন্যাল।'

ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে ও দ্রুত পদে ট্রেনের দিকে এগোচ্ছে। আমিও চলেছি ওর াথে। টাকা আর খুঁজে পাচ্ছি না। ও চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়েছে। আমি টাকাটা দতে গেছি, ও বাধা দিল, 'আরে রেখে দাও তোমার কাছে দিতে হবে না। রেখে দাও।'

তবুও দিচ্ছি দেখে হাত বাড়িয়ে নিল, 'চিঠি লিখ।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে। প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে ভিড় ঠেলে আমিও এগোচ্ছি। আহীর ইশারা করে আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে বলছে। গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ান হাতে রডটা ধরে বাঁ হাতটা নাড়ছে। ও যে কেন এভাবে হাত নাড়ে! আমার াটে সহ্য হয় না; দেখলেই কান্না পায়। ট্রেনের গতি বেড়ে গেছে। আমি আর াছি না তাল রেখে দৌড়োতে। কামরাগুলো ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে আমার পাশ দয়ে। আহীর দূরে চলে যাচ্ছে, আরো দূরে! ওর মুখ আর বোঝা যাচ্ছে না। ত্ু এখনো হাত নেড়ে চলেছে। উল্টোদিক দিয়ে আসা একটা কার সাথে ধাক্কা খেলাম। একে দু চোখ ঝাপসা তার উপর দূরত্ব বেড়ে গেছে। আহীর আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। আর দেখতে পাচ্ছি না ওকে। শুধু ট্রেনের ব্যাকলাইট রক্তচক্ষু হয়ে তাকিয়ে আছে। এক সময় তাও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আমাদের দৃষ্টি শক্তি কেন যে এত কম! এইটুকু পার্থিব দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষমতা

দু বছর এমনি করে ও আমার পার্থিব দৃষ্টির অগোচরে থাকবে। দু বছর! সে তো অনেকগুলো দিন। এতদিন থাকব কি করে? থাকব, আমি ঠিক থাকব। তোমার অপেক্ষা করতে করতে একটা একটা করে দিন কেটে যাবে। আমি ঠিক থাকতে পারব। এবার এসে আমাকে নিয়ে যাবে তুমি। এভাবে স্টেশানে একা ফেলে চলে যেতে পারবে না। আমার পা দুটো অসাড় হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এখানেই বসে ি। কি অসম্ভব যন্ত্রণা মনে! সেই বিজাতীয় যন্ত্রণা, শরীর মনকে এক সাথে কুরে কুরে ঝাঁঝরা করছে। বড্ড কষ্ট; এত ভালোবাসা ভালো নয়। সোনা খাঁটি ওয়ার জ্বলন্ত ব্যথা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। প্ল্যাটফর্মের সেড ছেড়ে নেকটা চলে এসেছি। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছি একা। আমার সামনে ট নেই। শুধু লম্বা লম্বা লোহার লাইনগুলো মৃত শরীসৃপের মত পড়ে আছে

উপড়ে হয়ে। পিছনে কি আছে জানি না, সামনে অনন্ত শূন্যতা। ভবিষ্যতে কুয়াশাচ্ছন্ন বিবরের মধ্যে চলে গেল আহীর। কবে ফিরবে জানি না। এখান থেকে শুরু হল আমার প্রতীক্ষা।

* * *

আমার এখন প্রতিটি সন্ধ্যা কাটে ছাতে একা। অনেক রাত পর্যন্ত থাকি। ক বলি আহীরের সাথে। আমাদের মাটি আলাদা। আমি যে মাটিকে স্পর্শ ক দাঁড়িয়ে আছি আহীর সে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন। বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলরা দ্বারা বিচ্ছিন্ন আমরা। তাই ওর স্পর্শ পাই না। কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক আকাশের নিচে। যে চাঁদ আহীর দেখতে পাচ্ছে সেই চাঁদের দিকে আমিও তাকি আছি। চাঁদের মধ্যে আহীরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমি। ছোটবেলায় শু ছিলাম তারা খসার লগ্নটা না কি খুব শুভ। ঐ সময় ঈশ্বর, মানুষের কাঙ্খিত বস্তু আবেদন মঞ্জুর করেন। আমি কত রাত অপলক দৃষ্টিতে তারা ভরা আকাশের দি তাকিয়ে থেকেছি। সাগ্রহে অপেক্ষা করেছি তারা খসার। দেখেছি, নিজের চে ছায়াপথ ধরে এক একটা তারা কি অদ্ভুত ভাবে সরে সরে যাচ্ছে।

তুমি কোথায় যাচ্ছ তারারাণী? আমার পিয়ার নগরে যদি যাও তো তাকে একা খবর পেঁছে দেবে? বোলো—"সমি ছাতে দাঁড়িয়ে আছে তোমার জন্য। তুমি গি একবার চাঁদের সামনে দাঁড়াও। চাঁদকে আয়না করে নিজেকে ফুটিয়ে তোল তা বুকে। যাও আহীর, সমি যে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে দেখবে বলে।"

আজি বেদন অবগুণ্ঠন খুলি
অম্বর পানে সিক্ত আঁখি তুলি
কাহারে খুঁজিয়া মরি আনমনা,
চকিতে হেরিনু চন্দ্রমুকুরে
মোর দূর পরবাসী বন্ধুরে
প্রাণে বাজে তাই সুরের ব্যঞ্জনা।

আহীর আন্দামানে গেছে দু মাস হয়ে গেল। আমি যেন এখনো দাঁড়িয়ে আ সেই অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে। আমার সমস্ত অস্তিত্বটুকু নিয়ে স্থবির হয়ে গেছে সে মুহূর্তটা। মাথার উপর খোলা আকাশ। সামনে নিঃসীম শূন্যতা। আহীরে একটাও চিঠি আসেনি। আমি দুটো দিয়েছি তার উত্তরও পাইনি। তুমি কি আমা ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছ আহীর! তা নাও, আপত্তি নেই। আর কারুর কাছে হারলে তোমার কাছে হারবো না। এখন তো প্রতিটা দুপুর বাইরের বারান্দায় দাঁড়ি থাকি। কাল দাঁড়িয়ে ছিলাম, আজ দাঁড়িয়ে আছি, কালও দাঁড়াব। মাঝে মা স্বপ্ন দেখি আহীরের চিঠি এসেছে। আমি নিজেই যেন সে চিঠি বয়ে আনা অনেক দূর থেকে। আমার হাতেই রয়েছে কিন্তু পড়তে পারছি না। হয় চারিদি

ঘোলাটে অন্ধকার, পড়ার মত পর্যাপ্ত আলো নেই। নয়তো আশে পাশে কেউ রয়েছে, যাদের দৃষ্টির সামনে এ চিঠি পড়া যায় না। আমি পরিবেশ খুঁজছি। কি জানি কেন পড়তে পারছি না। সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো। কোথা থেকে কি সব হয়ে চলেছে। আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাড়ি ফিরতে পারছি না। তারপর হয়ত খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে যাব—ঘুম ভেঙে যায়। আর পড়া হয় না সে চিঠি। এত কষ্ট হয়! ওটা পড়ার পরও তো ঘুমটা ভাঙতে পারত! খুব রাগ হয় নিজের উপর। ভাবি কি লেখা ছিল কে জানে। পড়তে পারলে কদিন তবু ঐ লাইনগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যেত। তুমি তোমার কথা রাখনি আহীর। কখনো কি ভুল করেও মনে পড়ে না আমার কথা! মনে হয় না দু কলম লিখে পাঠাই! কি করে ভুলে গেলে আমাকে? আমি কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য তোমাকে ভুলিনি। ভুলতে পারিনি। আমার অনুভবে যে সর্বক্ষণ তোমার উপস্থিতি আহীর, তোমাকে কি ভোলা যায়!

বিছানায় শুয়ে আছি। আমার দৃষ্টি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে দালানের ক্যালেন্ডারটার উপর। একটা মেয়ের বড় মুখ। তুমি ঈভ। আমি তোমার প্রতিভূ। পুরুষের বিরুদ্ধে কি নিদারুন অভিযোগ আমার! আমি জানি আমার মনে এ অভিযোগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আমার পিতা। তার উপর একটু একটু করে বঞ্চনা, প্রত্যাখ্যান, হেরে যাওয়া, না পাওয়া, হতাশা, আর আমার ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের টুকরো টুকরো পাথর সাজিয়ে তৈরী করেছি বিশাল এক চীনের প্রাচীর। যে প্রাচীর টপকে কোন পুরুষই আসতে পারেনি আমার কাছে। আমিই আসতে দিইনি। অতন্দ্র প্রহরীর মত সর্বদা পাহারায় থেকেছি। কিন্তু আজ সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীরটা কাঁচের সচ্ছ দেওয়াল হয়ে গেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি ওপারে আহীর দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁতে চাইছি। কাঁচের মসৃন দেওয়ালের স্পর্শ পাচ্ছি আমি। প্রচন্ড একটা মুষ্ঠি প্রহারে ভেঙে ফেলতে চাইছি এ প্রতিবন্ধক। আমাদের মাঝখানে বঙ্গোপসাগরের অনতিক্রম্য নিষেধের বাধা। আহীর এখন আন্দামানে, আমার কাছ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে। কি করে যাই ওর কাছে! আমি যে আর পারছি না। আমি অসুস্থ; এতটা দূরত্ব অতিক্রম করার সাধ্য আমার নেই। আমি সুস্থ হলেও কি পারতাম! না, পারতাম না। আমি বন্দী—আমি বন্দী! আমাকে মুক্ত কর। শক্তি দাও ঈশ্বর; আমি পারছি না। প্রেমের দহনে এত পীড়া! আর যে সইতে পারছি না; আমাকে সিক্ত কর—আমাকে শান্ত কর—অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে তৃপ্ত কর আমায়। আমি কাকে ডাকছি? আহীরকে না ঈশ্বর কে? কে করবে আমায় তৃপ্ত? আমি কাঁদছি, দিন রাত পড়ে পড়ে কাঁদছি বিছানায়। নিজের অশ্রু বারীতে নির্বাপিত করতে চাইছি এ দুঃসহ বিরহের দাবানল। আমি ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছি আহীর; তুমি ফিরে এস—আমাকে গড়ে নাও নিজের মত করে। আজ আমি তোমার সামনে নতজানু। তিতাপাতির রসে নেশাগ্রস্থ মাছেদের মত আমি তোমাতে বশীভূতা। আমার নারীত্বের

অহঙ্কার আজ বিসর্জিত। বিশ্বাস হচ্ছে না, 'আমি নারী' কবিতাটা একদিন আমিই লিখেছিলাম। এতদিন যা সস্তা রোম্যান্টিসিজম্ বলে মনে হয়েছে আজ সেটা জীবনের মন্ত্র হয়ে সোচ্ছাসে উচ্চারিত হচ্ছে। মনে পড়ছে অঞ্জুর কথা। আমার কলেজের বন্ধু। বাবা মার অমতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল অঞ্জু। বলেছিল—

'কুহেলি তুই লভ ম্যারেজ করবি।'

'কি করে বুঝলি?'

'তোর ঠোঁটের উপর তিল আছে।'

'বোগাস! কোনদিন ম্যারেজই করব না, তার আবার লভ আর অ্যারেঞ্জ।'

'কেন?'

'পুরুষ জাতটাকে আমার সহ্য হয় না। একমাত্র পুরুষ বন্ধুই ভালো। অন্য সম্পর্কের পুরুষ সে বাবা, ভাই, দাদা, প্রেমিক বা স্বামী যেই হোক না কেন; শুধু শাসন করতে জানে, বন্দী করতে জানে মেয়েদের, সন্দেহ করতে জানে।'

কি অসম্ভব ঘৃণা ছিল সেদিন আমার কণ্ঠে। কোথায় হারিয়ে গেল আমার সে সত্ত্বা! আমার যেন নবজন্ম ঘটেছে। অথবা মহাকালের প্রলয় এসে আমার ভিতরকার সব ঘৃণা সব তিক্ততা ধুয়ে মুছে আমাকে প্রেমের মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে অঞ্জুর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। এখন দেখা হলে বলতাম—'অঞ্জু আমিও ভালোবাসতে পারি।'

আজকাল কেবলই মনে হয় আমার ভালোবাসা সুরক্ষিত নয়। বাড়ির লোক উঠে পড়ে লেগেছে আমার বিয়ের জন্য। আজ এ একটা সম্বন্ধ আনে তো কাল ও একটা। যখন আহীরকে চিনতাম না, ওর ঠিকানা জানতাম না তখনই ওর জন্য অপেক্ষা করতাম। আর এখন তো ওকে খুঁজে পেয়েছি, আমার হাত দুটো দিয়ে ছুঁতে পারি ওকে। এখন কি অন্য কারুর কথা ভাবা যায়! সে তো নিজেকে অপমান করা। সে হয় না। মাঝে মাঝে মা এমন জোর করেন; ভয় হয়। মানুষ পরিস্থিতির দাস। আমাকে যদি এমন কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়; আহীর ছাড়া অন্য কারুর ঘরে যদি যেতে হয়! দয়া কর ঈশ্বর, নিয়তির চেয়েও নিষ্ঠুর সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিও না। আমি বড় দুর্বল। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লড়ব সে শক্তি সে জেদ আমার নেই। সেই ছোট্টবেলা থেকে হারতে হারতে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। এখনো কি শেষ হয়নি আমার পরাজয়ের পালা? জয়ের সে অনাবিল স্বাদ কি আমার জন্য নয়? কেন নয় ঠাকুর? আমি যে স্বপ্ন দেখি—আহীর ফিরে আসবে। আমার চোখের জলে ভেজা দুঃসহ রাতগুলো প্রেম আর আদরে ভরিয়ে দেবে ও। আমার সব যন্ত্রণা মুছে দিয়ে এ ক্ষত বিক্ষত মনটাতে প্রাণ সঞ্চার করবে। নতুন করে বাঁচতে শেখাবে। ও আমাকে এখনো চেনেনি, তবে চিনবে। আমি যে পতিপ্রিয়া। আমাকে ভালো না বেসে তুমি পারবে না। তুমি আমার। আমাকে তুমি ভোলোনি। আমার এ যন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শ না করুক আমার প্রেম তোমাকে স্পর্শ করবে ঠিকই। প্রেমকে উপেক্ষা করার স্পর্দ্ধা যে ঈশ্বরেরও নেই আহীর, তুমি

করবে কি করে! ফিরে এস। আমি অন্য কারুর আঙিনায় নির্বাসিত হওয়ার আগে আমাকে নিয়ে যাও তোমার কাছে।

আমি ভালো নেই আহীর। খালি খালি কান্না পায়। তোমার জন্য ভীষণ মন কেমন করে। কবে আসবে তুমি? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তাড়াতাড়ি এস। বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি আমি ভালো নেই। রোজ কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকি। না কাঁদলে ঘুম আসতে চায় না। আমি পাগল হয়ে গেছি আহীর। তুমি আমাকে সম্মোহিত করেছ। এখন তুমিই বলে দাও আমি কি করব। জানি তোমাকে এভাবে চিঠি দেওয়া অন্যায়, এভাবে বিরক্ত করা বুঝি ঠিক হচ্ছে না। তবুও এ অন্যায় করছি; কে যেন আমাকে বাধ্য করছে এ অন্যায় করতে। আমি নিজের কাছে হেরে গেছি আহীর। নতুন করে অন্যের হাত ধরে বাঁচার ন্যূনতম ক্ষমতাটুকু আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। তুমি আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছ। কি ভাবছ? আচ্ছা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, না? ভাবছ মেয়েটা স্বেচ্ছাচারী। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। সবাই তো আর আমার মত উম্মাদ নয়। এমন নিশকলুষ বিশ্বাস ক'জনার থাকে! মাঝে মাঝে আমার নিজেরই হিসেবে সব গোলমাল হয়ে যায়। আর সে হিসেব মেলাতে নিজেকে দাঁড় করাই কতকগুলো বাস্তব প্রশ্নের মুখোমুখি—তোমাকে না দেখে ভালোবাসলাম কি করে? তুমি আমাকে ভালোবাস না জেনেও তোমার প্রতি আমার এত আকুতি কিসের? আমার মধ্যে এত আত্মসমর্পণের উদারতা এল কোথা থেকে? তোমাকে এভাবে চিঠি লেখার ধৃষ্টতা আমার জন্মালো কোথা থেকে? তুমি আমার নাগালের বাইরে জেনেও তোমাকে পাওয়ার এ নিশ্চয়তা আমার মধ্যে বাসা বাঁধল কি ভাবে? শুধুই প্রশ্ন, কখনো উত্তর না মেলা প্রশ্ন। নিজেকে বোঝাই আমি কোন গল্প বা নভেলের ক্যারেক্টার নই। কল্পনা নয়, বাস্তবের শক্ত মাটিতে আমাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে না পারলেও বাঁচতে হবে। কিন্তু কি করি, অবাধ্য 'আমি' কিছুতেই যে মানতে চায় না। এই অবাধ্যতার কি শাস্তি দি বলতো! এক সময় বিশ্বাস করতাম—'যাকে ভালোবাসি তার উপেক্ষার চাইতে যাকে ভালোবাসি না তার আমন্ত্রণ অনেক বেশী দামি।' আজ সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি ভেঙেছ সে বিশ্বাস। আমাকে বদলে দিয়েছ। নিজের কাছে অপরিচিত করে দিয়েছ আমায়।

এ তুমি কি করলে আহীর, ভালোবেসে দুহাত ভরে দিয়ে গেলে চরম একাকিত্ব! কিছু ভাললাগে না আর। কোথাও যাই না। থমকে গেছে আমার জীবন। একদিন কিছু না জেনে, নিছক কৌতুহল আর খেলার ছলে যে ঘটনার সূত্রপাত করেছিলাম সেটা আজ এরকম জায়গায় এসে দাঁড়াবে ভাবিনি। সবচেয়ে বড় কথা কি জান! তোমাকে পেয়ে আমার কষ্ট আছে কিন্তু দুঃখ নেই। এক বুক যন্ত্রণা আছে কিন্তু বিন্দুমাত্র আফশোস নেই। বরং এটা ভাবলে ভয় লাগে, কাগজে তো অনেক ঠিকানা ছিল। তোমার ঠিকানায় না দিয়ে যদি অন্য কোথাও দিতাম! তাহলে তো তোমার সাথে দেখাই হত না। তখন! কোথায় পেতাম তোমায়! কি ভাবছ? তাহলে তুমি বেঁচে যেতে বল? ওসব আমি জানি না। তুমি শিগ্‌গিরি

এস। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব, এই বিশ্বাস নিয়ে যে তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। আর যদি না আস তো বিশ্বাস করে নেব এ চিঠি তুমি পাওনি। পেলে অবশ্যই আসতে। আহীর, তুমি আমার ভালোবাসা। আমার ভালোবাসা কোনদিন আমার বিশ্বাসে আঘাত হানবে না। তুমি তা পার না। নিজেকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে আনার জন্য এতদিন অনেক বড় বড় আদর্শের কথা বলেছি। নিজেকে নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সে এক নিদারুন প্রচেষ্টা। কিন্তু আসল কথা, আমার মনের অত জোর নেই। ছোটবেলা থেকে দেখে আসা স্বপ্নকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়ব সে রসদ আমার নেই। তুমি আমার আত্মার আত্মীয়। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার আত্মা বাঁচতে পারে না—না আহীর, এটা কোন কাব্যের কথা নয়। তুমি দেখে নিও আমার এ যন্ত্রণা নিস্ফল হবে না। গত আট মাস ধরে আমি তিল তিল করে পুড়েছি তোমার আগুনে। এ আগুনের আঁচ আমি কাউকে লাগতে দিইনি; এমন কি তোমাকেও নয়। সবাই আমাকে জ্বলতে দেখেছে কিন্তু হাজার খুঁজেও পায়নি সে আগুনের উৎস। আমি ঈশ্বরকে দেখিনি আহীর, তোমাকে দেখেছি। তুমি আমার অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে দাও। মুক্তি দাও এ দহন জ্বালা থেকে। আমার যুগান্তের তপস্যাকে সফলতা দাও। আমার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দাও। ও গো আমার নিষ্ঠুর দরদী আমি যে আত্মসমর্পিতা, আমাকে গ্রহণ কর।—

সমি

সকালবেলা পড়ার টেবিলে বই খাতা নিয়ে বসেছি। মা এসে বসলেন বিছানায়।

'সমি, তোকে একটা কথা বলার ছিল।'

'বল।'

'সুকুমার কাকু তোর জন্য একটা ছেলে দেখেছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মাসে বার হাজার টাকা মাইনে। আর—'

'আমাকে আর কটা দিন সময় দাও মা।'

'কি করবি সময় নিয়ে? এর আগেও বলেছিস ভাবার সময় দাও। অনেক তো ভাবলি এবার একটা সিদ্ধান্ত নে। বয়স তো আর থেমে থাকবে না!'

'আমি তোমাদের সমস্যাটা বুঝি মা। প্লীজ আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমি তোমাদের দেখা ছেলেকে বিয়ে করতে পারব না।'

'কেন? কেন পারবি না বল!'

'কারণ আমি নিজে দেখে নেব।'

'দেখ, গত ক বছর ধরে এই এক কথা শুনে আসছি। আসলে এটা কোন কারণ নয় এটা তোর বাহানা। তাছাড়া আর কবে দেখবি! আগে তবু বাইরে বের হতিস; এখন তো সারাক্ষণ চার দেওয়ালের মধ্যে। এভাবে কি ছেলে দেখা যায়?'

'যায়। ইচ্ছে থাকলে যায়। ছেলে দেখার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয় না।'

'ও সব ইচ্ছে অনিচ্ছে বুঝি না। ছেলেটা খুব ভালো; তাই বাপি আর তোর কোন বাহানাই শুনবে না। কাকু হয়ত কাল তোর ছবি নিতে আসবে।'

'মা—মা লক্ষ্মীটি আমাকে আর একটা সুযোগ দাও। বাপিকে বল এ সম্বন্ধটা ভেঙে দিতে। তুমি তো জান আমার শরীর খারাপ, রাতে ঘুম হয় না। এখন এসব বললে আমি আর সুস্থ হতে পারব না।'

'তুই কি চাইছিস বলত? একটার পর একটা ভালো সম্বন্ধ আসছে আর তুই কেটে দিতে বলছেস! কি চাইছিস তুই? কবে দেখবি নিজে?'

'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আমি দেখে নিয়েছি!'

'হতে পারে মানে!'

'মানে আমার দেখা হয়ে গেছে।'

'দেখা হয়ে গেছে! কে সে?'

'আমি জানতাম। আমি জানতাম এরপর এই প্রশ্নটাই তুমি করবে।'

'সেটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এই স্বাভাবিক প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারছি না, পরে সব বলব মা। এখনই কিছু জানতে চেয়ো না। আর এর পরও যদি ছেলে দেখা অভিযান চালু রাখতে চাও তো রাখতে পার, আমাকে বিরক্ত করবে না।'

'জানি না বাপু কি চাস তুই!...'

বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বিরিয়ে গেলেন মা। এ ব্যাপারে বাপির সাথে মার কি কথা হয়েছে আমি জানি না, বা আদৌ কোন কথা হয়েছে কি না বলতে পারব না। তবে পরদিন যথা সময়ে কাকু এলেন আমার ছবি নিতে। খানিক পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন অন্য একটা ঘরে। পাশে বসিয়ে আদর করে জিগ্যেস করছেন।

'সমি, ছেলেটা কে?'

'কে ছেলে?'

'কাকে পছন্দ করেছিস?'

প্রশ্ন শুনে আমি মাথা নিচু করে নিয়েছি।

'অপরাধীর মত মাথা নিচু করছিস কেন? তুই কোন অন্যায় করিসনি। আমার দিকে তাকিয়ে কথা বল। তাকা—এবার বল।'

আমার ভয় করছে। ইস্ কেন বোকার মত মা কে বলতে গেলাম!

'আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছিস! তোর কোন ভয় নেই মা, আমাকে বল। আমি জানি তুই ভুল করতে পারিস না। আর তোর রুচি তোর পছন্দ সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা তোর অবিভাবক, তোর ব্যাপারে জানা আমাদের দরকার। বল লক্ষ্মীটি, নির্ভয়ে বল।'

কাকু আমাকে এমন ভাবে জানতে চাইছেন মনে হচ্ছে সব বলে দি; তারপর যা হয় হবে।

'ওভাবে জানতে চাইবেন না কাকু, আমি তাহলে সব বলে দেব।'

'হ্যাঁ বল, আমি তো শুনতেই চাইছি। বল না। ছেলেটা চাকরি করে, না বিজনেস্ ম্যান?'

'চাকরি করে।'

'কোথায় ?'

'সেন্ট্রাল গভ্‌মেন্টে।'

'দেখ; তোর প্রথম পছন্দের সঙ্গে আমাদের পছন্দটা কেমন মিলে গেল। তোর বাবাও চাকরিজীবি ছেলে খুঁজছে। কে ছেলেটা? আমাদের চেনা জানার মধ্যে—'

'না; আপনি চেনেন না।'

'কোথায় থাকে; কলকাতায় ?'

'না।'

'বল ঠিক করে। আমি কথা দিচ্ছি তোর অমতে কিচ্ছু হবে না। আর আমি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা দেখেছি তার সাথেও আর যোগাযোগ করব না। তুই পরিস্কার করে বল ছেলেটা কেমন!'

'সরি কাকু, এই মুহূর্তে এর থেকে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন ছেলেটা নিঃসন্দেহে ভালো। তবে কেউই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না; দোষ গুণ মিলিয়েই তবেই মানুষ। হয়ত ওর মধ্যেও কিছু নেগেটিভ দিক আছে, সেগুলো মানিয়ে নেব। ওর গুণ গুলো যদি আমার হয় তাহলে দোষগুলোও আমার। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর আমার ভাগ্যে যদি বিয়ে থাকে তাহলে হবে, ওর সাথেই হবে।'

'কথাগুলো এত জোর দিয়ে বলছিস, ভবিষ্যতে মনে থাকবে তো ?'

'থাকবে।'

'আমি জানি, তুই খুব সেন্টিমেন্টাল। এসব আবেগ প্রবণ কথা—'

'না কাকু। এ কথার মধ্যে আপনি হয়ত শুধু আবেগ খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু আমি আমার সমস্ত বিশ্বাসটুকু দিয়ে একথা বলছি। আর আমি যদি শুধু আবেগ নির্ভর হয়ে কাজ করতাম তাহলে এতদিন পর এ ঘটনা ঘটত না। অনেক আগেই কিছু একটা করে ফেলতে পারতাম।'

'তোর কথা শুনে খুব ভালো লাগছে। বুঝতে পারছি তুই আর ছোট্টটি নেই। আমাদের ছোট্ট সমি এখন বড় হয়ে গেছে। নামটা বল।'

'নামে কি এসে যায়। রাম শ্যাম কিছু একটা ধরে নিন্ না।'

'নামও বলবি না? একবার দেখাবিও না?'

'এখানে থাকে না তো।'

'কোথায় থাকে ?'

'ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে।'

অবাক হন কাকু। 'ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে! কোথায় ?'

'প্লীজ কাকু, আর জানতে চাইবেন না। শুধু একটা কথা দিন। আপনি বাপি বা মাকে কিছু বলবেন না। কারণ আমি জানি, মা জানলে বাপির জানতে বেশী সময় লাগবে না। আর বাপি জানলে, এক্ষুনি ছেলের নাম ঠিকানা জানতে চাইবেন।

দরকার হলে লোক দিয়ে খোঁজ খবর নেওয়াবেন, ছেলেটা কেমন, কি করে। কারণ মেয়ের বাবা হিসাব সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মুহূর্তে সেগুলো ঠিক হবে না।'

'বেশ, বলব না। তবে আমার মনে হয় আর বেশী দেরি করা উচিত না। তোর বাপি খুব চিন্তার মধ্যে আছে। চল।'

'আর দুটো মাস সময় দিন।'

'ও.কে। চল।'

আমি ভাবছি, দু মাস সময় চাইলাম কেন! আহীর তো বলে গেছে দু বছর পর আসবে। পুজোর সময় মনে হয়েছিল আসতে পারে। সেই ভেবে এবারে কোথাও যাওয়া হয়নি। কেবলই মনে হত আমি চলে যাব তারপর যদিও আসে! আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না; দেখাও হবে না। আর যদি নিজে নাও আসে, যদি চিঠি আসে সেটাও পাব না যথাসময়ে। কিন্তু চিঠি তো কই এল না! কি যে করি! অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে কেবল সময়ের পদধ্বনি শোনা। ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডের ধাপ পেরিয়ে দিনগুলো সপ্তাহ মাসে বদলে যাচ্ছে। কোন দিনের সাথে কোন দিনের তফাৎ নেই। হয়ত আছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। রোজই যেন এক রকম। সেই সূর্য্য ওঠে আর অস্ত যায়। কোন বৈচিত্র নেই। আমি এ সমাজ থেকে নির্বাসিত; ভাবের ঘরে দিন কাটাচ্ছি একাকি। এভাবে কেটে গেল আরো একটা মাস। কোথায় আহীর, কোথায় চিঠি!

এতদিন হয়ে গেল শরীরটাও ঠিক সারছে না। পুরোপুরি রিকভার করে উঠতে পারছি না। আর শরীরেরই বা কি দোষ! ভালোবাসা মনকে পোড়ায় আর মন পোড়ায় শরীরকে। আমার যে মন পুড়েছে. শরীর রেহাই পাবে কেন! মাঝে মাঝে ভাবি, কোন্ স্পর্দ্ধায় আমি কাকুকে আহীরের কথা বললাম! আহীর আমাকে সরাসরি না বলেনি ঠিকই কিন্তু হ্যাঁও তো বলেনি। কোন বিশ্বাসের জোরে আমি এত বড় সিদ্ধান্তের কথা কাকুকে জানালাম! কোথায় পাচ্ছি এত বিশ্বাস! কে জোগাচ্ছে! জানি না। শুধু জানি, আমি আহীরকে ভালোবাসি। আর এই জানাটাকে সম্বল করেই আমার এত কংক্রীট বিশ্বাস! ধন্য আমি! নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। রাত কত হল কে জানে! এই রাত জাগা রোগটাই আমাকে সুস্থ হতে দিচ্ছে না। আর মাথার মধ্যে সর্বদা চিন্তা থাকলে ঘুম আসবেই বা কোত্থেকে! আজকাল কোন কিছুই আর স্বাভাবিকভাবে হয় না। ঘুমের জন্যেও চেষ্টা করতে হয়। খানিকটা সেই তপস্যা করার মত!

অনেক চেষ্টার ঘুম মাঝ রাতে ভেঙে গেল মায়ের ডাকে।

'সমি—সমি কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন?'

এক দম বন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মা আমাকে ডেকে তুললেন।

'কি হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন? স্বপ্ন দেখেছিস?'

স্বপ্ন! আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম! "গায়ে গয়না, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এক অচেনা জায়গায় অপরিচিত লোকেদের মাঝে রয়েছি। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না কার সাথে আমার বিয়ে হল। কখন হল। আমাকে যেন সেন্সলেস অবস্থায় বিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু মনে পড়ছে না। আমি আহীরকে খুঁজছি। হন্যে হয়ে খুঁজছি। না, ওর সাথে আমার বিয়ে হয়নি। অন্য কারুর সাথে। সে কে জানার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। আমি আহীরকে খুঁজছি, এঘর ওঘর উপর নিচ দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি নামছি। এত জোরে দৌড়োচ্ছি তবু একটুখানি দূরত্ব অতিক্রম করনে কত সময় লাগছে। কে যেন আমাকে টানছে পিছন দিকে। সে অদৃশ্য টান উপেক্ষা করে পারছি না, পারছি না এগোতে। ভাবছি এই সর্বনাশের পর আহীরের কাছে কি আর যেতে পারব! আর যার সাথে বিয়ে হয়েছে সেই লোকটাই বা আমাকে ছাড়বে কেন! কি যে করি এখন! আমি চিৎকার করে কাঁদছি অথচ গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। শব্দগুলো জমাট বেঁধে বুকের মধ্যে তালগোল পাকাচ্ছে। হাঁপিয়ে উঠছি ক্রমাগত। আহীরকে ডাকছি কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছে না! আশে-পাশের লোকগুলো নির্বিকার। আমি একাই কেঁদে মরছি।"

'সাম, এখনো কাঁদছিস কেন? এই তো আমি। আমাকে ছুঁয়ে দেখ, তুই স্বপ্ন দেখছিলিস।'

আমি এখনো কাঁদছি। স্বপ্ন ভেঙে গেছে, ভাঙেনি স্বপ্ন-পরিনামের আতঙ্ক। এই আতঙ্কটাই আমাকে এখনো কাঁদাচ্ছে। এ স্বপ্ন আমি আগেও দেখেছি। আহীরকে নিয়ে যেদিন কাকুর সাথে কথা হয়েছিল সেদিন। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেছিল। মনে পড়ছে, গত সন্ধ্যে আমার বিয়ে নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হয়েছিল। এ তারই ফল। এক স্বপ্ন অনেকবার দেখার স্বভাব আমার। মনে আছে, তখন এইট কি নাইনে পড়ি, 'প্রদীপের শিখা' নামে একটা গল্প লিখছিলাম। এ গল্পে নায়িকার ক্যানসার হয়েছে। সেই সময় আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম আমার ক্যানসার হয়েছে। এমনিতেই অ্যানিমিয়ার জন্য শরীর রুগ্ন ছিল। মাথা ঘুরত চোখ ধোঁয়া হয়ে যেত এসব কারণে মনের মধ্যে সংশয় বাসা বাঁধল। ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম আমার ক্যানসার হয়েছে। দিন রাত মৃত্যু শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকতাম। কাউকে কিছু বুঝতে দিতাম না। সকলের সামনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতাম। সামান্য জ্বর সর্দি হলেও ডাক্তারের কাছে যেতে চাইতাম না। পাছে ক্যানসার ধরা পড়ে যায়। এই নিয়ে একটার পর একটা গল্প লিখতে শুরু করলাম। সব গল্পের শেষে নায়িকা ক্যানসারে মারা যেত। সেই সময় আত্মহত্যা করব বলে লম্বা চওড়া একটা সুইসাইড নোটও লিখে ফেলেছিলাম। অবশ্য সুইসাইড নোট না বলে সুইসাইড লেটার বলাই ভালো। বাপি ম্যর উদ্দেশ্যে লেখে! বছর দেড়েক দুয়েক পর ওটা ভাই-এর হাতে পড়ে যায়। ওই আমাকে না জানিয়ে ওটা পুড়িয়ে ফেলেছিল। এখন বুঝি, সে স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আজকের দেখা স্বপ্ন যদি বাস্তব হয়ে কোনদিন আমার পথ

আগলে দাঁড়ায় ! আজ ঘুম ভেঙে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি, সেদিন যদি ঘুম না ভাঙে ! আমার সারাটা জীবন যদি এই দুঃস্বপ্নের অন্তরালে হারিয়ে যায় ! এ স্বপ্ন যে ক্যানসারের চেয়েও মারাত্মক। ক্যানসার হলে মৃত্যু নিশ্চিত। তাতে মরে বাঁচা যায়। কিন্তু এ তো বেঁচে থেকে মৃত্যু। তিল তিল করে নিজেকে মরতে দেখা। আর ঘুম আসছে না। দুঃস্বপ্নের আঁচে ঝলসে গেছে বাকি রাতটা। পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়ে জেগে আছি। ভাবছি, আগ্রায় একটা চিঠি দিলে কেমন হয় ! আহীরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছি না। মহেনকে চিঠি লিখে আহীরের কথা জানতে চাইব। দুটো এয়ার স্টেশানের মধ্যে কমিউনিকেশান ফেসিলিটি নিশ্চই আছে। সকালে উঠেই খাতা কলম নিয়ে বসলাম। কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। কি বলেই বা সম্বোধন করি !—

Hallo Mr. Sannal,

চিঠির শেষে নামটা দেখে হয়ত কিছুটা অবাক হবেন। হ্যাঁ ; আমি কুহেলি, কুহেলি সান্যাল। আহীরের কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে দু একটা কথা হয়ত শুনে থাকবেন। আমিও আহীরের গল্পেই আপনার সাথে পরিচিত হয়েছি। আমার এ চিঠি আপনাকে অবাক করেছে জানি—কিন্তু বিশ্বাস করুন, একান্তই নিরুপায় না হলে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করতাম না। আহীর আন্দামানে যাওয়ার পর আমি কোন ভাবেই ওর সাথে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। এতদিনে ওর একটাও চিঠি পাইনি। কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কেমন আছে, কবে ফিরবে কিছুই জানি না। বোধ হয় আমাকে জানাবার প্রয়োজন মনে করেনি ! কিন্তু আপনি তো ওর বন্ধু ! খুব কাছের বন্ধু। আপনার সাথে নিশ্চই ও যোগাযোগ রেখেছে। না,না, আমার হয়ে ওকে কিছু বলতে বলছি না। আমি নিজের ঠিকানা দিলাম। কাইন্ডলি ওর কোন ম্যাসেজ যদি দুই ছত্র লিখে পাঠান উপকৃত হব।

Please don't mind. I am really sorry. I don't like to disturb you. But I am helpless. Please trust me.

কুহেলি—

আমি দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বাঁচতে চাইছি। বাস্তবের স্বচ্ছানতায় যাতে কোনদিন ঐ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় সেই প্রচেষ্টাই করছি। আহীর-কেও দু কলম লিখি। চিঠিতেই ওকে জানাই আমার দুঃস্বপ্নের খবর। এখন আমার স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন যা কিছু সবই তো ওকে ঘিরেই। ভাবছি—না থাক। এলেই বলব। তার চেয়ে বরং একটা ব্ল্যাঙ্ক পেপার পাঠাই। তাতে করে বোঝান যাবে আমি ওর ওপর কতটা রেগে আছি। একটা ফুল স্কেপ কাগজের বাঁদিকের উপর লিখলাম প্রিয় সমি। আমি ওর প্রিয় কিনা না জেনেই লিখলাম। আর শেষ প্রান্তে লিখলাম, আহীর। ব্যাস্ ! ফিল ইন দ্যা ব্ল্যাঙ্কস্। একটা ছোট্ট অ্যাডড্রেস প্যাডে লিখে দিলাম আমাদের বাড়ির ঠিকানা। চিঠি দুটো পোস্ট করে ফিরছি, ভাবছি আহীরের

খামের মধ্যে একটা ফ্রেস খাম পাঠালে ভালো হত। তাতে করে আমার রাগের অভি-ব্যক্তিটা আরো প্রকট হত। ইস্‌ বড় ভুল হয়ে গেল তো! যাগ্‌গে, কি আর করা যাবে! এই নিয়ে তো চারটে পাঠালাম। গত বারেরটা তো রেজিস্টি করেছিলাম. দশটাকার স্ট্যাম্প পড়লে একটা গুরুত্ব পাবে ভেবে। জানি না আদৌ পেঁচেছে না বঙ্গোপসাগরে সলিল সমাধি ঘটেছে। আচ্ছা, এমন যদি হয়, কোন এক বিকালে আহীর বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে এসে বসে আছে। আনমনে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। একটা ছোট্ট কাগজ ঢেউ-এর মাথায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। আহীর দেখেও দেখছে না। কে জানে কি কাগজ! হঠাৎই একটা বড় ঢেউ এসে কাগজটাকে তীরে পেঁছে দিয়ে গেল। নিতান্তই অবহেলে আহীর তাকাল সেদিকে। একটা খাম। উপরে ঠিকানা লেখা। Mr. Ahire kumar Basu. আহীর বাসু! আহীর বাসু তো আমার নাম! আহীর যেন নিজের নামটা ভুলে গেছিল, নতুন করে মনে পড়ল। এতক্ষণে খামটা হাতে তুলে নিয়েছে। আমি বল পেনে চিঠি লিখি তাই অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে গেলেও মুছে যায়নি। তাছাড়া সাগরের হৃদয় তো বিশাল, সে তো একজন প্রিয়ার হৃদয়ের কথা মুছে দিতে পারে না। আহীর আমার চিঠি পড়ছে। ভিজে কাগজটা মেলে ধরেছে দু হাতে। ঝাপসা অক্ষরগুলো আমার ভিজে চোখের মতই অভিমানী। তারা আহীরের দিকে তাকিয়ে আছে পুণ্যস্নাত হয়ে।…

'কুহেলি—এই কুহেলি—'

কে যেন ডাকল! পিছন ফিরে দেখি বকুল।

'কি রে, অনেক দিন পর দেখা হল তোর সাথে। কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'কাকিমা কেমন আছেন রে বকুল?'

'ভালোই। তোর কি খবর? বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছিস কেন?'

আমি অবাক। বকুল কি করে জানল! খবরটা কি কাগজে বেরিয়েছিল না কি! বললাম, 'তুই কি করে জানলি?'

'কদিন আগে তনুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওই বলছিল। আমি তো শুনে অবাক, তোর মত মেয়েও ঘরে শান্ত হয়ে আছে!'

'তনু আর কিছু বলেনি?'

'হ্যাঁ, বলছিল মাস কয়েক আগে তোর খুব শরীর খারাপ হয়েছিল। এখন কেমন আছিস?'

'ভালো। ঐ জন্যই বের হইনি।'

'তাহলে টিউশনি ফিউশনি বন্ধ তো এখন?'

'আপাতত।' তোর ট্রেনিং এর কি খবর?'

'এই তো শেষ হল! সেই নিয়ে ক'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। তোকে যে একবার

দেখতে যাব সময় করে উঠতে পারিনি। তনুর কাছে খবরটা পেয়ে মনটা ভীষণ খচ্‌খচ্‌ করছিল।

'এবারে কি, চাকরি?'

'দাঁড়া। অত সোজা! আমার মত কত ছেলে মেয়ে ট্রেনিং কম্‌প্লিট করে ফ্যা ফ্যা করছে।'

'তা তুই কি শুধু ফ্যা ফ্যা করছিস না টিউশনিও করছিস?'

'না, টিউশনি করছি।'

'তোর ক্রেডিট আছে মাইরি। এরকম অফ্‌সিজিনে খোদ্দের পেলি কোত্থেকে?'

'ও আমার ঠিক জুটে যায়। বলনা, তোর দরকার?'

'না ভাই, থ্যাংকস। আপাতত দরকার নেই, হলে বলব।'

'এদিকে কোথায় এস্‌ছিলিস?'

'পোস্ট অফিসে চিঠি পোস্ট করতে।'

'কার চিঠি?'

'বাব্বাবা! চোখ নাচাচ্ছিস কেন? চিঠি মানেই কি প্রেম পত্র না কি!'

'নাহ্‌! আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'তুই প্রেম টেম কিছু একটা করছিস।'

'তাই বুঝি! কি করে বুঝলি?'

'তোর চোখ মুখ দেখে।'

'তোর মুণ্ডু! প্রেম কি জণ্ডিস না কি, যে চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারবি?'

'ওরে, জণ্ডিসের চেয়েও মারাত্মক।'

'হ্যাঁ, তা তো বলবি। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিস বুঝি?'

'সে আর বলতে! একদিন মিলন তো এক সপ্তা বিরহ।'

'এখনো মিলন বিরহের পালা চলছে! এ্যাদ্দিন তো হয়ে গেল এবার প্রাইমারি স্টেজটা অতিক্রম কর! কবে বিয়ে করবি?'

'আর বলিস না মাইরি। রোজ একটা না একটা বাহানা। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করে কাটাচ্ছে।'

'কি বলছে, অসুবিধাটা কোথায়? সবই তো হয়ে আছে, শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে ঢুকবি, একটা দেওয়ালের তফাৎ।'

'ওটাই তো সমস্যা। বিয়ের পর এখানে থাকা যাবে না কি! অন্য জায়গায় ঘর খুঁজছে। পেতে পেতে এখনো এক দেড় বছর।'

'দেখ, কি আর করা যাবে। তবু একটা সুবিধা দিন রাত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিস।'

'তোর বিয়ের খবর কি?'

'আমার কোন খবর নেই ভাই।'

'সেই বউটা এখনো তোর কথা বলে। তোকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছিল ছেলেটার কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি। বল তাহলে কাকিমাকে বলি।'

'এই না! খবরদার না।'

'কেন, তুই কি বিয়ে করবি না?'

'সে পরে দেখা যাবে। চলি রে, একদিন বাড়িতে আসিস্ না। আড্ডা মার যাবে।'

'যাব। এখন তো আমার ট্রেনিং কম্প্লিট। বাড়িতেই থাকি। তুইও তো আসতে পারিস। মা তোর কথা জিগ্যেস করে। অনেক দিন আসিস্ নি।'

'ঠিক আছে, কাকিমাকে বলিস এবার একদিন আসব। চলি।'

'আয়।'

আগে কেউ বিয়ের কথা বললে খুব ঠাট্টা করতাম। এখন আর পারি না। পারব কি করে, সেই আমি তো আর নেই।

✻✻✻

আজকের সকালটার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট নেই। আর পাঁচটা সকালের মতই একঘেয়ে। ঘুম থেকে উঠে ধরা বাঁধা ছকে এগোচ্ছিল দিনটা। সকালে স্নান সেরে টুকটাক কয়েকটা কাজ করছিলাম। পিশি আসতে টিভি চালিয়ে দিলাম। খানিক পরে আমিও গিয়ে বসলাম সেখানে। মা আর পিশির মধ্যে টিভিতে অভিনীত চরিত্রগুলোকে নিয়ে আলোচনা চলছিল। বাইরের দরজায় শব্দ হতে মা বেরিয়ে গেলেন আমি ঘর থেকেই শুনতে পেলাম, 'সমি, ফোন এসেছে।'

কাকিমার গলা। মা জানতে চাইছেন, 'কে করেছে গো?'

'জানি না, শুধু বলল খবরের কাগজের অফিস থেকে।'

আমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম। কাকিমা বললেন,

'দশ মিনিট পর করবে বলেছে।'

বুকটা চড়াৎ করে উঠল। এ তো আহীরের পেটেন্ট ডায়লগ! ও ডেকে দিতে বলে দশ মিনিট পর আবার রিং করে। তাহলে কি আহীর ফোন করেছে! প্রতিবারে তো নাম বলে, এবারে কাগজের অফিস থেকে বলল কেন! না কি আলাপ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর জন্য সোমনাথ ফোন করেছে! ঠিক বুঝতে পারছি না। কাকার অফিসে বসে বসে ভাবছি। মনে হচ্ছে আহীর শয়তানি করেছে। কিন্তু ও তো এখন আন্দামানে। এত তাড়াতাড়ি কি ফিরেছে! না কি আন্দামান থেকে করেছে। আবার মনে হচ্ছে সোমনাথ হলেও হতে পারে! আমার ভাবনার কিনারা করতে যথা সময়ে বেজে উঠল ফোনটা।

'হ্যালো—'

'হ্যালো, এট্যা কি…?'

আর কোন সন্দেহ নেই। আহীর রেস্পন্স পেয়েই রং নাম্বার কি না জেনে নেয়।

'হ্যা।'

'আপনি কে বলছেন?'

'কুহেলি।'

'আমি কে বলুন তো?'

'আহীর।'

'হাই! বনলতা—কি করছিলে?'

'টিভি দেখছিলাম। তুমি কবে বাড়ি এসেছ?'

'কাল।'

'কোথা থেকে ফোন করছ, খবরের কাগজের অফিস থেকে?'

'আহীর হাসছে। 'কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি কেমন আছ সাম?'

'সেটা তো আমার চাইতে তুমিই ভালো জান।'

'সে কি! শরীর তোমার মন তোমার, আমি কেমন করে জানব?'

ও—তুমি তাহলে আমার শরীর মন, এসবের কোন খবরই রাখ না! ও বলছে, 'অ্যায়, আমি জানতাম, আমি জানতাম তুমি চুপ করে যাবে।' মুহূর্তের জন্য সব নিরব। আহীরও আর কিছু বলছে না। একি! লাইনটা কেটে না তো!

'হ্যালো—হ্যালো আহীর—'

'শুনছি।'

'তুমি চিঠি পেয়েছ?'

'কই না তো!'

'তার মানে! আমি চারটে চিঠি দিয়েছি।'

ও হাসছে 'একটাও পাইনি।'

'ও নো!'

'ও ইয়েস! তাহলে বোধ হয় তুমিও আমার চিঠি পাওনি।'

'সত্যিই পাইনি। তুমি দিয়েছিলে?'

'নিশ্চই। আন্দামানে রওনা হবার আগের দিন ম্যাড্রাসে বসে তোমাকে চিঠি লিখেছি।'

'আমার কিন্তু খুব রাগ হচ্ছে।'

'কোন লাভ নেই। রাগ করে আর কি করবে বল! আচ্ছা, তুমি এত ফ্রীলি কথা বলছ কি করে বলত? ওখানে কেউ নেই বুঝি?'

'না। ময়দান ফাঁকা। যা বলার তুমি নির্ভয়ে বলতে পার। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

'আচ্ছা! সাহস খুব বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে!'

'আমার সাহস বরাবরই একটু বেশী।'

'হ্যাঁ, সে আমি জানি। তুমি এস, তোমার হচ্ছে। আজ ফ্রী আছে?'

'কি?'

'বলছি, আজ ফ্রী আছ?'

'হ্যাঁ, একেবারে ফ্রী।'

'তাহলে আজ এস।'

'কখন ?'

'এখন কটা বাজে ?'

'কি জানি, এখানে তো দেখছি কোন ঘড়ি নেই।'

'কটা আর হবে ; একটা পাঁচ দশ হবে বোধহয়। আড়াইটে নাগাদ চলে এস।'

'কোথায় ?'

'যেখানে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল।'

'ও. কে.।'

'কোথায় বলত ?'

'রিজার্ভেশান কাউন্টার।'

'ইয়া। বাড়িতে কি বলবে ?'

'ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও, তুমি ভেবো না। আর শোন, দেরি করবে না কিন্তু। তুমি এক নাম্বারের লেট মাস্টার।'

'ও. কে. বাবা ও.কে.। এস কথা হবে। বাই।'

'বাই—'

আমার প্রতীক্ষার দু বছর দু মাসেই শেষ হয়েছে ভেবে মজা লাগছে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি এলাম। অনুমতি পেতে দেরি হল না। খবরের কাগজের অফিস থেকে ফোন করছি বলে আহীর তো আমার সুবিধা করে দিয়েছে। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগালাম।

যেতে যেতে ভাবছি, আজ মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের সঙ্গে দেখা করব। সেদিনের পর থেকে আর দেখা হয়নি। অনেক বার ভেবেছি থ্যাঙ্কস্ জানিয়ে একটা চিঠি লিখি ওনাকে। শুধু ভেবেইছি, দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কি জানি, হয়ত আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দেখি মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্ন নেই, অন্য এক ভদ্রলোক বসে আছেন। কাঁচের সার্সী দিয়ে ভিতরটা খুঁজে দেখলাম, দেখতে পেলাম না। ভেরি ব্যাড লাক্। লম্বা করিডোরটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম আহীরকেও খুঁজে পেলাম না। ঘড়িতে দুটো চল্লিশ, এত তাড়াতাড়ি আসবে! তাহলে তো আমার ভাগ্য খুলে যেত। কতক্ষণ ওয়েট করাবে কে জানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়ত পা ধরে যাবে, তারচেয়ে বসাই ভালো। একটা ফাঁকা চেয়ার দেখে বসলাম। আজ কাউন্টারে অসম্ভব ভিড়। সোলজার ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজন ইতস্তত ঘোরা-ফেরা করছে। স্টেশানের বাইরেও একটা ব্যাটেলিয়ান দেখলাম, লাগেজ-ফাগেজ নিয়ে জমায়েত হয়েছে। ওদের কোন কন্‌ফারেন্স আছে মনে হয়। আমি ধীরে ধীরে অধৈর্য্য হচ্ছি। ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর পেরিয়ে সাড়ে তিনটের দিকে পা বাড়িয়েছে। এখনো আহীরের পাত্তা নেই। ওকে যদি ভালো না বাসতাম তাহলে এই একটা কারণেই আমাদের বন্ধুত্ব ডিস্‌মিস্ হয়ে যেত। পাংচুয়্যালিটি বলে যে ডিক্‌স্‌নারীতে একটা শব্দ আছে ওর বোধহয় জানা নেই। আর জানলেও বাস্তবে

তার ব্যবহার করার প্রয়োজন মনে করে না। দেরি করে আসাটা ওর কাছে যেন একটা ফ্যাশান। ভাল্‌লাগে না। আর আমিও হাঁদি আছি। ওকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি একটু দেরি করে এলেই হয়। আজ আসুক জিগ্যেস করব না কেন দেরি হল। আমি খুব রেগে গেছি। এত করে বলে দিলাম তবুও শুনল না। তিনটে পঁয়ত্রিশ। অ্যায়। আসছে দাঁত বের করতে করতে। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট লেট। বলিহারি বাপু! আমার ডানদিকের চেয়ারটাতে বসল।

'কখন এসেছ?'

'আড়াইটে।'

'কটা বাজে এখন?'

'তিনটে পঁয়ত্রিশ?'

'সরি। সরি রিঅ্যালি সরি। কি করব বল। বেহালায় এসে গাড়িটা এমন আটকে গেল! হকার উচ্ছেদ হচ্ছে, রাস্তা জ্যাম, এক ঘণ্টার পথ দু ঘণ্টায় এল।'

আমি কিছুই জানতে চাইনি ও একাই বলে চলেছে, 'রাগ করেছ?'

ওর মুখ ভঙ্গিমা দেখে না হেসে পারলাম না।

'চল, একবার আমাদের অফিসে যেতে হবে।

'কোথায়?'

'সেইখানে—তুমি যেখানে আমাকে খুঁজতে গেছিলে। মনে নেই?'

'ও—' সিঁড়ি দিয়ে নামছি আমরা।

আহীর বলছে, 'সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছ?'

'না গো, খুঁজলাম, দেখতে পেলাম না। মনে হয় আজ আসেন নি!'

'তোমার ভাগ্যটা ভালো, তা না হলে আমাকেও হয়ত আর দেখতে পেতে না।'

'কেন?'

'এই ক' দিন আগে যে প্লেনটা ক্র্যাশ হল, এয়ার ফোর্স-এর অফিসাররা ছিল যেটাতে, ওটাতে আমিও ছিলাম।'

'তারমানে!!'

ও হাসছে, 'আন্দামান থেকে ঐ প্লেনে করেই ম্যাড্রাস এসেছি। তারপর প্লেনটা ওখান থেকে ব্যাঙ্গালোরের পথে রওনা হয়েছিল। আর মাঝ পথেই—'

ও গড! এ সংশয় সেদিনই আমার মনে বাসা বেঁধেছিল, যেদিন খবরে শুনলাম এই দুর্ঘটনার কথা। প্লেনে শুধু এয়ার ফোর্স-এর অফিসাররা আছে শুনে খুব ভয় পেয়েগেছিলাম। একজনও বাঁচেননি। টিভিতে দেখলাম অতবড় যানটা ভেঙে দুমড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। অনেক কষ্টে সে ভয় দূর করেছি মন থেকে। নিজেকে বুঝিয়েছি, আহীর তো এখন আন্দামানে, এই প্লেনে ওর থাকার কথাই নয়, আহীর সুরক্ষিত। ওর কিছু হয়নি। ভালো আছে ও।

'মাঝে মাঝে ভয় হয় জান, ছুটি ছাটা পেলে ওগুলোতে করেই তো বাড়ি ফিরি— কবে কোনদিন যন্তরটা বিকল হয়ে সমুদ্রের মাঝে মুখ গুঁজে পড়বে, একেবারে সলিল সমাধি।'

'কিচ্ছু হবে না তোমার। তুমি দেখে নিও, আমি বলছি।'

মনে মনে বললাম, তোমার ভাগ্য আমার সাথে জড়িয়ে গেছে আহীর। ঈশ্বর জানেন, আমি কখনো কারুর ক্ষতি করা তো দূর, কাউকে আঘাত দেওয়ার কথাই ভাবতে পারি না। আমার এতবড় ক্ষতি উনি করবেন না। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করবেন।

একথা জেনে অনেকেই হয়ত আমাকে সুপারস্টিসিয়াশ বলে গালাগালি দেবেন। দিন, আপত্তি নেই। কারণ, যুক্তি যেখানে হার মানে সেখান থেকেই শুরু হয় অযৌক্তিক, অলৌকিক ঘটনাবলীর সীমারেখা। অনেক বড় বড় যুক্তিবাদী মানুষকে পরিস্থিতির ফেরে এই সীমারেখায় মুখ থুপড়ে পড়তে দেখেছি, আর আমি তো কোন শর্মা!

'এই—কি ভাবছ? আমি তো তোমার সঙ্গে আছি।'

'তুমি দু বছর পর আসবে বলে দু মাস পরেই চলে এলে?'

'একটা কাজ নিয়ে এসেছি, কাজ হয়ে গেলেই চলে যাব!'

'কবে যাবে?'

'ন তারিখ। তোমার নাটকের কি খবর?'

'কি নাটক?'

'অভিনয়—'

'ও—সে তো কবেই ছেড়েছি।'

'তারমানে তুমি আমার কথা রাখনি।'

'সরি। এই—টিকিট না কেটে প্ল্যাটফর্মে চলে এলে? চেকার ধরলে কিন্তু ফাইন করবে বলে দিচ্ছি।'

'তুমি তো আছ, ধরলে তোমাকে দেখিয়ে দেব। আর তোমাকে তো এখানে সবাই চেনে।'

'আহা! কি আবদার! আমি বলব আমি তোমাকে চিনি না।'

'আচ্ছা! বলে দেখনা একবার!'

'কি করবে?'

'বলেই দেখ আগে।'

সিঁড়ি টপকে আমরা উপরে উঠছি। মাস ছয় আগে এই অফিসেই এসেছিলাম মিস্টার জিজ্ঞাসা চিহ্নের সঙ্গে। আহীর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওর রিজার্ভেশান করছে। আমি ভিতরটা দেখছি। সেই ভদ্রলোকও নেই। চেয়ারটা ফাঁকা। থাকলে চিনতে পারতাম।

'এই যে ম্যাডাম, জানেন কি? এখানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ।'

'কোথায় লেখা আছে?'

'লেখা থাকবে কেন; এমনিতেই এখানে মেয়েরা আসে না।'

'সেটা আলাদা ব্যাপার। আসে না আর আসা নিষেধ দুটো তো এক কথা নয়! প্রয়োজন পড়ে না আসে না, আমার প্রয়োজন পড়েছে তাই এসেছি।'

'কি প্রয়োজন তোমার?'

'রিজার্ভেশান করাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ না ?'

আহীর হাসছে। 'পিটানি খাবে ?'

'বারে! তাহলে আমাকে আনলে কেন এখানে ? চলে যাচ্ছি!'

'আরে দাঁড়াও ; কিচ্ছু হবে না। তুমি এর আগেও তো এসেছিলে ?'

'ভিতরে গেছিলাম। ঐ চেয়ারে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, ওনার সাথেই কথা বলেছিলাম। আজ নেই দেখছি।'

'আমি সাধারণত এখান থেকে রিজার্ভেশান করাই না, আজ দেরি হয়ে গেছে তাছাড়া তুমি আছ সঙ্গে।'

'আমি আছি তো কি ?'

'তুমি একা বসে থাকবে আর আমি টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকব! এখানে কি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।'

কথায় কথায় আমরা বেরিয়ে এলাম স্টেশান থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আহীর বলছে, 'কোথায় যাবে গো এবার ?'

'কোথায় যাওয়া যায়! চল, সাবওয়েতে একটা ভালো কাফে আছে, খুঁজে দেখি কোথায়।'

'তোমার খোঁজা মানে তো জানা আছে। গতবারে কি যেন একটা খুঁজলে—'

'র‍্যালিস।'

'ইয়েস, র‍্যালিস। খুঁজতে খুঁজতে খিদে পেয়ে যাবে না তো ?'

সত্যিই তাই। সাবওয়ের গোলক ধাঁধা পথে খানিক ঘুরপাক খেলাম, কাফে আর দেখতে পেলাম না। কি অসম্ভব ভিড়। যে দিকে তাকাও শুধু মানুষ আর মানুষ।

'এত লোক কোথা থেকে আসছে বলত! দেশের জনসংখ্যা কি হারে বেড়ে চলেছে!'

আহীর আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'তুমিও তো বাড়াবে একদিন।'

'তুমি বাড়াবে না মনে হচ্ছে!'

'নাহ্!'

না, নিজে না বাড়ালেও বাড়াতে সাহায্য তো করবে! কথাটা মনে জাগতেই লজ্জা পেলাম। নিজের কাছে লজ্জা। আহীরের মুখটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। পিছন ফিরে তাকালাম ওর দিকে। হঠাৎ থমকে গেছি দেখে একটু অবাক হয়।

'কি হল! কি দেখছ ?'

'তোমাকে।'

'কেন ?'

'এমনি। দেখতে ইচ্ছে হল।'

'বাবা। হঠাৎ হঠাৎ কি যে তোমার ইচ্ছে হয়!'

আরো খানিক গিয়ে আহীর নিরাশ হয়ে বলছে, 'হ্যাঁ গা, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?'

'কি জানি, খুঁজে পাচ্ছি না। চল লণ্ড ঘাটে যাই, গঙ্গার ফ্রেস হাওয়া খাওয়া যাবে।'

'শেষ পর্যন্ত হাওয়া খাওয়াবে ! চল ।'

চওড়া চওড়া রাস্তাগুলো টপকে ওপারে গেলাম ।

'দাঁড়াও, টিকিট কাটি ।'

'টিকিট কাটবে কেন, আমরা কি ওদিকে যাচ্ছি না কি ?'

'ওদিকে নাই বা গেলাম, আমরা যখন ব্যাক করব ধরবে না ! ওরা কি জানবে না কি আমরা লঞ্চ ঘাটে বসেছিলাম না ওদিক থেকে আসছি !'

'তাইতো ! ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসেনি ।'

'দাঁড়াও এখানে, আমি কেটে আনছি ।'

আহীর টিকিট কেটে আনল । আমি বলছি, 'সেই যখন টিকিট কাটলে এখানে বসে থেকে কি করব ! চল ওদিকেই যাই ।'

'চল, আমার আপত্তি নেই । এই—লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে ।'

'কি হবে ! ধরতে পারবে না ? চল না ছুটি ।'

'ছুটতে পারবে ?'

'হ্যাঁ পারব ।'

কাঠের ব্রীজের ওপর দিয়ে ছুটেছি দুজনে । ছুটতে ছুটতে এক লাফে লঞ্চে উঠে গেছি । আহীর জেটিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে ।

'আসবে তো । উঠে এস ।'

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি ওর দিকে । আমার হাত কাঁপছে । দূরত্ব বাড়ার আগেই ও উঠে এল । লঞ্চের গেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমরা উঠেছি । রড ধরে ধার দিয়ে যেতে যেতে যদি একবার জুতো হড়কে যায় তো টপাং করে জলে পড়ব । এদিকে কোমর পর্যন্ত উঁচু রড় দিয়ে ঘেরা । লঞ্চের সবাই দেখছে আমাদের । আমি আর তাকাচ্ছি না ওদের দিকে ।

আহীর হাসছে, 'কি করে যাবে এখন ?'

'অতদূর যাব কেন ! এই রডটা টপকাও না ।'

'পরবে ?'

'পাঁচিলে চড়া অভ্যেস আছে । চলে এস ।'

খেলার মাঠে ফেন্সিং টপকানোর মত টপাটপ্ রড টপকে ভিতরে এলাম দুজনে ! কেবিন থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলছেন, 'এত রিস্ক নিয়ে এভাবে আসার কি দরকার ছিল ! পরেরটাতে আসতে পারতেন ।'

আহীর এখনো হেসে চলেছে । 'না না, এটুকু আসা যায় । আসলে একটু তাড়া আছে ।'

ভদ্রলোক আর কিছু না বলে কেবিনে ঢুকে গেলেন । আমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে আছি । আহীর মুখটা আমার কানের কাছে নিয়ে এসে বলছে—

'তোমার ভয় করল না ?'

'ভয় করবে কেন ?'

'যদি পড়ে যেতে ?'

'আমি সাঁতার জানি। যদিও এখানে সাঁতার কাটতে পারতাম কি না সন্দেহ আছে।'

'কেন ?'

'এত জল দেখে হয়ত সাঁতার ভুলে যেতাম।'

'সাগর দেখে এ জল আমার কাছে আর কিছুই মনে হয় না।'

'আন্দামানের গল্প বল না।'

'কি গল্প শুনবে, জায়গাটা বেড়াতে যাবার পক্ষে ভালো। তবে খুব বেশী হলে এক দু মাস ঠিক আছে। দু বছর থাকা যায় না। বৃষ্টি তো লেগেই আছে। সমুদ্র উপকূল তো, ক্লাইমেটটা বড় বাজে।'

'আর ওখানকার লোকজনদের কথা বল।'

'আন্দামানীদের কথা ? ওদের অগ্রগতি এখনো হয়নি। অনুন্নত পোশাক। হাত খানেক চওড়া এক চিলতে কাপড় শুধু কোমরে জড়ানো।'

'সে কি !'

'হ্যাঁ গো, মেয়েরাও ওভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ওর কথা শুনে আমি খুব হাসছি।

'হাসছ যে ! সত্যি বলছি। দেখে দেখে আমাদের চোখ পচে গেছে। তবে এখন একটু চালাক হয়েছে মেয়েগুলো। আমাদের কাছে আর আসে টাসে না—'

'হেই—কি অসভ্যতা ! তোমাদের কাছে আসতে যাবে কেন শুধু শুধু ?'

'আরে বাবা, আমাদের কাছে মানে সভ্য এলাকায়। ওরা থাকে ভিতর দিকে। আমাদের দেখতে পেলেই পালিয়ে যায়।'

'তাই বল।'

'তুমি কি ভেবেছিলে ? আরে, হাসছে দেখো—ফাজিল।'

'ওখানে তোমার অনেক বন্ধু হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, পুরনো বন্ধুদেরই তো পেয়ে গেছি।'

'পুরনো বন্ধু মানে ?'

'আমার আগে যারা আগ্রা থেকে ট্রান্সফার হয়ে ওখানে গেছে।'

'ও আচ্ছা। তোমার বন্ধুকে একটা চিঠি দিয়েছি জান ?'

'কাকে ! মহেনকে ?'

'হ্যাঁ।'

'কি লিখেছ ?'

'তোমার কথা জানতে চেয়েছি।'

'আমার কথা ও কি করে বলবে !'

'আমি ভেবেছি তোমাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে।'

'মহেন এখন ওখানে নেই মনে হয়।'

মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি ঘুর ঘুর করছে। ভাবছি ভেবে কি হবে বলেই ফেলি।

'তোমাকে একটা কথা বলি ?'

'বল।'

'আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।'

'যাঃ! সত্যি?'

আমি ঘাড় নেড়ে নিরবে হ্যাঁ বলছি।

'কবে?'

'শুধু দিনটা ঠিক হতে বাকি আছে।'

'কোথাকার ছেলে?'

'জানি না।'

'কি করে?'

'তাও জানি না।'

'ছেলেটাকে দেখেছ?'

'না।'

'দূর! এ আবার হয় না কি! কিছুই জান না। তোমার মতামত না নিয়ে বাবা মা তোমার বিয়ে দিচ্ছেন?'

'মতামত নেন নি কে বলল?'

'তুমি তো কিছুই জান না বলছ। না জেনে কি মতামত দিলে?'

'মতামত দেওয়ার জন্য কিছু জানার প্রয়োজন মনে করিনি। বাড়ির লোক যা দেখে দিয়েছে তাকেই বিয়ে করছি।'

'তোমার মত মেয়ের মুখে একথা মানায় না।'

'পরিস্থিতি মানুষকে মাঝে মাঝে এমন কিছু করতে বাধ্য করায় যা তার পক্ষে বেমানান; তাকে মানায় না।'

'কোন্ পরিস্থিতি তোমাকে বাধ্য করছে বল?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'তুমি বাজে বকছ।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি কিন্তু সত্যি বলছি।'

আহীর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে! মুখ পড়ে বোঝার চেষ্টা করছে আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে—।

বলছে, 'আমাকে নিমন্ত্রণ করবে না?'

'আসবে?'

'ডাকলে আসব।'

আহীর কি বিশ্বাস করে নিল! মনে হয়। মুখটা একটু অন্যরকম লাগছে কি! হতে পারে। বাড়ির পোষা পাখিটাও যদি কখনো শিকল কেটে উড়ে যায়, ক্ষণিকের জন্য হলেও মনটা টন্‌টন্ করে। অল্প দিনের আলাপ হলেও আহীর তো আমাকে ভালোবাসত, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড। ওর ভালোবাসার স্নিগ্ধ উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করে।

লঞ্চ ঘাটে ভিড়ল। আর সকলের সাথে আমরাও নামার জন্য এগিয়ে এলাম। ও হঠাৎ জিগ্যেস করছে, 'হ্যাঁ গো টিকিট?'

'আমি কি জানি।'

'সে কি! তোমার হাতেই তো দিলাম।' জামা প্যান্টের পকেট হাতড়ে বলছে, 'পাচ্ছি না তো. কোথায় গেল বলত?'

আমি হেসে ফেলেছি। আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'ঐ তো টিকিট। খালি শয়তানি না!'

ভিড় সরিয়ে আহীর আমাকে হাত ধরে লঞ্চ থেকে নামাল। ওঠার সময় আমি ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম; ও আমাকে নামতে সাহায্য করল। লঞ্চ ঘাটে একটা ছোট্ট শিব দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল শিব ঠাকুরের মেক্‌আপ।

'ঐ দেখ শিব ঠাকুর। তুমি শিব পূজো কর?'

আমি হাসছি। লঞ্চ ঘাট থেকে বেরিয়ে আহীব ডান দিকে মোড় নিল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? সোজা গেলে বাস স্ট্যান্ড আগে পড়বে।'

ও বলছে, 'এক্ষুণি স্ট্যান্ডে গিয়ে কি করবে! চল না ইডেনে একটু বসি।'

'চল।'

'তোমার শরীর কেমন আছে এখন?'

'কেন বলত?'

'কেন কি! তোমার তো শরীর খারাপ ছিল। গতবারে বলেছিলে তোমার অ্যানিমিয়া হয়েছে।'

'তোমার এখনো মনে আছে সে কথা?'

'কেন থাকবে না! কি ভাব তুমি আমাকে? মানছি তোমার মত অত ইমোশনাল নই। সবকিছু অত গভীরভাবে ভাবতে পারি না। তাই বলে তোমার অসুস্থতার খবরটাও ভুলে যাব!'

'সরি, আমার এরকম ভাবা উচিত হয়নি।'

'স্রেফ এই ব্যাপারটা নিয়ে এক বন্ধুর সাথে আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল। বন্ধুটা ওর নিজের একটা ঘটনার কথা বলছে, আমি শুনলামও মন দিয়ে। যতই বোঝাই, ও একই কথা বার বার বলে চলেছে। তখন বলেছি, দেখ যা হবার তা হয়ে গেছে এ নিয়ে ভেবে আর লাভ আছে! ও ভাবল আমি ওর কথার গুরুত্ব দিচ্ছি না। এর কোন মানে হয় বল! এত আবেগ ভালো না।'

'মানুষের জীবনে আবেগের মূল্য আছে আহীর। আবেগ বর্জিত মানুষ তো রোবট, একটা যন্ত্রের সমান। মানছি ইমোশনাল মন পদে পদে আঘাত পায়, কষ্ট পায়। তাই বলে, আঘাত পাওয়ার ভয়ে তুমি যন্ত্র হয়ে যেতে চাইবে? আর কেউ চাইতে পারে এটা অন্তত আমার কাম্য নয়।'

'তার মানে বলতে চাইছ আমাকে বন্ধুর ভুল বোঝাটাই স্বাভাবিক?'

'কখনোই না। এই সামান্য কারণে ভুল বোঝার কি আছে! হ্যাঁ, সাময়িক কষ্ট পেতে পারে। সে হয়ত মানসিক দিক দিয়ে খুব বিক্ষুব্ধ ছিল। তোমার যুক্তিটাকে গ্রহণ করার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। তাই বলে ভুল বোঝা উচিত হয়নি।'

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এর আগে কখনো দেখিনি। দুই বন্ধু

মুখোমুখি বসে একজন আর একজনের চোখে কাঠি দিয়ে কি যেন করছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি ভালো করে।

'কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লে ?'

'কি করছে ওরা ?'

আহীর এক ঝলক্ দেখে বলল, 'কাজল পরছে।'

'য্যা্ ! ছেলেরা আবার কাজল পরে না কি ! তাছাড়া লোকটা তো বুড়ো হয়ে গেছে, কাজল পরছে কেন ?'

'শখ হয়েছে পরছে ; তুমি চল।'

'একবার দেখে আসব কাছ থেকে ?'

'দূর ! কি দেখবে, চল।' আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল রাস্তার অন্য ফুটে। আমার কিন্তু খুব কৌতুহল হচ্ছে। লোকটা এই বুড়ো বয়সে কাজল পরছে কেন !

'কি খাবে বল।'

'কেন খাব কেন ?'

'সামনে এত খাবাব দোকান রয়েছে খাবে না ! কি খাবে ঝাল না মিষ্টি ?'

'ঝাল। চপ্ খাব।'

'দাঁড়াও, ভেজিটেবিল চপ্ আছে কিনা জিগ্যের করি।'

'ভেজিটেবিল ভাল্লাগে না। আলুচ্চপ খাব।'

'ভেজিটেবিলের চেয়ে আলুচ্চপ ভাল্লাগে ! কি যে তোমার ভালোলাগা !'

সব দোকানগুলোতে জিগ্যেস করা হল একটাতেও নেই।

'কি খাবে গো ? আলুচ্চপ ভেজিটেবিল চপ্ কিছুই তো নেই। অন্য কিছু খাও না ? মিষ্টি খাবে ?'

'না। পিঁয়াজি খাব।'

'খাবে ? ফুটপাথে ভাজছে বলে বলিনি। চল।'

কাছে গিয়ে পিঁয়াজির চেহারা দেখে ভক্তি গরম হয়ে গেল।

'ইস্, কি পিঁয়াজির ছিরি ! পিঁয়াজগুলো যেন দাঁত বের করে ভ্যাঁঙাচ্ছে। তাও চুণ্ডে পুড়ে থাক্।'

'বেশী পিঁয়াজি মেরো না তো, পিঁয়াজি খাও।'

'খাব না। আগে বাড়ো।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ইডেনে পেঁছিলাম। আহীর আন্দামানের গল্প বলছে। কখন কি করে, কখন বন্ধুদের সঙ্গে সাইকেল নিয়ে আড্ডা মারতে বের হয়। সেখানে কি কি পাওয়া যায়। কোন জিনিসের কত দাম। এখানকার সাথে কি তফাৎ, কি মিল, আরো কত কি। গল্প করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা ফেরার পথ ধরেছি। নানান কথা প্রসঙ্গে ও আমার কথা তুলল। কিছুটা অবাক মিশ্রিত স্বরে বলছে, 'তুমি আমাকে এতটা ভালোবাসলে কি করে বলত ? আমি কিন্তু তোমাকে ভালোবাসি না।'

আমি হাসছি ওর কথা শুনে। অকপট স্বীকারোক্তি।

ও আরো অবাক। 'তুমি হাসছ! আমি সিরিয়াস বলছি, এটা ইয়ার্কি ভেবো না।'

'আমি কিছুই ভাবছি না। সিরিয়াসও না ইয়ার্কিও না।'

আহীর আমাকে টেনে নিল নিজের কাছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল—

'রিঅ্যালি, আই ডোন্ট লভ ইউ।'

'আমি জানি তো।'

'জেনেও ভালোবাসছ কি করে! এভাবে হাসতে পারছ তুমি?'

সত্যি আমি হাসছি। আহীরের এই ভালোবাসতে না পারার মধ্যেও আমি ওর ভালোবাসার স্পর্শ পাচ্ছি। কি অদ্ভুত মানসিকতা আমার! আহীর আমাকে ভালোবাসে না এ কথা ওর মুখে শুনেও আমার কষ্ট হচ্ছে না। কারণ আমি নিশ্চিত, আহীর আমার। ও আমার ছাড়া আর কারুর হতেই পারে না। তাই ও আমাকে ভালোবাসে; যে ভালোবাসার খবর ওর নিজেরই জানা নেই।

'রিঅ্যালি সাস, আই মীন্ ইট্।'

'দেখো, আমি তোমাকে ভালোবাসি—এটা তুমি অনুভব করতে পার?'

'পারি।'

'তুমি যে আমায় ভালোবাস, এটাই কি তার সবচাইতে বড় প্রমাণ নয়? তুমি আমাকে ভালোবাস বলেই না আমার ভালোবাসাটা ফিল্ করতে পার!'

'ও গড! অদ্ভুত যুক্তি তোমার। কি দেখলে তুমি আমার মধ্যে? কেন এত ভালোবাসলে?'

'জানি না। আমার বেঁচে থাকার জন্য বাইরের কোন একজন যে এভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠবে আগে কখনো ভাবিনি।'

আমরা অন্ধকার মাঠের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছি। উঁচু উঁচু পোস্টের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে জনহীন মাঠের বুকে। আহীর আমাকে ধরে আছে একই ভাবে। ওর দৃঢ় বাহু বন্ধনে আমি গলছি ধীরে ধীরে। এই নিঝুম মায়াময় আলো আঁধারি পরিবেশটা আমার বুকে কাঁপন তুলছে। এ বন্ধন মুক্ত হওয়ার আগে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি কাঁদছি।

'এই—সামি, কি হয়েছে?'

'আমি ভালো নেই আহীর, একটুও ভালো নেই।'

'আমি জানি, আমি জানি তুমি ভালো নেই।'

'তুমি চলে যাবে; আবার কবে আসবে জানি না। আমি কি করব বলে দাও।'

'তুমি কাঁদছ কেন বোকার মত?'

'আর পারছি না বিশ্বাস কর।'

'আচ্ছা, কিছু না জেনে না বুঝে কেন এমন করলে? এটা কি তোমার হঠকারীতা নয়? কি জান তুমি আমার সম্বন্ধে? কিছুই তো জান না। কোন্ বিশ্বাসের জোরে আমাকে ভালোবাসলে? আমি তো ফ্রড হতে পারতাম।'

'পারতে। কিন্তু তা তুমি নও।'

'কি করে বুঝলে, হতেও তো পারি ?'

'কখনোই না। আমি তোমাকে না দেখেই চিনেছি, আর দেখার পর শুধু মিলিয়ে নিলাম। আমি নির্ভুল।'

'আমার অবাক লাগছে সমি, এও কি সম্ভব ! তুমিও তো নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেছ ; কোন সঠিক উত্তর খুঁজে পেয়েছ কি ? একটা মানুষকে না দেখে না জেনে তাকে ভালোবাসা যায় ?'

'যায়। আমি পারি।'

'তুমি একটা বোকা।'

আহীরের কথাগুলো আমাকে স্ট্রাইক করছে। নিজেকে প্রশ্ন করার কথা আহীর জানল কি করে। আমি তো কখনো বলিনি। হ্যাঁ, আমার শেষ চিঠিটায় একথা লেখা ছিল। তাহলে কি আমার চিঠি পেয়েই ও এখানে এসেছে ! হতে পারে। একটু আগে আমি যখন বললাম, আমি ভালো নেই। ও আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল আমি জানি তুমি ভালো নেই। ও জানল কি করে ! আমার ভালো না থাকার খবর আমি তো ঐ চিঠিতেই জানিয়ে ছিলাম। তাহলে চিঠির কথা ও গোপন করতে চাইছে কেন ! ও কি চাইছে আমি ওকে ভুলে যাই ! আর আমার চিঠি পেয়ে এখানে ছুটে এসেছে জেনে আমি যদি ওকে আরো ভালোবাসি ! যদি ভুলতে না পারি ! তাই কি অসত্য বলছে ! যদি তাই হয় তাহলে তো—ও গড্ ! কিন্তু ও কি সত্যিই চায় আমি ওকে ভুলে যাই ! জানি না। কিছু জানি না। আমার চিন্তার জট আরো জটিল হয়ে উঠছে। আর ভাবতে পারছি না। আমার গলা বন্ধ। কিছু বলতে পারছি না। ওর হাতটা সাঁড়াশির মত পিষে ধরছে আমাকে। মনে হচ্ছে প্রাণ ভরে একটু কাঁদি। চিৎকার করে বলি তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে, সত্যি।

'এই—কিছু বলছ না যে ?'

ওর হাতটা শক্ত করে ধরলাম। আমার নিরব অভিব্যক্তি প্রমাণ করে দিল ওর সান্নিধ্য আমার কাছে কতটা নিরাপদ। আর এ ভাষা বোঝার মত যথেষ্ট ফীলিংস্ ওর আছে। তাই বুঝি আহীর প্রত্যুত্তর জানালো আমারই মত নিরব অভিব্যক্তিতে।

'আমার সব কথা তোমাকে বলব। তোমার জানা দরকার। তারপর ভেবে দেখো। আমরা খুব শিগ্‌গির মিট্ করব।'

'কবে ?'

'ফোনে জানালে হবে না ?'

আমি ভাবছি। বার বার ফোন পেয়ে বেরিয়ে আসছি, মা কোন সন্দেহ করছে কি না কে জানে ! তাছাড়া কাকিমারাও অফেন্ডেড হতে পারেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। সবচেয়ে বড় কথা গতবারের মত যদি আমাকে বলতে ভুলে যায় তো গেল।

'কি ভাবছ ? ফোনে জানালে হবে না ?'

'না। এক্ষুনি বল।'

'এক্ষুনি বলতে হবে ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক হ্যায়। আজ—আজ যেন কি বার?'

'শুক্রবার।'

'মঙ্গলবার এস, বারটা নাগাদ। মঙ্গলবার কত তারিখ পড়ছে বলত?

'আজ সাতাশ। তাহলে মঙ্গলবার একত্রিশ। একত্রিশে ডিসেম্বর। বছরের শেষ দিন।'

'বাড়িতে কি বলবে?'

'প্রতিবার যা বলি! শিয়ালদায় যাচ্ছি।'

'ঐ দিন তোমাদের ইন্সটিটিউট ছুটি থাকবে না?'

'তাই তো! আগে ভাবিনি; যাগ্‌গে, ছুটি থাকলেও বাপি জানবেন না। বলে দেব ছুটির দিনে স্পেশাল কিছু একটা আছে।'

'সত্যি, তুমি না, পারও বটে। তোমার বাস ছাড়ছে যাও।'

'পরেরটাতে যাব। দেখছ না একটাও সিট্ নেই। এতটা রাস্তা দাঁড়িয়ে যাব বুঝি!

ও হাসছে, 'তারমানে না যাওয়ায় ধান্দা। শুধু বাহানা না!'

হঠাৎ আমাকে টাচ্ করতে লাফিয়ে সরে এসাছ ওর পাশ থেকে।

'বাবা! তুমি এত সেন্সিটিভ্? আর একবার দি—!'

'না, অসভ্য! পাবলিক প্লেসে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি' হচ্ছে না!'

আর করব না— অন্যায় হয়েছে। আমার একটা বন্ধু আছে জানতো, ঠিক তোমার মত। তোমার তো তবু গায়ে হাত দিতে হয়, আর সে যদি জানতে পারে তাকে কেউ ছুঁতে যাচ্ছে তাহলে দূর থেকেই নাচতে শুরু করে। বন্ধুগুলো বলে শালা বিয়ের পর কি করবি রে?'

'কি আর করবে, সারাদিন শুধু নাচবে।'

'যা বলেছ, বিয়ের প্রথম রাতেই খাট ভেঙে ফেলবে।'

'য্যা! অসভ্য!'

'অসভ্যর কি আছে! তুমি যেটা মনে ভাবছ আমি সেটা মুখে বললাম।'

'তাই বলে বলবে?'

'না বলার কি আছে, তোমার কাছে বলা যায়। তবে মেয়েদেয় মুখে 'অসভ্য' কথাটা শোনাও ভাগ্যের ব্যাপার। বেশ বল তোমরা; অসভ্য!'

'পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটা এসে দাঁড়াল আমাদের পাশে। সেদিকে তাকিয়ে ও বলছে, 'মঙ্গলবার বারটায়, মনে থাকবে তো?'

'থাকবে। কি বলবে সেদিন?'

'আমার কথা, যা তুমি জান না।'

'আমি শুনব না।'

'কেন?'

'এমনি। শোনার প্রয়োজন মনে করছি না।'

'তোমাকে শুনতেই হবে।'

'শুনব না।'

'শুনব না গান গান শুনব না…'হাত নেড়ে নচিকেতার গান ধরেছে।

'তুমি গান গাও আমি আসছি।'

'এস ডার্লিং।'

অসভ্য!'

বাসের দিকে দু কদম এগোতেই ও ডাকল, 'সমি—'

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। কাছে এসে আহীর জিগ্যেস করছে,

'সত্যি সত্যি তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে?'

আমি স্তম্ভিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। সারা মুখে পরিতৃপ্তির নির্বাক হাসি।

'বল না, সত্যিই বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে?'

আমার ভাষা নেই। ঘাড় নেড়ে জানালাম, না।

'যাও, মঙ্গলবার কথা হবে।'

আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এমন একটা মুহূর্তে আহীরের এ প্রশ্নের কি অর্থ খুঁজত আমি জানি না। আমি ভাবছি, আহীর কেন প্রকাশ করতে পারছে না ও আমাকে ভালোবাসে। আমি কিন্তু ভাবিই নি কথাটা ও এভাবে মনে রেখেছে বা আমাকে আবার জিগ্যেস করতে পারে। সম্ভব অসম্ভবের দোলায় দুলছে আমার ভবিষ্যৎ। পদ্মপাতায় জলের মত টলমল করছে আমার ভালোবাসা। যে হাওয়াব ঝোঁকা এসে পাতাকে কাৎ করে মুক্ত সম ভালোবাসাকে অনন্ত দীঘির গর্ভে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে, সেই হাওয়াই আবার পাতাকে সোজা রেখে ভালোবাসাকে সুরক্ষিত রাখতে চাইছে। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। আমার ভালোবাসার ইন্ধন তো আহীর। ও না চাইলে আমি ওকে ভালোবাসতে পারতাম না। ওর ভালোবাসা না পেলে আমার ভালোবাসা হারিয়ে যেত নামহীন কোন অন্ধকারে। ওই তো ভালোবেসে বাঁচিয়ে রেখেছে আমার ভালোবাসাকে, আমার আবেগকে, আমার প্রেমকে।

✻ ✻ ✻

হাতে পুজোর ডালা নিয়ে দক্ষিনেশ্বরের মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে আছি। আজ এখানে আসব সে প্রোগ্রাম অনেকদিন আগেই ঠিক করা ছিল। আমার পিছনে মা দাঁড়িয়ে আছেন। লাইন এগোচ্ছে কচ্ছপ গতিতে। মা কত কথা বলছেন। বার বার জিগ্যেস করছেন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে কি না। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ভীষণ মন কেমন করছে। মনে হচ্ছে ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে একটু কাঁদতে পারলে বেশ হত। চোখের কোনে জমে ওঠা জল আমারই দীর্ঘশ্বাসের উত্তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন সেই অশ্রু বাষ্পকে সাক্ষী রেখে এই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে কিছু একটা প্রতিজ্ঞা করছি। প্রতিজ্ঞা করছি, "আমি আবার আসব এখানে। আহীরকে নিয়ে।" কাল এখনো আহীরের ফোন পাইনি। আর আজ অ্যালকোহলের নেশার মত বুঁদ হয়ে আছি ওর নেশায়। এভাবেই কেটে গেল বছরের শেষ সপ্তাহটা।

আজ শেষদিন। মঙ্গলবার। একঘণ্টা পাঁচ মিনিট বসে আছি এসপ্ল্যানেড বাস কাউন্টারে। আমার নিজেকে সন্দেহ হচ্ছে; আমি কি পাগল না বোকা! না কি অন্য কিছু! আমি তো জানি দেরি করে আসাটা আহীরের স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার। তবু কেন আমি যথা সময়ে আসি! আজ পনের মিনিট লেট হয়েছে তাই মনে হচ্ছিল, ইস! আহীর যদি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে বাজে ব্যাপার হবে। এসে দেখি, কোথায় আহীর! তারপরও এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত। আজ আর ওর উপর রাগ হচ্ছে না, রাগ হচ্ছে নিজের উপর। এতদিনে এটুকু বোঝা আমার উচিত ছিল। আহীরের কোন দোষ নেই, আমিই বোকা। নিজেকে ধরে পিটাতে ইচ্ছে করছে। না, আর চুপচাপ বসে থাকা যাচ্ছে না। নিজের উপর রাগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একটু অন্যমনস্ক হওয়া দরকার। মুখের চিক্‌লেটটাও বিস্বাদ হয়ে গেছে। এমনিতে অচেনা কারুর সাথে অহেতুক যেচে কথা বলি না। এক একজনকে দেখি আগডুম বাগডুম সাত সতের বকেই চলেছে। তাতে সামনের ব্যক্তি বিরক্ত বোধ করছে কিনা সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। আমার এগুলো ভাললাগে না। প্রয়োজন থাকলে আলাদা ব্যাপার। আজ বলতে ইচ্ছে করছে। পাশে বসে থাকা ভদ্রমহিলাকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কোথায় যাবেন বৌদি?'

যাব না, এলাম। আমার ভাই দোকানে গেছে তাই অপেক্ষা করছি।'

'ও আচ্ছা।' ভাইটা কেমন কে জানে! বিবাহিত না অবিবাহিত! বউটার বয়স খুব একটা নয় অবিবাহিত হলেও হতে পারে। যাব্‌ বাবা! আমি এসব ভাবছি কেন? বেল পাকলে কাকের কি!

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমি? শশুর বাড়ি।'

বউটা একটু অবাক হল। 'কোথায় শশুর বাড়ি?

'ডায়মণ্ডহারবার।'

ওনার চোখ দুটো আমার মুখে কপালে হাতে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি উনি বিবাহিতের প্রমাণ খুঁজছেন।

হেসে বললাম, 'আপনি হয়ত ভাবছেন আজকালকার ম্যারেড আনম্যারেড মেয়েদের মধ্যে তফাৎ করা দায়—'

'না, তা ভাবব কেন! আজকাল অনেকেই তো শাঁখা সিঁদুর পরে না। তাতে কি!'

'হ্যাঁ; আসলে আমার শশুর বাড়ির সকলে ভীষণ আধুনিক। এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাছাড়া ওর বিদেশে চাকরি। বেশীরভাগ সময়ইতো দেশের বাইরে কাটে।'

'কোথায় চাকরি করেন?'

'ফ্রান্সে'। মপাসাঁ সিরিজ শেষ করে ফ্রান্সটা এখন চেনা চেনা মনে হয়।

'তাই না কি! ভালোই তো বিদেশে ঘুরতে পারছেন।'

আমি অন্য কথা ভাবছি। এক্ষুনি যদি জিগ্যেস করেন কি চাকরি করে, কি বলব! প্লেনের চাকায় হাওয়া দেয় না আইফেল টাওয়ারে ঝাড়ু মারে?

'কারোর জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, আমার হাজব্যানডের জন্য ওয়েট করছি। এই কাছেই আমার ভাশুরের অফিস ওখানেই গেছে।'

ছ্যাবলামির একটা সীমা থাকে। আমি আনলিমিটেডলি ঢপ দিয়ে যাচ্ছি। আমার খুব হাসি পাচ্ছে কিন্তু হাসতে পারছি না। হাসি চাপতে গিয়ে মুখটা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছে। মনে পড়ছে বি এসসি পড়ার সময় অ্যান্থ্রোপোলজি এক্সকারশানে গিয়েছিলাম এক গ্রামে। আমাদের পাঠ্যের একটা বিষয় ছিল প্রতিটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পরিবারের মেম্বার সংখ্যা, তাদের ইকনমিক্যাল কণ্ডিশান, সোর্স অফ ইনকাম এগুলো সার্ভে করা। এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। লেখাপড়া শিখেছে যৎ সামান্য কিন্তু তাদের কথা বার্তা অল্পবিদ্যা ভয়ংকরের মত। আমরাও সুযোগ পেয়ে শুরু করলাম—'বোটানি এক্সকারশানে গেছিলাম ওয়ালটিয়ারে। আর এখান থেকে ফিরে জুলজি এক্সকারশানে যাব গির অরণ্যে। আমাদের স্পেশাল প্যারমিশান নেওয়া আছে। সরকার থেকে সিকিউরিটির বন্দবস্ত করেছে। আসলে আমাদের কলেজটাতো খুব বড়লোক...।' আগডুম বাগডুম সে আরো কত কি। আসলে আমরা গেছিলাম আলিপুর জু গার্ডেন।

কলেজ লাইফ পিছনে ফেলে এসেছি কিন্তু এখনো সেই বাঁদরামো যায়নি। একা বসে বোর হচ্ছিলাম, এভাবে একটু টাইম পাস করলাম আরকি।

বাঁদিকে ঘাড়টা ঘোরাতেই দেখি মূর্তিমান এগিয়ে আসছেন। চোখে চোখ পড়তে ইশারা করে ডাকল আমাকে। দেড়টা বাজে। পাক্কা দেড় ঘণ্টা লেট। উঠে যাওয়ার সময় ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম, উনি দেখছেন আমাদের। আমার বেশ মজা লাগছে।

বাইরে বেরিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জিগ্যেস করলাম,

'তুমি কি ভুলে গেছিলে আমার কথা ?'

নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শুনে ও আমার দিকে তাকাল। বিনম্র অপরাধীর মত বলল, 'সরি।'

'ইংরেজরা এই শব্দটা রেখে গেছিল বলে তোমরা রেহাই পেয়ে গেলে।'

'বিশ্বাস কর, আমার সময়টা একদম ভালো যাচ্ছে না। রাস্তায় বের হলেই খালি অ্যাক্সিডেন্ট—'

'সে কি ! কি হয়েছে ? কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ?'

না না, আমার কিছু হয়নি। আসার পথে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করল। একবার বলছে যাবে একবার বলছে যাবে না, অন্য গাড়িতে যান। এই করতে করতে দেরি হয়ে গেল। অবশ্য আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিও একটু দেরি করে।'

'আচ্ছা, আমি কি বোকা ? আমি তো জানি তুমি দেরি করে আসবে। তবু ঠিক সময়ে আসি কেন ? একটু পরে এলেই তো পারি !'

'বোকা নও, পাংচুয়্যাল। অবশ্য আমিও অফিসে ভীষণ পাংচুয়্যাল। কোনদিন লেট করি না।'

'তা তো হবেই। সাস্‌পেন্ড হবার ভয় আছে যে! তোমাদের ডিফেন্সের ভাষায় কি যেন বলে—মিলিটারি টার্ম্‌স্‌ গো—হ্যাঁ, কোর্ট মার্শাল। এবার লেট করলে আমি তোমায় কোর্ট মার্শাল করব।'

'বাবা! তুমি অনেক কিছু জান দেখছি।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন?'

'যেদিকে দু চোখ যায়—হাসছ? তুমি একাই কাব্য করতে পার, আমি পারি না?'

'কে বলেছে পার না! তুমি তো নিজেই একটা কাব্য।'

'ঠাট্টা করছ?'

'তৌবা তৌবা! আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করি সে ধৃষ্টতা এ অধমের নেই।'

'কথার মাস্টার।'

'ওটা তো সাধু ভাষা। চলিত ভাষায় বল—বাচাল। জানি তো। সবাই বলে। তুমিও বলতে পার।'

খেলার মাঠ টপকে পরিচিত পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। আমাদের দিশি তেন্ডুলকর জাদেযার। ব্যাট বল নিয়ে মাঠ কাঁপাচ্ছে। আমি ধরতে পারি এমন একটা ক্যাচ্‌ মিস্‌ করল এক ফিল্ডার। তাই দেখে আহীরের সে কি আফসোস।

যাগ্‌গে, আমি ক্রিকেটের ধারাভাষ্য দিতে বসিনি। আহীরকে জিগ্যেস করছি, 'তুমি তো আগে কলকাতায় থাকতে, কোথায় থাকতে গো?'

ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সোনাগাছি।'

'ইস্‌! সব সময় ইয়ার্কি। আমি সত্যি সত্যি জানতে চাইছিলাম।'

'আমিও তো সত্যি সত্যি উত্তর দিলাম। কেন, ওখানে থাকতে পারি না?'

'জানি না যাও। আর জিগ্যেস করব না। কি হল, দাঁড়ালে কেন?'

'দাঁড়াও না একটু খেলা দেখি।'

'কি খেলার ছিরি, এ আবার কেউ দাঁড়িয়ে দেখে না কি!'

'তাহলে বসে দেখ।'

'না। দেখতে হবে না চল। আমি রোদে দাঁড়াতে পারছি না; কষ্ট হচ্ছে।'

'এই রোদেও কষ্ট হচ্ছে! তাও শীতকাল। বাড়িতে কোন কাজ করবে না—'

'এই—কাজ করি না তোমায় কে বলল!'

'কি কর?'

'সব করি। কাপড় কাচি, ভাতের চাল ধুই—হাসছ কেন?'

'এগুলো আবার কাজ হল?'

'কেন নয়! কলসী করে জল আনি।'

'তুমি কলসী নিতে পার! ও তো গ্রামের মেয়েরা নেয়।'

'আমিও পারি।'

'গাঁয়ের বধূর মত?'

'হ্যাঁ।'

ইডেনে ঢুকে আমরা বসার জায়গা খুঁজছি।

'কোথায় বসবে গো ?'

'এই সান বাঁধান চাতালটাতে বসি এস। অনেক দিন পুকুর পাড়ে বসিনি।'

'বোস না, ঐ ছেলেগুলো এক্ষুনি স্নান করতে আসবে। বসে বসে দেখ।'

'তোমাকে বলেছে স্নান করতে আসবে।'

'দেখ না এদিকেই আসছে।'

'চল তাহলে ঐ খানে যাই।'

'এই স্টাইলের বাড়ি কোথায় দেখতে পাওয়া যায় বলত ?'

'চীনে। এগুলোকে প্যাগোডা বলে। বৌদ্ধ উপাসনা গৃহ।'

'কি করে জানলে, তুমি চীনে গেছ ?'

'এটা জানার জন্য চীনে যেতে হয় না। বইতে দেখেছি, টিভিতে দেখেছি।

আমরা ঐ প্যাগোডার চাতালটাতে বসলাম। আহীর আমার কলেজের গল্প শুনতে চাইছে। কোয়েড কলেজের আড্ডাটা ও মিস্ করেছে। তাই সে সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা জানতে চাইছে।

সে সময় জোক্স আর সমাসের ফোয়ারায় মাতোয়ারা থাকত এক একটা আড্ডা। কলেজের মাঠে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা যে কোথা দিয়ে চলে যেত বুঝতে পারতাম না। প্রায় দিনই থিওরি ক্লাস মিস্। চোখ কান বুজে প্র্যাকটিক্যালটা সেরেই মাঠে চলে আসতাম। কলেজ স্টুডেন্টদের আড্ডায় নির্দিষ্ট কোন অ্যাজেন্ডা থাকে না। তাই সবরকম আলোচনাই চলত। কি দিয়ে শুরু হয়ে কিসে যে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। সোজা কথা, শুরু আর শেষের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকত না। ক্রিকেট থেকে শুরু করে রাজনীতি। হলিউডের তাজা খবর থেকে শুরু করে পাড়ার ছেলেটা নতুন বৌদির বোনকে কি স্টাইলে প্রেম নিবেদন করেছে, অথবা ইভ্‌টিজারদের লেটেস্ট ডায়লগ, প্রত্যুত্তরে মেয়েদের পাল্টা জবাব কি হতে পারে ; সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। আর একবার জোক্স শুরু করলে তো রক্ষে নেই, ভেজ্ ননভেজ সব রকম চলে নির্দ্বিধায়। মাঝে মাঝে চাঁদা তুলে মামুর ক্যান্টিনে ঘুঘনি পাঁউরুটি, ডিমের চপ্ তো রয়েইছে। অবশ্য মাঝের মধ্যে ভদ্রসভাও বসত। কলেজের ছোট বড় সমস্যা নিয়ে আলোচনা, ইউনিয়ানের মিটিং, কাউকে সাহায্য করা। আবার আন্তক্‌সারিও চলত কোন কোন দিন। আমাদের এক বন্ধু ভালো মাউথ অর্গান বাজাত। কতদিন ওর অর্গান শুনে সময় কেটেছে। মাঝে মাঝে উর্দু শেরের মুশায়রা বসত। আমাদের অনেক মুসলিম বন্ধু দিল। কত শের লিখেছিলাম তখন। এখনো মনে আছে কিছু কিছু—

'দো ধুন মিলকে এ হো গেয়ি
মন্দিরকা ঘন্টা অর মস্‌জিদকা আজান,
আজ হিন্দুকে দিলমে আল্লা হ্যায়
কিত্‌নে মুসলিম ম্যাহেমান।'

সবাই ভীষণ তারিফ করেছিল আমার এ শেরের। বলেছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী। তখন উর্দু শিখতাম ওদের কাছে। একদিন ক্যান্টিনে চাউ খেতে

খেতে এক বন্ধু বলছে, 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, একই প্লেটে চাউ খাই।' জানি, সেদিন আর কখনো ফিরে আসবে না। ফিরে আসে না, যা যায় তা যায়ই। পিছনে ছেড়ে যায় শুধু স্মৃতির পদচিহ্ন। আমি বিশ্বাস করি এই স্টুডেন্ট লাইফটাই একটা মানুষের জীবনের স্বর্ণযুগ।

'আমাকে দুটো জোক্‌স বল না। তোমার কাছ থেকে শিখে গিয়ে আমার বন্ধুদের বলব। ভেজ্‌ চলবে না, নন্‌ভেজ বলতে হবে।'

'ধ্যাৎ! সে আমি বলতে পারব না।'

'কেন পারবে না! বন্ধুদের কাছে বলতে কি করে?'

'সে তো ওরাও বলত।'

'তাহলে আমিও বলি।'

'এই না! বোলো না।'

'কেন, বলি না একটা? আমিও জানি গো।'

'না, বলবে না। আমি শুনতে পারব না।'

'হ্যাঁ পারবে। আরে—হাসছে দেখো, আমি বলছি কিন্তু। বলি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলি একটা।'

'প্লীজ, প্লীজ বোল না। ওগুলো খুব বাজে হয় আমি জানি।'

'হোক না বাজে, শোন একটা।'

'ইস্‌! চল অন্য কোথাও বসি।'

'কেন! এখানে কি হল?'

'দেখছ না, পাশে বসে বসে কেমন সিগারেট ফুঁকছে! সব ধোঁয়াগুলো আমার মুখে আসছে।'

'ভাল লাগছে না?'

'এটা ভালোলাগার জিনিস?'

'নিশ্চই, তা না হলে ঐ ভদ্রলোক খাচ্ছেন কেন!'

'ওঁর ভালোলাগতে পারে, আমার লাগছে না।'

'আচ্ছা ধর, তোমার বর যদি সিগারেট খায়? ভীষণ নেশা, চেনস্‌ স্মোকার। তখন কি করবে তুমি?'

'অবান্তর প্রশ্ন।'

'কেন, অবান্তর কেন?'

'জানি না।'

'ও থাকতে থাকতে সহ্য হয়ে যাবে কি বল? সিগারেট খায় বলে তো আর ছেড়ে চলে আসতে পারবে না! এই দেখ না, যে লোকগুলো মদ খায় তাদের বৌদের কি শাস্তি। এক গলা মদ খেয়ে রাত্রি বেলা টোলতে টোলতে বাড়ি ঢুকল। মুখ দিয়ে ভক্‌ ভক্‌ করে গন্ধ বের হচ্ছে। ইস্‌! আমাদেরই ঘেন্না করে তো তোমাদের কি দোষ দেব। ভেবে দেখ ঐ মুখেই বউকে কিস্‌ করতে হচ্ছে। হাসছ? সারারাত একই বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতে হচ্ছে।'

'কেন! মদ খাবার পয়সা আছে আর একটা বালিশ কেনার পয়সা নেই ?'

আহীর খুব হাসছে, 'থাকবে না কেন, থাকলেও এক বালিশে শুতে হয়। মাঝে মাঝে তো বালিসই লাগে না।'

মা গো—কি বাজে বাজে কথা বলছে। আমার কিছু বলার নেই। মাথা নিচু করে শুধু হাসছি। আহীরও হাসছে। এক সময় হাসি থামিযে বলছে, 'সমি, কি ভাবছ তুমি আমাকে ? দেখ, দেখ আমার দিকে।'

তাকালাম। ওর দু চোখে চাপা হাসি। 'অসভ্য বলবে না ?'

'অসভ্যই তো।'

'সত্যিই আমি খুব বাজে ছেলে। জান তো, আমাদের পাড়ার এক বৌদির সঙ্গে আমার অবৈধ্য সম্পর্ক আছে।'

'ভয় দেখাচ্ছ ?'

'ভয় দেখাব কেন। তাছাড়া আমার অবৈধ্য সম্পর্ক থাকলে তুমিই বা ভয় পাবে কেন ?'

'কারণটা তুমি ভালো করেই জান। দেখ, ও পাঠশালা থেকে অনেক দিন আগেই আমি পাশ করে বেরিয়েছি। ওসব পুরানো স্ক্রীপ্ট আজকাল আর চলে না। নতুন কিছু জানলে বলতে পার।'

'আরে! সত্যি বলছি।'

'আই অ্যাম সরি। মানতে পারলাম না। আচ্ছা, তোমার সম্বন্ধে এই কথাগুলো বলবে বলেই কি আমাকে ডেকেছ ?'

আহীর হাসছে। বোকা বোকা হাসি। ধরা পড়ে যাওয়ার হাসি। স্কুল কলেজে পড়ার সময় এসব ডায়লগ অনেক মেরেছি। কেউ প্রেম নিবেদন করলেই বলতাম, আই অ্যাম এনগেইজ বা বন্ধুদের দিয়ে বলতাম আমি খুব বাজে মেয়ে। আনফিট, অসুস্থ যাই হোক একটা বাহানা লাগিয়ে দিতাম। খুব সহজেই রেহাই পাওয়া যেত এ ধরনের প্রেমের কবল থেকে। শুধু আমি কেন, অনেকেই এ পলিসিতে চলত।

'বোটিং করবে ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুটোই তো এনগেইজ।'

আমাদের সামনের জলাটায় দুটো প্যাডেল বোট নিয়ে দু দল ঘোরাফেরা করছে। একটা ইয়ং কাপল আছে। নিঃসন্দেহে ওরা প্রেমিক প্রেমিকা। ভাবছি, ওদের দেখেই কি আহীরের বোটিং করার শখ হল!

'সাগরের বুক থেকে ঘুরে এসে এই পুকুরে বোটিং করতে ভাললাগে! তুমি কখনো জাহাজে করে কোথাও যাওনি ?'

'না। আচ্ছা ধর, জাহাজটা যখন মাঝসাগরে; চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু মাথার উপর অনন্ত খোলা আকাশ। তখন কেমন লাগে? মনে মনে ভয় ভয় করে না ?'

'ভয় করবে কেন! খুব ভালোলাগে।'

'ধর, তখন যদি তুফান ওঠে! সাইক্লোনে পড়ে!' শরৎবাবুর বর্মা যাবার পথে

পথে সাইক্লোনের বিবরণটা চোখের সামনে ভাসছে। মনের মাঝে সে ঢেউ-এর দোল অনুভব করা যায়। কি নিখুঁত বিবরণ।

'ওরা এক সপ্তাহের ক্লাইমেট চেক করে তবেই রওনা হয়। সাইক্লোনে পড়বে কেন!'

'ধর অ্যাক্সিডেন্টালি। প্রকৃতিকে নিয়ে তো আর গ্যারান্টি দেওয়া যায় না! বেগড়াতে কতক্ষণ! কি হবে তখন জাহাজ ডুবে যাবে?'

'তা যাবে বৈকি। তবে সাধারণত এ রকম হয় না।'

'বাপ্‌রে! আমার তো ভাবতেই ভয় লাগছে।'

'আচ্ছা বেশ, মনে কর তুমি এমনি একটা সিচুয়েশানে পড়েছ। তুমি যে জাহাজটাতে রয়েছ সেটা মাঝসাগরে তুফানে আটকা পড়েছে। বাঁচার কোন চান্স নেই, জাহাজ ডুববেই। সেই সময় তোমার এক পুরুষ সঙ্গী তোমাকে প্রপোজ করে বসল, দেখুন আমাদের তো মৃত্যু নিশ্চিত। হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই এ জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আর আমরা দুজনেই আনম্যারেড। জীবনের অনেক স্বাদ থেকেই আমরা বঞ্চিত রয়ে গেছি। আসুন না, শেষ মুহূর্তে আমরা পরস্পরকে সেই সুখ দিয়ে ধন্য করি।'

আমার চোখ কপালে উঠে গেছে, 'কি সাংঘাতিক! এই সব উদ্ভট চিন্তাও তোমার মথোয় আসে?'

'বলনা, তুমি তখন কি করবে?'

'আমি মার কাছে যাব।'

'যাঃ, বাচ্চা মেয়ের মত মার কাছে যাব। তোমার মা ওখানে নেই।'

'তাহলে বাপির কাছে যাব।'

'বাপিও নেই।'

'আহা, পিঁয়াজি না কি! বাপি নেই মা নেই, আমি জাহজে করে একা একা কোথায় যাচ্ছি?'

'আচ্ছা বেশ, বাপি মা আছেন অন্য কেবিনে। তুমি ঐ ছেলেটার সাথে অন্য কেবিনে আছ।'

'কেন আমি শুধু শুধু একটা অপরিচিত ছেলের সঙ্গে অন্য কেবিনে ঢুকতে যাব?'

'অপরিচিত তো নয়। ঐ জাহাজেই তোমাদের আলাপ হয়েছে। গত ক'দিনে দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। জানতো, ঐ সব জাহাজে ছোট খাটো রেস্টুরেন্ট থাকে, বার থাকে। তোমরা সেখানে গেছ গল্প করেছ। তাই ছেলেটার কেবিনে তুমি ঢুকতেই পার গল্প করতে। বল, ছেলেটার প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করবে?'

'ঐ চরম মুহূর্তে এসব ভাবা যায় না আহীর।'

'চরম মুহূর্ত হবে কেন! এ কি নৌকা না কি! ঝড় উঠল আর আধ ঘন্টা কুড়ি মিনিটের মধ্যে উল্টে-পাল্টে সব শেষ। একটা অতবড় সিপ্‌ ডুবতে কমসে কম পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা টাইম লাগবে, তার বেশী বই কম না। তোমার হাতে এখন অনেক সময়; কি করবে বল?'

'আমি বাঁচতে চাইব।'

'বাঁচার কোন রাস্তা নেই, তুমি মরতে বাধ্য। বল, রাজি হবে না?'

'তুমি কি আমাকে জোর করে রাজি করাবে না কি ?'

'না না জোর করছি না ; সেচ্ছায় বল ।'

'জানি না। ও রকম পরিস্থিতিতে তো কখনো পড়িনি। আগে পড়ি তারপর বলব ।'

'তা কেন ! উত্তর দেওয়ার জন্য পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ! তুমি জান, চাকরির ইণ্টারভিউ নেওয়ার সময় এ ধরনের প্রশ্ন করা হয় !'

'মোটেই না। কোন চাকরির ইন্টারভিউ-এ এরকম অসভ্য প্রশ্ন করে না ।'

আহীর খুব হাসছে আমার কথা শুনে। 'আরে, অসভ্য প্রশ্ন করতে যাবে কেন ! কোন একটা ঘটনা বা সিচুয়েশানের কথা বলে দিয়ে জিগ্যেস করে, তখন তুমি কি করবে ! এসব প্রশ্ন রাখে উপস্থিত বুদ্ধি দেখার জন্য ।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উত্তর দিতে হয়। অনেক দিন আগে, কার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম ; একটা মেয়েকে ছেলের বাবা দেখতে এসে প্রশ্ন করছে, আচ্ছা মা, ধর কোন একদিন এমন অবস্থা দাঁড়াল—তোমার স্বামী অফিস যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছে, এদিকে তোমার বাচ্চা খিদেতে চিৎকার করে কাঁদছে। অন্যদিকে রান্নার উনুনে এক কড়া তেল ফুটছে, আবার তোমার শশুর মশাই মানে আমার ওষুধ খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তখন তুমি কি করবে ? মেয়েটি কি বলেছিল জান !'

'কি বলেছিল ?'

'বলেছিল, কড়ার ফুটন্ত তেলটা আপনার মাথায় ঢেলে দেব ।'

'বাহ্ ! মেয়েটার বুদ্ধি আছে তো। ঐ মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো উত্তর আর হয় না। মেয়েটা কে গো, তুমি নিজে নও তো ?'

'য্যাঃ !'

'তোমার ইণ্টারভিউ এর কথা বল না। তোমাকে দেখতে এসে কি প্রশ্ন করে ?'

'সবাইকে যা করে আমাকেও তাই। তুমি তো নিজে মেয়ে দেখতে যাও, জান না ?'

'তবু বল শুনি ।'

'বলব না ।'

'বেশ, বলতে হবে না। জাহাজে কি করবে বল, রাজি হবে ?'

'নেভার ।'

'কেন ?'

'আমার মোরজি ।'

উত্তর শুনে মনটা খারাপ করে বলছে, 'দূর ! রাজি হলে পারতে। কি ক্ষতি হত তোমার ? একটু পরেই তো মরে যাবে ।'

'কি আশ্চর্য ! আমি রাজি হচ্ছি না বলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন ?'

এবার হেসে ফেলল। 'আমি হলে কিন্তু একবাক্যে রাজি হয়ে যেতাম ।'

'তা তো হবেই। এমন সুবর্ণ সুযোগ বার বার আসে না কি !'

'আসে নাই তো। কোন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ ইচ্ছে পূরণ করা কত বড় পুণ্যের কাজ জান !'

'আহা ! ইচ্ছেটা শুধু মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার, তোমার মোটে ইচ্ছে নেই। তুমি তো বাচ্চা ছেলে।...'

খুব হাসছি আমরা। প্রাণ খুলে। ভাবছি, প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিনকার কথা। সেদিন আর আজকের গল্পের মধ্যে কত তফাৎ। কত ফ্র্যাঙ্ক হয়ে গেছি। অথচ মাত্র সাত দিন মিট্ করেছি আমরা। আহীর প্রবাল দ্বীপের গল্প বলছে। সমুদ্রের গল্প বলছে। জাহাজ যখন কিনারে পৌঁছয় না, তখন একটা বড় কাঠের পাটাতনের উপর লাফিয়ে নেমে ওখান থেকে ছোট ছোট বোটে করে কিনারে যেতে হয়। কাঠের তক্তাটা এমনি জলের উপর ভাসে। প্রথম প্রথম নামতে ভয় লাগে। মনে হয় এই বুঝি উল্টে গেল। আহীরের গল্প শুনে আমার পায়ের তলা সির্‌সির্ করছে। প্রবালদ্বীপে অনেক সুন্দর সুন্দর নানা আকারের রঙিন মাছ দেখা যায়। বোটে যেতে যেতে দেখা যায় স্বচ্ছ জলের তলায় তারা খেলে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের জলজ শ্যাওলা রয়েছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নীল লাল মাছগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে ছুটে বেড়াচ্ছে। একে অপরকে তাড়া করছে। হয়ত শ্যাওলার আড়ালে লুকোচুরি খেলছে ওরা। ইস্ ! ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে। কল্পনার চোখেই যদি ব্যাপারটা এত উপভোগ্য হয় তাহলে বাস্তবটা না জানি কত সুন্দর। লোভ-সম্বরন করতে না পেরে বলেই ফেললাম—

'আমি যদি ওখানে যেতে পারতাম, কত সুন্দর সুন্দর গল্প লিখলাম দেখতে। নতুন পরিবেশে গল্পের অনেক অচেনা উপকরণ ছড়িয়ে থাকে। একটা একটা করে সব কুড়িয়ে আনতাম।'

'হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার গল্পের কি খবর ! লিখছ তো ?'

'হ্যাঁ—একমাত্র এই লেখাই তো আছে যার উপর অভিমান করে থাকা যায় না। আমি লেখা ছাড়লেও লেখা আমাকে ছাড়ে না। কতবার মনে হয়েছে, আর বুঝি লিখতে পারব না। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, নতুন করে যে কলম ধরব সে ইচ্ছে বা ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার খাতা পেন নিয়ে বসি। সাদা পাতার সাথে নিভৃতে দুটো কথা বলে নিজেকে হালকা করি।'

'বই ছাপাচ্ছ না কেন ?'

'কে আমাকে সাহায্য করবে বল ?'

'এটা ঠিক, প্রথমটা একটু সাহায্য না পেলে দাঁড়ান যায় না। প্রতিভাবান মানুষেরা তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটান ঠিকই কিন্তু সমাজের অন্যস্তরের মানুষেরা যদি সাহায্য না করেন তো সে প্রতিভা প্রকাশ পাবে কি করে ! অথচ দেখো কেউ যখন বড় হয়ে যায়, প্রতিষ্ঠা পায়, তাকে নিয়ে কত মাতামাতি। কিন্তু শুরুতেই যে সাহায্যের প্রয়োজন সেটাই পাওয়া বড় দুষ্কর। তোমার একজন গড্‌ফাদার দরকার।'

'হাসালে ! কে হবে আমার গড্‌ফাদার ?'

'হবে কেউ একজন। যে তোমাকে বুঝবে।'

'আমাকে কেউ বোঝে না। বুঝতে চায় না।'

'কেন বুঝবে না, তুমি কি দুর্বোধ্য না কি ! আর তোমার লেখার জন্যই তোমার

কলকাতায় সেট্‌ল হওয়া দরকার। ব্যাপারগুলো এখান থেকে যতটা সুবিধা, অন্য কোথাও ততটা হবে না। তাই কলকাতার কোন ছেলেকে তোমার বিয়ে করা উচিত।'

আয়! শুরুটা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম কথাটা তালতলা বেলতলা ঘুরে সেই কলকাতায় এসে থিতোবে। শালা ইলাস্টিক! যতই টান, ছেড়ে দিলে কুঁচকে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে।

'কি হল ওভাবে তাকাচ্ছ কেন?'

'আবার ফালতু বকতে শুরু করেছ?'

'না না ফালতু নয়। একবার ভেবে দেখ কথাটা—'

'তুমি কি বলতে চাইছ, যত রাইটার সব কলকাতাতেই জন্মেছে! কলকাতার বাইরে থেকে রাইটার হওয়া যায় না?'

'যাবে না কেন! কলকাতায় সুযোগটা বেশী। রেগে যাচ্ছ কেন! তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

'ধন্যবাদ! এতটা ভালো নাই বা করলে!'

'ও. কে, ও. কে বাবা, আর বলব না। অন্যায় হয়ে গেছে। কলকাতার ছেলেদের উপর তুমি এত হাড়ে চটা কেন বলত? ওদের বিয়ে করতে বললেই রেগে যাও।'

সত্যি আমার খুব রাগ হচ্ছে। একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে।

'চা দেব দাদা?'

আগেও দুবার এসে ফিরে গেছে। মনে হল খুব মুখ করে দি। নিজেকে সামলে নিলাম। এক জনের রাগ অন্যের উপর ফলিয়ে লাভ আছে কি! তাতে নিজেকেই বোকা মনে হয়।

আহীর আমাকে জিগ্যেস করছে, 'চা খাবে?'

'না।'

'খাও না, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। না কি আর একটা আইসক্রীম খাবে? ইওর ফেভরিট কাঠি আইসক্রীম।'

ছেলেটা বলছে, 'কফিও আছে দেব?'

'ইয়েস! তুমি তো কফি খাও, খাবে?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, 'না।'

'ম্যাডাম রেগে গেছেন ভাই। চা কফিতে কাজ হবে না, তুমি যাও।'

ছেলেটা চলে গেল। গাছ পাতার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অনুপ্রবেশ ঘটছে ইডেনে। সামনের বড় পুকুরটায় স্থির হয়ে থাকা জলটা দেখছি একদৃষ্টে: কয়েক মুহূর্তের জন্য আহীরও চুপ। আমি হাতের উপর মুখ রেখে বসে আছি আনমনে। হঠাৎই ওর তর্জনী আমার অধর স্পর্শ করল। 'এই, কি ভাবছ?'

আমি চোখ বন্ধ করে নিয়েছি। এ তো অতর্কিতে আক্রমন। এ উপহার বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আহীরের মুখটা আমার কানের কাছে। ওর নিঃশ্বাসের উষ্ণতা স্পর্শ করে যাচ্ছে আমার গাল। ধীর গলায় বলছে, 'কি এত ভাবছ? সত্যি করে বল এই মুহূর্তে ঠিক কি ভাবছ। আমি জানি তুমি আমাকে মিথ্যে বলবে না। বল কি ভাবছ।'

জানি না। আমি কি সত্যিই কিছু ভাবছি না কি! আমি তো অনুভব করছি। আহীরের স্পর্শ ধূপের ধোঁয়ার মত আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি স্পর্শের সুবাস পাচ্ছি—

আজি অধর পথ বাহি
  যে প্রেম গেল বহি
    হিযা মাঝে অনুভবি বিদ্যুৎকশা।
রাঙা শরমের ওড়না ঢাকি
  কোমা বাহুমাঝে লুকাযে থাকি
    নিরবে শুনি নব পরশের ভাষা॥

আহীর এখনো জানতে চাইছে আমি কি ভাবছি। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। শক্ত করে হাতটা ধরে আছি। কি আশ্চর্য! আমার মুঠোয় আহীরের হাত। কখন ধরেছি কে জানে! মুঠোর বাঁধন আলগা করতেই ও আমার হাতটা ধরল।

'কি ভাবছ বলবে না?'

'তুমি কি সত্যিই আমার চিঠি পাওনি?'

'সত্যি পাইনি, বিশ্বাস কর। আর পেলে তোমার কাছে গোপন করব কেন!'

'জানি না. আমার মনে হচ্ছে তুমি পেয়েছ।'

'এ রকম মনে হওয়ার কারন?'

'আমি চিঠিতে তোমাকে খুব শিগ্‌গিরি আসতে লিখেছিলাম আর এও লিখেছিলাম. তুমি যদি না আস আমি বিশ্বাস করে নেব তুমি আমার চিঠি পাওনি। আর পেলে অবশ্যই আসবে।'

'ও— আমি এসেছি তাই তোমার মনে হচ্ছে আমি চিঠি পেয়ে এসেছি। আর কি লিখেছিলে চিঠিতে?'

'মনে নেই।'

'ঠিক আছে. গিয়ে নিশ্চই পেয়ে যাব। আসলে থাকি এমন একটা জায়গায়. কি বলব—একটু আগে বলছিলে না. তুমি কি পৃথিবীর বাইরে থাক? সত্যিই তাই। ফোন করলে স্পষ্ট শোনা যায় না। ইকো হয়। হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যালো— হাসছ? সত্যি গো। আর, চিঠির কথা বোল না। পুজোর সময় এখানে আমার কথা ছিল. আসতে পারব না জানিয়ে চিঠি দিয়েছি সে চিঠি এখনো আসেনি. আমি চলে এসেছি।'

'বাড়িতে চিন্তা করছিল?'

'করবে না! সবাই ভাবছে কি হল। কি আর হবে, মরে গেলে সরকারি চিঠি আসবে, আর সেটা আসতে বাধ্য।'

'কি কথার ছিরি!'

'চল, এবার ওঠা যাক। সন্ধে হয়ে গেছে, তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে তো।'

'চল।'

আমরা উঠে হাঁটতে শুরু করেছি। একটু একটু করে আলোকে গ্রাস করতে করতে অন্ধকার তার প্রভাব বিস্তার করছে। সন্ধ্যে নেমেছে কলকাতার বুকে। আহীর বলছে, 'হ্যাঁ গো, কিছুই তো বলা হল না।'

'কি বলা হল না ?'

'আমার কথা, যে জন্য তোমায় ডেকেছিলাম।'

'তখন তো বললে, এখনো বাকি আছে ?'

'আমি কিন্তু সিরিয়াস।'

'জানি তো, আমি কি বলছি তুমি ইয়ার্কি করছ !'

'সমি, আমি তোমাকে বুঝতে পারি। তোমার ইমোশানকে ফিল করতে পারি। কিন্তু নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমার মন সায় দিচ্ছে না।...'

নিজের নিরুপায়তা প্রকাশ করতে আরো অনেক কিছু বলছে।

আমি মাথা নিচু করে পথ হাঁটছি ওর পাশে পাশে। হঠাৎ কথা থামিয়ে বলছে।

'কি ব্যাপার, তুমি আমার দিকে দেখছ না কেন ?'

'পারছি না দেখতে।'

'কেন ?'

'জানি না, তাকাতে পারছি না তোমার দিকে।'

'আগের দিনের মতই আহীর আমাকে কাছে টেনে নিল। ডান হাতে মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে বলছে, 'তাকাও আমার দিকে। আমি জানি, তোমার বিয়ের জন্য বাড়ির লোক অধীর। তুমি যে একমাত্র সন্তান। সেটাই তো স্বাভাবিক। আমার চাইতে অনেক ভালো ছেলের সাথে তোমার বিয়ে হবে দেখো। তুমি সুখী হবে সমি। তুমি খুব ভালো মেয়ে।...'

আমার হাসি পাচ্ছে। আহীর কেমন বয়স্ক লোকেদের মত কথা বলছে। যেন আমাকে আশীর্বাদ করছে। আমি ওকে পাত্তা দিচ্ছি না। আমার গা থেকে সরিয়ে দিয়েছি ওর হাত। রাস্তা ক্রস্ করার সময় আহীর আবার আমার হাত ধরল।

'আমি কি বাচ্চা মেয়ে ! একা রোড ক্রস্ করতে পারি না ?'

'পারবে না কেন ! তবু তোমাকে সাহায্য করছি।'

'তোমার সাহায্যের দরকার নেই।'

কথাটা বলেই ওর মুখের দিকে তাকালাম। মুখে হাসি নেই। আমি কি বুড়োলি কিছু বলে ফেললাম ! এটা বলা বুঝি ঠিক হল না। কেন বললাম ! এমন স্টুপিডের মত ব্যবহার করি মাঝে মাঝে !

পরক্ষণেই আহীর হেসে বলছে, 'এটা সাহায্য নয়। তোমাকে ছোঁয়ার বাহানা।'

'খুব সাহস যে দেখছি। এটা পাবলিক প্লেস মশাই এখানে মেয়েদের হাত ধরে হাঁটাটা মোটেই শোভনীয় নয়।'

'আচ্ছা আর ধরব না। তুমি কিন্তু আমার কথার গুরুত্ব দিচ্ছ না। রিঅ্যালি সমি. আমি এখন নিজের বিয়ের কথা ভাবছি না। আগামী চার বছর তো নয়ই। তোমার বাড়িতে তাড়া আছে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেল—'

'প্লীজ আহীর, এভাবে বোল না।'

'কি ভাবে বলব বল! আমি তোমার মত গুছিয়ে বলতে পারি না। দেখো, কেউ কারুর জীবনে অপরিহার্য হয় না। পুরনো কথা ভেবে এসব তুমি ভুলে যাও। তাছাড়া সবচেয়ে বড় বাধা আমার দাদার পাত্রী হিসাবে তোমার ছবি বাড়িতে গেছিল, তারপর আমি যদি—সত্যি, আমিও নিজেকে বোঝাতে পারছি না।'

আমিও পারছি না আর সহ্য করতে। ভীষণ ছোট লাগছে নিজেকে। আহীরের এ কথাগুলো উপেক্ষা করার মত শক্তি পাচ্ছি না। আমি যেন সমুদ্রের তটে দাঁড়িয়ে আছি; আহীরের এক একটা কথা দুরন্ত ঢেউ হয়ে এসে আমার পায়ের তলা থেকে বালি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এক্ষুনি পড়ে যাব। শক্ত করে ধরেছি আহীরের হাতটা। হাত ধরতেই ও সচেতন হয়ে উঠল, 'সমি, কি হয়েছে সমি? শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।'

'কষ্ট হচ্ছে? ইস্, আমি কি আহাম্মক দেখো। কথা বলতেও জানি না। আই অ্যাম সরি সমি, রিয়্যালি সরি। বিশ্বাস কর তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। এভাবে কথাগুলো বলা আমার উচিত হয়নি। ও সিট্! আমি একটা আহাম্মক।'

এতক্ষণ শুধু কষ্ট হচ্ছিল। আহীরের সান্ত্বনা চোখে জল এনে দিল। আমার ভয় করছে। রাতের পর রাত যে দুঃস্বপ্ন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে সে দুঃস্বপ্নকে আজ বাস্তব করতে চাইছে আহীর। আমি ভাবতেই পারছি না। ও কি আমার সাথে ঠাট্টা করছে!

'আহীর, তুমি কি বলতে চাইছ আমি অন্য কারুর ঘরে যাব?' 'বল না। এটা সত্যি? না না, এ হয় না। অসম্ভব।'

'তোমার বাস ছাড়ছে সমি।'

'আমি আর একটু থাকি? পরেরটাতে যাব। প্লীজ—'

'সরি সমি, তোমার সারাটা দিন মাটি করে দিলাম। এতক্ষণ কত হাসছিলে তুমি। তোমার মনটা খারাপ করে দিলাম।'

'তোমাকে ছাড়া আমায় বাঁচতে বলছ? একা? আমি পারব?'

'সমি প্লীজ।'

'পারব না আহীর। আমি পারব না। সত্যি বলছি বিশ্বাস কর।'

'সে কি, তুমিই না বল, কথাগুলো কি বোকা বোকা শোনায়! এ কথা তোমার মুখে মানায় না। তুমি তো আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নও। তুমি যে সকলের চাইতে আলাদা সমি—'

'আলাদা ছিলাম, আজ আর নই। তুমিই আমাকে বদলে দিয়েছ। আমাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দাও আহীর। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'সমি প্লীজ কেঁদোনা। বল আমাকে কি করতে হবে। আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে রাজি আছি। বল।'

'আর কিচ্ছু করার নেই। আমি আর কখনো আগের জায়গায় ফিরতে পারব না। ফিরতে চাইও না, হোক কষ্ট। তুমি ভেবো না।'

'এস বাসে গিয়ে বসি। তোমাকে পেঁছে দিয়ে আসব।'

'কতটুকু দিয়ে আসবে! বাকিটা পথ তো আমাকে একাই যেতে হবে।'

'তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসব। এস।'

'তার দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

এ বাসটাও ছেড়ে দিচ্ছে। আহীর আমার হাতটা ধরে বলছে, 'এস।'

আমি ওর হাত ছাড়িয়ে দিয়ে এক পা এক পা করে পেছিয়ে যাচ্ছি, 'না, আমি যাব না। আর একটু থাকতে দাও তোমার কাছে। প্লীজ, আর একটু থানি।'

'আমার নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। আমি কখনো কাউকে এত কষ্ট দিইনি। কেন তুমি আমাকে ভালোবাসলে সমি?'

বাঁ হাতের তালুতে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে আহীর। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হচ্ছে। এমন বাজে ব্যবহার করলাম, ওর মনটাও খুব খারাপ হয়ে গেছে! বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। আমি আহীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, 'আহীর।'

চোখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

'আমরা আর কখনো দেখা করব না?'

'কেন করব না! আরে, কি পাগলের মত বকছ! আমাদের সম্পর্ক কি শেষ হয়ে গেছে না কি! নিশ্চই দেখা করব। তোমার সঙ্গে শেষ দেখা করে যাব, মানে আন্দামানে ফেরার আগে আমরা আবার দেখা করব। আর হ্যাঁ, আমি নয় তারিখ যাচ্ছি না; আমার ছুটি বেড়েছে। এবার একটু হাস। প্লীজ—একটু হাস, একটু থানি।'

আমার সত্যি হাসি পাচ্ছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আহীর আমাকে হাসতে বলছে। আমি তো মানুষ, না কি মেশিন!

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে, আমি কালই তোমায় ফোন করব।'

'কি বলব আমি?'

ও হাসছে, 'কথা বলবে আমার সাথে। যা জানতে চাইব বলবে।'

আমি কি খুব বোকার মত প্রশ্ন করে ফেললাম! আর একটা বাস এসে দাঁড়াল সামনে। আজ বাসগুলো এত তাড়াতাড়ি আসছে কেন কে জানে! এই সময় এটাও ছাড়ার উপক্রম করছে। আহীর আমার দিকে তাকাল। আমি ওকেই দেখছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, ও সত্যি সত্যি কথাগুলো বলছে, না আমাকে যাচাই করছে! আমি জানি ও এক্ষুনি বলবে, সমি তোমার বাস ছাড়ছে। ও বলার আগেই আমি বললাম, 'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না আহীর। পারছি না, কি করে যাব!'

'তুমি কিন্তু একটার পর একটা বাস ছেড়ে দিচ্ছ। বাড়ি ফিরতে কত দেরি হবে একবার ভেবে দেখেছ! রাত ক্রমশ তোমার বাপি চিন্তা করছেন সমি।'

আমি বাড়ির কথা ভাবতে পারছি না। এ বাসটাও ছেড়ে দিল।

'আচ্ছা আহীর, তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে বিচ্ছিন্ন হতে বলছ তোমার থেকে? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি কি আমার মনটা একটু ছুঁতে পারনি? কেন পারলে না আহীর? আমাকে তুমি একটুও ছুঁতে পারলে না—'

এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই ওর কাছে! দু চোখে কেবল বোবা দৃষ্টি। ডান হাতে

আমার গালটা আলতো স্পর্শ করে বলল, 'তুমি কি এভাবে কেঁদে আমাকে অপরাধী করবে! আমি তোমাকে কখনো ভুলতে পারব না। কখনো ভুলব না তোমাকে।'

ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে থেকে। ওর এ আদর এ সমবেদনা আমার ধৈর্যের সীমা পার করে দিচ্ছে। আমাকে লাগাম ছাড়া করার আগেই সরে এলাম ওর কাছ থেকে।

আহীর এসে আমার কাঁধে হাত রাখল। 'এস, এস আমার সাথে।' আমাকে সঙ্গে নিয়ে ও হাঁটছে। বাস টার্মিনাস ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমার মনে কোন সংশয় নেই। নির্দ্ধিধায় হেঁটে চলেছি। ওর সাথে সর্বত্র যেতে পারি। ওর হাতে খুন হতেও যেন আমি প্রস্তুত। সেটা এই যন্ত্রণাদায়ক জীবনের থেকে অনেক বেশী মঙ্গলের, অনেক বেশী শান্তির। সামনের ফুটপাথে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। 'কি খুঁজছ?'

'ট্যাক্সি। তোমাকে এই অবস্থায় একা ছাড়তে ভরসা হচ্ছে না। আর মুখের যা হাল করেছ বাসে যাবে কি করে! চল, আমরা দুজনে ট্যাক্সি করে যাই।'

আমি হাসছি। আমার গন্তব্যস্থল একটাই, আমার বাড়ি। এই বাস টার্মিনাসে আহীরকে ছেড়ে আমি একা সেখানে পেঁছিব। এখনো এতটা অক্ষম হয়ে পড়িনি যে কাউকে পেঁছে দিয়ে আসতে হবে। শাড়ীর আঁচলে দুহাতে নিজের মুখটা ঢাকলাম। আমার চোখের জল মোছার জন্য নিজের আঁচলটুকুই পর্যাপ্ত। ধন্যবাদ বন্ধু, আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছ এটাই যথেষ্ট। সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই। শোকের ভারে আমি এখনো এতটা মুহ্যমান হইনি যে নিজের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে এগোতে পারব না—'চল।'

'কোথায়?'

'বাস স্ট্যান্ডে।'

'এখানে চুপটি করে দাঁড়াও, আমি তোমাকে পেঁছে দেব।'

'তার দরকার হবে না, আমি একাই যাব।'

'জেদ কোর না সমি।'

আমি ওর হাতটা ধরলাম। 'এস। তোমার কোন ভয় নেই। আমি সোজা বাড়ি পেঁছিব। এস।'

ফিরে এলাম বাস স্ট্যান্ডে। কয়েক মিনিট পরই বাস এল। আমি বাসে উঠে ফাঁকা সিটে ব্যাগটা রাখলাম। আহীর নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে আমার মায়া হচ্ছে। এভাবে হ্যারাজ করার কোন মানেই হয় না। আই আম জাস্ট এ স্টুপিড! আমার এভাবে রিঅ্যাক্ট করা উচিত হয়নি। বেচারা! কত দেরি করিয়ে দিলাম। বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে কে জানে! সরি আহীর। ভাবছি নিচে গিয়ে দুটো কথা বলি; বাস ছাড়লে চলে আসব। নামব বলে গেটের দিকে এগোতেই দেখি ও উঠে আসছে। বলছে, 'বোস। আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'না।'

'প্লীজ—'

'আমি একা যাব।'

'আমিও যাই তোমার সাথে।'

'কোন দরকার নেই। তুমি নেমে যাও। বাস ছাড়ছে।'

আহীরের দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার মুখে। কি ভাবছে ও! আমি ঠিক মত বাড়ি পৌঁছতে পারব কি না! না অন্য কিছু! কেমন বোকা বোকা লাগছে ওর মুখটা, প্রথম দিন দেখে এরকম বোকা মনে হয়েছিল। ও কি ভাবতে পারে সেটা অনুমান করে আমার মজা লাগছে। ইঞ্জিন কেঁপে উঠল। 'যাও।'

'আমি যাই না?'

'না, তুমি নেমে যাও। যাও বলছি।'

গাড়ির চাকা গড়াচ্ছে। একরকম জোর করেই নামিয়ে দিলাম ওকে। যেতে যেতে বলছে, 'আমি তোমাকে ফোন করব; কালই করব। তুমি সাবধানে যাবে কিন্তু। মন খারাপ কোর না।'

আহীর ফোন করেনি। নিজের কথা রাখেনি ও। পরদিন ১লা জানুয়ারী। সকাল আটটায় কাকিমা এসে বললেন, 'সমি তোমার ফোন—'

আমি নিশ্চিত এ আহীর ছাড়া আর কেউ নয়। কালকের রাতটা কি আমারই মত ওর বিনিদ্র কেটেছে! এত সকালে ফোন করা ওর পক্ষে তো বেশ অসুবিধার। কিন্তু আমার-এ আশা যে বাস্তবের সঙ্গে মেরু দূরত্বে অবস্থান করছে কে জানত।

রিসিভার তুলে শুনতে পেলাম, 'হ্যালো—সমি, আমি কে বলত? কিরে, চিনতে পারছিস না? সমি—চিনতে পারছিস না আমাকে?'

'দাদা?'

'হ্যাঁ রে, কেমন আছিস?'

'ভালো। খুব ভালো আছি।'...

ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদছি আমি। ওপারে দাদা কথা বলছে। রিসিভার সরিয়ে নিয়েছি মুখ থেকে। আমার এ কষ্ট, এ বেদনার সাক্ষি রাখতে চাই না। চাই না আমার অশ্রু কারুর হৃদয় ভেজাক। আমি কি বড্ড বেশী আশা করে ফেলেছিলাম! গত রাত্রে ঠিক মত বাড়ি পৌঁছতে পেরেছি কিনা এ খবর নেওয়ার জন্য তো ভালোবাসার প্রয়োজন হয় না! আর যদিও বা হয়, জানতাম এটুকু ভালো তুমি আমাকে বাসোই। আমার এ জানাটাকে মিথ্যে প্রমানিত করে তোমার কি লাভ হল আহীর! তোমার ফোনের অপেক্ষায় আমার দিন কাটছে, এ আর নতুন কথা কি! কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তুমি চলে গেলে। আমাকে না জানিয়ে আন্দামানে ফিরে গেলে। এমন কি তোমার ফেরার নির্দিষ্ট দিনটাও আমাকে জানাওনি। কেন বন্ধু? পাছে তুমি না ডাকতেই আমি গিয়ে তোমার পথ আগলে দাঁড়াই? এ অপমান তো কেউ শত্রুকেও করে না, আর তুমি তো আমার বন্ধু! বন্ধু হয়ে কি কেউ এমন করে বন্ধু!

আমার সম্মান বোধ এত ঠুনকো নয় আহীর। সত্যিই যদি এমন কিছু ঘটে থাকে, আমাকে না জানিয়ে চলে যাওয়াটা যাদি তোমার ইচ্ছাকৃত হয়—তাহলে তুমি আমাকে অপমান করতে পারনি। অপমান করেছ নিজের বন্ধুত্বকে। কারণ একদিন তুমি নিজে আমাকে এ সম্মান দিয়েছিলে। বলেছিলে, 'তোমাকে না বলে চলে যাব

এটা তুমি ভাবলে কি করে! 'যাবার আগে তোমার সাথে একবার দেখা করব না!' এত তাড়াতাড়ি সে সম্মানের অধিকার ফিরিয়ে নিলে? মানছি, সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব অনেকটাই নিজের উপর বর্তায়। মানছি আমি শুধু তোমার বন্ধুত্বই চেয়েছিলাম। মানছি আমার সে চাওয়ার সীমারেখা লঙ্ঘন করেছি আমি। কিন্তু মন যে মানুষের শাসন মানে না আহীর। সে যে বড় স্বাধীনচেতা, বড় অবাধ্য। কারুর মানা সে শোনে না। শুনলে, এ পৃথিবীর মুখ্যদ্বারে নোটিস বোর্ড ঝুলত, "আবেগের প্রবেশ নিষেধ।" প্রকৃতি ডালা সাজিয়ে বসে থাকত কিন্তু পাখিরা তার সাথে গলা মেলাতো না। চাঁদনী রাত তো থাকত কিন্তু তা দেখে কেউ মুগ্ধ হত না, কবিরা গান বাঁধত না। প্রজ্ঞা ব্যক্তিরা অনেক দামি দামি শব্দ সৃষ্টি করতেন কিন্তু 'প্রেম' শব্দটার জন্ম হত না! পৃথ্বী গর্ভবতী হত কিন্তু তার প্রসব যন্ত্রণায় সুখ থাকত না। সেই আবেগহীন ধরিত্রীতে গর্ব করার মত আর যাই থাকুক এত ভালোবাসা থাকত না। মানুষ মানুষকে এমনি করে ভালোবাসত না কখনো। আর আমাকেও এভাবে কাঁদতে হত না তোমার জন্য। যার মন আছে সেই তো ভালোবাসে বন্ধু। ভালো তো তুমিও বাস। তোমার প্রকাশ নেই। তোমার ভালোবাসার প্রজাপতি শুধু উঁচু আকাশের বুকে ডানা মেলতে চায়। তাই তো মনের আঙিনায় তার ছায়া পড়ে না। কিন্তু আমি আমার কল্পজগতে সেই প্রতিবিম্বের স্পর্শ পেয়েছে। আমি ভালোবাসতে জানি আহীর। কেবল সেদিন ক্ষণিকের জন্য নিজের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। ইচ্ছে না থাকলেও তোমার কথাগুলো সত্যি মনে করছিলাম। তোমাকে সবজান্তা ভেবে আমার ভবিষ্যৎটা তোমার মর্জির কাছে সঁপে দিয়েছিলাম। তাইতো সেদিন অমন রিঅ্যাক্ট করেছিলাম, স্টুপিডের মত। তুমি কি ভাবছ, দৃপ্ত কণ্ঠে হুকুম করলে—'আমাকে ভুলে যাও'। আর আমি তোমাকে ভুলে গেলাম! অন্য কাউকে বিয়ে করে শান্তিতে সংসার পাতলাম! ব্যাপারটা বুঝি এত সোজা! বোকা ছেলে! আমার ভালোবাসাকে এতটা দুর্বল ভাবলে কি করে! জানতো, "মেয়েদের ভালোবাসা যখন শ্রদ্ধার দ্বারে পৌঁছে যায় সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা কারুর থাকে না।" এ আমার কথা নয়। আমার অনেক আগে কোন একজন অভিজ্ঞ মানুষ একথা বলে গিয়েছেন। তাঁকে আমি চিনি না। কিন্তু তাঁর এ উক্তি আমার বড় চেনা। 'নিজের ভালোবাসার গভীরতাকে যাচাই করতে ডুব দিয়েছিলাম নিজেরই মনের গহনে। ডুবতে ডুবতে অন্তিম চৌকাঠে পা ঠেকেছে আমার। যেখানে দাঁড়িয়ে এ উক্তির প্রতিধ্বনি শুনেছি আমি। আমাকে সমৃদ্ধ করেছে এ উক্তির প্রতিটি শব্দ। তাইতো আজ হাত বাড়িয়ে আকাশটাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে পারি—"তোমার ভালোবাসা পেলে মৃত্যুর আলিঙ্গনেও আমি দেখতে পারি বেঁচে থাকার স্বপ্ন॥"

মিথ্যে বলব না, প্রথমটায় বড় অভিমান হয়েছিল। পরে ভাবলাম, তুমি তো আমার নিঠুর দরদী। আমাকে চাবুক মেরে হাসতে বল। বাঁচার সাধন কেড়ে নিয়ে বল, ভালো থেকো। তেমনই হয়ত না বলে চলে গিয়ে তোমাকে ভুলতে সাহায্য করছ।

প্রমাণ করতে চাইছ আমাকে ভালোবাস না। কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ ভালোবাসায় আমি বিশ্বাসী নই আহীর। আমার ভালোবাসা প্রমাণ চায় না। চায় ভালোবেসে ভালোবাসাকে জয় করে নিতে। আর আমার এ জয়কে পরাজয়ের অন্ধকারে ঠেলে দিতে তুমি পার না। কথায় আছে, কোন মানুষ সারা জীবন ধরে হারলেও মৃত্যুর আগে একবার অন্তত সে জেতে। আমিও জিতব। হারতে হারতে আজ আমার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। কিন্তু মৃত্যুর আগে সেই বহু কাঙ্খিত অমোঘ জয়টা আমার এখনো বাকি রয়ে গেছে। তুমিই আমার জয় আহীর। দাও বন্ধু, আমার ভালোবাসাকে ভালোবেসে জিতিয়ে দাও। মানছি এ আমার অযাচিত প্রেম। কিন্তু ফুলের সুবাস, সেও তো অযাচিত। তুমি না চাইলেও সে তার দুর্লভ মাদকতায় তোমাকে পরিতৃপ্ত করে, তখন কি তুমি পার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে? পার এমনি করে নির্দয় হাতে মনের দরজা বন্ধ করে দিতে? অযাচিত বলে পার তাকে উপেক্ষা করতে? তাহলে আমার এ অযাচিত প্রেমকে কেন দু পায়ে মাড়িয়ে যেতে চাইছ? আহীর, সাগরের ঢেউ এসে তোমার পা দুটো ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে বলে ভেবো না, ঐ ঢেউ এর বুকে পা রেখে তুমি এগিয়ে যেতে পারবে।

সাগরের ঢেউ আসি
চুম্বিল রাশি রাশি
তব সৌম্য চরণ যুগল.
ভেবো না তাই বলে
সে ঢেউরে দু পায়ে দলে
সম্মুখে আগাইতে তুমি হইবে সফল।

※ ※ ※

সাদা খামের উপর আমার নাম লেখা। হাতের লেখাটা অপরিচিত। কে দিতে পারে ভাবতে ভাবতে খামের মুখ খুলে দীর্ঘ পত্রখানা বের করলাম। ওয়াও! এক্সেলেন্ট! ফ্যানটাস্টিক চিঠি। মিস্টার মহেন! কি সুন্দর একটা জলপরীর ছবি এঁকে পাঠিয়েছেন। পাথরের উপর বসে হাসছে। পাতার চারিদিকে গোলাপী রিবন আঁকা। রিবনের শেষ প্রান্তে একটা নোটিস বোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা—"I could not swim upto that island".

আচ্ছা! আমি আপনাকে সাঁতরে আইল্যান্ড পেরোতে বলেছি? সে ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি ভেবেছেন সেটা আপনার মহানুভবতা। I also could not swim upto that island. But I must try to reach my destination.

গত তেরই ডিসেম্বর মহেনকে চিঠি দিয়েছিলাম আজ পয়লা মার্চ। আড়াই মাস পর রিপ্লাই। এনি ওয়ে, লেট ইজ দ্যা বেটার দ্যান নেভার।

Hi Miss Kuhali,

আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি একটু অবাক হয়েছি আপনার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে। আহীরদার কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনার লেখা চিঠির নির্বাচিত কলামগুলো (শুধু যেটুকু আমাকে আহীরদা দেখিয়েছে) পড়েছি। কবিতাও পড়েছি। ভালো লেখেন আপনি। যদিও আপনার এ চিঠিতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু কথাই আছে। তবু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না—এর প্রতিটি লাইনে হতাশার শ্বাস বইছে। অথচ সৌজন্যবোধ এক চুলও মাত্রা ছাড়ায় নি কোথাও।

আহীরদার কাছ থেকে শেষ চিঠি এসেছিল প্রায় দুমাস আগে। তাও transit camp থেকে লেখা। ওটাই এখান থেকে যাবার পর ওর লেখা প্রথম চিঠি। তাও আমাকে লেখা নয়। বাড়িতেও চিঠি দিয়েছে কিনা জানতে পারিনি। চিঠি দিয়েও কোনও উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়েছি, খানিকটা আপনারই মতো। অপনার ক্ষেত্রে টানাপোড়েনটা একটু বেশীই হবে। অস্বীকার করবেন ? তা করতে পারেন—তবে আমার অনুমান—অনুমান বলি কেন—বিশ্বাস বলতে পারি ; আপনার মনের অবস্থা ভালো নেই। আপনার চিঠি তো তাই বলে।

আপনার হয়ে ওকে কিছু লিখি—এটা আপনি চান না। চাইলেও কিছু করে উঠতে পারতাম না। কেউ মুখ ফিরিয়ে থাকলে কি করা যায় ? 'Farax baby'—তো আর নয় যে ভুলিয়ে রেখে মান ভাঙা যাবে ! আমার রাগ হচ্ছে ওর ওপর।

আমি জানি আপনি কষ্ট পাবেন। শুরুতেই যে মনের chemistry-তে গোলমেলে ক্রিয়া-বিক্রিয়া জুড়ে ফেলেছেন ! আহীরদার কোন খবর আপাততঃ আপনাকে দিতে পারলাম না। এজন্য আমি দুঃখিত। এরমধ্যে যদি আহীরদার কোন চিঠি পাই তাহলে আপনাকে অবশ্যই ওর কথা লিখে জানাব।

এ পৃথিবীতে অনেক আলো—অনেক হাওয়া, বাঁচতে শিখুন। যেমনটি আগে ছিলেন।

ভালো থাকুন। শুভেচ্ছা রইল—

মহেন।

চিঠিটা বার কয়েক পড়লাম। অনেকদিন পর আহীরের তরফ থেকে কোন চিঠি পেলাম। মানছি এতে আহীরের কোন খবর নেই, কিন্তু ওর নাম তো লেখা আছে। আর মহেন তো আহীরেরই বন্ধু। আমার মন কেমন করছে। মহেনের সমব্যথীতা আমার ক্ষতস্থানকে স্পর্শ করেছে। শীতলতার স্পর্শে উষ্ণ বাষ্প যেমন করে বিন্দু বিন্দু ঘামে পরিনত হয় ঠিক তেমনি করে ক্ষতের উপর তিল তিল রক্তকনা জমছে। আমি চোখ বুজে প্রত্যক্ষ করছি সে ঘনীভবনের দৃশ্য।

আহীর কি একা থাকতে বেশী ভালোবাসে ! ওর কোন ইন্টিমেট ফ্রেন্ড নেই কেন ! না কি আছে আমি জানি না ! আমি তো ভেবেছিলাম মহেনের সাথে ওর ভীষণ বন্ধুত্ব। তাই যদি হবে তাহলে ওর সাথে যোগাযোগ রাখেনি কেন ! মহেন

আহীরদা লিখেছে, তাহলে কি আহীরের থেকেও জুনিয়ার! তা হোক, বয়সের ফারাকে বন্ধুত্ব আটকায় না। আমি ভাবছি এ চিঠির একটা প্রতিউত্তর পাঠান দরকার। সৌজন্য বোধ বা ভদ্রতা যাই বলি না কেন তার সম্মান রাখতেই এটা প্রয়োজন। না; এ চিঠিতে আর হতাশার শ্বাস বইবে না। যন্ত্রনার জায়গাটা আমি কারুর সাথে শেয়ার করতে পারি না মহেন। আপনার সাথেও না। আমি জানি, আপনিও আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়। এ পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ প্রতিটা মানুষের আত্মীয়। আমরা যে সবাই আদম—ঈভের বংশধর। অথচ কি অসম্ভব দূরত্ব একের সাথে আর এক জনের। আমি নিজের ক্ষেত্রে কিছুতেই এ দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারি না। এ নিয়ে আমার প্রতি বন্ধুদের সে এক নিদারুন অভিযোগ —'তোর কি কোন কথাই নেই? কোন সমস্যা নেই? আমরা আমাদের কষ্টের কথা তোকে বলি। তোর কি কোন কষ্ট নেই? এটা তো হয় না। রক্ত মাংসের মানুষ যখন দুঃখ কষ্ট তোরও আছে। তুই বলিস না আমাদের কাছে। তুই স্বার্থপর। আমাদের বন্ধু বলিস কিন্তু বন্ধুত্বের মর্যাদা দিস্ না। যে কষ্ট বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে হয় সেটা তুই একা একা বয়ে বেড়াস।...'কতদিন এই কথা নিয়ে রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে গেছে আর কোনদিন আসব না তোদের বাড়ি। কদিন যেতে না যেতেই আবার এসে হাজির। এক গাল হেসে বলে, 'কেমন আছিস কুহেলি? তোর ওপর রাগ করে থাকা যায় না।' ছেলেগুলো বলে তুই আমাদের 'সুজাতা'। মান্না দের ''কফি হাউস' গানের সুজাতার মত তুইও খুব সুখে থাকবি। তোর ভালো বর হবে, গাড়ি, বাড়ি, গয়না হবে। আর আমরা রমা রায় অমলদের মত বেকারত্ব, ব্যর্থপ্রেম আর হতাশার আগুনে পুড়তে পুড়তে একদিন গোয়ানিজ ডিসুজার মত ঘুমিয়ে পড়ব। আমি তখন হাসি মনে মনে। চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করি নিজেকে—কি কুহেলি তুমি তো তোমার বন্ধুদের চোখে সফল, সুখী সুজাতা। সত্যিই কি তাই? উত্তর মেলে—এক নিরব বাঁকা হাসি। যে হাসির শব্দ দরদী বন্ধুদের কানে গিয়ে পৌঁছয় না। যে হাসির ছবি ঐ বন্ধুদের চোখে প্রতিফলিত হয় না। যে হাসির অর্থ বন্ধুদের দীর্ঘশ্বাসের জন্য দায়ী হয় না। আসলে এসব মন কেমন করা কথা বলে ওরা আমাকে আপাত দৃষ্টিতে ওদের থেকে আলাদা করতে চায়। আমাকে পরোক্ষ ভাবে ইনসিস্ট করে মুখ খুলতে। ভাবে এই বুঝি কুহেলি রেগে গিয়ে দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসল। কিন্তু আমি নিজের দুঃখের উপাখ্যান শুনিয়ে আমার বন্ধুদের আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। ওরা নিজেদের সমস্যায় জর্জরিত, আমি আর কেন বিব্রত করি ওদের। আর তাই চিরকাল আমার কষ্টটা রয়ে গেছে একান্ত ভাবে আমার। সুখের ভাগ করতে পারি নির্দ্ধিধায় কিন্তু কষ্ট ভাগের ক্ষেত্রে আমি কৃপণ। তাই বুঝি আজ আমি অ্যাটলাসের মত ভারাক্রান্ত, মুহ্যমান। ঘাড় গুঁজে হাঁটু মুড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছি। আমার এ নিম্ন দৃষ্টি নিয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি মহেন। জানি না আমার বেদনার নাব্যতাকে উপেক্ষা করে সৌজন্য বোধের গণ্ডীর মান রাখতে পারব কি না।

Mr. Mahen,

"খুদা কি ঘর মে দের হ্যায় আন্ধের নেহী"—আজ আপনার চিঠিটা পেয়ে এই প্রবাদ বাক্যটা আর একবার সত্যি মনে হচ্ছে। অবশ্য এটাকে চিঠি না বলে সমগ্র একটা ছবি বলাই ভালো। কি বলব—excellent! অভূতপূর্ব! থাক না; নাইবা কিছু বললাম। জানেন তো মাঝে মাঝে কিছু না বলার মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু বলা হয়ে যায়! তাই এক্ষেত্রে সেই মৌন ভাষাটাই বেছে নিলাম। জনান্তিকে বলে রাখি, এ চিঠির যথাযথ মূল্যায়ন করতে আমি অক্ষম। আহীরের কাছে শুনেছি আপনি ভালো ফটোগ্রাফার। দামি ক্যামেরা ট্যামেরা রাখেন। কিন্তু নিজে এত ভালো ছবি আঁকতে পারেন জানতাম না। ধন্যবাদ; আমার নতুন বন্ধুর সাথে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। 'জল পরীর' হাসিটা ভারি সুন্দর। এক সময় আমিও হাসতাম জানেন! আপনার জল পরীর মত নির্ঝর হাসি। এ পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় আর তাই বোধ হয় সেই হাসিও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

আপনাকে একটা অনুরোধ, আমার কথা ভেবে আহীরের উপর আপনি রাগ করবেন না প্লীজ। কারণ আমার মনে হয় ও যা করছে সেটা ওর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। "When our finger burn we always blem the fleam—" এ থিওরিতে আমি বিশ্বাসী নই। পোড়ার যন্ত্রণা নিরবে সহ্য করার ক্ষমতা না থাক, সেটাকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা আমার নেই। মহেন বাবু. মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যদি আলো আর বাতাসই sufficient হত তাহলে এত মন অকালে মারা যেত না। আপনি লিখেছেন, আমি যেন আবার আগের মত করে বাঁচতে শিখি। তাই কি হয়? জানেন তো, একটা ভাঙা আয়নাকে যতই নিখুত ভাবে জোড়া লাগান হোক না কেন একটা সরু দাগ বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেয় আয়নাটা একবার ভেঙে গেছিল। আপনিই বলুন, একটা ভাঙা আয়নার কাছ থেকে বিকৃত প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিই বা আশা করা যায়?

Any way, আহীরের সাথে আমাব দেখা হয়েছে। আমি ভালো আছি। তবে সকলের ভালো থাকার সংজ্ঞাটা তো সমান নয়; তাই বলি, আমি আমার মত করে ভালো আছি। আর কি লিখব—আপনি তো জানেন আমার শিল্প বিবর্ণ। আপনার মত থাকত যদি রঙিন ভাষা গঠনের ক্ষমতা তাহলে হয়ত নতুন করে কিছু দেবার প্রচেষ্টা করা যেত—তা যখন নেই, খালি হাতেই ইতি টানছি। আশা করি আমার এ অক্ষমতা ক্ষমার অযোগ্য হবে না।

Thanks for the sweet reply. কুহেলি

"দীঘার সমুদ্রের ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেবলই মনে হত, সাঁতরে যদি ওপারে যাওয়া যেত তো এক্ষুনি চলে যেতাম। এই সমুদ্রের মাঝে কোথাও তো রয়েছে আন্দামান। ঐ যে—যেখানে সীমাহীন সাগরের বুকে মুখ রেখে আকাশটা সোহাগ

করছে, আর সাগর তার ঢেউ এর পরশে আদরে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছে প্রেমিক আকাশকে। ঐ খানে—ঐ খানে তো আন্দামান। আহীর যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাটিকে স্পর্শ করে আছে এই জল। মনে হচ্ছে এই ঢেউ এর কাছে আত্ম সমর্পণ করি। এই ঢেউই আমাকে পেঁৗছে দেবে আহীরের কাছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছি সীমাহীন সীমার দিকে। এর আগে কখনো এত জল দেখিনি। অথচ আমার একটুও ভয় করছে না। আমি স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটে চলেছি। বাধা পেলাম পিছন থেকে—'সমি, অতদূরে যাচ্ছিস কেন! একা একা ঢেউ এর মাঝে যাস না। এই সাত সকালে জামাটা ভেজালি তো! উঠে আয়; উঠে আয় বলছি।'

নেই। মুক্তি নেই। এই বাস্তব থেকে মুক্তি নেই। 'ও গড়! গিভ্ মী স্যালভেশান প্লীজ! প্লীজ গিভ্ মী।'

আমার এ আর্ত স্বগতোক্তি দু চোখে এনে দিল নোনা জলের ঢেউ। বুকের মাঝে জোয়ারের গর্জন আর অন্তরে বিশ্বাসের ঝিনুকে সুরক্ষিত প্রেমের মুক্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি সাগরের বুকে। আমি যেন সাগরেরই প্রতিভূ। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গলিত মোমের মত পড়ে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বিশাল জলরাশিতে। আমি যেন ঋণ পরিশোধ করছি। সাগরিকা আমাকে আহীরের স্পন্দন দিচ্ছে, আর আমার এ অশ্রু তারই বিনিময়।

'তুমি ফিরে এস আহীর'—সাগরের মুখে এ বার্তা পাঠালাম।"

* * *

আজ তেইশে মার্চ। ঠিক এক বছর আগে এমনই একটা দিনে আহীর নামের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আমার জীবনে। একটা নামের অনুপ্রবেশ। একট নতুন জীবনের অনুপ্রবেশ। একটা অধ্যায়ের অনুপ্রবেশ। গত এক বছর ধরে আমার প্রতিটা পল: প্রতিটা মুহূর্ত সাক্ষী রয়েছে এই অনুপ্রবেশের প্রতিফলনের। সেই দিনটার সঙ্গে আজকের দিনটার কত তফাৎ। সেদিনের কুহেলি সকালের সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারত। আর আজকের কুহেলি মিশরের পিরামিডে শুয়ে মমি হয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষা করছে। সূর্য্য ওঠার হিসেব কষতে ভুলে গেছে সে। এতো মেটামরফসিস্। নদীর উৎসের সঙ্গে মোহনার তফাৎ—ঝড়ের সঙ্গে নিঃশ্বাসের তফাৎ—দাবানলের সঙ্গে দীপশিখার তফাৎ।

আমি একা বসে আছি। ইডেনে সেই প্যাগোডার নিচে। সেই একই জায়গায়। আমার ডান পাশের জায়গাটা ফাঁকা। শেষ দিন ওখানে আহীর বসেছিল। আজ আহীর নেই। আছে ওর অনুপস্থিতি। এই অনুপস্থিতির মধ্যেও আমি ওর উপস্থিতি খুঁজে পাচ্ছি। অনুভব করছি ওর সান্নিধ্য। ওর নিঃশ্বাসের অনুরনণ শুনতে পাচ্ছি আমি। শুনতে পাচ্ছি ওর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। শেষ দিন এখানে বসে ও আমাকে হাসিয়ে হাসিয়ে পাগল করে দিয়েছিল। লাগাম ছাড়া ভাবে কথা বলছিল সেদিন।

আজ স্মৃতির আগুনটা উস্কে দিয়ে নিজেকে পোড়াচ্ছি। স্মৃতির উত্তাপে দগ্ধ করছি আমার ক্ষত।

কতক্ষণ এভাবে বসে আছি কে জানে! আমি কি তপস্যায় বসেছি! অনন্ত কাল ধরে বসে আছি এখানে! আহীর আমার তপস্যার অভিষ্ঠ। না; এ তপস্যা নয়, এ লড়াই। আমার লড়াই আমার নিজের বিরুদ্ধে। আমি একা লড়ছি। এমন কি যার জন্য লড়াই সেও নেই আমার সাথে। কি অদ্ভুত! আমি সঠিক জানি না এ আমার তপস্যা না লড়াই। শুধু এটুকু জানি, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই বাস, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই সত্যকে আশ্রয় করে তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি। চাও তো পরীক্ষা করে দেখতে পার। আমার এ প্রতীক্ষার পরিসর জানা নেই, তবে শেষ একদিন হবেই। সেদিন তুমি নিজে আসবে আমায় নিতে। আমি হয়ত ফসিল হয়ে যাব তখন। অথবা ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়া কোন থাতিলানো অতীত।

তবুও তুমি এস আহীর। তোমার আবেগহীন যান্ত্রিক মনটা একা একা পথ চলতে চলতে যেদিন ক্লান্ত হয়ে পড়বে সেদিন এস আমার কাছে। কথা দিচ্ছি আমি ফসিল হয়ে গেলেও আমার মনটা ফল্গুর মত রাখব অশ্রুসিক্ত। তুমি আমাকে অনেক যত্ন করে অবহেলা দিয়েছ। তোমার এই সযত্ন অবহেলার প্রতি আমার যে একটা দায়-বদ্ধতা আছে আহীর। তাকে অস্বীকার করি কি করে ব'ল! আর তাকে বরণ করতেই যে বিরহের পাতায় পাতায় অশ্রুবারীতে লিখে চলেছি এ হৃদয় আলেখ্য।

অন্ধকার নেমে এসেছে। শুধু এ মাটির বুকে নয় আমার জীবনেও। আমি অন্ধকারের পথযাত্রী। ইডেন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি, সেই চেনা পথ ধরে। এ পথ দিয়ে কতদিন গল্প করতে করতে আমরা বাড়ি ফিরেছি। আজ আমি একা। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমি একা। বহু চেনা পথ আজ অচেনার আস্তরণে ঢেকে আছে। আলেয়ার আলোয় পরিবৃত এ যেন অন্য কোন গ্রহের পথ। সেই আলো আঁধারি ছায়াপথ ধরে আমি হাঁটছি—আমি হাঁটছি—আমি হাঁটছি। আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস। অলস পদক্ষেপের তালে অনুরণিত হচ্ছে সে দীর্ঘশ্বাস খান্ খান্ হয়ে যাওয়ার শব্দ। আমি দেখছি, দিক্ চক্রবাল রেখাকে স্পর্শ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে জনহীন প্রান্তর দিয়ে যুগ যুগান্ত ধরে চলেছে আমার নিঃসঙ্গ সপ্তপদী গমন।

চারিদিক পাষাণের মত নিস্তব্ধ। আর সেই জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে সুদূর মহাকাশ থেকে ভেসে আসছে আমার কবিগুরুর কণ্ঠস্বর—

"দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটেছে গরব
তবু প্রেম কিছুতেই মানে না পরা

ঃ সমাপ্ত ঃ